॥ পূর্ণ পরমাত্মায় নমঃ ॥

# জীবনের পথ

## (Way of Living)

লেখক:- সন্ত রামপাল দাস
শিষ্য
স্বামী রামদেবানন্দ জী মহারাজ

**জীব আমাদের জাতি, মানব (Mankind) ধর্ম আমাদের।**
**হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ঈসাই পৃথক কোনো ধর্ম নয় ॥**

প্রার্থনা:- বাঙালি ভক্ত সমাজের সরল ভাষাতে বোধগম্য হওয়ার জন্য সন্ত রামপালজী মহারাজের দ্বারা লিখিত "জীবনের পথ" পুস্তক, যা সমস্ত ধার্মিক গ্রন্থের আধারে লেখা হয়েছে। এই পুস্তকটি হিন্দি "জীনে কি রাহ" থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে, এই পুস্তকে লেখা সমস্ত প্রমাণ, বিবরণ এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা হিন্দি ধার্মিক শাস্ত্রের সাথে মিলিয়ে সত্যতা যাচাই করতে পারেন।

# অবশ্যই দেখুন

সন্ত রামপাল জি মহারাজের মঙ্গল প্রবচন

প্রতিদিন রাত 07:30 থেকে 08:30

প্রতিদিন রাত 08:30 থেকে 09:30

প্রতিদিন সকাল 06:00 থেকে 07:00

LOKশাহী

প্রতিদিন সকাল 05:55 থেকে 06:55

প্রতিদিন দুপুর 02:00 থেকে 03:00


প্রকাশক :- প্রচার প্রসার সমিতি ও সর্ব সংগত

সতলোক আশ্রম, হিসার - টোহানা রোড বরবালা

জেলা - হিসার (প্রান্ত - হরিয়াণা) ভারত।

মুদ্রক :- কবীর পিন্টার্স

C-117, সৈক্টর-3, ববানা ইন্ডস্ট্রিয়ল এরিয়া নিউ দিল্লী

ধর্মার্থ মূল্য :- ২০ টাকা /-


সন্ত রামপাল জী মহারাজের কাছ থেকে নাম উপদেশ (মন্ত্র দীক্ষা) প্রাপ্ত করার জন্য এবং অধিক তথ্য জানার জন্য এই নম্বর গুলিতে যোগাযোগ করুন :-


সম্পর্ক সূত্র (বাংলা) :- +91 8882914911, +91 8450030878, +91 8373002290, +91 6295917636

সম্পর্ক সূত্র (আশ্রম) :- +91 8222880541, +91 8222880542, +91 8222880543, +91 8222880544, +91 8222880545

Visit us at : www.jagatgugurampalji.org

E-mail : jagatgugurampalji@yahoo.com

# -: বিষয় সূচী :-

❒❒❒

# "ভূমিকা"

সন্ত রামপালজী মহারাজ প্রণীত 'জীবনের পথ' পুস্তকটি বিশ্বের প্রত্যেক বাড়িতে রাখার যোগ্য। এই পুস্তক পড়লে তথা এই পুস্তকের নিয়ম মেনে চললে মানুষ এই লোকে ও পরলোকে সুখী হবেই। পাপ কর্মের ফলে প্রাপ্য দণ্ড ভোগের হাত থেকে বাঁচবে। চিরতরে অশান্তি, কলহ (ঝগড়া-ঝাটি) সমাপ্ত হয়ে যাবে। ছেলে বৌ-রা মাতা-পিতা, শ্বশুর-শাশুড়ীদের অন্তর থেকে সেবা-যত্ন করবে। পরিবারে শান্তি বিরাজ করবে। বিশ্বের প্রতিটি ঘরে পূর্ণ পরমাত্মার নিবাস হবে। ভূত, প্রেত, পিতর, ভৈরব বেতালের মত আত্মারা ঐ সব পরিবারের আশেপাশে আসতে পারবে না। দেবতারা ঐ সময় ভক্ত পরিবারের সুরক্ষা প্রদান করবে। যে সকল পুণ্য আত্মারা এই পুস্তক পড়ে পূর্ণ গুরুর কাছ থেকে নাম দীক্ষা নিয়ে নিয়মের (মর্যাদা) সাথে সাধনা করবে তাঁদের পরিবারে অকাল মৃত্যু হবে না।

এই পুস্তক পড়লে দুঃখী পরিবার সুখী হবে। যে বাড়িতে এই পুস্তক থাকবে সেই বাড়ির লোক এই পুস্তক পড়ে নিজের ইচ্ছায় নেশা করা বন্ধ করে দেবে কারণ এই পুস্তকে এমন প্রমাণ দেওয়া আছে, যাতে অন্তর আত্মা জাগ্রিত হয়ে যাবে। মদ, তামাক বা অন্য নেশার প্রতি ঘৃণা জন্মে যাবে, এমনকি এই সব জিনিসের নাম নিতেই আত্মা কেঁপে উঠবে। সমস্ত পরিবার সুখী হবে, জীবনে চলার পথ সহজ সরল হবে। কারণ তখন জীবনের লক্ষ্য পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পূর্ণ পরমাত্মা কে? তাঁর নাম কি? পূর্ণ পরমাত্মার ভক্তি কিভাবে করতে হবে? এই সকল বিষয় এই পুস্তকের মাধ্যমে জানতে পারবেন।

পরিবারে কোনো প্রকারের বিকার (খারাপভাব) থাকবে না। মানব জীবন সফল হয়ে যাবে। পরমাত্মার কৃপা সর্বদা থাকবে। জীবন চলার পথ উত্তম হওয়ায় জীবনের যাত্রা সহজ হয়ে যাবে। যাঁরা এই পুস্তক বাড়িতে রাখবে না, তাঁদের জীবন চলার পথ কঠিন হবে। তাঁরা জগৎ সংসার রূপী বনে ভ্রমণ করে দূর্লভ অমূল্য মানুষ জীবন নষ্ট করে দেবে। পরমাত্মার দরবারে যাওয়ার পর নিজ ভুল কৃত কর্মের জন্য আফসোস করে বলবে, হে ভগবান! আমি এ কি করলাম। তখন তাঁরা বুঝতে পারবে জীবনের চলারপথ না পাওয়ার জন্য জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই তাঁরা আবার পরমাত্মার কাছে প্রার্থণা করবে, হে প্রভু! আমাকে আর একবার মানব জীবন দাও। আমি এইবার সত্য মনে আপনার ভক্তি করবো। জীবনের সত্য চলার পথ খোঁজ করার জন্য সৎসঙ্গে যাব। আজীবন ভক্তি করে নিজের আত্মার কল্যাণ করাবো। তখন পরমাত্মার দরবারে (কার্য্যালয়) আপনার পূর্বজন্মের চলচ্চিত্র চালানো হবে। যতবার আপনি মানব জীবন প্রাপ্ত করেছিলেন ততো- বারই এই একই প্রার্থণা করেছিলে, হে প্রভু। আমাকে আর একবার মানব জীবন দাও আমি আর অপকর্ম করব না। আজীবন আপনার ভক্তি করে জীবন যাপনের জন্য গৃহস্থ কর্ম করব আর পূর্ণ সদগুরু থেকে দীক্ষা নিয়ে নিজের আত্মার কল্যাণ করাব। যে ভুল এই মানব জীবনে আমি করেছি তা দ্বিতীয় বার করব না। তখন পরমাত্মা বলবে, নিজের বুদ্ধিতে নিজে মূর্খ হয়ে পাপের গাড়ি ভরে জীবন নষ্ট করে এসেছ, এখন আমাকে মূর্খ বানিয়ে কোন লাভ হবে না। এখন নরক ভোগ কর আর চুরাশি লাখ যোনী ভ্রমণ কর। যখন মানব শরীর (স্ত্রী-

পুরুষ) প্রাপ্ত হবে তখন সাবধান হয়ে পূর্ণ সন্তের সৎসঙ্গ শুনে নিজের জীবনের কল্যাণ করাবে।

পাঠকবর্গদের কাছে নিবেদন এই পবিত্র পুস্তক পড়লে আপনার একশো এক পীঢ়ী ইহলোক ও পরলোক সুখী হবে। পরমাত্মার আদেশ মনে করে সবাই মিলে এই পুস্তক পড়ুন এবং অন্যদেরও পড়ে শোনান। এখানে লেখা প্রত্যেক প্রসঙ্গ সত্য মনে করবেন। এ কারো নিজের ভাবনা নয়। পরমেশ্বরের এই দাস (সন্ত রামপাল দাস) মানব জীবনের কল্যাণের জন্য বা উদ্দেশ্যে লিখেছেন। তাই সর্বাত্মা লাভ গ্রহণ করুন।

॥ সত সাহেব॥

লেখক
দাসন দাস রামপাল দাস
শিষ্য-স্বামী রামদেবানন্দ জী
সতলোকআশ্রম বরবালা
জেলা: হিসার, হরিয়াণা **(ভারত)**

# দুটি কথা

প্রাণীদের জীবন যাত্রা জন্ম থেকেই শুরু হয় এবং তাদের ঠিকানা (মঞ্জিল) পূর্ব নির্ধারিত হয়। এই পবিত্র পুস্তকে মানব জীবনের চলার পথের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। মানবের (স্ত্রী/পুরুষ) লক্ষ্য মোক্ষ প্রাপ্তি। এই পথে পাপ ও পুণ্যের কাঁটা বা গর্ত আছে। সেই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:- পুণ্য কর্ম রূপী দুটি গর্ত

পাপ রূপী কাটা বা গর্ত-মানব জীবন শাস্ত্র বিধি অনুসার পরমাত্মার সাধনা করে মোক্ষ প্রপ্তি করার জন্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পাপ কর্মের কষ্ট ভক্তিতে বাধার সৃষ্টি করে। উদাহরণ পাপ কর্মের ফলে শরীরে রোগ হওয়া, ফসল নষ্ট হওয়া, গৃহপালিত পশুর হানি ইত্যাদি অর্থ কষ্ট বা ঋণ বৃদ্ধি করে। ঋণী ব্যক্তি দিন রাত চিন্তিত থাকে। তাই সে ভক্তি করতে পারে না। পূর্ণ গুরু থেকে নাম উপদেশ নিলে পূর্ণ পরমাত্মা উপরোক্ত কষ্ট সমাপ্ত করে দেয়। তখন ভক্ত অধিক শ্রদ্ধার সহিত ভক্তি সাধনা করতে পারে। পরমাত্মার উপর বিশ্বাস বেড়ে যায় এবং ভক্তি ভাব দৃঢ় হয়। কিন্তু ভক্তকে পরমাত্মার উপর সমর্পিত হতে হবে। যেমন পতিব্রতা স্ত্রী নিজের পতি (স্বামী) ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে কামবাসনা পূর্তির জন্য স্বপ্নেও চিন্তা করে না। সে যতই সুন্দর হোক। পতি-পত্নীর প্রত্যেক প্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়ার যথা সম্ভব চেষ্টা করে এবং বিশেষ প্রেম ও করে। সেইরূপ পূর্ণ গুরু থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত করার পরে পরমাত্মার সাথে আত্মার সংযোগ হয়ে যায়। গুরুজী আত্মার বিবাহ পরমাত্মার সাথে করায়। এই মানব শরীর ধারী আত্মার নিজের পতি পরমেশ্বর তাঁর জীবন চলার পথের বাধক পাপ রূপী কাটা (কর্ম) ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে দেন অর্থাৎ পাপ কর্ম সমাপ্ত করে দেন। ঐ আত্মার জীবন চলার পথ সুগম ও বাধা রহিত হয়। এবং সহজেই এঁর মঞ্জিল প্রাপ্ত হয়। ঐ আত্মার জন্য পরমাত্মা কি না করেন! সন্ত গরীব দাসজী পরমেশ্বর কবীরজী থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানে বলেছেন:-

**গরীব, পতিব্রতা জমী পর, জ্যো জ্যো ধরি হৈ পাঁবে।**
**সমর্থ ঝাড়ু দেত হৈ, না কাঁটা লগ জাবে॥**

পরমেশ্বর কবীর জী বলেছেন-

**কবীর, সাধক কে লক্ষণ কহুঁ, রহে জ্যো পতিব্রতা নারী।**
**কহ কবীর পরমাত্মা কো, লাগৈ আত্মা প্যারী॥**
**পতিব্রতা কে ভক্তি পথ কো, আপ সাফ করে করতার।**
**আন উপসনা ত্যাগ দে, সো পতিব্রতা পার॥**

ভক্তি করলে ঐ পাপ সমাপ্ত হয়ে যায়, যা ভক্তি পথের বাধা হয়েছিল।

**কবীর, জব হি সত্য নাম হৃদয় ধরো, ভয়ো পাপ কো নাশ।**
**জৈসে চিঙ্গারী অগ্নি কী, পড়ে পুরানে ঘাস॥**

এই জন্য পূর্ণ গুরু থেকে নাম দীক্ষা নিয়ে প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষ, ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে (তিন বছরের উর্দ্ধে) বৃদ্ধ, যুবক সবাইকে ভক্তি করা উচিত।

**পুণ্য ভক্তি পথের বাধা হয়:-**

পূর্ব জন্মে করা পুণ্যের ফলে টাকা, পয়সা, ধন দৌলত অর্থাৎ সকল সুবিধা প্রাপ্ত হয়, কেউ রাজার পদ প্রাপ্ত করে। এই অতিরিক্ত সুখ সুবিধা ভক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই সুখ মানুষ কে পরমাত্মার থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়। এমন সুখ জীবনে চলার পথের কাঁটা। কারণ এই সুখের জন্য আমরা পরমাত্মাকে ভুলে যাই।

**কবীর, সুখ কে মাথে পত্থর পড়ো, নাম হৃদয় সে জাবৈ।**

**বলিহারী ও দুঃখ কে, জো পল-পল নাম রটাবৈ॥**

একবার কোন ধনী ব্যক্তি বা কোন রাজাকে পরমাত্মার কথা শোনানোর চেষ্টা করে দেখুন। তিনি পরমাত্মার জ্ঞান শোনায় রুচি দেখাবেন না। অন্য দিকে পাপ কর্ম ফল ভোগ করা কোন ব্যক্তিকে পরমাত্মার চর্চা শোনাও আর বলো পরমাত্মা সমস্ত কষ্ট দূর করে দেন। আমাদের গ্রামের অমুক ব্যক্তি ঐ সন্তের কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়ে সুখী হয়েছেন। আপনিও পরমাত্মার ভক্তি করুন। ঐ ব্যক্তিও আপনার মত দুঃখী ছিলেন। তখন ঐ দুঃখী ব্যক্তি পরমাত্মার ভক্তিতে লেগে যাবে। ঐ দুঃখ ঐ ব্যক্তির জন্য আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়াবে। যে সুখী তাকে কি ভাবে বোঝাবেন? তার কাছে পূর্ব জন্মের ভক্তি রূপী পুণ্য ধন পর্যাপ্ত পরিমানে আছে। ঐ ব্যক্তি নিজের পুণ্য কামাই নষ্ট করে মৃত্যুর পরে পাপ রূপী মাল গাড়ি ভরে ভীরু কাপুরুষের ন্যায় মুখ নিচু করে পরমাত্মার সামনে দাঁড়াবে। পরবর্তীতে কুকুর, গাধা, শুয়োরের জন্ম হবে অর্থাৎ ৮৪ লক্ষ প্রকার যোনী প্রাপ্ত করবে। অন্য দিকে ঐ নির্ধন ব্যক্তি পরমাত্মার ভক্তি করবেন দান- ধর্ম করে এই লোকে সুখ ভোগ করে আর পাপ কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে, ভক্তি ধনে ধনী হয়ে পুণ্য রূপী মাল গাড়ি ভরে নির্ভয়ে পরমাত্মার দরবারে যাবেন। পরমাত্মা তাকে বুকে টেনে নিয়ে পূর্ণ মুক্তি দিয়ে চিরকালের জন্য সুখী করে দেবেন।

যদি ধনী বা রাজার পদ প্রাপ্ত সুখী ব্যক্তি ভক্তিতে লেগে যায় তাহলে তাঁর মোক্ষতে কোন বাধা আসে না।

প্রশ্ন:- এক সত ব্যক্তি বলেন, আমি কোন নেশা করি না, অন্যায় বা খারাপ কাজ থেকে সব সময় দূরে থাকি, অন্যের মা-বোনকে নিজের মনে করি। কোন পাপ কাজ করি না। আমার ভক্তি করার কোন প্রয়োজন নেই। সৎসঙ্গে এমন ধরনের মানুষকে যেতে দেখি যারা বদনামী এবং খারাপ কাজ করে।

উত্তর:- যেমন ধরুন দুই একর জমি, এক একর জমির ঘাস বা জঙ্গল পরিষ্কার করে হাল চাষ করে রেখে দিয়েছো কিন্তু বীজ রোপন করোনি।

অন্য এক একর জমিতে, ঘাস বা জঙ্গলে ভরা। এই দুই জমিই ব্যর্থ। যদি কেউ ঐ জঙ্গল ভরা জমি পরিষ্কার করে ধান বা গমের বীজ বপন করে দেয় তাহলে তা ঐ পরিষ্কার করা জমি থেকে অনেক গুন ভাল।

তাই যদি আপনি বিকার অর্থাৎ পাপ মুক্ত হয়েও যান, তাহলেও আপনাকে ভক্তি রূপী বীজ বপন করতেই হবে, তখন শরীর রূপী ক্ষেতের (জমি) লাভ প্রাপ্ত হবে।

যদি কেউ খারাপ কাজ করে এবং জ্ঞান হওয়ার পরে সমস্ত বিকার (খারাপ কর্ম) ছেড়ে পরমাত্মার ভক্তি করে, তাহলে সে তার জীবন চলার পথ পরিষ্কার করে নিয়েছে। তাই সে তাড়াতাড়ি লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

আপনারা এই গ্রন্থে, পরবর্তীতে জানতে পারবেন, এক বেশ্যা, কবীর পরমাত্মার সৎসঙ্গ শুনে নিজের জীবন চলার পথ পরিবর্তন করে নাম দীক্ষা নিয়ে সৎ সঙ্গে যাওয়া শুরু করেন। কিন্তু নগরের (ছোট শহর) লোকদের ভালো লাগে না। মুখ বাকা করে বলতে শুরু করে, বলে যে কবীর সাহেবের সৎসঙ্গে বদনামী স্ত্রী যায়। এ ভালো সন্ত নয়। নিজেদের মেয়ে বোনদের ওখানে যেতে দেবে না। লোকের কথা শুনে কিছু ভক্ত ও একই কথা বলতে শুরু করে। তখন পরমেশ্বর কবীর জী বলেন :-

**কুষ্ঠী হো সন্ত বন্দগী কীজিয়ে।**
**জে হো বেশ্যা কো প্রভু বিশ্বাস, চরণ চিত দীজিয়ে॥**

**ভাবার্থ:-** যদি কোন ভক্তের কুষ্ঠ রোগ হয় আর সে পরমাত্মার ভক্তি শুরু

করে, তাহলে ভক্ত সমাজের উচিত ঐ ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে আদর করা অর্থাৎ ঐ দুঃখী ভক্তকেও অন্য ভক্তদের মত প্রেম পূর্বক নমস্কার করা। ওকে সম্মান করা উচিত, যাতে ঐ দুঃখী এবং রোগ ঠিক হয়ে জীবন সফল হয়। যদি কোন বেশ্যাবৃত্তি করা বা পতিতা মেয়ে বা বোনের ভক্তি করার প্রেরণা হয় এবং পরমাত্মার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে ভক্তি সাধনা শুরু করে এবং সৎসঙ্গের বিচার শুনে সব খারাপ কাজ ছেড়ে দেবে। তখন তার আত্মার কল্যাণ হবে। যদি ঐ আত্মা সত্সঙ্গে না আসে তাহলে সে তাঁর পাপ কাজের বিষয় কিছু বুঝতে বা জানতে পারবে না। যেমন ময়লা কাপড় সাবানের স্পর্শে না এলে কি করে পরিষ্কার হবে? এই জন্য যদি কোন বদনামী স্ত্রী ভক্তি শুরু করে তাহলে তাকে বিশেষ আদরের চোখে দেখবে যাতে সৎসঙ্গে আসতে দ্বিধা না করে। যদি ঐ আত্মাকে সৎসঙ্গে আসতে না দাও, তাহলে তুমি দোষী হবে। পরবর্তী অংশ এই পুস্তকে পৃষ্ঠা ১০৭ পড়ুন। "কবীর জী দ্বারা শিষ্যদের পরীক্ষা।"

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা দেখে নেবেন, গীতা অধ্যায় ৯ শ্লোক ৩০-এ প্রমাণ আছে, যদি কোন জঘন্য (অত্যাধিক দুরাচারী) পাপী ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে পরমাত্মার ভক্তি করে তাহলে তাঁকে মহান আত্মার সমান মানা উচিত। কারণ সে সন্তের বিচার শুনে বিকার মুক্ত হয়ে নিজের জীবনের কল্যাণ করছে। তাই মানব শরীর ধারী প্রাণীকে তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়ে পরমাত্মার ভক্তি তথা শুভকর্ম, দান, ধর্ম, করে গুরু দেবের শরণে থাকা উচিত।

পুজ্য কবীর পরমেশ্বর বলেছেন :-

**কবীর, মানুষ জন্ম দুলর্ভ হৈ, মিলে ন বারং বার।**
**তরুবর সে পত্তা টুট গিরে, বহুর না লাগে ডার॥**

**ভাবার্থ:-** উপরোক্ত বাণীতে কবীর পরমেশ্বর বোঝাতে চেয়েছেন যে, হে মানব শরীর ধারী প্রাণী! মানব জন্ম (স্ত্রী/পুরুষ) যুগ-যুগ ধরে বিভিন্ন যোনীতে ভ্রমণ করার পরে অনেক কষ্টে প্রাপ্ত হয়। এই মানব জন্ম বার-বার প্রাপ্ত হয় না। তাই এই মানব শরীর থাকতে পরমাত্মার ভক্তি করতে হবে, অন্যথায় এই শরীর একবার সমাপ্ত হয়ে গেলে পূনরায় এই স্থিতিতে মানব শরীর পাওয়া যাবে না। যেমন গাছের পাতা একবার গাছ থেকে ঝড়ে গেলে পুনরায় ডালে লাগে না।

তাই মানব শরীরের অমূল্য সময় ব্যর্থ না করে সত্ ভক্তি করতে হবে। তাই কবীর জী বলেছেন:

**কবীর, মানুষ জন্ম পায় কর, নহীঁ রটে হরি নাম।**
**জৈসে কুয়া জল বিনা, বনবায়া ক্যা কাম॥**

**ভাবার্থ:-** মানব জীবনে যদি ভক্তি না করা হয়, তাহলে সেই মানব জীবন ঠিক এই রকম, যে রকম সুন্দর কুয়া বানিয়ে রাখা হয়েছে। যদি সেই কুয়াতে জল না থাকে অথবা জল আছে কিন্তু তা লবণাক্ত (পানের যোগ্য নয়); হতে পারে সেটির নাম কুয়া, কিন্তু তা কুয়ার গুন যুক্ত নয়। ঠিক একইভাবে যে মানুষ ভক্তি করে না, তাকেও মানুষ বলা হয়, কিন্তু তিনি মনুষ্য গুণধারী নন। পূর্ব জন্মের শুভ কর্ম বা ভক্তির কারণ সুস্বাস্থ্য শরীর থাকলেও, হঠাৎ অসুখ হয়ে লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করে মৃত্যুকে প্রাপ্ত করে। কেউ জন্ম থেকে অসুখে ভোগে, আজীবন কষ্ট ভোগ করে, মৃত্যুকে প্রাপ্ত করে। কেউ জন্ম থেকে নির্ধন হয় আবার কেউ ধনী হয়ে জন্ম নেয়, কেউ নিঃসন্তান হয়, আবার কারো সন্তানে ভরা সংসার হয়। কেউ পুত্র সন্তানের আশা করলেও মেয়ে সন্তান হয় পুত্র সন্তান হয় না। এই সমস্ত পূর্ব জন্মের কর্ম ফল মানুষকে ভোগ করতে হয়। যতক্ষণ পুনরায় ভক্তি আরম্ভ করবে না ততক্ষণ পূর্ব কর্ম ফলই ভোগ করতে হবে। যখন পূর্ণ গুরু থেকে

দীক্ষা নিয়ে মর্যাদার সাথে ভক্তি শুরু করবে তখন শুভ সংস্কার বৃদ্ধির কারণে দুঃখের সময় সুখে বদলে যাবে।

## "সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের ধারনা"

আধ্যাত্মিক জ্ঞান না থাকলে সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের ধারনা কেমন হয়?

১. প্রতিটি সাধারণ মানুষের আজন্ম লালিত ইচ্ছা বড়ো হয়ে লেখাপড়া শিখে চাকরী করে উপার্জনের ব্যবস্থা করা ও বংশের ধারা বজায় রাখতে বিবাহ্ শাদী করে পরিবারের প্রতিপালন করা। ছেলে মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রাণপন চেষ্টা করে, যাতে তার সন্তানেরা ভবিষ্যতে চাকরী করে প্রতিষ্ঠা পায়। ছেলে মেয়ে উপযুক্ত হলে সমবন্ধ করে তাদের বিবাহ্ দেওয়া, তারপর তাদের প্রার্থণা থাকে ভগবান আমার সন্তানের সন্তান দিও অর্থাৎ নাতি-নাতনীর মুখ দেখার প্রবল ইচ্ছা পূরণ করা আর এতেই তিনি ভেবে নেন আমার কর্তব্য শেষ হল। কখনো কখনো গ্রামের বা পাশের গ্রামের বয়স্করা এক জায়গায় মিলিত হয়ে নিজেদের ভালো-মন্দের খবর জানার চেষ্টা করে। এইভাবে এক দিন বয়স্কদের আড্ডায় এক বৃদ্ধ বলেন, পরমাত্মার দয়ায় আমার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে আছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে লেখা পড়া শিখিয়ে তাদের বিবাহ্ দিয়েছি। তাদের সকলের ছেলে-মেয়ে হয়েছে। এখন আমার সুখের সংসার, আমার বয়স ৭৫ বছর হয়েছে। অভিভাবক হিসেবে আমার সব দায়-দায়িত্ব শেষ এখন নিশ্চিন্তে মরতে পারি। আমার জীবন সফল হয়েছে। আমার বংশ পরম্পরা বেশ ভালো ভাবেই চলছে, সমাজে আমার বংশের নাম উজ্জ্বল থাকবে।

**বিশ্লেষণ**:- আধ্যাত্মিকতার বিচারে উপরোক্ত প্রসঙ্গে যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছে, তা পূর্ব নির্ধারিত সংস্কার বা কর্মফলে প্রাপ্ত হয়েছে। ঐ ব্যক্তির নুতন কিছুই প্রাপ্ত হয়নি।

এক ব্যক্তির বিবাহের পরে সন্তান রূপে একটি মেয়ে হয়। বর্তমান মানব সমাজের ধারনা যদি পুত্র না হয় তাহলে বংশ পরম্পরা চলবে না। (কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ছেলেমেয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই) তাই দ্বিতীয়বারও পুত্র সন্তানের আশা করে। কিন্তু দ্বিতীয়বারও কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। আবারও পুত্র সন্তানের জন্য তৃতীয়বারের চেষ্টা, কিন্তু তৃতীয়বারেও কন্যা সন্তানের প্রাপ্তি হয়। এই ভাবে ঐ ব্যক্তির কন্যা সন্তানের জন্ম হলেও পুত্রের জন্ম হয়নি অর্থাৎ তার পুত্র প্রাপ্তির আশা অপূর্ণ রয়ে যায়। এতে প্রমাণিত হয় মানুষ যা কিছু পেতে চায় তা কখনোই পূরণ হয় না। যা প্রাপ্তি হয় তা পূর্ব সংস্কারের বা কর্মফলের জন্য হয়। এটাই পরমেশ্বরের বিধান। মানব শরীর ধারী প্রাণীকে বর্তমান জীবনে পূর্ণ সন্তের থেকে নাম উপদেশ নিয়ে ভক্তি ও দান, ধর্ম ও শুভ কর্ম অবশ্যই করা উচিত। অন্যথায় পূর্ব জন্মের অর্জিত পুণ্য কামাই সমাপ্ত করে খালি হাতে পরমাত্মার দরবারে যেতে হবে। তখন পাপ কর্মের জন্য পশু যোনীতে চলে যেতে হবে। চাষি যেমন জমিতে ধান, গম, ছোলা ইত্যাদি রোপন করে। পরিশ্রম করে ফসল উৎপন্ন করে। তা পাকলে এনে গোলা ভর্তি করে রাখে। যদি পুনরায় ফসল তৈরি না করে জমানো ফসল খেয়ে শেষ করতে থাকে, তাহলে চাষির বর্তমানে কোন অসুবিধা বা সংঙ্কট হবে না। কারণ পূর্বের ফসল ঘরে মজুদ আছে। কিন্তু যখন পূর্বের জমানো ফসল শেষ হয়ে যাবে, তখন ঐ কৃষক পরিবার ভিখারী হয়ে যাবে। সেইরূপ মানব শরীরে যা কিছু প্রাপ্ত হচ্ছে, তা পূর্ব জন্মের সঞ্চিত কর্ম ফল। যদি বর্তমানে শুভকর্ম বা ভক্তি না করে, তাহলে ভবিষ্যৎ জীবন নরকে পরিণত হবে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান হওয়ার পর মানুষ বুদ্ধিমান কৃষকের মত প্রতি বছর প্রত্যেক মরশুমে দান, ধ্যান, সুমিরণ রূপী ধর্ম ফসল লাগাবে তথা নিজের ঘরে সংগ্রহ

করে রাখবে আর ব্যয়ও করবে। অর্থাৎ পূর্ণ গুরু থেকে নাম দীক্ষা নিয়ে তাঁর বলা মার্গ অনুসরন করে প্রতি সমাগমে সদ্ ভক্তি ও দান-ধর্ম করে ভক্তি ধন সংগ্রহ করবে। এক মাত্র পরম সন্তই মানুষকে তার জীবনে চলার পথ দেখায় আর ঐ সকল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সত্যতা সকল সদ্ গ্রন্থের প্রমাণিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান। পূর্বোক্ত প্রসঙ্গে এক বৃদ্ধ বলেছে, আমি আমার সকল সন্তানদের পালন পোষণ করে বিবাহ দিয়েছি। আমার জীবনের সকল কাজ শেষ করেছি। আমার জীবন সফল হয়েছে। এখন নিশ্চিন্তে মরতে পারি। বিচারের বিষয় যে, ঐ বৃদ্ধ তার জমানো পুঁজিই ব্যয় করেছে। ভবিষ্যতের জন্য কিছু জমা করে রাখেনি। যার কারণ, ঐ ব্যক্তির মানব জীবন ব্যর্থ হয়েছে।

কবীর জী বলেছেন:-

**ক্যা মাঙ্গু কুছ থির না রহাঈ। দেখত নৈন চলা জগ জাঈ।**
**এক লাখ পুত সবা লাখ নাতী। উস রাবণ কে দীবা ন বাতী॥**

**ভাবার্থ:-** যদি কেউ এক পুত্র থেকে তার বংশ পরম্পরা চিরকাল ধরে রাখতে চায়, তাহলে সেটি তার ভুল ধারনা। যেমন শ্রীলঙ্কার রাজা রাবণের এক লক্ষ পুত্র ও সোওয়া লক্ষ নাতি ছিল। বর্তমানে সেই রাবণের ঘরে প্রদীপ জ্বালানোর কেউ জীবিত নেই। সব শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই হে মানব! পরমাত্মা থেকে এসব কি প্রার্থণা করছো? এখানে কোন কিছুই স্থায়ী নয়। এসব প্রেরণা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অভাবের কারণে হয়। তোমার ইচ্ছায় কিছুই হবে না। ঐ বৃদ্ধের কথা মত, পুত্র হলে বংশ বৃদ্ধি হয় ও বংশের নাম থাকে। কোনো গ্রামে প্রথমে দুই চার জন ব্যক্তি বসবাস করত। পরে ঐ বংশে শত-শত পরিবার হয়ে যায়। তাঁর বংশ চলছে আর তার নামও চলছে। কিন্তু শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে সাধনার কারণে পরমাত্মার নিয়ম অনুসার ঐ মনুষ্য শরীরধারী অবোধ প্রাণী গাধা হয়ে জন্ম নিয়ে কষ্ট ভোগ করছে আর ওখানে গাধার বংশ বৃদ্ধি ও সমাপ্ত করার পর কুকুরের যোনীতে জন্ম নিয়ে কুকুরের বংশের বৃদ্ধি করবে অথবা অন্য প্রাণীর শরীর প্রাপ্ত করে অসংখ্য জন্ম কষ্ট ভোগ করবে। ভাবার্থ হল এই যে, মানব শরীরধারী প্রাণীদের সাংসারিক কর্ম করতে করতে আত্ম কল্যাণের কর্মও করা উচিত। তাহলে পূর্ব জন্মের পাপের ফলে পরিবারে আসা দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে এবং সংসার সুখী হবে। অন্যথায় পাপ-পুণ্য, শুভ-অশুভ দুই কর্ম করে সুখ ও দুঃখের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

এক সময় আমি (শ্রী রামপাল জী মহারাজ) এক গ্রামে তিন দিনের সৎসঙ্গে পাঠ করছিলাম। ঐ পরিবারের এক আত্মীয় তাঁর চার বছরের এক ছেলেকে সাথে নিয়ে আসে। কথা প্রসঙ্গে ঐ ব্যক্তি বলে, আমার চার ছেলে আর দুই মেয়ে বর্তমান। সকলের বিয়ে দিয়েছি। আমার মত সুখী আমাদের গ্রামে মনে হয় কেউ নেই। ঠিক দু'বছর পরে এমন পরিস্থিতি হল যে, ঐ সুখে থাকা ব্যক্তির ঘর একেবারে বরবাদ হয়ে নরকে পরিনত হল। ঐ ব্যক্তির দুই ছেলে মোটর সাইকেল নিয়ে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়ে পরলোক গমন করে। ফলস্বরূপ ওদের বিধবা পত্নীরা অন্য গ্রামে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে ঐ পরিবার ছেড়ে চলে যায়। এই ঘটনার এক বছর পরে অন্য এক ছেলে রাত্রে জমিতে টিউবওয়েলের মাধ্যমে জল সেচের সময় সাপে কেটে মারা যায়। পরপর দুই ভাইয়ের অকাল মৃত্যুর শোক সহ্য করতে না পেরে হৃদ রোগে আক্রান্ত (হার্ট অ্যাট্যাক্ট) হয়ে ঐ ব্যক্তির চতুর্থ পুত্রের মৃত্যু হয়। বাকি বৌমারাও ঐ পরিবার ছেড়ে চলে যায়। ঐ পরিবারের তিন পুত্রের অকাল মৃত্যুর ফলে ওদের মায়ের অর্থাৎ আমার স্ত্রী'র মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ মানসিক রোগী হয়ে যায়।

এখন বড় মেয়ের এক ছেলের ভরসায় ওদের দিন কাটছে। মেয়ে জামাইকে বাড়িতে রেখেছে। প্রিয় পাঠকগণের কাছে আমার এই বার্তা- আপনারা বিবেক দিয়ে একবার বিচার করুন আর মানব জীবনের সত্য রাস্তা ধরে সদ্ ভক্তি করে নিজেদের কল্যাণ অবশ্যই করুন।

সন্তান হওয়া বা না হওয়া এটা আপনার পূর্ব জন্মের কর্মফল। সন্তানের যদি ধর্ম কর্মের জ্ঞান না থাকে, তাহলে যতই ভালো হোক না কেন, কোন না কোন সময় খারাপ কর্ম করে ফেলে। এই সব পূর্ব জন্মের পাপ কর্মের ফলে হয়। এক দিন এক ব্যক্তি বলে, আমার শ্বশুর চার একর জমির জাট কৃষক ছিল। দিন রাত পরিশ্রম করে ১৬ একর জমির মালিক হয়। তাঁর চার ছেলে এক মেয়ে। সকলের বিবাহ দিয়েছে। ৬০ বছর বয়সে আমার শ্বশুরের প্যারালাইসিস হয়। চার ছেলে আলাদা হয়ে যায়। আমার শ্বশুর তার বড় ছেলের কাছে থাকতে শুরু করেন। কিন্তু ৬-মাসের মধ্যে জামা কাপড় থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। বড়ো ছেলে বাবাকে আর রাখতে রাজি না হলে, তখন সেজো ছেলের কাছে থাকতে লাগেন। কিছুদিন পরে সেও মানা করে দেয়। এই ভাবে চার ছেলে বাবার সেবা যত্ন করতে অস্বীকার করে। অসুস্থ বৃদ্ধ বাবাকে দেখা শুনা করা নিয়ে ঐ পরিবারে অশান্তি শুরু হয়। শালিসি সভায় গ্রাম পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত নেয়, যে ছেলে বাবার সেবা যত্ন করবে তাকে দুই একর জমি বেশি দেওয়া হবে। জমির লোভে ছোট ছেলে সেবা করতে রাজি হয়। কিন্তু ৬ মাস পরে ঐ ছোট ছেলে বলতে শুরু করে আমার দ্বারা বাবার দেখাশুনা করা আর সম্ভব নয়। আত্মীয় স্বজনরা একত্রিত হয়ে চার ভাইকে বোঝায় কিন্তু কেউ বাবার দেখাশুনার ভার নিতে আর রাজি হয়নি। ঐ ভক্ত বলছিল, আমার শ্বশুর এখন ঠিকমত কথা বলতে পারে না। যখন ছোট নাতনী কাছে আসে তখন ইশারা করে ডাকে। আমার কাছে আয় একটু আদর করি। এই ভুল সমস্ত সংসারে। পুত্র পিতাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে আর নাতি- নাতনির মমতা এখনো বাকি। এখন দুই একর জমি লিজে দিয়ে শ্বশুরের সেবা-যত্ন করার জন্য এক জন চাকর রাখা হয়। বৃদ্ধ অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়ে মারা যায়। এই করুণ চিত্রের প্রতিফলন বর্তমানের সভ্য সমাজের শিক্ষিত রুচিশীল মানুষের মধ্যে ধারাবাহিক কালচারে পরিনত হয়েছে যা এক প্রকার সামাজিক ব্যাধি।

বিচার করুন, ঐ ব্যক্তির যদি জ্ঞান হতো যে, ভক্তি ছাড়া তথা ধর্ম-কর্ম ছাড়া জীবন নরক হয়ে যাবে, তাহলে সাংসারিক কাজ কর্মের সাথে সাথে ভক্তি করত তাহলে এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতো না। সৎসঙ্গে এমন শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে ছেলে মেয়েরা তাদের মাতা - পিতার সেবা করে। শ্রদ্ধালুদের দয়া-ধর্মের পাঠ বা শিক্ষা দেওয়া হয়। সৎসঙ্গের সময় আশ্রমে বৃদ্ধ - বিকলাঙ্গ ব্যক্তি, রোগী ব্যক্তি, ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে নিয়ে মা - বোনেরা আসে। আশ্রমের পুরানো ভক্ত ও ভক্তমতীদের ঐ সমস্ত অসহায় বৃদ্ধ-রোগী ব্যক্তিদের সেবায় নিয়োজিত করা হয়। তাদের স্নান করানো, কাপড় চোপড় ধোয়া, ভাণ্ডারা ঘর থেকে ভোজন প্রসাদ এনে খাওয়ানো, দুধ, চা এনে খাওয়ানো ইত্যাদি। বিচার করুন, যে বাচ্চারা আশ্রমে অন্যের মাতা - পিতাদের সেবা করে, তারা নিজের মাতা - পিতা, শ্বশুর - শাশুড়ির সেবা অবশ্যই করবে। কারণ সেবা করা তাঁদের অভ্যাসে পরিনত হয়। ভক্তদের মনে দয়া ভরা থাকে। তাঁরা পরমাত্মার বিধানের সাথে ভালো ভাবে পরিচিত হয়। পূর্বের প্রসঙ্গে আসি ঐ শ্রমজীবি কৃষক যদি পরমাত্মার ভক্তি করতো, তাহলে শরীর সুস্থ ও নিরোগ থাকতো এবং ভজন ও সুমিরনের তেজে প্রভাবিত হয়ে পরিবারের সবাই তাকে আদর যত্ন করত। যেমন সাধু-সন্তরা ভক্তি করে, তাই গ্রামের লোকেরা তাদের সেবা

করে। ঠিক সেইরূপ পরমাত্মার ভক্তি করলে সেই ভক্তির শক্তি অন্যদের প্রভাবিত করে ভক্তের অনুকূল পরিস্থিতি করে দেয়। তাই সন্তজন ভক্তি করার প্রেরণা দেন। সৎসঙ্গে জীবন চলার পথ সুগম হয়।

কবীর পরমেশ্বর বলেছেন:-

**কবীর, কায়া তেরী হৈ নহীঁ, মায়া কহাঁ সে হোয়।**
**ভক্তি কর দিল পাক সে, জীবন হৈঁ দিন দোয়॥**
**বিন উপদেশ অচম্ভ হৈ, ক্যোঁ জিবত হৈ প্রাণ।**
**ভক্তি বিনা কহাঁ ঠৌর হৈ, এ নর নাহী পাষাণ॥**

**ভাবার্থ:-** পরমাত্মা কবীর জী বলেছেন, হে ভোলা মানব! আমি আশ্চার্য হচ্ছি, গুরুদীক্ষা বিনা কি আশা করে বেঁচে আছো। এই শরীর যখন তোমার নয়। আর এই শরীর ত্যাগ করে এক দিন চলে যেতে হবে। তাহলে এই সম্পত্তি, ধন, দৌলত, তোমার কি করে হয়? যে মানব জানে না ভক্তি বিনা কোন স্থান নেই। সে মানব নয়, পাষান। তার বুদ্ধিতে পাথর পড়ে আছে। কবীর সাহেব আবার বলেছেন:-

**অগম নিগম কো খোঁজ লে, বুদ্ধি বিবেক বিচার।**
**উদয়-অস্ত কা রাজ মিলে, তো বিন নাম বেগার॥**

**ভাবার্থ:-** পূর্বের দিনে পুলিশ থানায় কোন গাড়ি থাকত না। যদি কোথাও রেড করার প্রয়োজন হতো তখন কোন তিন বা চার চাকার প্রাইভেট গাড়ি জোর পূর্বক ধরে নিয়ে যেত। গাড়ির মালিকই ড্রাইভার হত এবং পেট্রোল বা ডিজেল খরচও ঐ গাড়িওয়ালা নিজে করত। ঐ দিনের মজুরী অর্থাৎ পারিশ্রমিক পেতো না। পুলিশের লোকেরা সারাদিন এদিকে ওদিকে ঘোরাতে থাকতো। সাধারণ ব্যক্তিরা মনে করতো গাড়িওয়ালার আজ অনেক টাকা উপার্জন করবে। সারাদিন গাড়ি চালাচ্ছে। কিন্তু গাড়ির মালিকই জানতো তার ঐ দিনের কি পরিস্থিতি। সেইরূপ রাজারা ভক্তি না করে কেবল রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ঠিক রাখার জন্য, নিজেদের জীবন ব্যতিত করে দেয় অর্থাৎ ঐ গাড়ি ওয়ালার মত বেগার শ্রম দেয়। পূর্ব জন্মের কর্ম ধনে রাজা হয়ে পুণ্য সমাপ্ত করতে থাকে। সাধারণ মানুষ মনে করে রাজা খুব আনন্দ ফুর্তি করে জীবন অতিবাহিত করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে রাজার ঐ কর্ম বেগার অর্থাৎ বৃথা কর্ম। যদি ঐ ব্যক্তি পূর্ণ গুরু থেকে নাম উপদেশ নিয়ে ভক্তি না করে তাহলে সমস্ত পৃথিবীর রাজা হলেও বৃথা লোক দেখানো ঠাটবাট ছাড়া কিছু নয়। তাতে কোন উপার্জন অর্থাৎ লাভ হবে না। তাই রাজা হও বা প্রজা, ধনী হও বা গরীব সবাইকে এই জন্মেই নতুন করে ভক্তি করতে হবে। তাতেই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে।

পরমাত্মা কবীর জী নিজের শিষ্য গরীবদাস জীকে তত্ত্বজ্ঞান বোঝান- (রাগ আশাবরী শব্দ নং ১)

**মন তু চলি রে সুখ কে সাগর, জহাঁ শব্দ সিন্ধু রত্নাগর (টেক)**
**কোটি জন্ম তোহে মরতা হোগে, কুছ নহী হাত লগা রে।**
**কুকুর-সুকর খর ভয়া বৌরে, কৌয়া হংস বুগা রে॥ (১)**
**কোটি জন্ম তু রাজা কিন্হা, মিটি ন মন কী আশা।**
**ভিক্ষুক হোকর দর-দর হাড়য়া, মিল্যা ন নির্গুন রাসা (২)**
**ইন্দ্র কুবের ঈশ কি পদবী, ব্রহ্মা, বরুণ ধর্মরায়া।**
**বিষ্ণুনাথ কে পুর কুঁ জাকর, বহুর অপুঠা আয়া॥ ৩॥**
**অসঙ্খ্য জন্ম তোহে মরতে হোগে, জীবিত ক্যোঁ না মরৈ রে।**
**দ্বাদশ মধ্য মহল মঠ বৌরে, বহুর ন দেহ ধরৈ রে॥ ৪॥**

**দোজখ, বহিস্ত সভী তৈ দেখে, রাজ-পাঠ কে রসিয়া।**
**তিন লোক সে তৃপ্ত নাহী, য়হ্ মন ভোগী খসিয়া॥ ৫॥**
**সদগুরু মিলৈ তো ইচ্ছা মেটৈঁ, পদ মিল পদৈ সমানা।**
**চল হংসা ওস লোক পঠাউঁ, জো আদি অমর অস্থানা॥ ৬॥**
**চার মুক্তি জহাঁ চম্পী করতী, মায়া হো রহী দাসী।**
**দাস গরীব অভয় পদ পরসৈ, মিলৈ রাম অবিনাশী॥ ৭।**

সূক্ষ্ম বেদের বাণীর ভাবার্থ :-

**বাণীর সরলার্থ :-** আত্মা আর মনকে পাত্র বানিয়ে সন্ত গরীব দাসজী সংসারের মানুষকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই সংসার দুঃখের ঘর। এই ঘর সংসার ছাড়া আরও অন্য এক সংসার আছে। যেখানে কোনো দুঃখ নেই। ঐ স্থানকে (সনাতন পরম ধাম সতলোক বলে) তথা ঐ লোকের প্রভু (অবিনাশী পরমেশ্বর) সুখের সাগর অর্থাৎ অমর পরমাত্মা, তথা তাঁর রাজধানী অমরলোকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে বলেছেন-

**শঙ্খোঁ লহর মেহর কী উপজৈঁ, কহর নহী জহাঁ কোঈ।**
**দাস গরীব অচল অবিনাশী, সুখ কা সাগর সোঈ॥**

**ভাবার্থ:-** যে সময় আমি (লেখক) একা থাকি তখন মাঝে মাঝে এমন ভাব আসে, সব নিজের মনে হয়। আমাকে যে যতই কষ্ট দুঃখ দিক তাদের প্রতি কোন প্রকার দ্বেষ ভাব থাকে না। সকলের প্রতি দয়া ভাব চলে আসে। এই স্থিতি মাত্র কয়েক মিনিট থাকে। এই স্থিতিকে মেহের কি লহর বলে (লহর মানে ঢেউ) সতলোক অর্থাৎ সনাতন পরম ধামে যাওয়ার পর, প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে এই ধরণের আনন্দের স্থিতিতে ঢেউ/শিহরণ আসে। ওখানে প্রত্যেক আত্মার হৃদয়ে এই ধরনের অসংখ্য ঢেউ উঠতে থাকে। যখন আমার আত্মা থেকে দয়ার ঢেউ চলে যায় তখন আমার দুঃখের স্থিতি শুরু হয়ে যায়। ঐ ব্যক্তি আমার ক্ষতি করেছে, কে আমাকে কি বলছে, ঐ লোকটা ভাল না ইত্যাদি কহরের লহর শুরু হয়ে যায়। এগুলিকে দুঃখের তুফান বলা হয়।

ঐ সতলোকে অসংখ্য দয়ার ঢেউ উঠতে থাকে। ওখানে ভয়ংঙ্কর দুঃখ নামের কিছুই নেই (সত্ লোকে দুঃখ নামের কিছু নেই। কহর-এর অর্থ ভয়ংঙ্কর কষ্ট। যেমন কোন গ্রামে ঝগড়া- মারপিঠে ৫/৭ ব্যক্তির মৃত্যু হওয়া বা ভূমিকম্পের কারণে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হওয়া অর্থাৎ বড় ধরনের দুঃঘটনাকে কহর বলা হয়। উপরের লেখা বাণীতে সুখ সাগরের পরিভাষা সংক্ষেপে বলা হয়েছে। ঐ অমরলোক, অচল-অবিনাশী অর্থাৎ কখনো ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। ওখানের পরমেশ্বর ও অবিনাশী। ঐ স্থান তথা পরমেশ্বর সুখের সাগর। যেমন জাহাজ বন্দর থেকে ১০০ বা ২০০ কিলোমিটার দূরে চলে গেলে জাহাজের যাত্রীরা জল ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। চারিদিকে জল আর জল দেখতে পায়। এইরূপ সতলোকে সুখ ছাড়া আর কিছু নেই। অর্থাৎ ওখানে কোন দুঃখ নেই।

এইভাবে পূর্বোক্ত বাণীর সংক্ষিপ্ত সরলার্থ প্রকাশ করা হল।

**মন তু চল রে সুখ কে সাগর, জহাঁ শব্দ সিন্ধু রত্নাগর॥ টেক॥**
**কোটি জন্ম তোহে ভ্রমত হোগে, কুছ নহী হাথ লগা রে।**
**কুকর শুকর খর ভয়া বৌরে, কৌয়া হংস বুগা রে॥**

**ভাবার্থ:-** পরমেশ্বর কবীর সাহেব নিজের প্রিয় আত্মা সন্ত গরীব দাসজীকে সুক্ষ্ম বেদের জ্ঞান বুঝিয়ে ছিলেন। গরীব দাস (গ্রাম ছুড়ানী জেলা- ঝজ্জর, হরিয়াণা- ভারত) জীব আত্মা তথা মনকে আধার বানিয়ে পৃথিবীর মানুষকে অর্থাৎ কালের লোকের মানুষদেরকে কষ্টের সাথে পরিচয় করিয়ে সতলোক নামক সুখের দেশ পরম ধামে

যাওয়ার জন্য শাস্ত্র সম্মত সাধনা করার প্রেরণা দিয়েছেন। মন তু চলরে সুখ কে সাগর অর্থাৎ সনাতন পরম ধামে চল যেখানে শব্দ নষ্ট হয় না। তাই শব্দের অর্থ অবিনাশী। ঐ স্থান অমরত্বের সাগর আর মোক্ষ রূপী রত্নের খনি (অর্থাৎ আগর)। এই কাল লোকে আপনারা ভক্তিও করছেন কিন্তু শাস্ত্র অনকুল সাধনা বলা তত্ত্বদর্শী সন্ত না পাওয়ার কারণে কোটি কোটি জন্ম ভ্রমণ করেও দুঃখ ভোগ করছেন। কোটি- কোটি টাকা রোজগারের জন্য সারা জীবন ব্যতিত করে তারপর মৃত্যু বরণ করছেন। পূর্ব সংস্কারের জমানো এই ধন ফেলে আপনারা সবাই সংসার ছেড়ে চলে যান। ঐ ধন সংগ্রহের জন্য যে পাপ করেছেন তা সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু জমানো ধন থেকে যাবে। মানব জীবনে তত্ত্বদর্শী সন্ত থেকে উপদেশ নিয়ে ভক্তি শাস্ত্রবিধি সম্মত না করার কারণে পুণ্যের ঝোলা শূন্য করে নিয়ে যেতে হবে, আর পাপের পাহাড় সঙ্গে থাকবে।

যার কারণে কুকুর = কুত্তা, খর = গাধা, শুকর = শুয়োর, কৌয়া = কাক, হংস = এক প্রকারের পাখী সে সরবর থেকে শুধু মোতি খায়, বুগা = বক পাখী ইত্যাদি যোনী প্রাপ্ত করে মহা কষ্ট ভোগ করতে হবে।

**কোটি জন্ম তু রাজা কীন্হা, মিটি ন মন কী আশা।**
**ভিক্ষুক হোকর দর-দর হাড়য়া, মিলা না নির্গুন রাসা॥**

**সরলার্থ:-** হে মানব! তুমি কালের লোকে কঠিন থেকে কঠিনতর সাধনা করেছো। ঘর বাড়ি ত্যাগ করে জঙ্গলে গিয়ে সাধনা করেছো। আবার গ্রামে-গ্রামে, শহরে-শহরে ঘুরে ভিক্ষা করেছো। পূর্বে সাধনা রত সাধকরা ভিক্ষা প্রাপ্তির জন্য সাধারণত নিকটবর্তী গ্রাম বা শহরে যেত। এক ঘরে পরিমান মতো ভিক্ষা না মিললে অন্য ঘরে গিয়ে ভিক্ষান্ন গ্রহন করে জঙ্গলে চলে যেত। কোন কোন সাধকরা এক দিন ভিক্ষা করে দুই-তিন দিন নির্বাহ করতো। রুটি বা খাবার গুলি রুমালের মতো পাতলা কাপড়ে জড়িয়ে গাছের ডালে বেঁধে রাখতো। রুটি শুকিয়ে গেলে জলে ভিজিয়ে নরম করে খেত। যাতে প্রতিদিন ভিক্ষায় সময় নষ্ট না হয় তার জন্য উপরোক্ত ব্যবস্থা করে কালের সাধনায় লেগে থাকত।

**ভাবার্থ:-** জন্ম-মৃত্যু রূপী রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য বেদে বর্ণিত ও লোক বেদের আধারে ঐ সাধক ঘোর তপস্যা করতো। তত্ত্বদর্শী সন্ত না পাওয়ার কারণে তারা নির্গুন রাসা অর্থাৎ গুপ্ত জ্ঞান যাকে তত্ত্বজ্ঞান বলা হয় তা পায় নি। যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ১০-এ তথা চার বেদের সারাংশ স্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২ ও ৩৪-এ বলেছে, যে যজ্ঞ অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানের বিস্তারিত জ্ঞান স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্ম নিজের মুখ কমল দিয়ে বলে শোনায়, তাকে তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ সুক্ষ্মবেদ বলা হয়। গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম বলেছে, ঐ তত্ত্ব জ্ঞানকে তুই কোন তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে গিয়ে সরলতা পূর্বক দণ্ডবত প্রণাম করে প্রশ্ন কর। তাহলে ঐ তত্ত্বদর্শী সন্ত তোকে তত্ত্ব জ্ঞানের উপদেশ দেবে। ইহাতে প্রমাণিত হয় ঐ তত্ত্বজ্ঞান চারবেদ ও গীতায় নেই। যদি এই পবিত্র পুস্তকে তত্ত্বজ্ঞান থাকত তাহলে গীতায় আরও এক অধ্যায়ে বলে দিত। আর বলতো তত্ত্বজ্ঞান অমুক অধ্যায়ে আছে। সন্ত গরীব দাস বলেছেন, এই নির্গুন রাসা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান না পাওয়ার কারণে কাল ব্রহ্মের সাধনা করে কোটি কোটি জন্মে রাজা হয়েছো। তাতেও মনের ইচ্ছা শেষ হয়নি। কারণ রাজারা চিন্তা করে স্বর্গে সুখ আছে। এই রাজ্যে কোন সুখ-শান্তি নেই।

নির্গুন রাসার ভাবার্থ- নিগুনের অর্থ কোন জিনিস (বস্তু) আছে কিন্তু তাঁর লাভ পাওয়া যাচ্ছে না। যেমন বৃক্ষের ফলের বীজে বৃক্ষ ও ফল নির্গুন রূপে থাকে। ঐ

বীজকে মাটিতে রোপন করে ঠিক মত জল, সার, ঔষধ দিলে সর্গুন বস্তু (বৃক্ষ ও ফল) পাওয়া যাবে। এই জ্ঞান না হওয়ার কারণ, বৃক্ষের ছায়া বা ফল থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। রাসা = ঝামেলা যুক্ত কাজ।

সুক্ষ্মবেদে পরমেশ্বর কবীর জী বলেছেন:-

নয় মন (৩৬০ কেজি) সুত = কাঁচা সুতো (ধাগা)

**কবীর, নয় মন সূত উলঝিয়া, ঋষি রহে ঝখ মার।**
**সদগুরু এস্যা সুলঝা দে, উলঝে ন দূজী বার॥**

**সরলার্থ:**-পরমেশ্বর কবীর জী বলেছেন, আধ্যাত্মিক জ্ঞান রূপী ৯ মন সুতা এলো-মেলো করে রেখেছে অর্থাৎ খারাপ করে রেখে দিয়েছে। এক কিলোগ্রাম খারাপ (এলো-মেলো) সুতা ঠিক করতে তাঁতীর এক দিনের বেশি লেগে যায়। যদি সুতা ঠিক করার সময় গাঁঠ লেগে যায় তাহলে ঐ গাঁঠ লাগা সুতার কাপড় মূল্য হীন হয়। তাই তাঁতী রূপে পরমেশ্বর কবীর তাঁতীর সঠিক উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন, যদি সুতা বেশি এলোমেলো হয়ে যায় তা তাঁতী ছাড়া কেউ ঠিক করতে পারে না। আধ্যাত্মিক জ্ঞান রূপী ৯ মন এলোমেলো সুতা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে ঋষি-মুণি ও গুরুরা গোলমাল করে রেখেছে। এই এলোমেলো সুতা অর্থাৎ উল্টো পাল্টা জ্ঞানকে সদগুরু তত্ত্বদর্শী সন্ত শাস্ত্রের আধারে বুঝিয়ে দেবেন, যা পুনরায় খারাপ বা এলোমেলো হবে না। এই উল্টো-পাল্টা অর্থাৎ গোলমাল জ্ঞানের আধারে বা লোকবেদের আধারে সাধনা করে স্বর্গ নরক বা পৃথিবীর উপর কোন অংশের রাজা বা স্বর্গ রাজ্য প্রাপ্তি করেও পুনরায় জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে ৮৪ লাখ প্রকার যোনীতে মহাকষ্ট ভোগ করতে হয়। কিন্তু বেদে বর্ণিত বিধি অনুসার সাধনা করে পরম শান্তি বা সনাতন ধাম প্রাপ্ত হয়নি। যা গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২-তে বলেছে, ঐ পরমেশ্বরের পরম পদ প্রাপ্ত হওয়ার পর সাধক পুনরায় এই সংসারে ফিরে আসে না। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪-এ বলেছে- কাল ব্রহ্মের সাধনায় নিম্নের লাভ প্রাপ্ত হয়।

**বাণী নং ৩:- ইন্দ্র-কুবের, ঈশ কি পদবী, ব্রহ্মা বরুণ ধর্মরায়া।**
**বিষ্ণুনাথ কে পুর কূঁ জাকর, বহুর অপুঠা আয়া॥**

**সরলার্থ:**- কাল ব্রহ্মের সাধনা করে সাধক ইন্দ্রের পদবীও প্রাপ্ত করে। অর্থাৎ ইন্দ্র স্বর্গের রাজপদ প্রাপ্ত করে। তাকে দেবরাজ অর্থাৎ দেবতাদের রাজা বা সুরপতিও বলা হয়। ইন্দ্র সেচ বিভাগ অর্থাৎ বর্ষা মন্ত্রনালয়ের পদও নিজের কাছে রাখেন।

**প্রশ্ন:**- ইন্দ্রের পদবী কিভাবে প্রাপ্ত হয়?

**উত্তর:**- আধ্যাত্মিক ভাবে তথা একশত মন (৪ হাজার কেজি) গাভীর ঘী দিয়ে ধর্মযজ্ঞ করলে এক ধর্মযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। এই রূপ একশত ধর্মযজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করলে সাধক ইন্দ্রের পদবী প্রাপ্ত করে। তপ বা যজ্ঞের সময় কোন মর্যাদা (নিয়ম) ভঙ্গ হলে নতুন ভাবে আবার যজ্ঞ করতে হয়। এইভাবে ইন্দ্রের পদ প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন- ইন্দ্রের শাসনকাল কত সময়? মৃত্যুর পরে ইন্দ্রদেবের জীব (আত্মা) কোন যোনীতে যায়?

**উত্তর:**- ইন্দ্র স্বর্গের রাজার পদে ৭২ চৌকড়ি অর্থাৎ ৭২ চতুর্যুগ পর্যন্ত থাকে। এক চতুযুগে - সত্যযুগ+ত্রেতাযুগ+দ্বাপরযুগ+কলিযুগ এই চারযুগ অর্থাৎ (১৭২৮০০০+১২৯৬০০০+৮৬৪০০০+৪৩২০০০) ৪৩ লাখ ২০ হাজার বছরে এক চতুযুগ হয়। এই রূপ ৭২ চতুযুগ পর্যন্ত সাধক ইন্দ্রের পদবির সুখ ভোগ করে। এক কল্প অর্থাৎ ব্রহ্মার এক দিনে (এক হাজার আঠ চতুর্যুগ) ১৪ ইন্দ্রের শাসনকাল সমাপ্ত হয় অর্থাৎ ১৪ জীবাত্মা ইন্দ্রের পদ প্রাপ্ত করে নিজেদের পুণ্য কামাই ভোগ করে। ইন্দ্রের

পদ ভোগ করে প্রাণী গাধার যোনী প্রাপ্ত করে।

## কথা:- “মার্কন্ডে ঋষি ও অপ্সরার সংবাদ”

এক সময় বাংলার সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানে (বাঙ্গাল কি খাড়িতে) মার্কণ্ডেয় ঋষি তপ করছিলেন। ইন্দ্র পদে বিরাজমান আত্মার জন্য এই শর্ত আরোপিত যে, তাঁর রাজত্ব কালে অর্থাৎ ৭২ চতুর্যুগের মধ্যে যদি কেউ পৃথিবীর উপর ইন্দ্র পদ প্রাপ্তির যোগ্য তপ বা যজ্ঞ মর্যাদার সাথে করে তাহলে বর্তমান ইন্দ্রকে গদিচ্যুত করে ঐ সাধককে ইন্দ্রের পদ দেওয়া হবে। তাই রাজা ইন্দ্র চেষ্টা করে তাঁর শাসনকালে কোন সাধক যাতে তপ বা যজ্ঞ পূর্ণ করতে না পারে, এই জন্য সে যেকোনো মূল্যে তপ বা যজ্ঞ ভঙ্গ করে দেয়।

এক দিন ইন্দ্রদেবের দূত ইন্দ্রকে বলে বাংলার খাড়িতে মার্কণ্ডেয় নামক এক ঋষি ঘোর তপ করছে। ইন্দ্র মার্কণ্ডেয় ঋষির তপ ভঙ্গ করার জন্য এক উর্বষী (ইন্দ্রের পত্নী)-কে পাঠায়। দেব- পরী সুন্দর শৃঙ্গার করে মার্কণ্ডে ঋষির সামনে এসে নিজের সিদ্ধি শক্তি দিয়ে বসন্ত ঋতুর বাতাবরণ তৈরি করে নাচ-গান করতে লাগে। ঋষির কোন ইচ্ছা বা হাল চাল না দেখে দেব পরী নিঃবস্ত্র হয়ে যায়। তখন মার্কণ্ডে ঋষি বলে, হে পুত্রী! তুমি একি করছো? এই গভীর জঙ্গলে একা কি জন্য এসেছ? উর্বষী বলে, ঋষিজী! আমার রূপে মুগ্ধ (আকর্ষিত) হয়ে এই জঙ্গলের সমস্ত ঋষি নিজের সন্তুলন হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আপনি ডগ-মগ (বিশেষ ভাব) হননি। আপনার সমাধী কোথায় ছিল? কৃপা করে আপনি আমার সঙ্গে ইন্দ্রলোকে চলুন। তা না হলে আমাকে দন্ড দেবে এবং বলবে যে, তুই হেরে এসেছিস। মার্কণ্ডে ঋষি বলে, আমার সমাধি ধ্যানে ব্রহ্মলোকে ছিল। আমি ওখানের উর্বষীদের নাচ দেখছিলাম। তারা এতো সুন্দর যে তোর মত ৭/৭ সুন্দরী তাদের দাসী। তাই আমি তোমাকে কি দেখবো। তোমার থেকেও বেশি সুন্দরী যদি কেউ থাকে তাহলে তাকে নিয়ে এসো। তখন দেব পরী বলে আমি ইন্দ্রের মূখ্য পাটরানী। স্বর্গে আমার থেকে সুন্দরী আর কেউ নেই।

তখন মার্কণ্ডেয় ঋষি জিজ্ঞাসা করে ইন্দ্রের মৃত্যু হলে তুই কি করবি? উর্বষী উত্তর দেয় আমি ১৪ জন-ইন্দ্রকে ভোগ করবো। ভাবার্থ যে, ব্রহ্মার এক দিনে ১০০৮ চতুর্যুগ হয়। একজন ইন্দ্র ৭২ চতুর্যুগের শাসনকাল সমাপ্ত করে, এই রূপ ১৪ ইন্দ্র মৃত্যু প্রাপ্ত করবে। ইন্দ্রের ঐ রানী কোন মানব জন্মে এতটা পুণ্য সঞ্চয় করেছিল যার কারণে ঐ দেবপরী ১৪ জন ইন্দ্রের পাটরাণী হয়ে স্বর্গ সুখ ভোগ করবে।

তখন মার্কণ্ডে ঋষি বলেন, এক এক করে যখন ১৪ জন ইন্দ্র মরে যাবে তখন তুই কি করবি? উর্বষী বলে তখন আমি মৃত্যুলোকে (পৃথিবীলোক বা মর্ত্যলোক) গাধী হয়ে জন্ম নেব। আর সর্ব ইন্দ্র যারা এখন আমার স্বামী তাঁরা সবাই গাধা হয়ে জন্ম নেবে।

মার্কণ্ডে ঋষি বললেন, তাহলে আমাকে কেন এমন লোকে নিয়ে যেতে চাও, যে লোকের রাজা গাধা, আর রানী গাধীর যোনী প্রাপ্ত করবে? উর্বষী বলে আমার সম্মান বাঁচানোর জন্য। তা না হলে ইন্দ্র বলবে, তুই পরাজিত হয়ে এসেছিস।

মার্কণ্ডে ঋষি বললেন, গাধীর আবার সম্মান কিসের? তুই বর্তমানেও গাধী, কারণ তুই ১৪-বার ইন্দ্রকে ভোগ করে মৃত্যুর পর তুই স্বয়ং স্বীকার করছিস আমি গাধী হবো। গাধীর আবার কিসের সম্মান? ঠিক সেই সময় ওখানে ইন্দ্র প্রকট হন। নিয়ম অনুসার ইন্দ্র নিজের রাজ্য মার্কণ্ডে ঋষিকে দেওয়ার জন্য বলে। ইন্দ্র বললেন, ঋষি জী! আপনি জয়ী হয়েছেন আর আমি পরাজিত হয়েছি। আপনি ইন্দ্রের সিংহাসন স্বীকার করুন। মার্কণ্ডে ঋষি বলে, আরে আরে ইন্দ্র! ইন্দ্রের পদবী (গদ্দী) আমার কোনো কাজের নয়। আমার জন্য এটা কাকের বিষ্ঠার (পায়খানা) সমান। ঋষি ইন্দ্র

দেবকে আরো বললেন, তুই আমার বলা মার্গে সাধনা কর, তাহলে তোকে ব্রহ্মালোকে নিয়ে যাব। এই ইন্দ্রের গদ্দী (সিংহাসন) ছেড়ে দাও। ইন্দ্র বলে, ঋষি জী! এখন আমাকে আনন্দফুর্তি করতে দিন পরে দেখব।

পাঠকগণ! বিচার করুন, ইন্দ্র জানে যে মৃত্যুর পরে তাকে গাধার যোনীতে যেতে হবে তবুও ঐ ক্ষণিক (সীমিত) সুখকে ত্যাগ করতে চায় না। বলে পরে দেখব। পরে আর কবে দেখবে? গাধা হওয়ার পরে তো কুমোর দেখবে যে, গাধার পিঠে কত মাটির বোঝা চাপাবো? কোথায় গর্ত ভরতে হবে? পৃথিবীর উপর কোন ভুখণ্ডের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যমন্ত্রী বা কোন সরকারি অফিসার পদের কর্মচারী বা কোনো ধনী ব্যক্তিকে যদি বলেন আপনি ভক্তি করুন তা না হলে পরের জন্মে গাধা হয়ে জন্ম নিতে হবে। এই কথায় ঐ ব্যক্তি ক্রোধিত হয়ে যাবে। তা না হলে বলবে আমি কেন গাধা হবো? দ্বিতীয় বার এই ধরনের কথা বলবেন না। যারা একটু সভ্য তারা বলবে কে দেখেছে গাধা হতে? তখন তাকে যদি বলা হয় সকল সদগ্রন্থ ও সন্তজন একই কথা বলে। অধিকাংশ লোক তখন বলে, “পরে দেখব। এখন সময় নেই।”

তাদের কাছে নিবেদন মৃত্যুর পর গাধা হওয়ার পরে কি দেখবে? তখন তো কুমোর দেখবে- গাধার সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে! যদি দেখতে চান তাহলে বর্তমানে দেখুন। সমস্ত বিকার খারাপ কর্ম ত্যাগ করে শাস্ত্র অনুকূল সাধনা করুন। এই পৃথিবীতে একমাত্র আমার কাছে (শ্রী রামপাল দাস) সেই শাস্ত্র অনুকূল সাধনা আছে। তাড়াতাড়ি এসে নিশুল্ক শাস্ত্রবিধি অনুসারে নামদীক্ষা প্রাপ্ত করে নিজের জীবনের কল্যাণ করুন।

উপরোক্ত লেখা বাণী নং ৩- এ বলেছে ইন্দ্র কুবের ঈশ এর পদবীর পদ প্রাপ্ত করে তথা ব্রহ্মার পদ, বরুণ ধর্মরায়ের পদ, তথা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত করে এবং দেবী দেবতাদের পদ প্রাপ্ত করেও পুনরায় জন্ম-মৃত্যুর চক্রে থাকতে হয়।

স্বর্গলোকে ৩৩ কোটি (প্রকার) দেব পদ আছে। যেমন ভারতবর্ষে ৫৪০ টি সংসদ সদস্যদের পদ আছে। ব্যক্তি বদলাতে থাকে, এই সদস্যদের মধ্য থেকে প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হতে থাকেন।

সেইরূপ ঐ ৩৩ কোটি দেবী-দেবতাদের মধ্য থেকে কুবেরের পদ অর্থাৎ ধনের দেবতার পদ প্রাপ্ত হয়, যেমন বিত্তমন্ত্রী হয়। ঈশ-এর পদবীর অর্থ প্রভুপদ, যা লোকবেদের আধারে তিন জনকে মান্য করা হয় যেমন:- (১) শ্রী ব্রহ্মা (২) শ্রী বিষ্ণু (৩) শ্রী শিব।

বরুণদেব জলের দেবতা। ধর্মরায়ের মুখ্য বিচারপতি যে জীবকে কর্মফল দেয় তাকে ধর্মরাজও বলা হয়। এরা কাল ব্রহ্মের সাধনা করে বিভিন্ন পদ প্রাপ্ত করেছে। পুণ্য সমাপ্ত হওয়ার পরে ঐ দেবতাদের দেব পদ থেকে মুক্ত করে (বিতাড়িত) চুরাশি লাখ প্রকার প্রাণীর যোনীতে পাঠায়। এরপর পুনরায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের পদ প্রাপ্ত করে সমহিমায় বিরাজমান।

ঐ সমস্ত দেবতাগণ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে থাকে, এরা অবিনাশী নয়। এই দেবতাদের স্থিতি বিস্তারিত ভাবে এই পুস্তকের “সৃষ্টি রচনা”র অধ্যায়ে বলা হয়েছে। কতজন প্রভু আছে? তাদের মাতা পিতা কে? এই সবকিছু সৃষ্টি রচনায় জানতে পারবেন।

**অন্য প্রমাণ:-** শ্রীদেবী পুরান (সচিত্র মোটা টাইপ কেবল হিন্দি গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত) তৃতীয় স্কন্দ পৃষ্ঠা ১২৩-এ লেখা আছে, তুমি শুদ্ধ সরূপা, এই সংসার তোমার থেকেই উদ্ভাসিত হচ্ছে। আমি (বিষ্ণু), ব্রহ্মা, আর শংকর তোমার কৃপায় বিদ্যমান আছি। আমাদের আবির্ভাব অর্থাৎ জন্ম, তিরোভাব অর্থাৎ মৃত্যু হইতে

থাকে। তুমিই সনাতনী প্রকৃতি দেবী।

ভগবান শংকর বললেন, হে দেবী! ব্রহ্মার পর উৎপন্ন হওয়া বিষ্ণু যদি তোমার থেকে উৎপন্ন হয়, তাহলে আমি তমোগুণী লীলা করা শংকর কি তোমার পুত্র নয়? অর্থাৎ আমাকেও তুমি উৎপন্ন করেছো। আমরা শুধু নিয়মিত কাজ'ই করতে পারি। অর্থাৎ যার ভাগ্যে যা লেখা আছে, তাই প্রদান করতে পারি। কাউকে একটু বেশি বা কাউকে একটু কমও দিতে পারি না।

পাঠকগণ! এই দেবী পুরানের উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, নাশবান। এই দেবতাদের মাতা শ্রী দুর্গাদেবী। বিস্তারিত জানার জন্য এই পুস্তকের "সৃষ্টি রচনা"র অধ্যায় পড়ুন পৃষ্ঠা-219। এই তিন প্রধান (মূখ্য) দেবতা, অন্য দেবতারা এই দেবতাদের থেকে নিম্ন স্তরের দেবতা। এই সকল দেব দেবীর জন্ম - মৃত্যু হয়। এরা অবিনাশী রাম বা অবিনাশী পরমাত্মা নয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ২-এ লেখা আছে গীতা জ্ঞানদাতা কাল ব্রহ্ম বলেছে, আমার উৎপত্তিকে না দেবতাগণ জানে, না মহর্ষিগণ। কারণ আমি সকলের আদি কারণ অর্থাৎ এই দেবতারা আমার থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫-এ গীতা জ্ঞানদাতা কাল বলছে হে অর্জুন! তোর আর আমার অনেক জন্ম হয়েছে। তুই জানিস না আমি জানি। গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২ তে স্পষ্ট আছে তুই আমি তথা সমস্ত রাজা ও সেনা আগেও জন্মেছিল আর পরেও জন্ম নেবে।

গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক ৩-এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছে, হে অর্জুন! আমার প্রকৃতি অর্থাৎ দুর্গা তো গর্ভ ধারণ করে। আমি দেবী প্রকৃতির গর্ভে বীজ স্থাপন করি, তাতে সর্ব প্রাণীদের উৎপত্তি হয়।

গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক ৪-এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছে, হে অর্জুন! বিভিন্ন প্রকার যোনীতে যে শরীর ধারী মূর্তি উৎপন্ন হয় (মহত্) দেবী প্রকৃতি এই সকল জীবের মা আর (অহম্ ব্রহ্ম) আমি ব্রহ্ম বীজ স্থাপন করা পিতা।

গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক ৫-এ গীতা জ্ঞানদাতা স্পষ্ট করে দিয়েছে, হে অর্জুন! সত্ত্বগুন শ্রী বিষ্ণু, রজোগুণ শ্রী ব্রহ্মা ও তমোগুণ শ্রী শিব, এই তিন দেবতা প্রকৃতি অর্থাৎ দুর্গা দেবী থেকে উৎপন্ন। এই তিন গুণ অবিনাশী জীব আত্মাকে কর্মের আধারে বিভিন্ন শরীরে বেঁধে রাখে। উপরোক্ত সদগ্রন্থের উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয়, উপরোক্ত দেবতারা নাশবান এবং কাল ব্রহ্ম এর সন্তান।

প্রসঙ্গ ছিল বাণী সংখ্যা ৩-এর সরলার্থ:- ইন্দ্র, কুবের, ঈশ অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের পদবী প্রাপ্ত করে এবং বরুণ, ধর্মরায়ের পদ, শ্রী বিষ্ণুনাথের লোকে গিয়েও জন্ম-মৃত্যুর চক্রে থাকতে হয়।

❖ মার্কণ্ডে ঋষি ব্রহ্ম সাধনা করতেন। তিনি এই সাধনাকে সর্বোত্তম সাধনা মনে করতেন। এই জন্য তিনি ইন্দ্রকে বলেন, এসো ইন্দ্র! তুমি আমার কাছে এসো আমি তোমাকে ব্রহ্ম সাধনার জ্ঞান করাব। ব্রহ্মলোকের তুলনায় স্বর্গের রাজ্য- যেমন হালুয়ার আর কাকের পায়খানার মধ্যে পার্থক্য।

প্রিয় পাঠক! শ্রী চুনক ঋষি, শ্রী দুর্বাসা ঋষি, শ্রী কপিল মুনি মোটকথা যারা ব্রহ্ম সাধনা করেছিলেন। তাঁদের সাধনাকে গীতা জ্ঞানদাতা গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮-তে অশ্রেষ্ঠ বা অনুত্তম্ বলেছেন। ঐ সাধনাকে অতি উত্তম মনে করে মার্কণ্ডে ঋষিও ঐ ব্রহ্ম সাধনা করেছিলেন। তাই তিনি ইন্দ্র দেবকে ব্রহ্ম সাধনার পরামর্শ দিয়ে বলেন

ইন্দ্র ব্রহ্ম সাধনা কর। সূক্ষ্ম বেদে বলেছে-

**ঔরোঁ পন্থ্ বতাবহীঁ, আপ ন জানে রাহ॥ ১**
**মোতী মুক্তা দর্শত নাহীঁ, য়হ্ জগ হে সব অন্ধ রে।**
**দিখত কে তো নৈন চিসম হৈঁ, ফিরা মোতিয়া বিন্দ রে॥ ২**
**বেদ পড়েঁ পর ভেদ না জানেঁ, বাঁচে পুরাণ অঠারা।**
**পাথর কী পূজা করে, ভুলে সিরজনহারা॥**

**বাণী নং ১ এর ভাবার্থ:-** অন্যদের মার্গ দর্শণ করায় কিন্তু নিজে ভক্তির জ্ঞান জানে না।

**বাণী নং ২ এর ভাবার্থ:-** তত্ত্বদর্শী সন্তের অভাবের কারণে মতি মুক্তা অর্থাৎ মোক্ষ রূপী মতি বা মোক্ষ মন্ত্র দেখা যায় না। এই সমস্ত সংসার আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান হীন অন্ধ, যেমন মোতিয়া বিন্দ (এক প্রকারের চোখের রোগ। এই রোগ হলে বাইরে থেকে চোখকে ভাল দেখা গেলেও রোগাক্রান্ত ব্যক্তি চোখে দেখতে পায়না।) তাই এই উদাহরণ দিয়ে বলেছেন- গুরু গম্ভীর হয়ে সংস্কৃত ভাষা বলায় মনে হয় খুব বুদ্ধি মান। কিন্তু সদগ্রন্থের গুঢ় গোপন রহস্যকে তারা জানে না। ওদের অজ্ঞান রূপী মোতিয়া বিন্দ হয়েছে।

**বাণী নং ৩ এর ভাবার্থ:-** বেদকে পড়ে মুখস্থ করা ব্যক্তিরা বেদের গুঢ় (গোপন) রহস্যকে না বুঝে বেদের বিপরীত সাধনা করে ও করায়। বেদের কোথাও পাথরের মূর্তি পূজার কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু তথাকথিত বেদ বিদ্বানরা তথা পণ্ডিতেরা মূর্তি পূজা করেন ও করান। তারা বেদে বর্ণিত সৃজনহারকে ভুলিয়ে দিয়েছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ২৫ থেকে ২৯ পর্যন্ত বলেছে, যে সকল সাধক তাদের বিশ্বাস অনুসারে যে যে সাধনা করেন, তিনি সেই সাধনাকে উত্তম মনে করেই করেন। সমস্ত সাধকরা নিজের নিজের সাধনাকে পাপ নাশক বলে জানেন।

গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২ এ স্পষ্ট ভাবে বলেছে, যে যজ্ঞ অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানের জ্ঞান স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম নিজের মুখ কমলের বাণীতে বিস্তারিত ভাবে বলেন, তাই তত্ত্বজ্ঞান। এই জ্ঞানকে জেনে সাধক সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪ এ স্পষ্ট করেছে, ঐ তত্ত্ব জ্ঞানকে তত্ত্বদর্শী সন্তই জানে। ঐ সন্তকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে বিনম্রতা পূর্বক প্রশ্ন করলে ঐ তত্ত্বজ্ঞান জানা সন্ত বা মহত্মা তোকে তত্ত্ব জ্ঞানের উপদেশ দেবেন।

উপরোক্ত বানীতে এই তত্ত্বজ্ঞানকে নির্গুণ রাসা বলেছে। এই নির্গুণ রাসা না পাওয়ার কারণে সমস্ত সাধক জন্ম মৃত্যুর চক্রে থাকে। মার্কণ্ডে ঋষি ব্রহ্ম সাধনা করছিল। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৬-তে বলেছে ব্রহ্মলোকে যাওয়া সাধক ও পুনরায় বারে বারে জন্ম- মৃত্যুর চক্রে আসতে থাকে।

পূর্বের বাণী সংখ্যা ৪:-

**অসংখ জন্ম তোহে মরতাঁ হোগে, জীবিত ক্যোঁ ন মরে রে।**
**দ্বাদশ মধ্য মহল মঠ বোরে, বহুর ন দেহ ধরৈ রে॥**

**সরলার্থ:-** হে মানব! অনন্তবার তোমার জন্ম মৃত্যু হয়েছে। তাই সত্য সাধনা কর তথা জীবিত মর। জীবিত মরার তাৎপর্য ভক্তের জ্ঞান হয়ে যাওয়া, যে এই সংসারের সকল বস্তু অস্থায়ী এমনকি এই শরীরও অস্থায়ী। জন্ম-মৃত্যুর রোগ অতি ভয়ংকর। এই সংসারে দুঃখ অতিরিক্ত অন্য কিছু নেই। মানব শরীরে ভক্তি করে মোক্ষ প্রাপ্তি না করলে পশুর মত জীবন-যাপন করতে হবে। যেমন গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৯-এ বলেছে যে সাধক জরা অর্থাৎ বৃদ্ধ অবস্থার কষ্ট ও মৃত্যুর দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে সাধনা কবে, সে তৎব্রহ্মকে তথা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মকে তথা কর্মকে জানে।

সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান জানার পর মানুষের অপ্রয়োজনীয় বস্তুর ইচ্ছা হয় না। মদ, মাছ, মাংস, তামাক, বিড়ি ইত্যাদি নেশার বস্তু সেবন করে না। নাচ, গান করা মূর্খের কাজ মনে করে। যেমন ভোজন পায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকে।

আত্ম কল্যাণের জন্য সাধক চিন্তা করে, যদি সৎসঙ্গে না যাই তাহলে গুরুজীর দর্শন হবে না। সৎসঙ্গের বিচার না শুনলে মন ভ্রমিত হয়ে যাবে। যাদের এইভাব হয় সেই সাধক সমস্ত কাজ ফেলে রেখে সৎসঙ্গ শুনতে যাবে। কারণ সে মনে মনে বিচার করে, আমরা প্রতিদিন দেখতে বা শুনতে পাই ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েকে ছেড়ে মাতা-পিতা মারা যায়, বড়-বড় ধনী ব্যক্তি দুর্ঘটনায় মারা যায়। সারা জীবন কষ্ট করে যে সম্পত্তি বানিয়েছিল তাও ছেড়ে চলে যেতে হয়। বড়-বড় পুঁজী-পতিরা দুর্ঘটনায় মারা যায়। সারাজীবন ধরে ইনকাম অর্জিত ধন-সম্পত্তি সব'ই এই পৃথিবী লোকে থেকে যায়। পুনরায় ঐ ব্যক্তি তার হাতে গড়া সম্পত্তি ভোগ দখলের জন্য আসতে পারবে না। মৃত্যুর একদিন আগেও কাজ ছাড়ার জন্য মন চাইতো না। এখন সেই কাজ চিরতরে সমাপ্ত হয়ে গেছে।

## "আজ ভাইয়ের সময় হয়েছে"

এক ভক্ত আত্মা পরমাত্মার জ্ঞান শুনে নাম দীক্ষা নিয়ে ভক্তি করা শুরু করে এবং সৎসঙ্গেও যেতে লাগে। ভক্ত তাঁর বন্ধুকে সৎসঙ্গে যাওয়ার জন্য ও ভক্তি করার জন্য প্রার্থণা করে। কিন্তু বন্ধু কোন কথা শোনে না। বলে খুব কাজের ঝামেলা। এখন সময় নেই, ছেলে, মেয়ে এখনো ছোট ছোট, এদের পালন পোষণ করতে হবে। কাজ বন্ধ করে সৎসঙ্গে গেলে সব চৌপাঠ (শেষ) হয়ে যাবে।

ঐ সৎসঙ্গে যাওয়া ভক্ত আত্মা তার বন্ধুকে যখনই সত্সঙ্গে যাওয়ার কথা বলতো, তখন তার বন্ধু বলতো এখন সময় নেই (ফুরসত নাই) কাজের ঝামেলা, সময় পেলে দেখব। এক বছর পরে বন্ধুর মৃত্যু হয়। ঐ ব্যক্তির অন্তিম ক্রিয়া করার জন্য বংশের লোক জন পাড়া প্রতিবেশী ও গ্রামের লোকেরা শ্মশানের দিকে নিয়ে যায়। সবাই 'রাম নাম সত্য হে, সত্য বোলে গত্ হে' (বলো হরি হরি বোল, বলো হরি হরি বোল) বলতে লাগে।

তখন ঐ ভক্ত বলে, রাম নাম তো সত্য, কিন্তু আজ ভাইয়ের সময় হয়েছে। নগর বাসীরা বলে 'সত্য বোলে গত্ হে', আর ভক্ত বলে, আজ ভাইয়ের সময় আছে। অন্য ব্যক্তিরা ঐ ভক্তকে বলে ভাই এই ধরনের কথা বলিস না, শুনলে ওর পরিবারের লোকেরা দুঃখ পাবে। ভক্ত বলে আমি এই রকমই বলব। আমি এই মূর্খকে হাত জোর করে অনেক বার প্রার্থণা করেছি সৎসঙ্গে চল, একটু ভক্তি কর। তখন এ বলতো এখন সময় নেই কাজের ঝামেলা। আজ এই মূর্খের কোন কাজের ঝামেলা নেই। ছোট ছোট বাচ্চাদেরও ছেড়ে চলে গেল। আর এদের বাহানা দিয়ে পরমাত্মার থেকে দূরে ছিল। ভক্তি করলে খালি হাতে যেতে হত না। কিছু ভক্তি ধন সাথে নিয়ে যেত। বাচ্চাদের পালন-পোষণ তো পরমাত্মাই করে। ভক্তি করলে সাধকের আয়ুও পরমাত্মা বাড়িয়ে দেন। তাই ভক্তগণ এই বিচারে ভক্তি করে, সকল প্রকার কাজ ফেলে রেখে সৎসঙ্গ শুনতে যায়।

**বিচার করুন:-** ভক্তগণ মনে মনে চিন্তা করে পরমাত্মা না করুক, যদি আমাদের মৃত্যু হয়ে যায় তখন আমাদের কাজ কে করবে? মনে কর আমার মৃত্যু হয়েছে। তিন দিনের জন্য আমি মরে গিয়েছি। এই মানসিকতা নিয়ে সৎসঙ্গে চলো। পরমাত্মা ভক্ত আত্মার কাজ খারাপ হতে দেয় না। তবুও মনে করি যে আমার অনুপস্থিতিতে কিছু

কাজ খারাপ হলেও তিনদিন পরে তা ঠিক করে নেব। কিন্তু যদি সত্যিই মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে ঐ কাজ আর ঠিক করতে পারব না। এই স্থিতিকে 'জীবিত মরা' বলা হয়।

বাণীর শেষ সরলার্থ :- **দ্বাদশ মধ্য মহল মঠ বৌরে, বহুর ন দেহি ধঁরে রে।**

**সরলার্থ:-** শ্রীমদ্ভগবত গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪-এ বলেছে তত্ত্ব জ্ঞান প্রাপ্তির পর পরমেশ্বরের ঐ পরম পদের খোঁজ করা দরকার যেখানে যাওয়ার পরে সাধক পুনরায় এই সংসারে ফিরে আসে না। অর্থাৎ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে না। সূক্ষ্ম বেদের এই বাণী স্পষ্ট করে দিয়েছে ঐ পরম ধামে দ্বাদশ (১২-তম) দ্বার পার করে যেতে হবে এবং পুনরায় মানব দেহ ধারণ করতে হয় না। এখন পর্যন্ত সকল ঋষি মুনি, সন্ত, মণ্ডলেশ্বরগণ দশম দ্বার পর্যন্তের কথা জানে বা বলে। কিন্তু পরমেশ্বর কবীর জী নিজের স্থান প্রাপ্ত করার সত্য মার্গ, সতস্থানের কথা স্বয়ং বলেছেন। তিনি দ্বাদশ দ্বারের কথা বলেছেন। এতে প্রমাণিত হয় আজ পর্যন্ত (সন ২০১২ পর্যন্ত) পূর্বের ঋষি, সন্ত, গুরুর ভক্তি কাল ব্রহ্ম পর্যন্ত ছিল। যার কারণ তাঁরা এখনো জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আছে।

বাণী সংখ্যা ৫:-

**দোজখ বহিশ্ত সভী তৈ দেখে, রাজপাট কে রসিয়া।**
**তীন লোক সে তৃপ্ত নাহীঁ, য়হ মন ভোগী খসিয়া॥**

**সরলার্থ:-** তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে পূর্ণমোক্ষের মার্গ না পাওয়ার কারণে কখনো নরকে (দোজখ) গিয়েছে, কখনো স্বর্গে (বহিস্ত) গিয়েছে, কখনো রাজা হয়ে আনন্দ ভোগ করেছে। যদি মানুষকে তিন লোকের রাজ্যও দেওয়া হয় তবুও তার তৃপ্তি হবে না।

**উদাহরণ:-** যদি কেউ গ্রামের প্রধান হয়। তাহলে সে চিন্তা করে যদি বিধায়ক হতে পারতাম তাহলে খুব ভাল হত, কোন দুঃখ টেনশন থাকত না আনন্দে থাকতাম। আর বিধায়ক ইচ্ছা করে মন্ত্রী হতে পারলে মনের ইচ্ছা পূর্ণ হত। মন্ত্রী হয়ে ইচ্ছা করে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার। যদি মুখ্যমন্ত্রী হতে পারি সমস্ত রাজ্য আমার অধীনে থাকবে। কেউ কিছু বলার সাহস করবে না, শুধু আনন্দই আনন্দ হবে। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রবল ইচ্ছা হয় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার। যদি প্রধানমন্ত্রী হতে পারি তাহলে জীবন সার্থক, ততক্ষনে জীবন লীলা শেষ হয়ে যাবে। তখন গাধা হয়ে কুমোরের লাঠি খেতে হবে। তাই তত্ত্ব জ্ঞানে বোঝানো হয় কাল ব্রহ্মের দ্বারা বানানো স্বর্গ, নরক, তথা রাজপাট প্রাপ্তির মরিচিকার পিছনে দৌড়ে সারাজীবন ব্যর্থ করছে। কিন্তু তাতেও এই খুসরা (হিজড়া) মনের সন্তোষ হয় না।

ইরাক দেশের বলখ শহরে আব্রাহিম সুলতান অধম নামক এক রাজা ছিলেন। তিনি পূর্ব জন্মের এক অতি পুণ্য আত্মা ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে ধন ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে ভ্রমিত হয়ে পরমাত্মাকে ভুলে যান। একদিন রাজা হাসি খুশি সহ ফুরফুরে মেজাজে রাজমহলে বসে ছিলেন। একদিন পরমাত্মা সতলোক থেকে এসে এক পথিকের রূপ ধারণ করে রাজার মহলে যান এবং বলেন, হে সরাই খানার (ধর্মশালার) মালিক! রাতে থাকার জন্য আমাকে একটি রুম (কামরা) ভাড়া দেন। কত টাকা ভাড়া নিবেন? রাজা বলে, হে পথ ভোলা পথিক! এটা সরাই খানা (ধর্মশালা) নয়। এ আমার মহল। আমি এখানের রাজা, এটা রাজ মহল। পথিক রূপে পরমাত্মা জিজ্ঞাসা করেন, আপনার পূর্বে এই মহলে কে থাকতেন? রাজা বলে, আমার পিতা, দাদা-পরদাদারা থাকতেন। পথিক রূপে পরমাত্মা জিজ্ঞাসা করেন, আপনি এখানে কত দিন থাকবেন? তখন রাজা বলে আমিও একদিন এই মহল ছেড়ে চলে যাব। পরমেশ্বর বলেন, তাহলে এটা সরাই খানা নয় তো কি? আপনার বাপ-দাদারা যেমন চলে গিয়েছে, সেইরূপ আপনিও চলে

যাবেন। তাই আমি এই মহলকে সরাই খানা বলেছি। তখন রাজার বাস্তবিক জ্ঞান হয়। সংসারের মায়া ত্যাগ করে আত্মকল্যাণ করায়। সদা সুখ আর অমর জীবন প্রাপ্ত করার জন্য দীক্ষা নিয়ে আজীবন ভক্তি করে নিজের জীবন সফল করে।

বাণী সংখ্যা ৬:-

**সদগুরু মিলৈঁ তো ইচ্ছা মেটৈঁ, পদ মিল পদে সমানা।**
**চল হংসা উস্ লোক পঠাউঁ, জো আদি অমর অস্থানা॥**

**সরলার্থ:-** তত্ত্বদর্শী সন্ত সদগুরু উপরোক্ত জ্ঞান বলে কাল ব্রহ্মলোকের সর্ব বস্তু থেকে তথা সর্ব পদের ইচ্ছা সমাপ্ত করে দেয় “পদ মিল পদে সমানা” ইহাতে এক পদ এর অর্থ পদ্ধতি অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি অনুসার সাধনা। দ্বিতীয় পদের অর্থ ‘পরমপদ’ অর্থাৎ ‘পদবী’। সদগুরু শাস্ত্রবিধি অনুসার পদ্ধতি বলে পরমেশ্বরের পরম পদের প্রাপ্তি করায় ওখানে যাওয়ার পরে সাধক পুনরায় এই সংসারে দ্বিতীয়বার ফিরে আসে না। হে ভক্ত! চলো, আমি তোমাকে ঐ আদি অমর স্থানে অর্থাৎ গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে-বর্ণিত সনাতন পরম ধামে নিয়ে যাবো, যেখানে এক মাত্র এক রস পরম শান্তি আছে।

বাণী সংখ্যা ৭ :-

**চার মুক্তি জহাঁ চম্পী করতী, মায়া হো রহী দাসী।**
**দাস গরীব অভয় পদ পরসৈ, মিলে রাম অবিনাশী॥**

**সরলার্থ:-** ঐ সনাতম পরমধামে পরম শান্তি তথা অত্যাধিক সুখ আছে। আর কাল ব্রহ্মের লোকে চার মুক্তি আছে বলে মানা হয়। সাধক তা প্রাপ্ত করে নিজেকে ধন্য মনে করে কিন্তু এই মুক্তি স্থায়ী নয়। কিছু কাল পরে পুণ্য সমাপ্ত হলে পুনরায় ৮৪ লাখ যোনীতে কষ্ট ভোগ করতে হয়। কিন্তু ঐ সতলোকে ৪ মুক্তির সুখ সদা ভোগ করা যায়। ওখানে মায়া তোমার চাকরানি হয়ে থাকবে।

সন্ত গরীব দাস জী বলেছেন, অমর লোকে যাওয়ার পরে সাধক নির্ভয় হয়ে যায়। আর ঐ সনাতন পরমধামে ঐ অবিনাশী রাম অর্থাৎ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত করে। তাই পূর্ণ মোক্ষের জন্য শাস্ত্রানুকুল ভক্তি করতে হবে, যাতে ঐ পরমেশ্বর পর্যন্ত পৌঁছানো যায়।

উপরোক্ত বাণী তথা পূর্বোক্ত বিবরণে বোঝা যায়, শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিব ভগবান সহ ওদের পিতা কাল ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ এই সব রাম অর্থাৎ প্রভু নাশবান। এক মাত্র পরম অক্ষর ব্রহ্মই অবিনাশী রাম অর্থাৎ প্রভু। এই পরমেশ্বরের ভক্তিতে পরমশান্তি তথা সনাতন ধাম অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। সেখানে চার মুক্তির সুখ সদা থাকে। মায়া অর্থাৎ সর্ব সুখ-সুবিধা সাধকের কাছে চাকরের মত উপস্থিত থাকে।

সুক্ষ্ম বেদে বলেছে:-

**কবীর, মায়া দাসী সন্ত কী, উভয় দে আশীষ।**
**বিলসী আউর লাতোঁ ছড়ী, সুমর-সুমর জগদীশ॥**

**ভাবার্থ:-** সমস্ত সুখ সুবিধা ধন থেকে প্রাপ্ত হয়। এই ধন শাস্ত্র বিধি অনুসার ভক্তি করা সন্ত বা ভক্তের সাথে সর্বদা থাকে। কিন্তু তাদের এই ধন প্রাপ্তির উদ্দেশ্য থাকে না তবুও ধন অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। যেমন কেউ ধান বা গমের ফসল লাগায়। উদ্দেশ্য থাকে ধান বা গমের ফসল উৎপন্ন করা। কিন্তু ভুষ বা বিচালী (খর) অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। বিচালী বা ভুষ, ধান গমের সাথে ফ্রিতে প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ সত্য সাধনা করা সাধক আপনা থেকে ধন প্রাপ্ত হয়। তার ভোক্তা সাধক হয়। এই ধন বা মায়া সাধকের চরনে পড়ে থাকে অর্থাৎ তাদের কখনো ধনের অভাব হয় না। প্রয়োজন ছাড়া অধিক ধন প্রাপ্ত হয়। পরমেশ্বরের ভক্তি করা ভক্ত বা সন্ত মায়ায় প্রাপ্ত ক্ষনিকের আনন্দে বিচলিত হয় না

তাই তাঁরা পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত করে।

উপরোক্ত প্রসঙ্গে এটা বলা যায় যে, মানুষ শরীর প্রাপ্ত প্রাণীকে নিজের উদ্দেশ্য মনে রাখতে হবে এবং ভক্তি করে আত্ম কল্যাণ করতে হবে। সুক্ষ্ম বেদে লেখা আছে:- (রাগ আসাবরী শব্দ নং ৭১)

**য়হ সৌদা ফির নাহীঁ সন্তো, য়হ সৌদা ফির নাহীঁ।**
**লোহে জৈসা তাব জাত হৈ, কায়া দেহ সরাহী॥**
**তিন লোক আউর ভুবন চতুর্দশ, সব জগ সৌদে আহীঁ।**
**দুগনে-তিগুনে কিয়ে চৌগুনে, কিন্হুঁ মূল গবাহীঁ॥**

**ভাবার্থ:-** যেমন দুই ব্যবসায়ী ৫ লাখ টাকা করে সম পরিমান মূলধন নিয়ে দূরের কোনো শহরে ব্যবসা করতে যায়। একজন মূল ধনের সদুপয়োগ করে। ধর্মশালা বা হোটেল ভাড়া করে ব্যবসা করতে লাগে। সস্তায় জিনিস কিনে বেশি দামে বিক্রি করে ২০ লাখ টাকা মুনাফা করে। দুই বছর পর বাড়ি ফিরে এলে গ্রামের সবাই তাকে নিয়ে চর্চা শুরু করে ও তার খুব প্রশংসা করতে লাগে। চারিদিকে তার প্রশংসা হতে লাগল। ঐ ব্যবসায়ী আরো ধনী হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ব্যক্তিও বিদেশে ভাড়ার ঘরে থেকে ব্যবসা না করে নেশা করে বেশ্যা গমন, নাচ গান দেখে, ঘুমিয়ে দিন কাটাতে লাগে। যে ৫ লাখ টাকার মূলধন ছিল তাও নষ্ট করে দেয়। ঋণী হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। যার কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিল, সে টাকা চায়। কিন্তু টাকা দিতে না পারায় ঐ ব্যক্তি তার ধার দেওয়া ৫ লক্ষ টাকা উসুল করার জন্য হিসেব বুঝে নেওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যবসায়ীকে তার চাকর বানিয়ে রাখে। উপরোক্ত বাণীর আসল অর্থ হল তিন লোকে (স্বর্গলোক, পাতাললোক ও পৃথিবী লোক) যত প্রাণী আছে, তারা সব রাম নামের ব্যবসা (সৌদা) করতে এসেছে। কেউ দুই গুন, তিনগুন, চারগুন ধন উপার্জন করেছে, অর্থাৎ পূর্ণ সন্তের থেকে দীক্ষা নিয়ে মানুষ জীবনের শ্বাসের পুঁজি যে মূলধন তা সদভক্তি করে বৃদ্ধি করেছে। অন্য ব্যক্তি যে সদভক্তি করেনি। সে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে মনমর্জী আচারণ করেছে বা অধিকারী হীন গুরু থেকে দীক্ষা নিয়ে ভক্তি করেছে তার কোনো লাভ হবে না। পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩, ২৪ -তে এর প্রমাণ আছে। ঐ ব্যক্তি নিজের শ্বাস রূপী মূলধনের সদভক্তি না করে জীবন নষ্ট করে দিয়েছে।

## ভক্তি না করায় ক্ষতি ও অন্য বিবরণ

**(শব্দ নং- 71 এর শেষ)**

**য়হ দম টুটে পিন্ডা ফুটে, হো লেখা দরগাহ মাঁহী।**
**উস দরগাহ মে মার পরৈগী, জম পাকড়েঁঙ্গে বাঁহী॥**
**নর-নারায়ণ দেহি পায় কর, ফের চৌরাসী জাঁহী।**
**উস দিন কি মোহে ডরনী লাগে, লজ্জা রহ কে নাঁহী॥**
**জা সতগুরু কি মৈঁ বলিহারী, জো জামণ মরণ মিটাহী।**
**কুল পরিবার তেরা কুটম্ব কবীলা, মসলিত এক ঠহরাহী।**
**বান্ধ পিঞ্জরী আগৈ ধর লিয়া, মরঘট কূ লে জাঁহী॥**
**অগ্নি লগা দিয়া জব লম্বা, ফুক দিয়া উস ঠাঁহী।**
**পুরাণ উঠা ফির পণ্ডিত আয়ে, পীছে গরুড় পঢ়াহী॥**

**ভাবার্থ:-** এই শ্বাস যেদিন সমাপ্ত হয়ে যাবে। সেদিন এই শরীর রূপী পিণ্ডও ছেড়ে যাবে। তারপর পরমাত্মার দরবারে পাপ-পুণ্যের হিসাব হবে। ভক্তি না করা বা

শাস্ত্র বিরুদ্ধ ভক্তি করা আত্মাকে কালের দূতেরা ধরে নিয়ে যাবে। সে রাজা হোক বা ভিখারী। তখন তার সাজা হবেই। পরমেশ্বর কবীর জী সন্ত গরীব দাসকে সশরীরে দেখা দিয়ে তাঁর আত্মাকে উপরে নিয়ে যান। তাঁকে সর্ব ব্রহ্মান্ড দেখায় এবং সমস্ত সন্দেহের সমাধান করে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান বুঝিয়ে গরীব দাসের আত্মাকে তাঁর শরীরে পাঠিয়ে দেন। তাই গরীব দাসজী নিজের চোখে দেখা সত্য কথা বলেছেন। হে মানব! তোমারা নারায়ণ অর্থাৎ পরমাত্মা স্বরূপ নর শরীর পেয়েছো। অন্যান্য প্রাণীরা সকল সুবিধা যুক্ত এত সুন্দর শরীর পায়নি। তাই এই অমুল্য শরীর পাওয়ার পরে মানবকে আজীবন পরমাত্মার ভক্তি করা দরকার। পরমাত্মা স্বরূপ শরীর প্রাপ্ত করে সদভক্তি না করার কারণ পুনরায় ৮৪ লাখ যোনীর চক্রে চলে যেতে হবে। ধিক্কার তোর মানবজীবন কে। আমি ঐ দিনের চিন্তা করলে ভয় পাই যে ভক্তি কম হওয়ার কারণ পরমাত্মার দরবারে অপমানিত হতে না হয়। আমি ভক্তি করতে করতেও ভয় পাই, যে ভক্তি কম না থেকে যায়। তোমরা তো ভক্তিই করোনা। আর যদিও করো তা শাস্ত্র বিরুদ্ধ করো। তোমাদের তো খুব খারাপ অবস্থা হবে। তাই আমি পরামর্শ দিচ্ছি এমন সদগুরু বেছে নাও যে জন্ম-মৃত্যুর দীর্ঘ রোগকে সমাপ্ত করে দেবে। যারা সত্য ভক্তি করে না, মৃত্যুর পর তাদের কি দশা হয়। পাড়া প্রতিবেশী ও বংশের লোকেরা এক জায়গায় মিলিত হয়ে বলে লাশ ওঠাও! দেরি হয়ে যাচ্ছে। তারপর ঐ লাশকে বাঁশের খাটিয়ায় পিচমোড়া করে বেঁধে খই ছড়াতে ছড়াতে ‘বলো হরি হরি বোল’ দিতে দিতে শ্মশান ঘাটে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে মাথায় বুকে বাঁশের লাঠির আঘাতে টুকরো টুকরো করে দেয়। পকেটে কিছুই রাখে না সব বের করে নেয়। শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা করে বা মনমর্জি আচারণ করে শরীর বা সংসার ছাড়ার পর জীব কল্যাণের জন্য গরুড় পুরাণ পাঠ করায়।

তত্ত্বজ্ঞানে (সূক্ষ্মবেদ) বলেছে জীব যখন নিজের মানব জীবন পূর্ণ করে চলে যাবে। তখন পরমাত্মার দরবারে তার হিসাব হবে। সেখানে কর্মানুসারে ভক্তির খতিয়ান দেখে ধর্মরায়ের নির্দেশে কর্মদণ্ড ভোগ করার জন্য শুয়োর, গাধা- কুকুর, ইত্যাদি যোনীতে যাওয়ার লাইনে দাঁড়াবে। মৃত্যুর পরে গরুড় পুরাণ পাঠ করলে কোন কাজে আসবে না। এসব শাস্ত্র বিরুদ্ধ ব্যর্থ ক্রিয়া। মৃত্যুর পর দণ্ড প্রাপ্ত ঐ প্রাণীর আত্মা যখন মানুষের শরীরে ছিল তখন ভগবানের সংবিধানে জ্ঞান জানার দরকার ছিল। তাতে ভাল কর্ম ও খারাপ কর্মের জ্ঞান হতো আর সে তার মানব জীবন সফল করতো।

**প্রেত শিলা পর জায় বিরাজে, ফির পিতরোঁ পিণ্ড ভরাহীঁ।**
**বহুর শ্রাদ্ধ খান কুঁ আয়া, কাগ ভয়ে কলি মাহীঁ॥**

**ভাবার্থ:-** মৃত্যুর পরে জীবের কল্যাণার্থে অর্থাৎ গতি করার জন্য প্রচলিত শাস্ত্র বিরুদ্ধ ক্রিয়া করা ব্যর্থ। যেমন মৃত ব্যক্তির মোক্ষের জন্য গুরুড় পুরান বা রামায়ণ পাঠ করে মুক্তি বা মোক্ষের জন্য গঙ্গায় অস্তি ভাসিয়ে দেওয়া। আবার তেরো দিনের, শ্রাদ্ধ হবন, ভাণ্ডারা (গ্রামের লোকদের খাওয়ানো) ইত্যাদি তার মোক্ষের জন্য করা হয়। পরে আবার প্রতি মাসে একবার ক্রিয়া করা হয়, ছয়মাস পরে ঐ জীবের মুক্তির জন্য পুনরায় ক্রিয়া করা হয়, এক বছর পরে মুক্তির জন্য আবার বাৎসরিক ক্রিয়া করা হয়। পরে আবার ঐ প্রাণীর মুক্তির জন্য পিণ্ড দানের ক্রিয়া ইত্যাদি করা হয়। শ্রাদ্ধের দিনে পুরোহিত ভোজন (খাবার) স্বয়ং নিজে বানায় আর বলে, ভোজনের কিছু অংশ বাড়ির চালের উপর বা ছাদের উপর রেখে দাও। তোমার পিতা কাক হয়ে আসবে। যদি কাকে খাবার খায় তাহলে বলে তোমার মাতা-পিতা বা যার মৃত্যু হয়ে হয়েছে, যার জন্য শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সকল ক্রিয়া করা হচ্ছে, সে কাক হয়ে গিয়েছে। তাই তোমার শ্রাদ্ধ

সফল হয়েছে। উপরোক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে মৃত ব্যক্তির মুক্তি লাভের আশায় যে সমস্ত শাস্ত্র বিরুদ্ধ ক্রিয়া করা হয়েছিল, সেই মৃত ব্যক্তি কাক হয়ে গিয়েছে। তার মুক্তি হয়নি।

পুরোহিত বলেন, শ্রাদ্ধ করলে মৃত জীব এক বছর পর্যন্ত তৃপ্ত থাকে। আবার এক বছর পরে শ্রাদ্ধ করতে হয়।

বিচার করুন, জীবিত ব্যক্তি দিনে তিনবার ভোজন করে। এখন একদিন ভোজন (খাবার খেয়ে) করে এক বছর পর্যন্ত কিভাবে তৃপ্ত থাকবে? যদি ছাদের উপর প্রতিদিন ভোজন রাখা হয় তাহলে কাক প্রতিদিন ভোজন খাবে।

দ্বিতীয়ত, মৃত্যুর পরে এই সব ক্রিয়া করিয়ে ঐ জ্ঞানহীন গুরুরা শেষ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তিকে কাক বানিয়ে দেয়। আসলে ঐ মৃত ব্যক্তির আত্মা প্রেত যোনীতে গিয়েছে। এদিকে গুরু (পণ্ডিত, পুরোহিত) আর কাকেরা ভোজনের আনন্দ নিচ্ছে। পিণ্ড দানের লাভের বিষয়ে বলেছে, পিণ্ড দানে প্রেত যোনী থেকে মুক্তি হয়। মনে কর কেউ প্রেত যোনী থেকে মুক্ত হয়ে যদি গাধা বা গরু হয় তাহলে কি লাভ, তার কেমন গতি (মুক্তি) হয়েছে?

**নর সে ফির পশুবা কীজৈ, গধা, বৈল বনাঈ।**
**ছপ্পন ভোগ কহাঁ মন বৌরে, কহী কুরড়ী চরণে জাঈ॥**

**ভাবার্থ:-** আমাদের মানব জীবন কত ভালো, ৫৬ প্রকারের ভোজন খাই। আর ভক্তি না করে বা শাস্ত্র বিরুদ্ধ ভক্তি করে গাধা বা অন্য পশুর যোনীতে গেলে কোথায় পাব ৫৬ প্রকারের ভোজন! তখন মাঠে ঘাস খাওয়ার জন্য যেতে হবে। বিভিন্ন প্রকারের পশু যোনীতে জীব ভয়ংকর কষ্ট ভোগ করে।

**জৈ সতগুরু কী সংগত করতে, সকল কর্ম কটি জাঈ।**
**অমর পুরি পর আসন হোতে, জহাঁ ধূপ ন ছাঁই॥**

**ভাবার্থ:-** পরমেশ্বর কবীর সাহেবের থেকে প্রাপ্ত সুক্ষ্ম বেদের জ্ঞান অনুসারে গরীব দাসজী বলেছেন, সদগুরুর (তত্ত্বদর্শী সন্তের) শরণে গিয়ে নাম দীক্ষা নিলে উপরোক্ত সকল প্রকার পাপ কর্মের কষ্ট নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ প্রেত, গাধা, গরু ইত্যাদি যোনীতে যেতে হয় না। অমর পুরিতে আসন অর্থাৎ গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তথা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪-এ বর্ণিত সনাতন পরমধাম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়। পুনরায় এই সংসারে ফিরে আসতে হয় না অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর কষ্ট দায়ক চক্র চিরকালের জন্য শেষ হয়ে যায়। ঐ অমর লোকে (সতলোক) রৌদ্র বা ছায়া নেই অর্থাৎ রৌদ্রে কষ্ট হলে ছায়ার প্রায়োজন হয়। ঐ সতলোকে শুধু সুখ, কোন দুঃখ নেই।

**সুরত নিরত মন পবন পয়ানা, শব্দে শব্দ সাঈ।**
**গরীব দাস গলতান মহল মেঁ, মিলে কবীর গোঁসাঈ॥**

**ভাবার্থ:-** সন্ত গরীব দাসজী বলেছেন, আমাকে কবীর পরমেশ্বর দেখা দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে সুরতি নিরতি মন, পবন (শ্বাস) এ ধ্যান রেখে নাম স্মরণ করার বিধি বলেছেন। এই সাধনাতে আমার জীবাত্মা সতলোকের শব্দের ধুনি ধরে সতলোকে চলে যায়। যার কারণে সতলোকে (শাশ্বত স্থান) নিজের মহলে আনন্দে থাকি। কারণ, সত্য সাধনা যা কবীর পরমেশ্বর সন্ত গরীব দাসজী মহারাজকে বলেছিলেন আর সেই স্থান (সতলোক) পরমেশ্বরের সাথে গিয়ে গরীব দাস জী মহারাজ স্বয়ং নিজের চোখে দেখে এসেছিলেন। তাই তিনি বিশ্বাসের সাথে বলেছেন, আমি যে শাস্ত্র অনুকূল সাধনা করছি, তা পরমাত্মা নিজে বলেছেন। যে শব্দ অর্থাৎ

নামের জপ আমি করছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি অবশ্যই মুক্তি (মোক্ষ) প্রাপ্ত করবো। এবং সতলোকে আমার নিজের মহলে (খুব সুন্দর বড় ঘর) থাকব। তাই আমি নিশ্চিন্ত ও খুশি, গলতানার অর্থ মহল প্রাপ্তিতে আনন্দিত হওয়া। পূর্ণ গুরু পরমাত্মা স্বয়ং নিজের লোক (সতলোক ) থেকে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছেন।

**গরীব অজব নগর মেঁ লে গয়ে, হামকো সতগুরু আন।**
**ঝিলকে বিম্ব অগাধ গতি, সুতে চাদর তান॥**

**ভাবার্থ:-** গরীব দাসজী বলছেন, সদগুরু অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মা স্বয়ং কবীর জী নিজের সতলোক থেকে এসে আমাকে সাথে করে আজব (অদ্ভুত) নগরে নিয়ে যায় অর্থাৎ সতলোকের শহরে নিয়ে যায়। ঐ স্থানকে নিজের চোখে দেখে পরমাত্মার বলা ভক্তি মার্গে চলছি। সত্যনাম ও সার নামের সাধনা করছি। তাই আমি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি অর্থাৎ আমার মোক্ষ প্রাপ্তিতে কোনো সন্দেহ নেই।

চাদর তানকর সোনা = নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে থাকা। কোন কিছুর চিন্তা না করে বা কোন কাজ না থাকলে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকলে গ্রামের লোকেরা বলে, ওর কি কোন চিন্তা নেই? তাই গরীবদাসজী বলেছেন, এখন বড় বড় মহল বানানোর জন্য কেন ব্যর্থ সময় নষ্ট করছো। এখন তো সতলোকে যাওয়ার সময় এসেছে। সেখানে নিজের বিশাল বিশাল ভবন আছে। মহাভুল করে ঐ মহল ছেড়ে সতলোক থেকে মৃত্যু লোকে (পৃথিবী) এসেছো। এখন ভালো সময় এসেছে। সত্য ভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞান পাওয়া যাচ্ছে, তাই সদভক্তি প্রাপ্ত করে সতলোকে চলুন।

হে পুণ্য আত্মা! এই সদভক্তি বর্তমানে আমার (সন্ত রামপাল দাস) কাছে আছে। ইহাতে এই দুঃখের সংসার থেকে পার হয়ে পরম শান্তি তথা শাশ্বত স্থান (সনাতন পরম ধাম) প্রাপ্ত করতে পারবে। যার বিষয়ে গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তথা গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪-এ বলেছে যে, তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত কর এবং ঐ তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে অজ্ঞানকে নাশ করে পরমেশ্বরের খোঁজ কর। যেখানের যাওয়ার পর সাধক পুনরায় আর এই সংসারে ফিরে আসে না।

## "ভক্তি না করলে জীবের খুব দুঃখ হবে"

সূক্ষ্মবেদে বলেছে:-

**য়হ সংসার সমঝদা নাহীঁ, কহন্দা সাম দোপহরে নুঁ।**
**গরীবদাস য়হ বক্ত জাত হৈ, রোবেঙ্গে ইস পহরে নুঁ॥**

**ভাবার্থ:-** অধ্যাত্মিক জ্ঞানের অভাবে পরমাত্মার বিধানের সাথে পরিচিত না হওয়ার কারণে প্রাণী এই দুঃখের সাগরে মহা কষ্ট ভোগ করছে। আর এই আপন ভোলা জীব এই দুঃখ দায়ী স্থানকে শান্তির স্থান মনে করে।

যেমন কোন ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর (জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে) রৌদ্রের দিনে ১২ টার সময় মদ খেয়ে পড়ে আছে। তখন যদি কোন এক ব্যক্তি এসে বলে হে ভাই! ওঠ তোমাকে গাছের ছায়ায় বসিয়ে দিই। ঘাম আর ধুলা বালিতে তোমার শরীর ভরে গিয়েছে। এখানে দুপুরের রৌদ্রে কেন পড়ে আছো? তখন ঐ মদ খাওয়া ব্যক্তি বলে আমি একদম ঠিক আছি। বেশ আনন্দ হচ্ছে, কোন কষ্ট নেই।

❖ এক ব্যক্তি এক দিন কোর্টে যায়। সেখানে ঐ ব্যক্তির এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হয়। একে অন্যের কুশল মঙ্গল জিজ্ঞাসা করে। দুই জনই বলে সবাই ভালো আছে। আনন্দে আছি।

❖ অন্য আর এক ব্যক্তির এক মাত্র পুত্রের কঠিন অসুখের জন্য পি.জি

হসপিটালে ভর্তি ছিল। ছেলের বাঁচার আশা ছিল না। তার মাতা পিতার কি অবস্থা তা সহজেই অনুমান করা যায়। আত্মীয় স্বজন দেখতে এসে বলে ছেলের কি অবস্থা? পিতা বলে বাঁচার আসা নেই। আবার জিজ্ঞাসা করে বাকি সব কুশলে মঙ্গলে আছে? পিতা বলে সবাই আনন্দে আছি।

**বিচার করুন:-** মদের নেশায় রৌদ্রে পুড়ে মরছে তাও বলছে আনন্দ হচ্ছে।

❖ কোর্ট কাছাড়িতে যে দুই আত্মীয়ের দেখা হয়, সেই দুইজনই বলে আনন্দে আছি, চিন্তা করুন যারা ঝগড়া, অশান্তি, অসুখের জন্য কোর্টে বা হসপিটালে গিয়েছে। ঐ ব্যক্তিদের স্বপ্নেও সুখ হয় না। তবুও বলছে আনন্দে আছি।

❖ যে ব্যক্তির একমাত্র পুত্র মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তার পিতার কেমন আনন্দ? তাই সুক্ষ্ম বেদে বলেছে, এই দুঃখালয় সংসারে প্রাণী মহাকষ্টেও সুখী হওয়ার বৃথা চেষ্টা করে।

**য়হ সংসার সমঝদা নাহীঁ, কহঁন্দা শাম দোপহরে নুঁ।**
**গরীব দাস য়হ বক্ত জাত হৈ, রোবেঙ্গে ইস পহরে নুঁ॥**

**ভাবার্থ:-** সন্ত গরীব দাস জী বলেছেন, মানুষ জন্ম পেয়েও যে ব্যক্তি ভক্তি করে না, সে কুকুর গাধা ইত্যাদি যোনীতে মহা কষ্ট ভোগ করে। কুকুর রাত্রে আকাশের দিকে মুখ করে কাঁদে। তাই গরীব দাস জী বলেছেন, এই মানব শরীরের অমূল্য সময় এক বার হাত ছাড়া হলে আর ভক্তি না করলে, এই সময়কে মনে করে কাঁদতে হবে।

## "ভক্তির পথে যাত্রা"

যতক্ষণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয় না, ততক্ষণ জীব মায়ার নেশায় নিজের উদ্দেশ্য ভুলে যায়। যেমন উপরোক্ত মাতাল ব্যক্তি দুপুরের রোদে ধুলাবালির মধ্যে পড়ে থেকেও বলছে আনন্দে আছি কিন্তু নেশা কাটার পরে আফশোস করবে যে বাড়ি এখনো অনেক দূরে আমি তো রাস্তায় পড়ে আছি।

কবীর জী তাঁর অমর বাণীতে বলেছেন :-

**কবীর, য়হ মায়া অটপটী, সব ঘট আন অড়ী।**
**কিস-কিস কো সমঝাউঁ, য়া কুয়ে ভাঙ্গ পড়ী॥**

**ভাবার্থ:-** আধ্যাত্মিক জ্ঞান রূপী ওষুধ খেলে জীবের নেশা কেটে যায়। তখন জীব ভক্তি মার্গে চলে। কারণ সে বুঝতে পারে নিজের আসল পিতা পরমাত্মার কাছে যেতে হবে। এবং সতলোকেই আমার নিজের আসল বাড়ি।

দূর দেশে যাত্রার সময় যাত্রী বেশি জিনিস নিয়ে যাত্রা করতে পারে না কেবল একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে যাত্রা করে। সেইরূপ ভক্তি রূপী সফরে আমাদের হাল্কা বোঝা নিয়ে চলতে হবে। তাহলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব। ভক্তি রূপী মার্গে চলতে হলে মানসিক শান্তিরও প্রয়োজন হয়। মানসিক অশান্তির কারণ পূর্বের পরম্পরা, যেমন নেশা করা, মান বড়াই, ভোগ বিলাস ইত্যাদি ভার ব্যর্থ। শৃঙ্গার করা, দামি। আভুষণ (অলংকার) পরা, বিবাহে দহেজ (যৌতুক) নেওয়া। দামি গাড়ি, বিবাহের সময় ব্যান্ড বাজনা, ডিজে বাজানো, মৃত্যুভোজ দেওয়া, শ্রাদ্ধ করা, পিণ্ড দান, সন্তানের জন্মের খুশি বা জন্মদিন পালন করা, খুশির সময় বাজী ফাটানো ইত্যাদি মানব জীবনের ভক্তি পথে বাধা স্বরূপ তাই অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ও ত্যাগ করতে হবে।

## "বিবাহ কিভাবে করবে?"

যে ভাবে শ্রী দেবী দূর্গা নিজের তিন পুত্র (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু, শ্রী শিব) কে বিবাহ

দিয়েছিলেন। (এই পুস্তকে দেওয়া আছে) আমার (শ্রী রামপাল মহারাজ) শিষ্যরা তেমনই করে। মাত্র ১৭ মিনিটের অসুর নিকন্দন রমৈনীতে বিবাহের কাজ সম্পন্ন করে। ফেরা লাগানোর স্থানে অসুর নিকন্দন রমৈনী পাঠ করা হয়, যা কোটি গায়ত্রী মন্ত্র (ওঁ ভূর্ভবঃ...) থেকে উত্তম ও লাভ দায়ক। এতে সকল দেবী দেবতা এবং পূর্ণ পরমাত্মার স্তুতি বা প্রার্থণা আছে। এজন্য সমস্ত দেব-দেবীরা ঐ নবদম্পত্তিকে সব সময় রক্ষা বা সহায়তা করে। বাঁচার রাস্তা সুগম হয় এবং কন্যা সুখী হয়।

## বিবাহে প্রচলিত বর্তমান পরম্পরা ত্যাগ:-

বিবাহে ব্যর্থ ব্যয় ত্যাগ করতে হবে। যেমন পুত্রীর (মেয়ের) বিবাহে বেশি বরযাত্রী আসা, পণ দেওয়া এসব ব্যর্থ পরম্পরা। এই সমস্ত পরম্পরার কারণে মেয়ের পরিবারের উপর আর্থিক ও মানসিক প্রভাব পরে, তাঁর ফলস্বরূপ আজকাল গর্ভেই মেয়ে সন্তানকে মেরে ফেলা হচ্ছে। সন্তান হত্যা করা মহাপাপ। মেয়ে দেবী স্বরূপ, আমাদের কু পরম্পরা মেয়েদের শত্রু বানিয়ে দিয়েছে। শ্রী দেবী পুরাণের তৃতীয় স্কন্দে প্রমাণ আছে এই ব্রহ্মাণ্ডের সূচনা লগ্নে তিন দেবতা শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীশিবকে যখন মাতা দূর্গা বিবাহ দিয়েছিলেন তখন কোন বরাতী ছিল না। কোন ব্যাণ্ড বাজা বা খাওয়া দাওয়া বা নাচ-গান ছিল না। শ্রী দূর্গা নিজের বড় পুত্র শ্রী ব্রহ্মাকে বলেন, হে ব্রহ্মা; তোমাকে এই সাবিত্রী নামের মেয়েকে পত্নী রূপে দিচ্ছি। একে নিয়ে নিজের সংসার পাতো। শ্রী বিষ্ণু কে লক্ষ্মী এবং শ্রী শিবকে পার্বতীকে দিয়ে বলেন, এই তোমাদের পত্নী এঁদের নিয়ে ঘর সংসার করো। তিন দেবতা স্ত্রীদের নিয়ে নিজের নিজের লোকে চলে যায়। ওখান থেকে সমস্ত বিশ্বের বিস্তার হয়।

**শংকা সমাধান:-** অনেকে বলে পাবর্তী মৃত্যুর পরে রাজা দক্ষের ঘরে পুনরায় জন্ম গ্রহন করেন। যুবতী হওয়ার পরে দেবী সতী (পার্বতী) নারদের কাছে শুনে শিবকে পতি বানানোর দৃঢ় সংকল্প করেন। মনের ইচ্ছা মায়ের মাধ্যমে পিতা দক্ষকে বলেন। রাজা দক্ষ বলে ঐ শিব আমার জামাই হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ ও অর্ধ নগ্ন থাকে। লজ্জা নিবারণের জন্য কেবল মাত্র মৃগছাল বেঁধে রাখে। ভাঙের নেশা করে শরীরে ভস্ম মাখিয়ে রাখে। সাপকে সাথে রাখে। এইরূপ ব্যক্তির সাথে মেয়ের বিবাহ দিলে জগতে হাসির পাত্র হতে হবে। কিন্তু দেবী পার্বতী খুব জেদি ছিলেন। নিজের ইচ্ছার কথা নিয়ে শিবের কাছে পৌঁছান এবং বলেন, আমি তোমাকে বিবাহ করতে চাই। রাজা দক্ষ পার্বতীর বিবাহ অন্য কোথাও ঠিক করেছিল। ঐ দিন শ্রী শিব প্রচুর সংখ্যায় ভূত-প্রেত, ভৈরব ও নিজের গণদের নিয়ে বিবাহ মণ্ডপে পৌঁছায়। রাজা দক্ষের সেনারা বিরোধিতা করে। দক্ষ সেনা আর শিব সেনার মধ্যে যুদ্ধ হয়। পার্বতী শ্রীশিবের গলায় বরমাল্য পরায়। পার্বতীকে জোর করে কৈলাস পর্বতে নিজের স্থানে নিয়ে যান। তাই অনেকে বলে দেখ! শ্রীশিব ভব্য বরযাত্রী নিয়ে পার্বতীকে বিবাহ করতে এসেছিল, বর যাত্রীর পরম্পরা অনেক পুরানো। তাই বরযাত্রী ছাড়া বিবাহ শোভা দেয় না। আসলে ওটা প্রেম প্রসঙ্গ ছিল। বিবাহ ছিল না। শ্রী শিব বরযাত্রী নিয়ে আসেননি। সেনাদের নিয়ে এসেছিলেন, দক্ষ রাজার বাড়ি থেকে বলপূর্বক পার্বতীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বিবাহের পুরানো পরম্পরা শ্রীদেবী পুরাণের তৃতীয় স্কন্দে আছে, তা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। ছেলে ও মেয়েদের উচিত মাতা-পিতাকে রাজি খুশি করে বা তাদের ইচ্ছা অনুসারে বিবাহ করা। প্রেম বিবাহ মহা দুঃখের কারণ হয়। একবার ভগবান শিব ও পাবর্তীর মধ্যে কোন কথায় মন মালিন্য হয়। শ্রী শিব পত্নীর সাথে কথাবার্তা বা পতি পত্নীর ব্যবহার বন্ধ করে দেন। তখন পার্বতী চিন্তা করে এই স্থান আমার জন্য নরক

হয়ে গিয়েছে। তাই কিছুদিন বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। পার্বতী বাপের বাড়ি চলে যায়। ঐ দিন রাজা দক্ষ হবন যজ্ঞের আয়োজন করেছিল। রাজা দক্ষ কন্যা পার্বতী আদর যত্ন না করে বলে, আজ কি জন্য এসেছিস? তুই আমার বাড়ি থেকে চলে যা। কোথায় গেল তোর শিবের প্রেম? শ্রী দেবী পাবর্তী মায়ের কাছে সব কথা খুলে বলে যে, শিব আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। মা রাজা দক্ষকে সব কথা বলে কিন্তু রাজা দক্ষ পার্বতীকে বাড়িতে থাকতে দেবে না। এখন পাবর্তীর না বাপের বাড়ি স্থান আছে না শ্বশুর বাড়ি। প্রেম বিবাহ এমন জটিল পরিস্থিতি উৎপন্ন করে দিয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত পার্বতীর আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না। তাই রাজা দক্ষের বিশাল হবন কুণ্ডের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মারা যায়, নিজের জীবনকে বিসর্জন করে দেয় এবং এক ধার্মিক অনুষ্ঠানকে নষ্ট করে দেয়। যখন শিব জানতে পারে তখন সেনা নিয়ে এসে শ্বশুরের গলা কেটে ফেলে। পরে অন্যরা ছাগলের মাথা লাগিয়ে রাজা দক্ষকে জীবিত করে। প্রেম বিবাহ কেমন অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল? এখন আমাদের সমাজ শিব সেনাকে বরযাত্রী মেনে কু-প্রথার জন্ম দিয়েছে। এই ঘটনা প্রেম বিবাহ ও বড় যাত্রী রূপী কু-প্রথার জনক। যা বর্তমান সমাজের নাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেবী দুর্গা যে প্রথায় তিন দেবের বিবাহ দিয়েছিল সেই সুপ্রথায় বিবাহ করলে সুখী জীবন যাপনের আশা করা যায়।

**বিবাহ করার উদ্দেশ্য:-** বিবাহ করার উদ্দেশ্য সন্তান উৎপত্তি করা। স্বামী-স্ত্রী মিলে মিশে পরিশ্রম করে তাদের লালন পালন করে বড় করে এবং বিবাহ দেয়। পরে সে নিজের সংসার বসায়। এর বিপরীত প্রেম বিবাহ সমাজে অশান্তির আগুনের ফুলকি (চিংগারী)।

## প্রেম কি ভাবে হয়?

**উত্তর:-** চরিত্র হীন ছেলে মেয়েরা রাস্তা দিয়ে চলার সময় বিভিন্ন ধরনের (আজব ধরনের অঙ্গ ভঙ্গি) আক্টিং করে। ঐ নির্লজ্জদের দৃষ্টি এদিক ওদিক থাকে। আগে পিছে বারে বারে দেখতে থাকে আর চটক-মটক (খুব স্টাইলে) করে চলাফেরা করে। এই সবই ঐ পাপী আত্মাদের অভ্যাস। পরে তারা প্রেম করে বিবাহ করে। পরবর্তীতে যখন জানতে পারে যে দুই জনেরই পূর্বে অন্য প্রেমিক, প্রেমিকা ছিল। তখন তাদের দশা ঐ শিব-পার্বতীর মত হয়। ঘরের জ্বালা/বাইরের জ্বালা, অশান্তি বিবাহ করার উদ্দেশ্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এর বিপরীতে জীবন চলার পথ নরক হয়ে যাবে। যদি ভুল করে কারো প্রেম সম্বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ঐ ছেলে মেয়েদের উচিত মাতা, পিতা বা সমাজের দিকে তাকিয়ে ঐ সম্পর্ককে ভেঙে দেওয়া। অন্তর জাতীয় বিবাহ করাতে বর্তমানে কোনো ক্ষতি নেই, তবুও উপরোক্ত মর্যাদার বিষয়ে অবশ্যই ধ্যান রাখো। ভগবান শিব জীও দেবী পার্বতীকে এই কারণে ত্যাগ দিয়েছিলেন।

## "ভগবান শিব নিজের পত্নীকে ত্যাগ করেন"

যখন অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে ছিলেন তখন পত্নী সীতাকে লঙ্কার রাজা রাবণ অপহরণ করে নিয়ে যায়। এই অপহরণ রামচন্দ্রের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে করেছিল বলে রামচন্দ্র জানতেন না। যখন জানতে পারলেন তখন সীতা হারানোর দুঃখে কাতর হয়ে রামচন্দ্র বার-বার বিলাপ করছিলেন। আকাশ থেকে শিব-পার্বতী দুজনেই রামচন্দ্রের বিলাপের দৃশ্য দেখছিলেন। হঠাৎ পার্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই ব্যক্তি কেন বিলাপ (শোক) করছেন? এই ব্যক্তি এমন কি সংকটে পড়েছে? তখন শ্রী শিব বলেন, এ কোনো সাধারণ ব্যক্তি নয়। শ্রী বিষ্ণু স্বয়ং

রাজা দশরথের ঘরে জন্ম নিয়ে লীলা করছেন। এখন বনবাস জীবন-যাপন করছেন। ওনার পত্নী সীতাও ওনার সাথেই ছিলেন। ওনার পত্নী (সীতা)-কে কেউ অপহরণ করেছে। তাই উনি দুঃখ করছেন। এই কথা শুনে পার্বতী বলেন, আমি সীতার রূপ ধারন করে শ্রী রামচন্দ্রের সামনে যাব। যদি আমাকে চিনতে পারে তাহলে আমি মেনে নেব, সত্যি উনি ভগবান এসেছেন। শ্রী শিব পার্বতীকে বলেন, এই ভুল স্বপ্নেও করবে না। যদি তুমি সীতা রূপ ধারণ করো তাহলে আমার কিছুই করার থাকবে না। তখন পার্বতী বলে ঠিক আছে, আমি পরীক্ষা করবো না। কিন্তু শিব অন্যত্র যেতেই পার্বতী সীতার রূপ ধারণ করে শ্রী রামচন্দ্রের কাছে আসে। সীতা রূপ ধারণ করা পর্বতীকে দেখে শ্রী রামচন্দ্র বলেন, হে দক্ষ পুত্রী মায়া! আজ শিবজীকে কোথায় রেখে এসেছো? তখন শ্রী দেবী লজ্জিত হয়ে বলেন, ভগবান শিব সত্য বলেছিলেন আপনি ত্রিলোকের নাথ। আমি আপনাকে পরীক্ষা করতে এসেছিলাম। এদিকে ভগবান শিব জানতে পারেন পার্বতী সীতা রূপ ধারণ করে শ্রী রামচন্দ্রের পরীক্ষা নিয়েছে। শ্রী শিবজী পাবর্তীকে বলেন, আমি তোমাকে সীতারূপ ধারন করতে মানা করেছিলাম। কিন্তু আমার কথা না শুনে তুমি সীতারূপ ধরে পরীক্ষা করেছো? পার্বতী মিথ্যা কথা বলে আমি পরীক্ষা করিনি। এই কথায় শিব ক্রোধিত হয়ে যায়, আর প্রেম বিবাহ সংকটে পড়ে, যা আগে বর্ণিত হয়েছে।

তাই যুবক যুবতীদের কাছে নিবেদন, নিজের দুর্বলতার জন্য মাতা, পিতা বা সমাজের অন্যদের দুঃখী করে বিবাহ করা ভাল না। মাতা, পিতা, ছেলে মেয়ের বিবাহের জন্য স্বয়ং চিন্তিত থাকে এবং ছেলে - মেয়ের বিবাহ না দেওয়া পর্যন্ত তারা দায়িত্বভার ছাড়ে না, তাই সংসার জীবন সম্পর্কে অপরিনত বুদ্ধির যুবক-যুবতিদের মাতা-পিতার প্রতি ভরসা রেখে চলা উচিত। আবেগের বসে ভুল সিদ্ধান্ত নিলে, সারা জীবন দুঃখের বোঝা বইতে হবে। বিবাহের পর ছেলে-মেয়ের জন্ম হলে তাদের পালন-পোষণ করা ও সংসারের সকল দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে বিবাহিত জীবনের আনন্দ সব মাটি হয়ে যায়। ঠিক সাত-আট বছর পরে মনে হবে- এ কেমন জীবন। তাই হরিয়াণার এক জাট কবি মেহর সিং বলেছে:-

**বিবাহ করকে দেখ লিয়ো, জিসনে দেখী জেল নহীঁ হৈ।**

যেমন জেলের ভিতরে চার দেওয়ালের মধ্যে থাকতে হয়। সেইরূপ বিবাহের পরে মাতা, পিতা ও পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য সমাজিক মর্যাদা রূপী চার দেওয়ালের মধ্যে থাকতে হয়। নিজের ইচ্ছামত চলাফেরা করা যায় না। যেমন যারা চাকরি করে তাঁরা চাকরিতে যায়। কৃষক জমিতে, মজদুর মজদুরীতে যেতে বাধ্য হয়। তাই বিবাহিত জীবনকে মর্যাদা রূপী কারাগার বলা হয়। কিন্তু এই কারগার (জেল) বিনা সংসারের উৎপত্তিও সম্ভব নয়। আপনার মাতা-পিতারও এক সময় বিবাহ হয়েছিল এবং ঐ মাতা-পিতার থেকে যে অমূল্য শরীর প্রাপ্ত হয় সেই শরীরে মোক্ষ প্রাপ্তি হতে পারে, যা বিবাহের বরদান। এই পবিত্র সম্বন্ধকে চরিত্রহীন ব্যক্তি (সেক্সী) কামুক কথা শুনিয়ে রাগ রূপী গান গেয়ে শান্ত যুবকদের উত্তেজিত করে সমাজে আগুন লাগায়। সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখা যায় ছেলে-মেয়েরা প্রেম করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। বাড়ির লোকেরা খোঁজ করে এনে বোঝায়, কিন্তু আধুনিক নোংরা চলচ্চিত্র দেখে যুবকরা এতোটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায় যে, কোন কথা শুনতে চায় না। পরিবারের লোকেরা ছেলে বা মেয়েকে হত্যা করে। পুলিশ, মাতা- পিতা, আত্মীয়দের ধরে নিয়ে জেলে দেয়। পরে তাদের যাবজ্জীবন জেল হয়ে যায়।

প্রেম প্রসঙ্গের কারণে বা প্রেম রূপী আগুনে সমস্ত সংসার জ্বলে শেষ হয়ে

যায়। এই ধরনের অনেক ঘটনা শহর বা গ্রামের আশেপাশে প্রচুর দেখা যায়। এই ধরনের ঘটনায় অনেকের ফাঁসির সাজা ও হয়। তাই যুবক যুবতীদের পরিবর্তনের সময় এসেছে। হে যুব সম্প্রদায়, জাগো আর বিচার করো। মাতা পিতা তোমাদের চিন্তা করে বেঁচে থাকে। তোমাদের লালন পালন করে লেখাপড়া শেখায়। আর তুমি নিজের মর্যাদা ভুলে ছোট একটি ভুলের কারণে নিজের জীবন নষ্ট করে দাও। তাই সতসঙ্গ শোনা অতি প্রয়োজন। ভেদ, ভাব, উচু, নীচু মুক্ত সমাজ গঠনের জ্ঞান লাভের অতি প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে এই জ্ঞান প্রায় সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে।

**প্রশ্ন:- বরযাত্রীর প্রচলন কীভাবে শুরু হয়?**

**উত্তর:-** বর যাত্রীর প্রচলন রাজাদের শাসন কালে শুরু হয়। তারা ছেলের বিবাহের সময় সৈনিকদের নিয়ে যেত। রাজার সুরক্ষার জন্য সৈনিকরা থাকত। কিন্তু মেয়ের পক্ষকে এই সমস্ত ব্যয় বহন করতে হত। অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তি বা ধনি ব্যক্তি বিবাহে যৌতুক (পণ) রূপে অধিক অলংকার (আভূষণ) ও ধন দিত। তারা গ্রামের গরীবদের মজুরী দিয়ে সুরক্ষার জন্য নিয়ে যেত। আগের দিনে ছেলের বাড়িতে মিঠাই খাওয়ানো হতো। মেয়ের বাড়ি থেকে প্রত্যেক রক্ষককে একটি রূপোর টাকা ও একটি পিতলের গ্লাস দেওয়া হতো। যে গরীব ব্যক্তি নিজের গরুর গাড়ি নিয়ে যেতো। তাকে কিছু অধিক ধনরাশি দেওয়া হতো। কারণ, ঐ সময় চারি পাশে অধিক জঙ্গল ছিল। যাতায়াতের জন্য কোনো মাধ্যম বা সুযোগ সুবিধা ছিল না। উপরোক্ত এই নিয়ম ধীরে ধীরে পরম্পরাগত ভাবে বর্তমান সমাজের জৌলুস পূর্ণ বিবাহের সঙ্গ হিসাবে বরযাত্রীর প্রচলন হয়েছে। যা এখন সামাজিক ব্যধিতে পরিনত হয়ে যায়। পূর্বের সময়ে অকাল পড়তো অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। মানুষ না খেয়ে মারা যেত, তাই ফাঁকা জায়গায় লুঠপাট হওয়া সাধারণ ঘটনা ছিল। এই জন্য বরযাত্রীর সাথে সুরক্ষার জন্য লোক যাওয়ার প্রচলন শুরু হয়। পরে ধীরে ধীরে এক পরম্পরার সৃষ্টি হয়। যার কোনো প্রয়োজনই হয় না।

**প্রশ্ন:-** বৌভাত (অতিথি দ্বারা নিশুল্ক দান ও ভাই দ্বারা বোনকে আর্থিক সহায়তা) এবং আশীর্বাদ কেন করা হয়।

**উত্তর:-** বরযাত্রী সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য মেয়ের পরিবারকে মিষ্টি খাওয়াতে হয়। মেয়ের পরিবারকে ও ছেলের পরিবারকে মিষ্টি তথা টাকা ও থালা গ্লাস ইত্যাদি দেওয়ার কারণে বৌভাত (ভাত বা নৌতা) প্রথা শুরু হয়। গ্রামের আশেপাশে বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করা হয়। কারণ, তখন মেয়ের পক্ষ একলা এই ব্যয় বহন করতে অসমর্থ হয়। তাই আত্মীয় স্বজনরা নিজেদের সামর্থ অনুসারে বিবাহে যোগদান করে আর্থিক সাহায্য করতো। কেউ ১০০ টাকা কেউ ২০০ টাকা এই ভাবে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করতো এবং প্রত্যেক ব্যক্তির আর্থিক সাহায্যকে একটি ডায়রিতে লিপিবদ্ধ করে রাখতো। তাই মেয়ের পরিবারের বেশি সমস্যা হত না।

**ভাত প্রথা:-** বোনের মেয়ের (ভাগ্নীর) বিবাহে জামা-কাপড় তথা নগদ ধন (ভাই দ্বারা আর্থিক সহায়তা) দেওয়াকে ভাত বলা হয়। যে বোনের ভাই নেই, সেই বোন ঐ দিনে খুব দুঃখী হয়। পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহন করলে মেয়ের বাপের বাড়ি থেকে বা অন্য আত্মীয় স্বজনের বাড়ি থেকে বংশ পরম্পরা অনুসারে যে সব ক্রিয়া কলাপ করা হয় তা ত্যাগ করতে হবে। কারণ এই সব পরম্পরা জীবনে চলার পথের বোঝা স্বরূপ। প্রয়োজনে মেয়েকে আর্থিক সাহায্য করতে পারেন। মেয়েদেরও উচিত প্রয়োজন ছাড়া কারো কাছ থেকে সাহায্য গ্রহন না করা বা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঋন শোধ করে দেওয়া।

**সমাধান:-** সুক্ষ্ম বেদ অনুসারে উপরোক্ত বিষয়ের সমাধান: আপনারা চার বেদের কথা শুনেছেন, যজুর্বেদ, ঋগ্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। কিন্তু পঞ্চম বেদ যা পরমাত্মা স্বয়ং পৃথিবীতে প্রকট হয়ে নিজের মুখ কমলে অমৃত বাণী দ্বারা প্রদান করেন। আমার (সন্ত রামপাল দাস) শিষ্যরা পঞ্চম বেদের নিয়ম অনুসারে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে। উপরোক্ত লোক দেখানো পরম্পরার প্রয়োজন হয় না। তাই ছেলে বা মেয়ে পক্ষের কোন খরচা হয় না। শুধুমাত্র কন্যা দান করতে হয়। মেয়ে নিজের পরিধানের জন্য মাত্র চার জোড়া কাপড় নিতে পারে। জুতা তো পায়ে থাকেই। আর কিছু লাগে না। যেই বাড়ি যাবে ঐ বাড়ির বা পরিবারের লোক ঐ মেয়েকে নিজের বাড়ির সদস্যদের মত রাখবে। নিজের বাড়ির আর্থিক অবস্থা অনুসারে বাড়ির অন্য সদস্যদের মতো প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র কিনে দেবে। মেয়ে নিজের মাতা-পিতা, ভাই-দাদাদের মাথার বোঝা হয়ে থাকবে না। যদি মেয়ে বাপের বাড়িতে আসে তখনও কোন জিনিস নেবে না। এই জন্য ঐ মেয়েকে সবাই আদর যত্ন করবে। বৌদিরা ননদদের খারাপ চোখে দেখে আর্থিক কারণে। কিন্তু আমাদের মেয়েরা এখন মাথা উঁচু করে সম্মানের সাথে আসবে এবং দুই পক্ষের ভিতর প্রেম ভালবাসা বজায় থাকবে তখন পরমাত্মার ভক্তিও ভালো হবে। এইভাবে জীবনের পথে যাত্রা করলে শীঘ্রই লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে।

**প্রশ্ন:-** সকালে বা কোন ভালো কাজে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় নিঃসন্তানদের মুখ দেখতে নেই কেন?

**উত্তর:-** আধ্যাত্মিক জ্ঞান না হওয়ার কারণে এই টোটকা অর্থাৎ এই কথা লোকে বলে। এই পুস্তকে আগেই আপনারা পড়েছেন, এক ব্যক্তির ৪ পুত্র ছিল, পিতার প্যারালাইজড় (পক্ষপাত) হওয়ার পরে কেউ সেবা করেনি। তাহলে ঐ ব্যক্তির দর্শন এই জন্য ভালো যে, তার চার পুত্র আছে? কিন্তু ঐ ব্যক্তির দূর্গতিকে দেখে কে ভালো বলবে?

## "কৃতঘ্নী পুত্র"

এক ব্যক্তির দুই ছেলে ছিল। সেনা বাহিনি থেকে রিটায়ার্ড হওয়ার পর তিনি পেনশন পেতেন। দুই পুত্র পৃথক হয়ে যায়। ছোটো পুত্র নিজের মাকে সাথে রাখে কারণ তার ছেলে-মেয়েরা ছোটো ছিল, তাই তাদের দেখাশুনা করার জন্য একজন লোকের দরকার ছিল। যখন বড়ো ছেলের ভাগে পিতা চলে আসে। তখন পিতা বলে, আমি যার সাথে থাকবো তাকেই পেনশনের টাকা দেব। এই কথা শুনে ছোট ছেলে বলে, পেনশনের টাকা অর্ধেক-অর্ধেক ভাগ করে দাও। পিতা এই কথা না মানায় ছোটো ছেলে একদিন রেগে গিয়ে পিতার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে। লাঠির আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে পিতার মৃত্যু হয়। এই অপরাধের জন্য ছেলের যাবজ্জীবন জেল হয়। ঐ ব্যক্তির পুত্র হওয়ার কারণে, ওনার দর্শন শুভ মানা হতো। যার সাথে এখন অশুভ হয়ে গেল। এখন আমরা আধ্যাত্মিক দাড়ি-পাল্লায় (balance) ওজন করে দেখি, নিঃসন্তানদের দর্শন শুভ না অশুভ? যেমন এই পুস্তকে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পরিবার পূর্ব জন্মের সংস্কার অনুসারে হয়। কেউ ঋণ শোধ করতে আবার কেউ ঋন নেওয়ার জন্য পিতা-পুত্র, পত্নী, মাতা-পিতা, ভাই-বোন প্রভৃতি রূপে জন্ম নিয়ে এক পরিবারে মোজ-মস্তিতে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু কেউ যুবক অবস্থাতেই মারা যায় তো কেউ বিবাহ হওয়ার পরেই মৃত্যুকে প্রাপ্ত করে। এরা সবাই নিজেদের ঋণ শোধ হতেই অবিলম্বে শরীর ত্যাগ করে চলে যায়। যাদের কোনো সন্তান হয়নি, তাদের কোনো লেন-দেন বাকি নেই। তারা যদি পূর্ণ গুরু থেকে দীক্ষা নিয়ে পরমাত্মার ভক্তি

করে তাহলে তাদের মত সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই। না কারো জন্ম হওয়াতে খুশি, না কারো মৃত্যুতে দুঃখ হয়। ঐ নিঃসন্তানদের দর্শন তো অতিশুভ। আর যদি ভক্তি না করে, তাহলে সে 'সন্তান প্রাপ্ত ব্যক্তি' হোক অথবা নিঃসন্তান ব্যক্তি; দুইজনই নিজের জীবনকে নষ্ট করে চলে যায়। যদি তারা সদভক্তি করে তাহলে দু'জনেরই দর্শন শুভ।

## নিঃসন্তান ব্যক্তিরা সাবধান!

যে সমস্ত পুণ্য আত্মাদের সন্তান হয় না, তারা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অভাবে সর্বদা সন্তান প্রাপ্তির ইচ্ছা করতে থাকে এবং যথাসম্ভব চেষ্টাও করে। তবুও লেন-দেন করার জন্য কাউকে না পাওয়ার কারণে আজীবন সন্তান প্রাপ্তির দুঃখ ভোগ করে। বিশেষ করে স্ত্রীদের সন্তান প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রবল হয়। তারা নিজেকে বন্ধ্যা বলা পছন্দ করে না। যদিও ডাক্তার পরীক্ষা করে বলে দেয়, আপনার মধ্যে বন্ধ্যাত্বের কোন লক্ষণ নেই। এটা বিধাতার লীলা। তবুও তত্ত্বজ্ঞানহীন স্ত্রী সন্তান প্রাপ্তির আশাতেই মরে যায়। ভক্তি না করার জন্য তার পরবর্তী জন্ম কুকুরের হবে। তখন যম দূতেরা তাকে বলবে, বোন! এই জন্মে সন্তানের জন্ম দিয়ে নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করে নিও। তখন এক-একবারে ৬/৭ টি করে বাচ্চা জন্ম দেবে। তারপর কুকুরের জীবন শেষ করার পরে শুয়োরের যোনীতে জন্ম হবে। তখনও এক-একবারে ১০/১২-টি করে বাচ্চার জন্ম দেবে। সন্তান প্রাপ্তির সব আশা তখন পূর্ণ হয়ে যাবে।

হে পুণ্যাত্মা পাঠক ভাই-বোনেরা! আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে বোঝার চেষ্টা করুন। আর মানব জীবনকে সফল করুন। নিজেদের জীবনের পথ সুগম করুন অর্থাৎ পূর্ণ গুরুর থেকে দীক্ষা নিয়ে ভক্তি করে কল্যাণ করান।

## বিবাহের সময় অজ্ঞানীরা নাচ গান করে

একদিন খবরের কাগজে দেখি, এক পরিবার ছেলের বিবাহের জন্য রোহতক থেকে বরযাত্রীর গাড়ী নিয়ে ভিবানী যাচ্ছিল। বরের সঙ্গে তারই দুই বোনের জামাই ঐ গাড়িতেই বসেছিল। ঘটনার আগের দিন সমস্ত পরিবারের লোকজন (বোন, ভাই, মাতা পিতা, আত্মীয় স্বজন) ব্যাণ্ড, ডিজে, বাজিয়ে নাচ-গান করে হৈ হুল্লোর করছিল। কলানৌরের কাছে বরের গাড়ির সঙ্গে বড় লড়ির ধাক্কা লাগে এবং গাড়ির সকল যাত্রীরা মারা যায়। বরও মারা যায়, সেই সাথে দুই বোনও বিধবা হয়। পরিবারের একমাত্র পুত্র ছিল। সব কিছু সর্বনাশ হয়ে যায়। এখন ডিজে বাজিয়ে খুব নাচ গান করো! পরমাত্মার ভক্তি করলে এই সব সংকট দূর হয়ে যায় অর্থাৎ কেটে যায়। তাই আমার (রামপাল দাস) অনুগামীদের স্পষ্ট আদেশ দেওয়া আছে- পরমাত্মাকে ভয় করে সকল কাজ করো। সাধারণ বিধিতে বিবাহ করো। এই নোংরা লোকে (কালের লোকে) এক মুহূর্তেরও বিশ্বাস নেই; কখন কি দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

## "সন্তের শিক্ষা"

একদিন এক ব্যক্তি প্রথমবার নানক জীর সাথে দেখা করতে আসেন। নানক জী উদাস মনে একান্ত স্থানে বসে সুমিরণ করছিলেন। ঐ ব্যক্তি সতনাম-বাহে গুরু বলে। শ্রী নানক জীও উত্তর দেন, পরে ভজন ও জ্ঞান বিচার শুনে চলে যায়। পরে একদিন ঐ ব্যক্তি পুনরায় নানকজীর কাছে আসে। আর বলে, মহারাজ জী! আপনাকে কোনো সময় খুশি দেখিনা। কারণ কি? তখন সন্ত নানক জী বলেন:-

**না জানে কাল কী কর ডারে, কিস বিধি ঢল জা পাসা বে।**
**জিন্হাতে সির তে মৌত খুড়কাদী, উন্হানু কেহড়া হংসা বে॥**

**ভাবার্থ:-** সন্ত নানক জী বলে হে ভাই! এই মৃত্যুলোকে সবাই নাশবান। কে জানে কার যাবার সময় কবে আসবে? তাই যার মাথার উপর মৃত্যু গর্জাতে থাকে, সেই ব্যক্তির নাচ, গান, হাসি-মজাক কিভাবে ভাল লাগবে? মূর্খ বা নেশা করা ব্যক্তি এই নোংরা লোকে খুশি বা আনন্দ করতে পারে। যেমন এক ব্যক্তির বিবাহের ১০ বছর পরে পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। ছেলে হওয়ার খুশিতে লাড্ডু মিষ্টি ইত্যাদি বানায়, ব্যাণ্ড বাজিয়ে ডিজে বাজিয়ে নাচ গান আনন্দ করে। এক বছর পরে ঐ জন্মদিন পালনের খুশির দিনে হঠাৎ ছেলের মৃত্যু হয়ে যায়। আনন্দ, খুশির দিনে দুঃখের পাহার ভেঙে পড়ে। শোকাতুর হয়ে সমস্ত পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়ে। ঘর নরক হয়ে যায়। এখন যত পার জন্মদিন আর খুশি বানাও! এই সত্য কথা শুনে ঐ ব্যক্তি বলে, হে প্রভু! আপনার কথা সত্য। কিন্তু, তবুও আপনি কখনো আনন্দিত হন না? নানক জী বলেন, আমারও খুশি বা আনন্দ হয়:-

**সাধ মিলে সাডে শাদী হুন্দী, বিছুড়দা দিল গীরী বে।**
**অখদে নানক সুনো জিহানা, মুশ্কিল হাল ফকীরী বে॥**

**ভাবার্থ:-** যখন আমার শিষ্যরা সত্সঙ্গ শুনতে আসে তখন ভক্তদের দেখে আমার খুশি হয়, কারন ভক্তরা পরমাত্মার ভক্তিতে লেগে আছে। কেউ বিচলিত হয় না। আর যখন সৎসঙ্গ শেষ হলে চলে যায়, তখন উদাস হয়ে যাই মনে ভয় হয়। কালের কোন দূত শিষ্যদের ভ্রমিত করে না দেয়। আর তারা পরমাত্মা থেকে দূরে চলে না যায়। জ্ঞানহীন গুরু সন্ত, ফকিররা ভক্তি মার্গকে কঠিন করে দিয়েছে। পূর্ণ মুক্তির মার্গ এরা জানে না। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ভক্তদের ভ্রমিত করে দেয়। গুরু হয়ে মনমর্জী নাম দান দিয়ে ভক্তদের (যা শাস্ত্র বিরুদ্ধ) কালের জালে ফাঁসায়। তাই পুনরায় সতসঙ্গে না আসা পর্যন্ত আমার চিন্তা হয়। যখন পুনরায় সব ভক্তরা সত্সঙ্গে আসে তখন আমার আনন্দ হয়। কিন্তু আমি নাচ, গান করি না আর মৃত্যুকে কখনো ভুলি না। কবীর সাহেব বলেছেন:-

**মৌত বিসারী মূর্খা, অচরজ কিয়া কৌন।**
**তন মিট্টি মে মিল জাএগা, জ্যোঁ আটে মেঁ লৌন॥**

**শব্দার্থ:-** হে মূর্খ মানব! আশ্চর্যের বিষয় তুই কিভাবে মৃত্যুকে ভুলে আছিস! মৃত্যুর পর তোর শরীর একদিন মাটিতে মিশে যাবে। তোর নাম নিষান অর্থাৎ চিহ্নও দেখতে পাওয়া যাবে না, যেমন- আটাতে লবন মিশে যাওয়ার পর আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাবার্থ হল, মৃত্যুর দিন ভুলে গিয়েই মানুষ (স্ত্রী/পুরুষ) স্বার্থের কারণে ভুল করে ফেলে আর সংসারের মধ্যে নিজের খাম খেয়ালে থাকে। যদি মৃত্যুর কথা মনে রাখে, তাহলে মানষ কখনো পাপ ও ভুল করবে না।

**অন্য উদাহরণ:-** এক শেঠ (ধনী) একদিন এক সন্তের আশ্রমে যায়। সন্তের দয়ায় শেঠের ব্যবসায় ভালো লাভ হয়। শেঠ, আপেল, কমলা, কলা ইত্যাদি ফল একটি বড় ঝোলা ভরে নিয়ে আসে। সন্তজী ফল প্রসাদ রাখার ঝুড়িতে রেখে দেয়। শেঠ দুই দিন পরে সন্তজীর কাছে গিয়ে দেখে, ঝুড়ি ফলে ভরা রয়েছে। সন্তজী কিছু ফল ভক্তদের দেয়। আর যে ফল প্রসাদ অন্য ভক্তরা আনে তাও ঝুড়িতে রেখে দেয়। শেঠ, সন্তজীকে বলে মহারাজ! আপনি কেন ফল খান না? সন্তজী বলে আমি মৃত্যুকে দেখতে পাচ্ছি, তাই খেতে ইচ্ছা হয় না। শেঠ জিজ্ঞাসা করে মহারাজ! কবে যাবেন সংসার ছেড়ে? সন্ত বলে আজ থেকে ৪০ বছর পরে আমার মৃত্যু হবে। শেঠ বলে মহারাজ! একদিন সবাইকে মরতে হবে। তাহলে ভয় কিসের? শেঠ বলে এটা কোনো কথা হলো? সাধারণ মানুষও মৃত্যুকে ভয় পায় না। আর আপনি এমন কথা

বলছেন? শেঠ ২/৩ দিন পরে আসে আর এই ধরনের বার্তালাপ করে। সন্ত চিন্তা করে একে শিক্ষা না দিলে এর জ্ঞান হবে না। ঐ নগরের রাজা ঐ সন্তের ভক্ত ছিল। সন্তজী রাজাকে বলেন, তোমার শহরে এক কিরোড়ী মল নামের শেঠ আছে, তার চন্দন কাঠের দোকান। ঐ শেঠকে ধরে এনে ফাঁসির সাজা শোনাও। ওকে বলে দাও, এক মাস পরে জ্যোৎস্না রাতে তোমার ফাঁসি হবে। জেলের ভিতর শেঠের রুমে (কক্ষ) ঘটি ভরে দুধ আর ঝুড়ি ভর্তি ফল রেখে দেবে। খাওয়ার জন্য ক্ষীর, হালুয়া প্রভৃতি মুখরোচক অর্থাৎ সুগন্ধি যুক্ত খাবার দেবে। রাজা সন্তের আজ্ঞা পালন করে। কিরোড়ী মল কে ধরে এনে ফাঁসির সাজা শোনায়। ২০ দিন জেলের ভিতরে থাকায় শেঠ দুর্বল হয়ে যায়। একদিন সাধু বাবা জেলে এসে প্রত্যেক বন্দীর সাথে দেখা করেন। শেঠজীকে দেখে সন্তজী জিজ্ঞাসা করেন, তোমার বাড়ি কোথায়? তোমার নাম কি? শেঠ বলে, হে মহারাজ! আপনি আমাকে চিন্তে পারেননি! আমি কিরোড়ীমল, চন্দন কাঠের দোকানদার। সন্তজী বলে, আরে কিরোড়ীমল তুই এতো দুর্বল কেন হয়েছিস? খাওয়া দাওয়া করছিস কি না? ঝুড়ি ভর্তি ফল, ঘটিভরা দুধ রয়েছে, আর তুই না খেয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিস। শেঠ বলে হে মহারাজ! মৃত্যু দণ্ডের সাজা দিয়েছে। আমি দিব্যি করে বলছি, আমি নির্দোষ। আমাকে বাঁচান মহারাজ! আমার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। সন্তজী বলেন, ভাই! সবাইকে তো মরতে হবে। তাহলে ভয় কিসের? খাও-দাও ফুর্তি করো। শেঠ জেলের জানালার ফাঁক দিয়ে হাত বের করে চরণ ধরে প্রার্থণা করতে লাগে, বাঁচান মহারাজ। আমাকে বাঁচান। আমি কিছুই খেতে পারছি না। শুধু ঐ ফাঁসির দিন জ্যোৎস্না চতুর্থী দেখতে পাচ্ছি। সন্তজী বলে, শেঠ কিরোড়িমল! আজ যেমন তুই জ্যোৎস্নার চতুর্থী রাত দেখতে পাচ্ছিস যে মৃত্যু নিশ্চিত!

সেইরূপ সাধু সন্ত ও নিজের মৃত্যুর চতুর্থী জ্যোৎস্না রাত দেখতে পায় তাহা যতই পরে হোক। আধাত্মিক জ্ঞানহীন প্রাণী আনন্দ-মস্তী করে, আর হঠাৎ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। তারা কিছু করতে পারে না। আমি আমার মৃত্যুকে দেখতে পাই ৪০ বছর পরে আমার মৃত্যু হবে, তাই কিছু খেতে ইচ্ছা হয় না। মনে কখনো আনন্দ আসে না। সব সময় পরমাত্মার স্মরণ করি। তোমার জ্ঞানের চোখের উপর অজ্ঞানের পট্টি বাঁধা আছে, সত্সঙ্গে আসলে খুলে যাবে এবং জীবনে চলার সহজ, সরল পরিস্কার (ঝামেলা মুক্ত) পথ মিলে যাবে এবং মুক্তিকে প্রাপ্ত করতে পারবে। সন্ত রাজাকে দিয়ে নির্দোষ ঘোষিত করিয়ে জেল থেকে মুক্ত করায়। শেঠ সন্তের কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়ে নিজের কল্যাণ করে।

## বিবাহের পরের জীবন যাত্রা

বিবাহের পর পতি পত্নীর (স্বামী-স্ত্রীর) অবশ্যই উচিত নিজেদের মধ্যে একে অপরের প্রতি বিশ্বাসের বন্ধন অটুট রাখা। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর উচিত যতি ও সতীর মর্যাদা বানিয়ে রাখা। স্বামীর অটল বিশ্বাস হবে, যে আমার স্ত্রী অন্য কোনো পুরুষের কাছে সমর্পিত হবে না, সে যত বড় ধনী বা সুন্দর হোক না কেন, সেইরূপ স্ত্রীকেও অটল বিশ্বাস রাখতে হবে যে, অন্য কোন মেয়ে এমন কি স্বর্গের পরী হলে ও সে আমার স্বামীকে ভ্রমিত করতে পারবে না অর্থাৎ স্বামীর বিশ্বাস থাকবে আমার স্ত্রী আমাকে ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের দিকে কু-নজরে দেখবেই না। আমার স্ত্রীরও ঠিক একই প্রকারে বিশ্বাস দৃঢ় থাকবে যে তার স্বামীও অন্য কোনো মহিলার প্রতি আসক্ত হবেই না।

**কথা:-** চাপ সিং নামের এক সৈনিক ছিল। তার স্ত্রী সতী অর্থাৎ পতিব্রতা ছিল।

এই কথা সে তার সাথী সৈনিকদের বলে। ধীরে ধীরে এই কথা রাজার মন্ত্রী শের খানের (মুসলমান) কানে পৌঁছায়। মন্ত্রী রাজাকে এই কথার সত্য-মিথ্যার প্রমাণ করার জন্য প্রার্থণা করে। রাজা, সভায় সৈনিক চাপ সিংহ চৌহানকে ডাকে। রাজা চাপ সিংকে জিজ্ঞাসা করে তোমার স্ত্রী কি পতিব্রতা নারী? তোমার স্ত্রী কোন প্রকারের প্রলোভনে বা অন্য কোন ভাবে পর পুরুষের সাথে মিলিত হয় না এ কথা সত্য? সৈনিক চাপ সিং বলেন একথা একশো শতাংশ সত্য। রাজা বলে যদি মিথ্যা প্রমানিত হয় তাহলে কি হবে? আপনি যে সাজা দেবেন তা মাথা পেতে মেনে নেব। শেরখান মন্ত্রী বলে রাজা মশাই! এই পরীক্ষা আমি করতে চাই। রাজা বলে ঠিক আছে। চাপ সিংহ বলে আমার বিবাহের সময়ে পাওয়া সুহাগের চিহ্ন একটি পটকা (কাপড়ের ওড়না) আর একটি কাটারী আমার স্ত্রী কাউকে দেবে না। যদি শের খান নিয়ে আসতে পারে এবং আমার স্ত্রীর শরীরের কোন চিহ্ন বলে দিতে পারে, তাহলে আমি মেনে নেব যে আমার স্ত্রী পত্নীধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে।

শের খান চাপ সিংহের নগরে গিয়ে এক চতুর স্ত্রীকে বলে এখানে চাপ সিং নামের এক সৈনিকের স্ত্রী থাকে, তাঁর সাথে আমার মিলন করায়ে দাও। তার বিনিময়ে তোমাকে অনেক ধন দেব। তখন ঐ স্ত্রী বলে, এটা কোনো মতে সম্ভব নয়। তখন শের সিং বলে, যে কোন ভাবে হোক ওর ঘর থেকে ওদের বিবাহে পাওয়া সোহাগের চিহ্ন একটা ওড়না ও কৃপাণ এনে দাও। চুরি করে আনলেও আনতে হবে। ঐ মহিলা চাপ সিংয়ের নকল পিসি সেজে সোমবতীর ঘরে যায়। সোমবতীর বিবাহের সময় এবং বিবাহের পরে চাপ সিংয়ের পিসি চাপ সিংহের বাড়িতে আসেনি। তাই বলে, অসুখে পড়ার কারণে আমি বিবাহের সময় তোমাকে দেখতে আসতে পারিনি। পিসির রূপ ধরে ঐ মহিলা কিছু দিন চাপ সিংহের বাড়িতে থাকে।

এক দিন স্নান করার সময় ঐ সোমবতীর কাছে গিয়ে তাঁর সুন্দর শরীরের প্রশংসা করতে লাগে এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ দেখে। সোমবতীর গুপ্তাঙ্গ এর কাছে একটা বড় তিল ছিল। এই চিহ্ন দেখে বাকপটু চতুর স্ত্রী ওড়না আর কৃপাণ চুরি করে নিয়ে যায়। শের খানকে তিলের স্থানের কথা বলে আর চুরি করা জিনিস দেয়। শেরখান রাজাকে গিয়ে বলে, আমি চাপ সিংহের স্ত্রীর সাথে মিলন করে এসেছি। আর ঐ স্ত্রী-লোকের জঙ্ঘায় একটা বড় কালো তিল আছে। যে চিহ্ন পতিব্রতা স্ত্রী, স্বামী ছাড়া কাউকে দেবে না। অথচ আমার প্রেম ও ধনের লোভে ঐ পতিব্রতা স্ত্রী আমাকে এই সব জিনিস দিয়েছে।

রাজা পুনরায় সভায় (মিটিং) বসে। চাপ সিংকে ডেকে ঐ ওড়না ও কাটারী দেখায়। চাপ সিং ভালো করে দেখে বলে এ আমার বিবাহের চিহ্ন। শের খান বলে আরো প্রমাণ দিচ্ছি শোন, তোমার স্ত্রীর ডান পায়ের দাপনায় গুপ্তাঙ্গের কাছে একটা বড় তিল আছে। চাপ সিং বলে এসব সত্য কিন্তু আমার স্ত্রী পত্নী ধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। রাজা বলে এই প্রমাণের পরেও তুই মিথ্যা বলছিস। আজ থেকে এক মাস পরে তোকে ফাঁসি দেওয়া হবে। তোর শেষ ইচ্ছা কি বল? চাপ সিং বলে আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। সৈনিক চাপ সিংকে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করায়। চাপ সিং তার স্ত্রীকে নীচ বলে কটু কথা বলে এবং বলে তোর জন্য এক মাস পরে আমার ফাঁসি হবে। সোমবতী বলে, তোমার পীসি এসেছিল, সেই আমার অঙ্গ দেখেছে এবং ঐ চিহ্ন চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। চাপ সিংহ বলে মন্ত্রী শেরখান এসেছিল। সেই এই ষড়যন্ত্র তৈরী করেছে। সৈনিক চাপ সিং চলে যায়। ফাঁসির এক সপ্তাহ আগে সোমবতী এক নর্তকী সেজে রাজাকে নাচ দেখানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করে, রাজা আজ্ঞা দেয়। সভায় শেরখান সহ সকলে

উপস্থিত ছিল। নর্তকীর নৃত্যে রাজা অতি প্রসন্ন হয়ে বলে, বলো তুমি কি চাও। আমি অতি প্রসন্ন হয়েছি। নর্তকী বলে, রাজা মশাই বচনবদ্ধ হন (প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন)। তবেই আমি কিছু চাইবো। রাজা বলে, রাজ্য ছাড়া যে কোন কিছু চাইতে পারো, তা আমি দেব প্রতিজ্ঞা করছি।

নর্তকী বলে আপনার সভায় আমার চোর আছে। আমার ঘরে চুরি করে এসেছে। শেরখান মন্ত্রীর নাম। ওকে ফাঁসির সাজা দেন। রাজা শেরখানকে বলেন, শেরখান একথা সত্য? শেরখান বলে হে রাজন! আমি এই স্ত্রী-কে এর আগে কোনদিন দেখিনি। আমি জানি না এই স্ত্রীকে।

সোমবতী বলে যদি আপনি আমাকে না দেখেন, তাহলে ঐ ওড়না কৃপাণ কোথায় পেয়েছেন? আমি চাপ সিং এর পতিব্রতা স্ত্রী। তোমার মিথ্যা কথার জন্য আমার স্বামীর ফাঁসির সাজা হবে। রাজা চাপ সিংকে ডেকে এনে ফাঁসির সাজা মাফ করে দেয় এবং আর্ধেক রাজ্য দান করেন। আর মন্ত্রী শেরখানকে ফাঁসি দেয়। ধন্য এমন মেয়ে, যারা ভারতবর্ষের গর্ব।

গরীব দাসকে পরমেশ্বর কবীর সাহেব বলেছিলেন:-

**তুরা ন তীখা কুদনা, পুরুষ নহীঁ রনধীর।**
**নহীঁ পদমনী নগর মে, যা মোটী তকসীর॥**

**ভাবার্থ:-** কবীর জী বলেছেন গরীব দাস! যে নগর বা দেশে তুরা (ঘোড়া) খুব দ্রুত গতিতে দৌড়ায় ও লাফায়, এমন ঘোড়া নেই সেই জায়গায় রনবীর (শুরবীর) নেই। আর যে শহরে পদমনী অর্থাৎ পতিব্রতা স্ত্রী নেই, সে শহর ও ভালো না। তাই চরিত্রবান স্ত্রী বা পুরুষ হওয়া অতি আবশ্যক।

❖ বিবাহের পর শ্বশুর বাড়িতে বউরা সেজে গুজে ঘুরে বেড়ায়। বা আধুনিক বেঢং-ঝাঁ চকচকে নজর কারা কু-রুচিকর কাপড় পরে বাজারে ক্ষেতে বা নল বা টিউবয়েলে জল আনতে যায়। তাদের উদ্দেশ্য কি? পতি অতিরিক্ত অন্য পুরুষকে আকর্ষিত করা। নিজের সুন্দরতার প্রদর্শন করা, এই সব চরিত্রবান মেয়ে বউদের লক্ষণ না। যদি কেউ বলে পতিকে প্রসন্ন রাখার জন্য সাজগোজ করি। তাহলে তা বাড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা ভাল। এই ধরনের লক্ষণ মনে দোষ উৎপন্ন করে। সাধারণ বস্ত্র (জামা, কাপড়) পরা উচিত তা সস্তা হোক বা দামী। মেয়ে বউদের চলা ফেরায় উচ্ছৃঙ্খলতা ঠিক না। মনে রাখতে হবে এমন কোন গতি বিধি না করি, যা অন্যের জন্য দুঃখদায়ক হয়। স্ত্রীদের ব্যবহারের কারণে উচ্ছৃঙ্খল লোকদের সাহস বেড়ে যায়। তারা বিরক্ত করতে থাকে। মহিলাদের হেসে হেসে কথা বলা এক প্রকার উৎপ্রেরক এবং অসভ্য আচরণ, যা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে খারাপ। মেয়ে, বোন, বউরা বাড়িতে যেমন ব্যবহার করে বাড়ির বাইরেও সেইরূপ আচরণ করা উচিত। তাহলে সভ্য সমাজও তার প্রশংসা করবে এবং অন্যরাও এই ধরনের ব্যবহারে অনুপ্রাণিত হবে। বারুদের গায়ে যদি আগুন না লাগে তাহলে বিস্ফোরণ হবে না।

❖ উচ্ছৃঙ্খল গতিবিধি সমাজে আগুন লাগনোর সমান। এ কথা যুবক, যুবতীদের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হয়।

যৌবন বারুদের মত হয়। যদি কোন চিঙ্গারী (আগুনের ফুলকি) লেগে যায় তাহলে সর্বনাশ করে দেয়। যদি বারুদে আগুনের চিংগারী না লাগে তা হলে অনেক বছর পর্যন্ত সুরক্ষিত রাখা যায়।

❖ প্রত্যেক পুরুষ চায় তাঁর বোন, মেয়ে, বউ সৎ চরিত্রের হোক। আশেপাশের

লোকজন যাতে বলতে না পারে ওদের পরিবারটা খারাপ।

❖ যদি কোন যুবতীকে দেখে মনে দোষ উৎপন্ন হয়। তাহলে তখনই বিচার করা উচিত যে যদি আমার বোন, মেয়ে, বা বউ হতো আর তার বিষয় যদি অন্য কেউ এই ধরণের খারাপ বিচার, খারাপ গতিবিধি বা খারাপ কর্মের চেষ্টা করত তাহলে আমার কেমন লাগতো? উত্তর পরিস্কার, ঐ ব্যক্তির হাত পা ভেঙে দিতাম। আর যে দুর্বল সে একান্ত স্থানে বসে কাঁদবে।

**জৈসা দর্দ অপনে হোবে, এইসা জান বিরাণৈ।**
**জো অপনৈ সো আউর কৈ, একৈ পীড় পিছনৈ।**
**কবীর, পরনারী কো দেখিয়ে, বহন-বেটী কে ভাও।**
**কহ কবীর কাম (Sex) নাশ কা, য়হী সহজ উপাও॥**

সমাধান :- পরমেশ্বর কবীর সাহেব বলেছেন:-

**যৌন উত্তেজনার প্রেরক:-** চলচ্চিত্রের নকল কাহিনি বা অভিনয় নকল করে যুবক ছেলে মেয়েরা নির্লজ্জ হয়ে যায়। চলচ্চিত্রে যে গতিবিধি দেখানো হয় তা সভ্য সমাজে দেখা যায় না। তাহলে চলচ্চিত্র দেখার উদ্দেশ্য কি? আসলে কিছু না। মনোরঞ্জন একটা বাহানা মাত্র। এই মনোরঞ্জনই সমাজের নাশের মূল কারণ। আমার অনুগামীরা (সন্ত রামপাল জীর শিষ্যরা) চলচ্চিত্র (ফিল্ম) দেখে না।

অশ্লীল গান, অশ্লীল ফিল্ম, অভিনয়, অশ্লীল চর্চা- নিকম্মা যুবকরা করে। ঐ দলে ভালো ছেলেরা মিশলে তারাও খারাপ হয়ে যায়। তাই কবীর জী বলেছেন-

**কথা করো করতার কী, সুনো কথা করতার।**
**কাম (সেক্স) কথা সুনো নহী, কহ কবীর বিচার॥**

**ভাবার্থ:-** কবীর পরমেশ্বর বলছেন পরমাত্মার গুণ গান করো। তা না হলে পরমাত্মার চর্চা শোনো। অশ্লীল চর্চা মনের ভুলেও করবে না, কবীর সাহেব এই কথা বলে সবাইকে সতর্ক করেছেন।

## "বিশেষ বিচার"

কাম (Sex) বিষয়কে বিশেষ ভাবে বিবেক দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো। পতি পত্নীর মিলনে সমাজ মান্যতা দেয়। পতি পত্নীর সন্তান উৎপত্তির ক্রিয়াকে সম্ভোগ বলে। এই ক্রিয়ার ফলে আমাদের ভাই বোনদের জন্ম হয়েছে। তাহলে বিচার কর এই ক্রিয়া কতটা পবিত্র বা ভালো এতে এক অমূল্য মানব শরীর প্রাপ্ত হয়। কেউ ডাক্তার হয়, কেউ ইঞ্জিনিয়র, কেউ কৃষক, যে সকলের জন্য অন্ন উৎপন্ন করে। কেহ মজদুর হয়ে সুন্দর সুন্দর ঘর বাড়ি ইত্যাদি তৈরি করে। মানব শরীরে আমরা ভক্তি, দান ধর্মের কর্ম করে নিজের জীবনের কল্যাণ করতে পারি। কিন্তু সম্ভোগ ক্রিয়াকে, রাগিনী গেয়ে, অশ্লীলকর গান গেয়ে, মলিন (খারাপ) বাসনার রূপ দিয়ে খারাপ মানসিকতার তৈরী করে দিয়েছে। পশু পাখীরা খোলা স্থানে প্রজনন ক্রিয়া করে তা আমাদের ভাল লাগে না। মানুষ সভ্য প্রাণী, তাই মর্যাদা রক্ষা করে সভ্যতা বানিয়ে রাখতে হবে।

উপরোক্ত বিচার পড়ে কোন বউ, মেয়ে, বোনের প্রতি অশ্লীল বিচার আসতে পারে না। ঠাকুরদা-ঠাকুমা এই ক্রিয়া করে পিতাকে জন্ম দিয়েছে। দাদু-দিদিমা মাতাকে জন্ম দিয়েছে, আর মাতা পিতা আমাদের উৎপন্ন করেছে। লালন পালন করে বড় করেছে। মাতা-পিতার উৎপন্নও কাম ক্রিয়া থেকে হয়েছে। তাই এই ক্রিয়া অশ্লীল নয়। কিন্তু অসামাজিক তত্ত্ব নিজেদের স্বার্থে অশ্লীল রঙ দিয়ে যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করে সমাজে আগুন লাগানোর চেষ্টা করে।

❖ দেশের সংবিধানে আইন আছে যদি কোন পুরুষ কোন স্ত্রীর সাথে শ্লীলতাহানি করে তাহলে তাকে তিন বছরের সাজা দেওয়া হবে। যদি কোন স্ত্রীর সাথে কেউ দুষ্কর্ম করে তাহলে তার ১০ বছরের সাজা হবে। সাধারণ মানুষের যদি এই আইন-কানুনের জ্ঞান হয় তাহলে মানুষ অন্যায়কে ভয় করবে। তাই আইন- কানুনের জ্ঞান হওয়া অতি প্রয়োজন। এই ধরনের পাপ কাল ব্রহ্ম করায়। কাল কে? জানার জন্য সৃষ্টি রচনার অধ্যায় পড়ুন।

❖ **চলচ্চিত্র (ফিল্ম) দেখবে না:-** চলচ্চিত্র এক মিথ্যা কাহিনীর মোড়কে জনসমাজকে বিপথে চালিত করার গণমাধ্যম। ফিল্ম দেখার সময় আমরা ভুলে যাই, যে যারা ফিল্ম তৈরি করেছে তারা অর্থ উপার্জনের জন্য করেছে। অভিনেতারা ফিল্মে অভিনয় করার জন্য কোটি কোটি টাকা নেয়। আর যুবকরা বিবেক হীন ভাবে তাদের প্রশংসা করে। ওরা ব্যবসা করছে আর জনতা মূর্খের মত সিনেমা দেখে ব্যর্থ সময় ও অর্থ নষ্ট করছে। যে নায়ক-নায়িকা তোমার প্রিয় সে তোমার কাছে বা তোমার বাড়ি কখনো আসবে না। তোমার প্রিয় নায়ক নায়িকা তোমাকে এক গ্লাস জলও খাওয়াবে না। অন্য জিনিস তো দূরের কথা। মনে করো-আমি লাড্ডু খাচ্ছি আর তুমি দেখে বলছো বাহ্! লাড্ডু বড় স্টাইলে খাচ্ছে। তুমি কি পেয়েছ? সিনেমা দেখা দর্শকদেরও এমনই অবস্থা।

❖ **আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে**

⇨ যেমন অশ্লীল মূর্তি দেখলে, খারাপ মানসিকতা উৎপন্ন হয় তাই এই ধরনের মূর্তি নষ্ট করে দিতে হবে।

⇨ আমরা দেশ ভক্তদের জীবনী পড়ি, ফটো আর মূর্তি দেখি। তখন আমাদের ভিতর দেশ ভক্তির প্রেরণা হয়। এই ধরনের ফটো বা মূর্তি বাড়িতে রাখলে ক্ষতি হয় না।

⇨ যদি আমরা সাধু-সন্ত, ফকির বা সৎ চরিত্রবানদের জীবনী পড়ি বা শুনি তাহলে সকল খারাপ চিন্তা ভাবনা শান্ত হয়ে যায় এবং মনে একটি ভাল নাগরিক হওয়ার বিচার আসে। তাই আমাদের সৎসঙ্গের অতি প্রয়োজন। যেখানে ভাল বিচার শোনানো হয়।

⇨ আমরা আমাদের ছোটো মেয়েকে স্নান করিয়ে জামা কাপড় পরাই, খাওয়া দাওয়া, আদর যত্ন, লালন পালন করে বড় করি। আর বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ি চলে যায়। অন্যের মেয়েরা বউ হয়ে আমাদের বাড়ি আসে। এর মধ্যে নতুনত্বের কি আছে? শুদ্ধ বিচার করার প্রয়োজন। এক বাড়ির মেয়ে অন্য বাড়ির বউ হয়েছে আর অন্য বাড়ির মেয়ে এই বাড়ির বউ হয়ে এসেছে। এই ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে অসাধুভাব নষ্ট হয়ে সাধুভাবের উদয় হবে।

⇨ সংবাদপত্রেও বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল ফটো ছাপানো হয়। এই সব ফটো দেখেও যুবকরা ভ্রমিত হয়ে যায়। স্ত্রী পুরুষদের অর্ধ নগ্ন অর্থাৎ অন্তর্বাস পরানো ফটো বেশি দেখা যায়। এই সব মহা নীচ মনোভাবের পরিচয়। এই ধরনের ফটো ছাপানো বন্ধ করা উচিত। তাই সভ্য সংগঠনের প্রয়োজন, সাংবিধানিক ভাবে আন্দোলন করে মানুষকে চরিত্রবান বানানোর জন্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বই তাদের উপহার হিসেবে প্রদান করে ঐ পুস্তক পড়ার জন্য উৎসাহ দিতে হবে এবং সত্সঙ্গ শোনানোর ব্যবস্থা করবে।

⇨ ভালো বিচার শোনা ছেলে মেয়েরা সংযমী হয়। অনেক সময় মেয়েদের বিবাহের কিছুদিন পরে স্বামী চাকরীতে চলে যায়। সাত-আট মাস পরে ছুটিতে বাড়ি

আসে। আবার অনেক মেয়েদের স্বামীরা উপার্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশে চলে যায়, দুই-তিন বছর পর্যন্ত বাড়ি আসে না। ঐ মেয়ে যদি সংযমী হয় এবং কোন অন্য পুরুষের দিকে যদি খারাপ দৃষ্টিতে না দেখে তাহলে সে ভাল ঘরের মেয়ে। সেইরূপ যে পুরুষরা সংযমী হয়, অন্য মা, বোনদের প্রতি হীন দৃষ্টিতে দেখে না, তারা উঁচু ঘরের ছেলে। আর যারা চরিত্রহীন হয় তারা উচ্ছৃঙ্খল ভাবে চলা ফেরা করে। এদিকে ওদিক তাকায়, বিভিন্ন ধরনের স্টাইলে অঙ্গ ভঙ্গী করে। মাথার চুল নতুন নতুন স্টাইলে কাটে, চুল কালো, লাল, হলুদ বানিয়ে, রঙ্গীন চশমা লাগিয়ে অলিতে-গলিতে কুকুরের মত ঘুরে বেড়ায়। এইসব ছেলে মেয়েরা লুচ্চা লফঙ্গ (চরিত্রহীন) হয়। এই সব মানসিকতার যুবকরা ঘর পরিবার বরবাদ করে দেয়। অন্যের মেয়ে বোনদের উল্টা-পাল্টা কথা বলে, ফলে ঝগড়া-লড়াই মারপিঠ হয়। অনেক সময় এই ঝগড়া লড়াইয়ে মৃত্যুও হয়। এই সব চরিত্রহীন অসভ্যরা না জানি কত পরিবার বরবাদ (ধ্বংস) করে দেয়। তাই ছোটো ছেলে-মেয়েদের সৎসঙ্গের বচন শোনানো উচিত যাতে ভালো চরিত্রের হয়।

## "চরিত্র বানের কথা"

শ্রী ব্যাসদেব ঋষির শুকদেব নামের এক পুত্র ছিল। একদিন তিনি নাম দীক্ষা নেওয়ার জন্য মিথিলা নগরীতে রাজা জনকের কাছে যান। রাজা জনক বলেন, শুকদেব কাল সকালে তোমাকে নাম দীক্ষা দেব। শুকদেবের থাকার ব্যবস্থা অন্য এক ভবনে করে। ঋষি শুকদেবকে পরীক্ষা করার জন্য রাজা জনক এক সুন্দরী যুবতীকে শুকদেবের কাছে পাঠায়। যুবতী শুকদেবের পায়ের কাছে পালঙ্কের উপরে গিয়ে বসে। শুকদেব নিজের পা অন্যদিকে সরিয়ে নেয়। যুবতী শুকদেবজীর আরও নিকটে যায়। তখন শুকদেবজী উঠে দাঁড়ায় এবং বলে, হে বোন! মনে হয় তুমি ভাল ঘরের মেয়ে। কৃপা করে কামরার বাইরে চলে যাও, তা না হলে আমি চলে যাচ্ছি, তখন যুবতী চলে যায়। রাজা জনকের কাছে গিয়ে বলে খুব ভাল (সৎ ব্যক্তি) লোক। সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। সকালে রাজা জনক, শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করে, এক স্ত্রী তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। তাকে স্বীকার না করে সুন্দর সংযমের প্রদর্শন করেছো। তুমি সংযমী পুরুষ। ধন্য তোমার মাতা-পিতা।

❖ কবীর পরমেশ্বরের বিচার এর থেকেও শ্রেষ্ঠ! তিনি বলেন, শুকদেব ঋষি আত্মজ্ঞানী ছিল না। কারণ যুবতী যখন পালঙ্কের উপর বসে, তখন শুকদেব ঋষি তাকে স্ত্রী মনে করে শরীর ছুঁতে দেয়নি আর পালঙ্ক ছেড়ে উঠে যায়। এতে স্পষ্ট হয় শুকদেব ঋষি আত্মজ্ঞানী ছিল না। যদি যুবতীর স্থানে যুবক হতো তাহলে শুকদেবজী কি করতো? তার কাছে কুশল মঙ্গল জিজ্ঞাসা করত। পালঙ্ক ছেড়ে পালাত না। বলতো ভাই পালঙ্ক একটা, তুমি উপর বসো আর আমি নীচে মাটিতে আসন লাগিয়ে বসছি। যদি যুবতী সভ্য হতো, তাহলে বলতো ঋষিজী আপনি উপরে বসে বিশ্রাম করুন, আমি নীচে বসছি। কিন্তু যুবতী হওয়ার কারনে ঋষির কাম দোষের ভয় হয়।

কবীর পরমেশ্বর বলেছেন, আত্মরূপে স্ত্রী পুরুষ এক। আত্মার উপর দুই ধরনের (স্ত্রী, পুরুষ নামের) কভার চড়ানো। গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ২২-এ বলেছে হে অর্জুন! জীব শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করাকে মৃত্যু বলে। যেমন মানুষ পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র ধারণ করে। তাই আত্ম তত্ত্বকে জান। উদাহরণ:- এক গ্রামে কয়েক দিন ধরে নাটক (সাংগ) হয়। আগের দিনে যাত্রা গান বা নাটকে স্ত্রীর অভিনয় পুরুষরা করত। একটি ছেলে তার বন্ধুকে নিয়ে প্রথমবার যাত্রা গান দেখতে যায়। স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করা ছেলেটি মেকআপ করে স্ত্রী-লোকের পোশাক ও সাজগোজ করে অভিনয় করছিল। প্রথমবার নাটক দেখা ছেলেটা বলে দেখ মেয়েটা

কত সুন্দর। অন্য ছেলেটি বলে, যে আগেও এই অভিনয় দেখেছে, ওটা মেয়ে নয় ছেলে। কিন্তু ঐ ছেলে এই কথা মানতে রাজী নয়। তার বন্ধুর কথা বিশ্বাস হচ্ছে না। নাটক সমাপ্ত হওয়ার পরে যাত্রা পার্টির লোকদের ঘরে যায়। যে ছেলে, মেয়ে সেজে অভিনয় করেছিল সে মেয়ের সমস্ত অলঙ্কার ও জামা কাপড় খুলে খুঁটিতে ঝুলিয়ে রাখে। বুকে কৃত্রিম স্তন আর নেই। খালি গায়ে স্নান করতে দেখে তখন বিশ্বাস হয় আসলে এটা মেয়ে নয় ছেলে। পরের দিন নাটকের সময় ঐ মেয়েকে দেখে ঐ ছেলের মধ্যে কোন মলিন বাসনা হয় না। কারণ সে ঐ মেয়ের মধ্যে ছেলের রূপ দেখতে পায়। তাই যদি শুকদেব ঋষির আত্মজ্ঞান হত, তাহলে ঐ মেয়েকে আত্মা রূপে পুরুষ মনে করে বলতো, তুমি পালঙ্কে বসো, আমি মাটিতে বিশ্রাম করছি। সাধু-সন্ত, ফকিররা এই বিচার ধারায় জীবন-যাপন (ব্যতীত) করে এবং সাধনা করে মোক্ষ লাভ করে।

## "সৎসঙ্গের প্রভাব ও প্রভুর বিশ্বাস"

এক গ্রামে এক ব্যক্তির বিবাহের পর ১০ বছর হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার কোন সন্তান ছিল না। ঐ গ্রাম থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে গ্রামের বাইরে একটি আশ্রমে এক সিদ্ধিযুক্ত সন্ত ছিলেন। ঐ সন্ত একবার গ্রামে ভিক্ষা করে যা পায়, তা তিন-চার দিন ধরে বসে খায়। একদিন সন্তজী এক নিঃসন্তান দম্পতির বাড়িতে ভিক্ষা নিতে যায়। স্বামী-স্ত্রী দু'জন ঐ সন্তের চরণ ধরে পুত্র প্রাপ্তির জন্য প্রার্থণা করলেন। সাধু বাবা বললেন, এক শর্তে সন্তান হতে পারে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বলে বলুন কি শর্ত? সাধু মহারাজ বললেন, প্রথম পুত্র জন্ম নেওয়ার দুই বছর পরে আমাকে দান করে দিতে হবে। ওকে আমি আমার উত্তরাধিকারী বানাবো। যদি তোমাদের এই শর্ত মঞ্জুর হয় তাহলে বলো। তারপর তোমাদের একটি মেয়ে হবে। পরে আবারও একটি পুত্র প্রাপ্ত হবে। দুজনেই সন্তের এই শর্ত স্বীকার করে নেয়। সাধুর আশীর্বাদে দশ মাস পরে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। দুই বছর পরে ঐ সন্তানকে সাধুকে সমর্পিত করে দেয়, তখন ঐ স্ত্রী গর্ভবতী ছিল। পরে এক মেয়ে এবং এক ছেলের জন্ম হয়। যার কারণে সাধু বাবার মহিমা চারিদিকে প্রচার হতে শুরু করে। সাধুর ঐ আশ্রমে যুবতী কন্যাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। যখন ঐ ছেলে ১৬ বছরের হয়, তখন সন্তজীর বুকে স্তনের পাশে একটা ফোঁড়া হয়। ফোঁড়ার যন্ত্রনায় সাধু কাতর হয়ে পড়ে। সাধু জড়ি-বুটি বানিয়ে ফোঁড়াতে লাগায় এবং ৪-৫ দিনের মধ্যে ঐ ফোঁড়া পেকে পুঁজ বের হয়ে ভাল হয়ে যায়। কিছুদিন পরে সাধু মহারাজের আবার জ্বর হয়। বৃদ্ধ অবস্থায় জ্বরের কারণে সাধু জী খুব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দুর্বলতার কারণে আর চলা ফেরা করতেও পারে না। সাধুজী ঐ শিষ্যকে ভিক্ষা করার জন্য গ্রামে আগে কখনো পাঠান নি। এই চিন্তা করে যে, যুবক ছেলে, গ্রামের মেয়েদের সাথে বসে খারাপ সঙ্গতে পড়ে কোনো ভুল না করে ফেলে।

সংসার করার বা বিবাহ করার ইচ্ছা না হয়ে যায়। কিন্তু ঐ দিন নিরুপায় হয়ে সাধু মহারাজ নিজের শিষ্যকে বলে, পুত্র! ভিক্ষা করে নিয়ে এসো। গ্রামের প্রথম গলিতে চতুর্থ ঘরে যা দেবে তাই নিয়ে চলে আসবে, অন্য বাড়িতে যাবে না। ছেলেটি গুরুজীর আদেশ অনুসারে ঐ বাড়ির দরজায় গিয়ে বললো, অলখ নিরঞ্জন! ঐ ঘর থেকে ১৪ বছরের এক মেয়ে ভিক্ষা দিতে দরজায় কাছে আসে। তখন সাধু ছেলে ঐ মেয়ের বুকের দিকে ধ্যানপূর্বক দেখতে থাকে। বুকের দিকে তাকাতে দেখে মেয়েটি চিন্তা করে সাধুর দৃষ্টি দোষ আছে। মেয়েটি বললো, ভিক্ষা নাও সাধুবাবা! সাধু ছেলেটি বলে, হে মায়ের পুত্রী! তোর বুকে দুটো ফোঁড়া হয়েছে। তুমি আশ্রমে এসো, আমার গুরুজী

ঠিক করে দেবে। তোমার অনেক কষ্ট হচ্ছে মনে হয়। আমার গুরুজীকে একটি ফোঁড়ায় খুব দুঃখী করে দিয়েছিল। এই কথা শুনে মেয়েটি বুঝতে পারে এই সাধুর চরিত্র ভালো না। মেয়েটি সাধুকে বলে, তোর মা-বোনের ফোঁড়া ভালো কর। নীচ, দুষ্ট, বদমায়েশ! তোকে জুতা দিয়ে পিটাবো। মেয়েটি পায়ের জুতা খুলে বলে, এখান থেকে চলে যা। আর কোনদিন এদিকে আসবি না। মেয়ের চিৎকার শুনে মেয়েটির মা এসে বলে, কি হয়েছে? মেয়েটি সাধুর চরিত্র হীনতার কথা বলে। মাতা জিজ্ঞাসা করে, বাবাজী! কোন আশ্রম থেকে এসেছো। সাধু ছেলেটি বলে, ঐ আশ্রম থেকে এসেছি, আমার গুরুদেব অসুস্থ, চলতে-ফিরতে পারে না, তাই এই প্রথমবার আমাকে ভিক্ষা করার জন্য পাঠিয়েছে। আমি ওনার শিষ্য। আমি এই বোনকে বলেছি তোমার বুকে দুটো ফোঁড়া হয়েছে, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে মনে হয়। আমার গুরুজীর একটি ফোঁড়া হয়েছিল। তার ব্যথা যন্ত্রণায় দিন-রাত খুব দুঃখী হয়ে পড়েছিল। গুরুজী ফোঁড়ার ওষুধ জানে। তুমি গুরুজীর কাছে গিয়ে ফোঁড়া ঠিক করে নিও। ঐ সাধু ছেলেটি ঐ মায়েরই পুত্র ছিল, যাকে তিনি সাধুকে দান করেছিল। ঐ মেয়েটি সাধু-ছেলেটির ছোটো বোন ছিল। মাতাজী বললেন, এটা তোর বড়ো দাদা, আমরা ওকে সাধু বাবাকে সমর্পিত করে দিয়েছি। এ জগতের চাল-চলনের বিষয়ে কিছুই জানে না। এর মধ্যে কোন বিকার বা খারাপ ভাবনা নেই। যে দোষ তুমি পেয়েছো তা তোমার ভায়ের মধ্যে নেই। এ তো পবিত্র শুদ্ধ মন থেকে বলেছিল। তুমি গ্রামের চঞ্চল, দুষ্ট যুবকদের শয়তানি মনে করে একেও ধমক দিয়ে দিয়েছো। তারপর মাতা বললেন, সাধুজী! আমার মেয়ের বুকে ওটা ফোঁড়া নয় ওটা স্তন (দুধী), দেখো আমার বুকেও আছে। এই মেয়ের বিবাহের পরে সন্তান উৎপন্ন হবে। তখন এই স্তন (দুধী) থেকে বাচ্চা দুধ খাবে। সাধু ছেলেটি বলে, হে মাতাজী! এর বিবাহ কবে হবে? কবে এর সন্তান হবে? মাতাজী বলে তিন-চার বছর পরে এই মেয়েকে বিবাহ দেব। তার দুই তিন বছর পরে সন্তান হবে।

সাধু-ছেলেটি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করে দেখলেন, জন্ম নেবে এমন বাচ্চার জন্য পরমাত্মার এতো চিন্তা। তার জন্মের ৭/৮ বছর পূর্বে দুধ পান করার ব্যবস্থা করে রেখেছে! তাহলে কি আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা উনি আশ্রমে করবেন না? আমরা গুরু-শিষ্য তো ঐ পরমাত্মার ভরসায় বসে আছি। আজ থেকে ভিক্ষা করা বন্ধ। সাধু-ছেলেটি যখন এই চিন্তা করছিল, তখন মাতাজী বললেন, বাবাজী! কি চিন্তা করছো? সাধু ছেলে বলে, মাতাজী! সব চিন্তা শেষ। এই কথা বলে, ভিক্ষার ঝোলা গলিতে ফেলে দিয়ে সাধু ছেলে খালি হাতে আশ্রমে চলে আসে। গুরুজী বললেন, ভিক্ষা কেন নিয়ে আসনি? ঝোলা কেউ কেড়ে নিয়েছে কি? ছেলেটি বলে, গুরুজী! পরমাত্মা যখন সন্তান জন্ম নেওয়ার ৭/৮ বছর পূর্বে তার খাবারের ব্যবস্থা করে রাখে, তাহলে তিনি আমাদের খাবার ব্যবস্থা আশ্রমে করবে না? অবশ্যই করবেন। তাই আমি ঝোলা গলিতে ফেলে চলে এসেছি। সাধু বুঝতে পারে এই অলস রাস্তায় ঝোলা ফেলে দিয়েছে যাতে প্রত্যেক দিন ভিক্ষা করতে না হয়। সাধু নিরুপায় তাই কিছু বলে না, চিন্তা করে কষ্ট করে কাল আমি ভিক্ষা আনতে যাব।

বালক সাধু ভিক্ষার ঝোলা গ্রামের গলিতে ফেলে আশ্রমে চলে গেলে পরমাত্মা ঐ গ্রামের কিছু মানুষের মধ্যে প্রেরণার সৃষ্টি করে যে, বড়ো সাধু বাবা অসুস্থ, ছোট সাধুকে গ্রামের কেউ কিছু বলেছে, তাই রাগ করে ভিক্ষার ঝোলা ফেলে চলে গিয়েছে। সাধু বাবা ও ছোট সাধু না খেয়ে অভুক্ত থাকবে। গ্রামের মানুষ এই চিন্তা ভাবনা করে ডাল, ফুলকা, ক্ষীর বানিয়ে আশ্রমে নিয়ে গিয়ে সাধু-বাবাকে বলে, ছোট বাবাজীকে কেউ কিছু বলেছে, তাই ভিক্ষাসহ ঝোলা গ্রামের গলিতে ফেলে এসেছে। আপনি

ভোজন (খাবার) করুন। সাধুবাবা বললেন, আগে ছেলেকে খেতে দাও। ছেলেটি বললেন, প্রথমে গুরুদেব খাবে, তারপর চেলা (শিষ্য) খাবে। সাধুবাবা ভোজন করতে শুরু করে। ইতিমধ্যে আরো একজন হালুয়া, পুরি, ছোলা নিয়ে আসে। এইভাবে প্রায় ১০/১২ জন গ্রামবাসী একের পর এক খাবার নিয়ে আশ্রমে পৌঁছায়। শিষ্য বলে বাহ্! ভগবান! আমি জানতাম না, তুমি এতো ভাল এতো দয়ালু। তাই তোমার নামের চিন্তা কম আর খাবারের চিন্তা বেশি থাকতো। গ্রামবাসীরা সিদ্ধান্ত নেয় এক দিনে একজনের ঘর থেকে আশ্রমে খাবার নিয়ে আসবে। গ্রামবাসীরা নিয়ম করে খাবার আনতে থাকে।

**শিক্ষা:-** যেমন সঙ্গত তেমন রংগত (লক্ষন)। নিজের দোষ অন্যের মধ্যে দেখা যায়। পরমাত্মার উপর বিশ্বাস ছাড়া ভক্ত অসম্পূর্ণ। চেয়ে খাওয়াও শাস্ত্র বিরুদ্ধ কারণ, যদি ভক্তের শ্রদ্ধা ও ভাবনা সত্য হয়, তাহলে পরমাত্মাই খাবারের ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু সংসারে থেকে কর্ম করে খাওয়া সর্বোত্তম। সাধু-সন্তদের কাজ, সত্সঙ্গ করা, ভক্তি করা। যদি সত্য ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে করে, তাহলে ভিক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। সন্ত গরীব দাসজী মহারাজ পরমাত্মা কবীর জীর দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানের অমৃতবাণীতে বলেছেন:-

"বৈরাগ প্রকরণের অঙ্গ থেকে কিছু বাণী"

**গরীব, নট পেরণা কঞ্জর সাঁশী মাঙ্গত হৈঁ ভঠিয়ারে।**
**জাকী তারী লাগী তত্ মেঁ মোতি দেত উধারে॥ ৩॥**
**গরীব, দ্রৌপদ সুতা কে চীর বঢ়ায় বিন হী তানে কাতে।**
**সকল মনোরথ পূর্ণ সাহিব তুম ক্যাঁ মাংগন জাতে ॥ ২॥**
**গরীব, আপ তেঁ আবৈ রত্ন বরাবর মাঙ্গ্যা আবৈ লোহা।**
**লক্ষণ নহীঁ জোগ কে জোগী জা বস্যা বন খোহা॥ ৬॥**
**গরীব, টুঁকা কারণ ফিরৈ কুকরা (কুকুর) শত ঘর ফির আবৈ।**
**এ তো লক্ষণ নহীঁ জোগ কে ক্যাঁ বাণা বিরদল জাবৈ॥ ১০॥**
**গরীব, জিনকো আত্মজ্ঞান নহীঁ হৈ বে মাঙ্গে রে ভাঈ।**
**চাবল চূন ইকাটঠা করকৈ ব্যাজ বধাবৈঁ জাঈ॥ ২৪॥**
**গরীব, জো মাঙ্গে সো ভড়বা কহিয়ে দরদর ফিরৈ অজ্ঞানী।**
**যোগী, যোগ সম্পূর্ণ জিসকা জো মাঙ্গ ন পীবৈ পানী॥ ৪১॥**
**গরীব, কদ নারদ জমত চলাঈ ব্যাস ন টুকড়া মাঙ্গ্যা।**
**বশীষ্ঠ, বিশ্বামিত্র জ্ঞানী শব্দ বিহঙ্গম্ জাগ্যা॥ ৫০॥**
**গরীব, কবীর পুরুষ কৈ বালদ আঈ নৌ লখ বোডী লাহা।**
**কেশব সে বণজারে জিস কৈ দেবৈঁ যজ্ঞ জুলাহা॥ ৫১।**

**ভাবার্থ :-** উপরোক্ত বাণীর ভাবার্থ হলো, যারা শাস্ত্র অনুকূল ভক্তি করে না, তারা সাধুর বেশ নিয়ে এমন ভাবে চেয়ে চেয়ে খায় যেমন কুকুর এক টুকরো রুটির জন্য সত্তরটা ঘরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। যদি সাধুও তেমন ভাবে চেয়ে খায় তবে তার সাধনায় ত্রুটি আছে। পরমেশ্বর কবীর জী নিজের দৈনিক কার্য হিসেবে জোলার কাজ করতেন এবং সত্য সাধনা ও সৎসঙ্গও করতেন। এই প্রমাণ স্বয়ং কবীর সাহেব দিয়েছে। কথা এই প্রকার :-

## "কাশী শহরে পরমেশ্বর কবীর জীর দ্বারা ভোজন - ভাণ্ডারার (ধর্ম যজ্ঞ) ব্যবস্থা করা"

শেখতকী নামের মুসলমানদের এক মুখ্য পীর ছিলেন। গোড়া থেকেই

আত্ম অহংকারী শেখতকীর সাথে কবীর পরমেশ্বরের তিক্ত সম্পর্ক ছিল। কবীর পরমেশ্বরকে খুব ঈর্ষ্যা করতো। সকল ব্রাহ্মণ, মুল্লা-কাজি ও শেখতকী এক সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে প্ল্যান তৈরী করে যে, নির্ধন কবীরের নামে চারিদিকে চিঠি পাঠাও যে, কাশীতে এক খুব বড় শেঠ আছেন তার নাম কবীর। পত্রে পুরো ঠিকানা দিয়ে দাও কবীর, পিতা - নূর আলি আনসারী, তাঁতী কলোনী, কাশী শহর। কবীর জী তিন দিনের ধর্ম ভোজন-ভাণ্ডারা করাবেন। সকল সাধু-সন্তদের আমন্ত্রন জানানো হচ্ছে। প্রতিদিন প্রত্যেকবার ভোজন করা ব্যক্তিকে একটি দোহর (ঐ সময়ের দামী কম্বল) আর একটি মোহর (১০ গ্রাম সোনা) দক্ষিণা দেবেন। প্রতিদিন যে যতবার ভোজন করবে, কবীর ততোবার' ই তাকে দক্ষিণা দেবেন। ভোজনে লাড্ডু, জিলাপি, হালুয়া, ক্ষীর, দইবড়া, মালপোয়া, রসগোল্লা ইত্যাদি মিষ্টান্ন থাকবে। এছাড়া সীধারূপে (আটা, চাল, ডাল, ঘী, বূরা) ইত্যাদি দেওয়া হবে। একটি পত্র শেখতকী নিজের নামে ও একটি পত্র দিল্লীর রাজা সিকন্দর লোধীর নামে লিখেন। নির্ধারিত দিনের পূর্বের রাত্রে সাধু সঙ্গত ও ভক্তরা একত্রিত হওয়া শুরু করে। পরের দিন ভাণ্ডারা শুরু হবে। পরমেশ্বর কবীরজীকে সন্ত রবিদাস দাস বলেন, আপনার নামের চিঠি নিয়ে প্রায় ১৮ লাখ সাধু-সন্ত, ভক্ত কাশী শহরে এসেছে। তারা সবাই ভাণ্ডারা খাওয়ার নিমন্ত্রণের চিঠি নিয়ে এসেছে। কবীর জী এখন তো আমাদের কাশী শহর ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে হবে। কবীরজী অন্তর্যামী ছিলেন। তবুও তিনি অভিনয় করছিলেন। তিনি বললেন, রবি দাসজী! ঝোপড়ির (কুঁড়ে ঘর) ভিতরে এসে বসো আর দরজা বন্ধ করে শিকল লাগিয়ে দাও, ওনারা নিজেরাই ঘুরে ফিরে চলে যাবে। আমরা বাইরে বের হবোই না। পরমেশ্বর কবীর নিজের রাজধানী সতলোকে পৌঁছায়। ওখান থেকে ৯ লক্ষ বলদের পিঠে থলি ভরে সকল ভাণ্ডারা যা চিঠিতে লেখা ছিল তা সবকিছু নিয়ে পৃথিবীতে আসেন। ভাণ্ডারার সেবাদারও সতলোক থেকে এসেছিলেন।পরমেশ্বর কবীরজী স্বয়ং বনজারার রূপ ধরে কেশব নামে পরিচয় দেন। দিল্লীর বাদশাহ সিকন্দর ও তার ধার্মিক পীর শেখতকীও আসে। কাশীতে ভাণ্ডারা চলছিল। সবাইকে ভাণ্ডারার স্থানে ভোজনের পর একটি কম্বল ও ১০ গ্রাম সোনা দক্ষিণা দিচ্ছিলেন। অনেক বেইমান (পাখণ্ডি) সন্ত দক্ষিনার লোভে দিনে তিন/চার বার ভোজন করে দোহর ও মোহর নিচ্ছিল। আবার অনেকে শুকনো সীধা (চাল, ডাল, ঘি)ও নিয়ে নিজের ঝোলা ভর ছিল।

এই সব দেখে শেখতকীর তো কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা হয়ে গেলো। যে তাঁবুর (Tent) নীচে কবীর পরমেশ্বর নিজে কেশব বনজারে (ঐ সময়ের ব্যবসায়ীদের বনজারে বলা হত) রূপ ধরে বসেছিলেন, সিকন্দর লোধীর সঙ্গে শেখতকীও সেখানে যায়। রাজা সিকন্দর লোধী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? আপনার নাম কি? আপনার সাথে কবীরজীর কি সম্পর্ক? কেশব রূপে পরমেশ্বর বলেন, আমার নাম কেশব। আমি বনজারা, কবীরজী আমার অন্তরঙ্গ (পাগড়ী বদল) বন্ধু। তিনি আমার কাছে খবর পাঠান যে, ছোটো একটি ভাণ্ডারা (ভোজন করার আয়োজন) করাতে হবে। তাই কিছু জিনিস পত্র নিয়ে আসবে। ওনার আদেশ পালনের জন্য সেবক উপস্থিত হয়েছে। সাধু-সন্তদের খাওয়া-দাওয়া চলছে। ছোটো একটা ভাণ্ডারার কথা শুনে শেকতকী তো মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ে, যখন শুনলো যে ১৮ লক্ষ মানুষ ভোজন করতে এসেছে! আর প্রত্যেককে দোহর (দামী কম্বল) ও মোহর এছাড়া আটা, চাল, ডাল ইত্যাদি শুকনো সীধা রূপে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু মান বড়াই আর ঈর্ষার আগুনে জ্বলে শেখতকী বিশ্রাম গৃহে চলে যায়; যেখানে রাজার থাকার ব্যবস্থা করেছিল। রাজা

সিকন্দর লোধী কেশবকে জিজ্ঞাসা করেন, কবীরজী কোথায় তিনি আসবেন না? কেশব উত্তর দিলেন, তাঁর গোলাম তো এখানে বসে আছে, ওনার কষ্ট করার এখানে আসার কি দরকার? যখন ইচ্ছা হবে তখন চলে আসবে। এই ভাণ্ডারা তো আরো তিন দিন চলবে। সিকন্দর লোধী হাতির পিঠে বসে অঙ্গ রক্ষককে নিয়ে কবীরজীর কুঠিরে যায়। হাতির পিঠ থেকে নেমে দরজার কাছে গিয়ে বলেন, হে পরবরদিগার! দরজা খুলুন! আপনার পুত্র সিকন্দর এসেছে। কবীর পরমেশ্বরজী বললেন, হে রাজন! কিছুলোক আমার পিছনে লেগেছে। প্রতিদিন একটা না একটা নতুন ষড়যন্ত্র করে আমাকে বিরক্ত করে। আজ মিথ্যা চিঠি ছড়িয়ে দিয়ে লক্ষ-লক্ষ মানুষকে ডেকেছে। আমি নির্ধন তাঁতী, কাপড় বুনে সংসার চালাই। আমার কাছে ভোজন ভাণ্ডারা করার জন্য এবং দক্ষিণা দেওয়ার জন্য ধন নেই। আমি আজ রাত্রে পরিবারকে সাথে নিয়ে কাশী শহর ত্যাগ করে অন্যত্র দূরে কোথাও চলে যাব। আমি দরজা খুলবো না। সিকন্দর সম্রাট বললেন, হে কাদির আল্লাহ! (সমর্থ পরমাত্মা) আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনি আর আমাকে ভ্রমিত করতে পারবেন না। আপনি কাশীর চৌপড়ের খোলা স্থানে এমন ভাণ্ডারা লাগিয়েছেন তা বর্ণনাতীত। আপনার মিত্র কেশব এসেছে অফুরন্ত খাদ্য সামগ্রী নিয়ে। লক্ষ লক্ষ লোক ভোজন করে আপনার জয়গান করছে। তারা আপনার দর্শন করতে চায়। একবার দরজা খুলে এই গোলামকে দর্শন তো দিন। কবীরজী সন্ত রবিদাসকে বলেন, দরজা খুলে দাও। দরজা খোলামাত্রই রাজা মুকুট সহ দণ্ডবত প্রণাম করেন। তারপর কাশীতে চলা ভোজন-ভান্ডারাতে যাওয়ার প্রার্থণা করলেন। যখন কবীর পরমাত্মা কুঠির থেকে বাইরে এলেন, তখন আকাশ থেকে এক সুন্দর মুকুট এসে পরমাত্মার মাথায় সুশোভিত হয় এবং সুগন্ধিত ফুলের বর্ষণ শুরু হয়। রাজা কবীর পরমাত্মাকে হাতির পিঠে বসার জন্য অনুরোধ করলেন। পরমাত্মা কবীর সাহেব, রবিদাসজীকেও সাথে নিয়ে রাজার সাথে হাতির পিঠে বসে ভাণ্ডারার স্থানে আসেন। উপস্থিত সকল জনতার সাথে কবীর শেঠের পরিচয় করান এবং কেশব রূপে স্বয়ং ডবল রোল করে অভিনয় করে উপস্থিত সন্ত-ভক্তদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত সৎসঙ্গ শোনায়। কয়েক লক্ষ সন্ত-ভক্তরা পূর্বের শাস্ত্রবিরুদ্ধ ভুল সাধনা ত্যাগ করে কবীরজীর থেকে দীক্ষা নিয়ে নিজের আত্মার কল্যাণ করায়। ভাণ্ডারা শেষে অবশিষ্ট সমস্ত জিনিসপত্র এবং তাঁবু গুটিয়ে বলদ-গরুর পিঠে চাপিয়ে বানজারাগণ চলে যাচ্ছিল। তখন রাজা সিকন্দর লোধী এবং শেখতকী, কবীরজী ও কেশব এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। সমস্ত বলদ-গরু ও বানজারা রূপের সেবক গঙ্গা পার করে চলে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে রাজা সিকন্দর লোধী কেশবকে বলেন, আপনি যান, আপনার সাথীরা চলে যাচ্ছে। যেদিকে বলদ-গরু ও বানজারা যাচ্ছিল, সেই দিকে যখন রাজা তাকায় তখন কাউকে দেখতে পায় না। রাজা আশ্চর্য হয়ে বললেন, কবীরজী! ঐ বানজারা, বলদ-গরু এতো শীঘ্র কোথায় চলে গেল? ঐ সময় দেখতে দেখতে কেশবও পরমাত্মা কবীর জীর শরীরে মিশে যায় (বিলীন হয়ে যায়) একলা কবীরজী দাঁড়িয়ে ছিলেন। এইসব চমৎকার (রহস্য) দেখে রাজা সিকন্দর বললেন, কবীরজী! এসব লীলা আপনারই ছিল। আপনি স্বয়ং পরমাত্মা। শেখতকীর তো তন-মনে অর্থাৎ সারা শরীরে ঈর্ষ্যার আগুন জ্বলে উঠে। বলে ওঠে, এমন ভাণ্ডারা তো আমি ১০০-টা করে দেব। এ কোনো ভাণ্ডারা হল? এতো দায়ে পড়ে করা মহৌছা।

মহৌছা সেই অনুষ্ঠানকে বলে, যখন কোন গুরু দ্বারা কোনো বৃদ্ধের গতি করানোর জন্য জোর করে চাপানো হয়। তার জন্য কম দামের খারাপ জিনিস আনা হয়। আর জগ জৌনার করা ঐ অনুষ্ঠানকে বলে, যখন কোন ব্যক্তি বিশেষ খুশি বা আনন্দের

দিনে কোনো অনুষ্ঠান করে, সেখানে ঐ ব্যক্তি খুশিতে মন খুলে টাকা খরচ করে।

**গরীব, কোঈ কহ জগ জৌনার করী হৈ, কোঈ কহে মহৌছা।**
**বড়ে বড়াঈ কিয়া করেঁ, গালী কাঢ়ে ওঁছা॥**

**শব্দার্থ:-** ঐ সহভোজ (সামূহিক ভান্ডারা যাতে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের লোক একসাথে সম্মিলিত হয়ে ভোজন করে) অর্থাৎ ভোজন ভান্ডারাকে দেখে সজ্জন ব্যক্তিরা বলছেন যে, জগ জৌনার অর্থাৎ মন খুলে অর্থ ব্যয় করে ধর্মের কার্য করেছে অর্থাৎ ভোজন খাইয়েছে যারা অহংকারী দুষ্টু প্রকৃতির ব্যক্তি তারা বলছে, মহোছা করেছে অর্থাৎ মনকে মেরে কম খরচা করে ভান্ডারা করেছে।

**সারাংশ -** কবীরজী ভক্তদের উদাহরণ দিয়েছে। যদি তোমরা আমার মত সত্য মনে ভক্তি করো এবং বিশ্বাসের সাথে জীবন নির্বাহ করো, তাহলে পরমাত্মা এইভাবে তোমাদের সহায়তা করবে।

ভক্তরা আসলে শেঠ অর্থাৎ ধনবান হয়। ভক্তদের কাছে দুই ধরনের ধন থাকে। এক সংসারের জন্য যে ধন প্রয়োজন সেই ধন আর একটি সত্য সাধনা রূপী ধন।

## এক অদ্ভুত করিশ্মা

তিনদিন যাবৎ ভাণ্ডারা চলছিল। প্রত্যেক ব্যক্তি দিনে কম করে দুবার ভোজন করে। কিছু ব্যক্তি তো তিন, চার বার করেও ভান্ডারা করছে। কেননা প্রত্যকবার ভোজন খাবার শেষে দক্ষিণা স্বরূপ একটি মোহর (১০ গ্রাম সোনা) আর একটি দোহর (দামি সুতির শাল) দেওয়া হচ্ছিল। এই লোভে অনেকে ৩/৪ বারও ভাণ্ডারা করেছিল। তিনদিন পর্যন্ত ১৮ লক্ষ মানুষ যদি কাশীর চারিদিকে পায়খানা, প্রস্রাব করতো তাহলে চারিদিকে দুর্গন্ধে ভরে যেত। ভান্ডারার সময় কাশীতে এক লক্ষ সেবাদার যারা সতলোক থেকে এসেছিল, ১৮ লক্ষ সন্ত, ভগত এবং কাশীর স্থানীয় মানুষ ছিল। এদের পায়খানা, প্রস্রাবে কাশী বাসীদের শ্বাস নিতেও কষ্ট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তেমন কিছুই হয়নি। সমস্ত মানুষ ইচ্ছামত বারবার খেয়েছে কিন্তু পায়খানা, প্রস্রাব একবারও করেনি। এতটাই সুস্বাদু খাবার ছিল যে, সবাই পেট ভরে ভরে খাচ্ছিল। আগের থেকেও বেশি খাবার খাচ্ছিল। তাই দ্বিতীয় দিনে কিছু লোকের চিন্তা হয়, না তো পেট ভারি, ঠিকঠাক খিদেও পাচ্ছে, রোগী না হয়ে যাই!

সতলোক থেকে আসা সেবাদারদের সমস্যার কথা জানায়, ওনারা বললেন, এই ভোজন এমন জড়িবুটি দিয়ে বানানো হয়েছে, যা খেলে এগুলি শরীরেই মিশে যায়। আমরা তো প্রতিদিন নিজের লঙ্গরে এমন ভোজন বানাই আর এটাই খাই। আমরা কখনো শৌচ করি না তথা না প্রস্রাব করি, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। তবুও চিন্তা হয় খাবার খেয়েছি কিছু মল হওয়া উচিত। যখন পায়খানা যাওয়ার প্রেশার হল, তাই শহরের বাইরে গিয়ে পায়খানার চেষ্টা করলে মলদ্বার দিয়ে হালকা সুগন্ধিত বায়ু বের হয়। তখন সেবাদারদের কথা বিশ্বাস হয় এবং তাদের ভয় সমাপ্ত হয়। এতো চমৎকারের পরেও তখন কার মানুষ পরমাত্মা কবীর সাহেবকে পরমাত্মা রূপে স্বীকার করেনি, এটা তাদের দুর্ভাগ্য। কারণ, ঐ সময় সকল মানুষের চোখে অজ্ঞানের পট্টি বাঁধা ছিল।

পুরাণে উল্লেখ আছে অযোধ্যার রাজা ঋষভদেবজী যখন রাজ্য ত্যাগ করে জঙ্গলে গিয়ে সাধনা করেছিল। তখন তার ভোজন স্বর্গ থেকে আসতো। ঋষভদেব জীর পায়খানায় সুগন্ধ বের হত। আশেপাশের ব্যক্তিরা তা দেখে অবাক হয়ে যেত। সেইরূপ সতলোকের আহারে কেবল সুগন্ধ বের হয় মল বের হয় না। স্বর্গ সতলোকেরই নকল রূপ (ডুপ্লিকেট)।

**প্রশ্ন:**-ভক্তি করার জন্য বাড়ি ত্যাগ করে যাওয়া বা বাড়িতে থেকে ভক্তি করার মধ্যে কোনটা উত্তম?

**উত্তর:**- শাস্ত্রবিধি অনুসার পূর্ণ গুরু থেকে দীক্ষা নিয়ে, ভক্তি মর্যাদায় থেকে আজীবন ভক্তি করলে পূর্ণ মোক্ষ হবে। যদি ঘর ত্যাগ করে বনে চলে যাও তাহলে ভোজনের (খাবারের) জন্য গ্রাম বা শহরে গৃহস্থের দরজায় আসতে হবে। শীত-গরম বর্ষা থেকে বাঁচার জন্য কুঠির (কুঁড়ে ঘর) বানাতে হবে। লজ্জা নিবারনের জন্য কাপড়ও চাইতে হবে। তাহলে পার্থক্য কি? তাই বাড়িতে বসে সত্য সাধনা করো। মোক্ষ নিশ্চিত। বিবাহ হোক অথবা না হোক স্ত্রী-পুরুষ দুই জনই ভক্তি করে মোক্ষ প্রাপ্তি করতে পারে। যদি কেউ বলে ব্রহ্মচারী জীবনেই ভক্তি সম্ভব তাহলে নপুংশকরাই ভক্তি করার প্রথম অধিকারী। আসলে শাস্ত্র অনুসারে সত্য সাধনা করলে সবাই মোক্ষ প্রাপ্ত করতে পারে।

**উদাহরণ:**- আমরা জানি ভক্ত ধ্রুবজী ও ভক্ত প্রহ্লাদ মুক্তি প্রাপ্ত করেছে। এই দুই জনই বিবাহিত ছিল। সন্তানও উৎপন্ন করেছিল। প্রহ্লাদের ছেলে বৈলোচন ছিল আর নাতি রাজা বলী ছিল যে শত যজ্ঞ করেছিল। ভগবান বামুন রূপ ধারণ করে তিন পা জমি দক্ষিণা চেয়েছিল। আর যারা বলে ব্রহ্মচারী পুরুষ মোক্ষ প্রাপ্তির অধিকারী হয়। বিচার করো হিজরা (নপুংশক) তো সদা ব্রহ্মচারী, তাহলে তার অধিকার তো সবার আগে হওয়া উচিত।

সত্য সাধনা করলে নপুংশক, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থী, স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই মোক্ষ প্রাপ্তি হবে। সন্ত গরীবদাসজী কবীর জীর জ্ঞানকে এই ভাবে বলেছেন:-

**গরীব, ডেরে ডাণ্ডে খুশ রহো, খুসরে লহে না মোক্ষ।**
**ধ্রুব-প্রহল্লাদ পার হুয়ে, ফির ডেরে (ঘর) মেঁ ক্যা দোষ॥ ১॥**
**গরীব, কেলে কি কোপীন হে, ফুল-পাত-ফল খাঁঈ।**
**নর কা মুখ নহী দেখতে, বস্তী নিকট নহী জাঈঁ॥২॥**
**গরীব, ওজঙ্গল কে রোঝ হৈঁ, জো মনুষ্যোঁ বিদকে জাহীঁ।**
**নিশ দিন ফিরো উজার মেঁ, য়ু সাঁই পাবৈ নাহীঁ॥৩॥**
**গরীব, গাড়ি বাহো ঘর রহো, খেতী করো খুশহাল।**
**সাঁই সির পর রাখিয়ে, সহী ভক্ত হরলাল॥৪॥**

**ভাবার্থ:**- বাণী সংখ্যা ১- এর ভাবার্থ উপরে বলা হয়েছে।

বাণী সংখ্যা ২-৩ এর ভাবার্থ:-কিছু ব্যক্তি বলছিল আমি সন্তের খোঁজে পাহাড়, জঙ্গলে গিয়েছি। এক পাহাড়ের জঙ্গলে এক সাধু ছিল। তার বিষয়ে আশেপাশের লোকেরা বলতো ঐ সাধু লজ্জা নিবারণের জন্য কলার পাতা বাঁধে। আর পাতা, ফল, ফুল খায়। গ্রামের কাছে আসে না। মানুষের তো মুখ দর্শনও করে না। মানুষকে দেখলে দ্রুত গতিতে জঙ্গলের মধ্যে চলে যায়। ওখানের লোকেরা বলে ঐ সন্তের দর্শন খুব ভাগ্যে হয়। একবার দর্শন হলে মালামাল হয়ে যায়। আমি কয়েকদিন যাবৎ সকালে যেতাম আর সন্ধ্যার সময় জঙ্গল থেকে আসতাম। এদিন দৌড়ে যাওয়ার সময় পিঠ দেখি। যদি দর্শন হয়ে যেত তাহলে ভাগ্য বদলে যেত। বিচার করুন, এই সব কাজ আসলে অপরাধী ব্যক্তিরা করে। যেমন করে অপরাধী ব্যক্তি পুলিশ দেখে বাঁচার জন্যে দৌড়ে পলায়। সন্ত গরীবদাসজী এমন ব্যক্তিকে রোঝ (নীলগাই) বলেছে। এর সাথে তুলনা করে বোঝাতে চেয়েছেন যে, নীল গাই যেমন মানুষ দেখা মাত্রই এদিক ওদিক দৌড়ে পালায়। এমন মানুষ সারা জীবন দিন-রাত জঙ্গলে ঘুরলেও পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে পারবে না।

বাণী সংখ্যা ৪- এর ভাবার্থঃ-

**গরীব গাড়ী বাহো ঘর রহো, খেতী করো খুশহাল।**
**সাঁঈ সির পর রাখিয়ে, সহি ভক্ত হরলাল।**

**ভাবার্থঃ-**

## "হরলাল জাট-এর কথা"

গ্রাম বেরীতে (জেলা ঝজ্জর, হরিয়াণা) এক হরলাল জাট নামের এক ধার্মিক প্রবৃত্তির কৃষক ছিল। তার পরিবারের সকল সদস্য ধার্মিক প্রবৃত্তির ছিল। গেরুয়া বেশধারী এক ব্যক্তি বেরী গ্রামের চৌপাল নামক স্থানে কিছুদিন সৎসঙ্গ করছিল। ভক্ত হরলালজী তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে তার ঘরে কেউ নেই। ছোট বেলায় মাতা-পিতার মৃত্যু হয়েছে। ভক্তির জন্য বাড়ি থেকে বের হয়েছে। ঐ সাধুকে ভক্ত হরলাল প্রার্থনা করে আপনি আমার বাড়িতে থাকুন। আপনি ভক্তি করার পুরো সময় পাবেন আর আমি ও সন্তের সেবা করার সুযোগ পাবো। গেরুয়া বসন পরা ব্যক্তি রাজী হয়ে যায়। ভক্ত হরলালের দুটি বাড়ি ছিল। এক বাড়িতে স্ত্রী-লোকেরা থাকত। কিছুটা দূরে অন্য বাড়িতে গৃহ পালিত পশু ও পুরুষ সদস্যরা থাকত। ওখানে সাধুর থাকার ব্যবস্থা করে। বাড়ির সকলে মিলে সাধুর সেবা করত। যত্ন সহকারে দুই-তিন টাইম ভোজন দিত। কোন জিনিসের অভাব হতে দিত না। কয়েক বছর পরে ঐ সাধু শরীর ত্যাগ করলে তাঁর অন্তিম সংস্কার করে বাড়ির নিকটে নিজের একটি জমিতে এক স্মৃতি চিহ্ন বানিয়ে রাখে।

শ্রী হরলাল জাট জী গরুর গাড়িতে করে ব্যবসার জিনিসপত্র এক মণ্ডী(বাজার) থেকে অন্য মণ্ডিতে নিয়ে যেত। বর্তমান সময়ে গরুর গাড়ি দেখা যায় না। এখন ট্রাকে (লরিতে) করে মালের সরবরাহ করা হয়। প্রায় ১৭৫০-সালের কথা তখন গরুর গাড়িতে করে চিনি, বুরা, চাল, গম, জোয়ার, বাজরা, শিম প্রভৃতি বহনের কাজ হতো। বেরী থেকে নজফ গড়ের মণ্ডীর রাস্তা গ্রাম ছুড়ানী হয়ে যায়। শ্রী হরলালের সাদা রং-এর একটি অলস গরু ছিল। গাড়ি নিয়ে কিছুদুর যেতেই বসে পড়ত। তখন লাঠি দিয়ে মারপিট করে উঠাতে হতো। আবার কিছু দূরে গিয়ে আবার বসে পড়তো। আবার লাঠি দিয়ে মারতে হতো তখন উঠত এই ভাবে চলতে থাকে। একবার গরমের দিনে ভোর ৪ টার সময় শ্রী হরলাল নজফগড় মণ্ডী থেকে গাড়ি ভর্তি মাল নিয়ে আসছিল। গ্রাম ছুড়ানীর একটি কুয়ার কাছে এসে গরু বসে পড়ে। হরলালজী গরুকে লাঠি দিয়ে মারতে লাগে। তখন ঐ কুয়াতে ছুড়ানী গ্রামের সন্ত গরীবদাসজী স্নান করছিলেন। সন্ত গরীবদাসজী বলে হে হরলাল! মারিস না, গাই-এর জায়া (বাচ্চা)। সন্ত গরীব দাস ও জাট কৃষক ছিলেন। গরীব দাসজী হরিয়াণায় প্রচলিত সাধারণ পোশাক ধুতি পাঞ্জাবী পরতেন। হরলালজী বলে ভাই! এ আমার রক্ত চুষে খাচ্ছে। আধা মাইল চলে আর শুয়ে পড়ে। সন্ত গরীবদাসজী ঐ বলদ গরুর কাছে গিয়ে কানে কানে কিছু কথা বলে। তখন ঐ সাদা গরু উঠে দাঁড়ায় সন্ত গরীব দাসজী বলে এই গরু এখন ভালো ভাবে চলবে। শ্রী হরলালজীর বিশ্বাস হয় না। গাড়ি নিয়ে চলে যায়। ঐ সাদা গরু দ্বিতীয় গরুর থেকেও তেজ গতিতে চলতে থাকে। ছুড়ানী থেকে নিজের গ্রাম পর্যন্ত গরু এক বারও বসেনি। শ্রী হরলাল আশ্চর্য হয়ে যায় এবং খুব খুশি হয়। বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের বললে তারাও বিশ্বাস করতে চায় না। পরে হরলাল জাট গ্রাম ছুড়ানীতে ঐ ব্যক্তির খোঁজ করতে যায়। কিন্তু হরলাল ঐ স্নান করা ব্যক্তির নাম জিজ্ঞাসা না করে ভুল করে। তাই ফিরে আসতে বাধ্য হয়। মনে মনে ভাবে ঐ ব্যক্তি স্নান করার

জন্য প্রতিদিন সকালে ঐ কুয়েতে আসে। হরলাল জাঠ তাই ভোর ৪-টার সময় ঐ কুয়াতে পৌঁছায়। তখন সন্ত গরীব দাসজী জিজ্ঞাসা করে হে হরলাল ভাই! ঐ গরুর কথা জানতে এসেছো? আপনি তো সব জানেন। আপনার কাছে লুকানোর কিছু নেই। আমি ঐ গরুর বিষয় জানতে এসেছি। আপনি কি জাদু করে দিয়েছেন? ঐ গরু এখন অন্য গরুর থেকে দ্রুত চলে।

সন্ত গরীবদাসজী বলেন, তোমার বাড়িতে এক সাধু ছিল, তার কি অবস্থা? আমি একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তুমি ঐ দিন গাড়ি নিয়ে অন্য কোথাও গিয়েছিলে। হরলাল বলে, তিনি ৪- বছর পূর্বে শরীর ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। স্মৃতি চিহ্ন বানানো আছে। তখন গরীবদাসজী বলে, এই সাদা গরুই ঐ পাখণ্ডি বাবা। আমি ঐ সাধুর সঙ্গে জ্ঞানচর্চা করেছিলাম। ওকে আমি বোঝাই তোমার ভক্তি ঠিক না। তুমি তো ভক্তিই করো না, খাও আর ঘুমাও। পরমাত্মার দরবারে সব লেখা হবে তখন তুমি বুঝতে পারবে। এখন যা খাচ্ছো তা পরিশোধ করতে হবে।

**গরীব, নর সে ফির পশুবা কীজৈ, গাধা বৈল বনায়।**
**ছপ্পন ভোগ কহাঁ মন বোরে, কুরড়ী চরণে জায়॥**
**গরীব, তুমনে উস দরগাহ কা মহল না দেখা।**
**ধর্মরাজ কৈ তিল-তিল কা লেখা॥**

আমার কথা শুনে ঐ পাখন্ডীর রাগ হয়ে যায়। আর বলে তুই গৃহস্থি আর আমি বাল ব্রহ্মচারী। এক সাধুকে শিক্ষা দিচ্ছো, আপনি যান।

**কবীর, রাম নাম সে খিজ মরৈঁ, কুষ্টি হো গল জায়।**
**শুকর হোকর জন্ম লে, নাক ডুবতা খায়॥**

**ভাবার্থ:-** কবীর জী বলেছেন অভিমানী ব্যক্তি রাম নামের চর্চায় রেগে যায়। পরে কুষ্ঠ হয়ে শরীর গলে যায়। পরের জন্মে শুয়োর হয়ে নোংরা খায়। শুয়োরের নাকও নোংরায় ডুবানো থাকে। ঐ প্রাণীকে এই রূপ কষ্ট ভোগ করতে হয়। যে ভক্তি করে না বা নকল সন্ত হয়ে জনতাকে মিথ্যা মহিমা বলে ভ্রমিত করে তার দশা ঐ রূপ হয়।

হে হরলাল! আমি ওর কানে বলেছি ঐদিনের কথা মনে কর। আমি কি বলেছিলাম। আমার কোন কথা শুনলে না। হে জীব! তোমাকে এই কৃষকের ঋণ শোধ করতে হবে। লাঠির মার খেয়ে শোধ কর বা রাজী-খুশিতে শোধ কর। তা না হলে মুক্তি পাবে না। ঐ গরুর শরীরধারী ভণ্ড বাবা এইবার বুঝেছে। এই আত্মা কোন জন্মে পরমেশ্বর কবারজীর শিষ্য ছিল। কিন্তু পরে গিরি পন্থে চলে যায়। তার জন্য জন্ম-মৃত্যুর কষ্ট ভোগ করছে। ঐ গরু আর বসবে না। হরলালজী গরীব দাস জীর চরণে পড়ে যায়। আর বলে, হে সাধু মহারাজ! আমাকে শিষ্য বানান। আমি বাড়ি ঘর ছেড়ে আপনার সাথে থাকব। আমার বন্ধ চোখ খুলে গিয়েছে। ভক্তি বিনা জীব কত কষ্ট ভোগ করে। সন্ত গরীবদাস জী বলেন-

**গরীব, গাড়ী বাহো ঘর রহী, খেতী করো খুশহাল।**
**সাঁঈ শির পর রাখিয়ে, সহী ভগত হরলাল॥**

**ভাবার্থ:-** পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য ঘর ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। নিজের পারিবারিক কার্য খুশি-খুশি করো, বাড়িতে থাকো। পরমাত্মার যে ভক্তি আমি বলছি, তা করো। তুমি সঠিক ভক্ত হবে।

**গরীব, নাম উঠত, নাম বৈঠত, নাম সোবত জাগ রে।**
**নাম খাতে নাম পিতে, নাম সেতী লাগ রে॥**

এই প্রমাণ যর্জুবেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ১৫-তে আছে।

**বায়ু অনিলম্ অথইদম্ অমৃতম্ ভস্মন্তম্ শরীরম্।**
**ওম (ওঁ) কৃতু স্মর কিলবে স্মর কৃতম্ স্মর॥**

**ভাবার্থ:-** সন্ত গরীব দাস জী বলেছেন, যে সত্য সাধনার সত মন্ত্র আমি তোমাকে দেব, তার জপ খাবার খেতে খেতে, জাগতে, শুতে, অর্থাৎ যে কোন সময় জপ করতে পারো। সকালে ঘুম থেকে উঠে কিছু সময় জপ করো। আবার শোয়ার সময় জপ করো যখন মনে পড়ে তখন জপ করো। কর্ম করতে করতে জপ করো। অধিকাংশ জায়গায় দেখা যায়, অনেকে তাস খেলে, হুক্কা, বিড়ি পান করে, রাজনীতির কথা বলে, অন্যের নিন্দা করে অথবা সিনেমা, থিয়েটার দেখে সময় নষ্ট করে। ঐ সময় পরমাত্মার ভক্তি তথা সত্‌সঙ্গ চর্চা শুনে সময়ের সদুপযোগ করলে মোক্ষ সম্ভব।

শ্রী হরলাল জাট দীক্ষা নিয়ে বাড়ি যায় এবং বাড়ির সবাইকে সব কথা খুলে বলে। ঐ নকল বাবার স্মৃতি চিহ্ন ভেঙে ফেলে এবং পরিবারের সকলকে গ্রাম ছুড়ানী নিয়ে গিয়ে গরীব দাসজীর কাছে থেকে নাম উপদেশ দেওয়ায়। সন্ত গরীব দাসের আদেশ অনুসার ঐ গরুকে দিয়ে কোন কাজ করাত না। ঐ গরুকে ভক্ত মনে করে পৃথক ভাবে রেখে সেবা যত্ন করতো। ঐ সাধু বাবার আত্মা গরুর শরীরধারী জীবকে দিয়ে আর হাল করাতো না এবং গরুর গাড়ীও চালাত না। সন্ত গরীব দাস জী বলেছে ও ভগত ছিল, কর্ম দোষের কারণে পশুযোনী প্রাপ্ত হয়েছে। একে দিয়ে আর কাজ করাবে না। ঐ গরু ৫ বছর বেঁচে ছিল। পরমাত্মা কবীরজী ভুলে ভ্রমিত ভক্তকে পশুযোনীতেও সহায়তা করে। পুনরায় মানব জীবন প্রাপ্ত করে পূর্ণ গুরু থেকে নাম উপদেশ নিয়ে সদভক্তি করলে ঐ আত্মার মুক্তি হবে। অন্যথায় ৮৪ লাখ যোনী তৈরি আছে।

ভক্ত হরলালের এই ঘটনার সাক্ষী বেরী গ্রামে এখনো বিদ্যামান।

## “তামাক সেবন মহাপাপ”

সন্ত গরীবদাসজী ভক্ত হরলালকে বলেন, তুমি (যারা দীক্ষা নেয়) আজ থেকে তামাক বা তামাক জাতীয় কোন জিনিস (হুক্কা, বিড়ি, সিগারেট, খৈনি ইত্যাদি) বা কোন ধরনের কোন নেশা করবে না। শিষ্য বলে, হে মহারাজ! তামাক তো প্রায় প্রত্যেক কৃষক সেবন করে। এতে কি ক্ষতি হয়?

**উত্তর:-** সন্ত গরীবদাস জী বলেন, তুমি রামায়ণ, মহাভারতের কথা তো শুনেছো নিশ্চয়ই। ওখানে কোথাও হুক্কা সেবনের বর্ণনা নেই। তামাকের উৎপত্তি কি ভাবে হয়েছে তা বলছি,শোনো!

## “তামাক উৎপত্তির বিবরণ”

এক ঋষি ও এক রাজা দুজনে ভায়রা ভাই ছিল। একদিন রাজার স্ত্রী তার বোনের কাছে নিমন্ত্রণ পাঠায় যে, তোমরা সপরিবারে আমাদের বাড়ি ভোজনের জন্য আসবে। তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে খুব ইচ্ছা করছে। ঋষির পত্নী, ঋষিকে এই বিষয়ে জানাতে ঋষি বলেন, ভায়রার সঙ্গে বেশি মেলামেশা ভালো নয়। তোমার বোন রাজরানীর জীবন-যাপন করছে। আর রাজার ধন ও রাজ্য শক্তির প্রতি অহংকার হয়। আমাদের অপমান করার জন্য ডেকেছে। এরপর আমাকেও ওদেরকে ভোজনের জন্য আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানাতে হবে। আমরা ওদের মত খাওয়া- দাওয়ার ব্যবস্থা এই জঙ্গলের মধ্যে করতে পারবো না। এসব ভায়রার ষড়যন্ত্র। ও নিজেকে মহান আর আমাদের গরীব প্রমাণ করতে চায়। তাই আমাদের না যাওয়া ভালো। তুমি

বোনের বাড়ি যাওয়ার বিচার ত্যাগ করে দাও। না যাওয়াতেই আমাদের মঙ্গল। কিন্তু ঋষির পত্নী এই কথা মানতে রাজি নয়। ঋষি ও তার পরিবার অতিথি হয়ে রাজার বাড়ি যায়। রানী বহুমূল্য বস্ত্র, অলঙ্কার পরেছিল। আর ঋষি পত্নীকে গলায় রাম নাম জপের মালা ও সাধারণ সাধ্ববীদের বস্ত্র পরা দেখে রাজ দরবারের কর্মচারীরা মুচকি হেসে ব্যঙ্গাত্মক ভাবে বলে, এই দেখ আমাদের রাজার ভায়রা। কোথায় রাজার ভোজ আর কোথায় গাঙ্গু তেলি। এই সব চর্চা ঋষির পরিবার শুনছিল। ভোজন করার পরে ঋষিপত্নীও রাজাকে নিমন্ত্রণ দেয়, আপনারাও আমার বাড়ি অমুক দিন আসবেন, আমি আপনাদের ভোজন ভাণ্ডারা করাবো।

নির্দিষ্ট দিনে রাজা হাজার হাজার সৈনিক নিয়ে পরিবার সহ ভায়রা ঋষির কুটিরে পৌঁছায়। ঋষি স্বর্গের রাজা ইন্দ্রদেবের কাছে প্রার্থনা করে এক কামধেনু (সর্ব মনস্কামনা পূর্ণ করা গাভী, কোন দ্রব্য এই গাভীর কাছে প্রার্থনা করলে তা সাথে সাথে প্রাপ্ত হয়, এটি এক পৌরাণিক মান্যতা) গাভী চায়। এই কামধেনু গাভীর বদলে ঋষি নিজের পুণ্য সংকল্প করে দেয়। ইন্দ্রদেব একটি কামধেনু ও কিছু সেবাদার এবং বিরাট তাবু ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠান। তবুও ভিতর গাভীকে ছেড়ে দেয়। ঋষি পরিবার গোমাতার আরতি করে, মনস্কামনা ব্যক্ত করে। সাথে-সাথেই ছাপান্ন (৫৬) প্রকারের ভোগ (খাবার) রূপোর থালা, হাঁড়ি, কড়াই ইত্যাদির মধ্যে স্বর্গ থেকে নামতে থাকে আর তাবুর মধ্যে রাখা হতে থাকে। খাবার জন্য, লাড্ডু, জিলাপি, হালুয়া, দই বড়া, ক্ষীর এবং ভাত, ডাল, রুটি, রসগোল্লা, বর্ফি, লুচি, বুন্দিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি ৫৬ প্রকারের খাবার আসে। সমস্ত খাবার তাঁবুর ভিতর সাজিয়ে রাখে, প্রায় অর্ধেক একর তাঁবু খাবারে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ঋষি, রাজাকে বলেন, আপনি ভোজন করুন। ঋষিকে বেইজ্জত (অপমান) করার জন্য রাজা বলে, আমার সাথে আমার সৈনিকদেরও ভোজন করাও এবং আমার ঘোড়াকেও খাওয়াতে হবে। ঋষিজী বলেন, প্রভুর কৃপায় সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে প্রথমে আপনি এবং আপনার সৈনিকরা ভোজন করুন। রাজা উঠে ভোজন করার স্থানে যায়। ওখানে সুন্দর কাপড় বিছানো ছিল। রাজা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। রূপার থালায় বিভিন্ন প্রকারের খাবার এনে সেবাদারেরা রাখতে লাগে। অন্নদেবের স্তুতি করে, ঋষি অন্ন গ্রহণ করার প্রার্থনা জানান। রাজা দেখে, এই খাবারের সাথে আমার দেওয়া খাবারের তুলনাই করা যায় না। আমি শুধু ঋষি পরিবারকে তিন চার প্রকারের খাবার দিয়ে ভোজন করিয়ে ছিলাম। লজ্জায় রাজার মাথা নীচু হয়ে যায়। খাবার খেতে খেতে রাজা হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। আর নিজেকে অপমানিত মনে করতে লাগে। সৈনিকরা খাবার খেয়ে সন্তের প্রশংসা করতে লাগে। আর রাজার রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। রাজা নিজের তাবুতে গিয়ে ঋষিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, এই জঙ্গলে এতো সুন্দর সুস্বাদু ভোজন কিভাবে তৈরি করেছেন? এখানে কোন উনুন জ্বালানো নেই, হাড়ি, কড়াই কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। ঋষি বলেন, আমি আমার পুণ্য শক্তি দিয়ে স্বর্গ থেকে একটি গাভী ধার চেয়ে এনেছি। ঐ গাভীর বিশেষত্ব হলো, আমি যত খাবার চাইব সে সাথে সাথে প্রদান করে দেয়। রাজা বলে, আমার সামনে খাবার চেয়ে দেখাও, তবেই আমি বিশ্বাস করবো। ঋষি ও রাজা গিয়ে তাঁবুর দরজায় সামনে দাঁড়ায়। তাঁবুর ভেতরে কেবল গাভীটি ছিল, দরজার দিকে মুখ করে ছিল। তাঁবু (প্যান্ডাল) খালি ছিল কারণ সকলের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। আর শেষ পড়ে থাকা জিনিসপত্র সেবকরা নিয়ে চলে গিয়েছে। গাভীটি চলে যাওয়ার জন্য ঋষির অনুমতির অপেক্ষায় ছিল। রাজা বলে ঋষি! এই গাভী আমাকে দিয়ে দাও। আমার অনেক সৈনিক আছে। ওদের খাবার এই গাভীকে দিয়েই তৈরী করাবো। তোমার

কি কাজে লাগবে? ঋষিজী বলে হে রাজন! আমি প্রার্থণা করে স্বর্গ থেকে এই গো মাতাকে ধার চেয়ে এনেছি। আমি এই গোমাতার মালিক নই। আমি এই গোমাতাকে দিতে পারব না। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিকদের রাজা আদেশ দেয়, এই গাভীকে নিয়ে চলো। রাজার মানসিকতা ঠিক নেই দেখে, ঋষি গোমাতাকে বলে,হে গোমাতা! তুমি তোমার মালিক রাজা ইন্দ্রদেবের কাছে শীঘ্র ফিরে যাও। তখনই কামধেনু তাঁবু ছিঁড়ে সোজা আকাশে উড়ে যায়। রাজা

গোমাতাকে নিচে নামানোর জন্য গাভীর পায়ে তির মারে। গাভীর পায়ের খুরে তিরের আঘাত লাগে এবং রক্ত বেরিয়ে পৃথিবীর উপর পড়তে লাগে। আহত অবস্থায় গাভীটি স্বর্গে ফিরে গেলো। যেখানে যেখানে গভীর রক্ত পড়েছিল সেখানে সেখানে তামাকের গাছ উৎপন্ন হয়। পরে ঐ গাছের বীজ চারিদিকে ছড়িয়ে আরও গাছ উৎপন্ন হয়ে গেলো। তাই সন্ত গরীবদাস জী বলেছেন-

তমা+খূ = তমাখূ।

খূ নাম খূন কা তমা নাম গায়। সো বার সৌগন্ধ ইসে ন পীয়ে খায়॥

ভাবার্থ:- খূ নাম খুন (রক্ত) তমা গাভী, গাভীর খুন-তামাক। এই তামাক গাইয়ের রক্ত থেকে উৎপত্তি হয়েছে। তামাকের গায়ে গাভীর লোমের মত লোম হয়। হে মানব! তোমার শতবার সৌগন্ধ (দিব্যে) এই তামাক সেবন থেকে দূরে থাকো। তামাক সেবন আর গাইয়ের রক্ত পান করায় সমান পাপ হয়। মুসলমান ধর্মের লোকেরা হিন্দুদের কাছে জানতে পারে তামাকের উৎপত্তি গাভীর রক্ত থেকে হয়েছে। তাই মুসলমানরা গাইয়ের রক্ত মনে করে তামাক সেবন শুরু করে। কারণ মিথ্যা জ্ঞানের আধারে মুসলনমান ভাইরা গাইয়ের মাংস খাওয়া ধর্মীয় প্রসাদ মনে করে। হজরত মুহম্মদকে মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক মানা হয়। কিন্তু তিনি কোনদিন জীবের মাংস খাননি।

**গরীব, নবী মুহম্মদ নমস্কার হৈ, রাম রসুল কহায়া।**
**এক লাখ অস্সী কূ সৌগন্ধ। জিন নহী করদ চলায়া॥**
**গরীব,অর্সকুর্সপরঅল্লহতখতহৈ,খালিকবিননহীখালী।**
**বৈ পৈগম্বর পাক পুরুষ থে, সাহেব কে অবদালী॥**

**ভাবার্থ:-** নবী মুহম্মদ আদরনীয় মহাপুরুষ ছিলেন এবং তিনি পরমাত্মার বার্তাবাহক ছিলেন। এই রকম এক লাখ আশি হাজার পৈগম্বর মুসলমান ধর্মে (বাবা আদম থেকে মুহম্মদ) পর্যন্ত হয়ে ছিল। তারা সবাই পাক (পবিত্র) ব্যক্তি ছিলেন। কোন পশু পাখীর উপর তরোয়াল (করদ) চালায়নি। তারা পরমাত্মাকে ভয় করতো। পরে কিছু মোল্লা কাজীরা মাংস খাওয়ার পরম্পরা শুরু করে দেয়। ভবিষ্যতে গিয়ে এই পরম্পরা ধার্মিক অপবাদে (বিকৃত রূপ) পরিনত হয়। যে কারণে আজ সর্ব মুসলমান এই পাপকে খাচ্ছে। ভ্রমিত মুসলমানরা তামাক সেবন (হুক্কাপান) শুরু করে। হিন্দু ধর্মের লোকেরা মুসলমানদের চালাকি বুঝতে না পেরে তারাও তামাক সেবন শুরু করে দেয়। বর্তমানে এই পাপ সমাজ বা পঞ্চায়েতের সম্মান হয়ে উঠেছে। ইহা মারাত্মক ভুল, অজ্ঞানতার কালো পর্দা। ভুলেও তামাক সেবন করা উচিত নয়। সন্ত গরীবদাসজী বলেছেন, হে হরলাল! আরও শোন তামাক সেবনে কত পাপ হয় -

**গরীব, পরদ্বারা স্ত্রী কা খোলৈ। সত্তর জন্ম অন্ধা হো ডোলে।**
**মদিরা পীবৈ কড়বা পানী। সত্তর জন্ম শ্বান কে জানী॥ ২॥**
**মাংস আহারী মানবা, প্রত্যক্ষ রাক্ষস জান।**
**মুখ দেখোঁ তাস কা, ও ফিরৈ চৌরাসী খান॥ ৩॥**

**সুরাপান মদ্য মাংসা হারি। গমন করে ভোগে পর নারী ॥ ৪ ॥**
**সত্তর জন্ম কটত হৈ শীশম্। সাক্ষী সাহেব হৈ জগদীশম্ ॥ ৫ ॥**
**সৌ নারী জারী করৈ, সুরাপান সৌ বার।**
**এক চিলম্ হুক্কা ভরৈ, ডুবৈ কালী ধার ॥ ৬ ॥**
**হুক্কা হরদম পীবতে, লাল মিলাবে ধুর।**
**ইসমে সংশয় হায় নহীঁ, জন্ম পীছলে শুয়র ॥৭॥**

**উপরোক্ত বাণীর ভাবার্থঃ-**

বাণী সংখ্যা ১ এ বলেছে, যে ব্যক্তি অন্যের স্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক রাখে, এই পাপের কারণে সে ৭০ জন্ম অন্ধ হয়। সে অন্ধ হয়ে বিভিন্ন যোনীতে কষ্ট ভোগ করে, যেমন:- অন্ধ গরু, অন্ধ গাধা, অন্ধ কুকুর, অন্ধ মানুষ ইত্যাদি হয়ে লাগাতার ৭০ জন্ম ভোগ করতে হয়।

বাণী সংখ্যা ২:- তিক্তো ঝাঁঝ যুক্ত মদ রূপী পানীয় যে পান করে, সেই পাপের কারণে সে সত্তর জন্ম কুকুর হয়ে কষ্ট ভোগ করে। নোংরা নালার জলপান করে। খাবার না পেয়ে পায়খানা খায়।

বাণী সংখ্যা ৩:- যে ব্যক্তি মাছ, মাংস খায় সে স্পষ্ট রাক্ষস। তার মুখ ও দেখা উচিত নয়। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির সাথে থাকলে অন্য ব্যক্তিও ভ্রমিত হয়ে মাছ, মাংস খাওয়া শুরু করবে। তাই ঐ ব্যক্তি থেকে দূরে থাকা দরকার। মাছ, মাংস খাওয়া ব্যক্তি ৮৪ লক্ষ যোনী ভ্রমণ করতে থাকবে।

বাণী সংখ্যা ৪-৫:- (সুরা) মদ খাওয়া এবং পরস্ত্রী গমন করা ব্যক্তি ও মাছ, মাংস খাওয়া ব্যক্তিকে আরো অন্যান্য পাপ কর্মও ভোগ করতে হয়। তাদের সত্তর জন্ম পর্যন্ত মানুষ, ছাগল, গরু, হাঁস, মুরগী, মাছ ইত্যাদির জন্ম নিয়ে শিশ অর্থাৎ মাথা কাটাতে হয়। পরমাত্মাকে সাক্ষী রেখে আমি যে কথাগুলি বলছি, সেগুলি একেবারে সত্য মনে করবে।

বাণী সংখ্যা ৬:- এক ছিলিম ভরে হুক্কা পান করলে বা ভরে দিলে তাতে যে পাপ হয় তা শোনো। একবার পর স্ত্রী গমন, একবার মদ পান, একবার মাংস খাওয়া ব্যক্তিকে উপরোক্ত যে কষ্ট ভোগ করতে হয়। এই রূপ পাপ শতবার করলে তার যে কষ্ট হয়, ঐ একই কষ্ট একবার হুক্কা ভরে দেওয়া ব্যক্তির হয়। তাহলে বিচার করুন তামাক সেবন করা ব্যক্তির কত পাপ হবে। তাই, বিড়ি, সিগারেট, খৈনী, গুটখা ইত্যাদি পদার্থ কখনও সেবন করো না।

**বাণী সংখ্যা ৭:-** সমাজের দেখাদেখি অনেক ব্যক্তি নেশা জাতীয় বস্তুর সেবন শুরু করে দেয়। যদি সৎসঙ্গ শুনে এই পাপ কর্ম ত্যাগ করে দেয়, তাহলে বুঝে নেবে ঐ জীব পূর্ব জন্মে মনুষ্য ছিল। ঐ আত্মার ভিতর নেশা করার অভ্যাস হত না। যারা বার বার সৎসঙ্গ শুনেও তামাক জাতীয় নেশার পদার্থ ত্যাগ করে না। তারা পূর্বের জন্মে শুয়োরের শরীরে ছিল। শুয়োরের শরীরে দূর্গন্ধ মাখার অভ্যাস (ব্যাড স্মেল) হয়ে যায়। তাই এই মানব জীবনে ও তামাক সেবন বা তামাকের দুর্গন্ধ নেওয়ার অভ্যাস শীঘ্র ত্যাগ করতে পারে না। তারা মানব শরীর রূপী অমূল্য রত্নকে নষ্ট করে দেয়। তাই এইসব ব্যক্তিদের অধিক (বেশি করে) সত্সঙ্গ শোনার পরামর্শ দেওয়া হয়। নিরাশ হয়ো না, সত্য মন দিয়ে পরমাত্মা কবীর জীর কাছে নেশা ত্যাগ করার জন্য প্রার্থনা করো তাহলে সমস্ত নেশা ছেড়ে যাবে।

## “তামাকের বিষয় অন্য বিচার”

তামাক ও হুক্কা পান করা ব্যক্তিদের স্থিতি (দশা):-
(সন্ত গরীবদাসজীর গ্রন্থে “অথ তমাখূ কী বৈঁত” কথা নামক অধ্যায়)

**পিত বাই খাঁসী নিবাসী নিবাস। কফ দল কলেজা লিয়া হৈ গিরাস॥**
**কালা তমখু অরু গোরা পিবাক। দশ বীশ লংগর জহাঁ বৈঠে গুটাক॥**
**বাজৈ নৈ গুড়গুড় অরু হুক্কে হজুম। কোরে কুবুদ্ধি বীসা হেন সুম॥**
**বাঁকি পগড়ী অরু বাঁকী হী নৈ খুদ ডুবে অরু ডুবোয় হৈ কৈ॥**
**গুটাকড় অটাকড় মটাকড় লহুর। এক বৈঠেগা অড় কর এক বেঠেগা দুর॥**
**পীবৈ তামাখু পড়ে কর্ম মার। অমলী কে মুখ মে মুত্র কি ধার॥**
**কড়বা হী কড়বা তু করতা হমেশ। কড়বা হী লে প্যারে কড়বা হী পেশ॥**
**কামী ক্রোধী তু লোভী লবুট। বচন মান মেরা ধুম ন ঘুট॥**
**হুক্কা হরামী গুলামী গুলাম। ধনী কে সরে মে ন পহুঁচে অলাম॥**
**পামর পরম ধাম জাতে ন কোঙ্গ। ঝুঠে অমল পর দই জান খোঙ্গ॥**
**মুরদা মজাবর হরামী হরাম। পীবৈ তমাখু সো ইন্দ্রী কে গুলাম॥**
**অজ্ঞান নদী সো উঠে জাগ, পীবৈ তামাখু গয়ে ফুটি ভাগ॥**
**ভাংগতামাখুপীবৈহী,সুরাপানসেহেত।গোসতমিট্টীখায়করজঙ্গলীবনেপ্রেত॥**
**গরীব,পানতমাখুচাবহী,শ্বাসনাকমেদেত।সোতোঅকার্থগয়েজ্যোভড়ভুজেকারেত॥**
**ভাংগ তমাখু পীবহী গেসত গলা কবাব। মোর মৃগ কুঁ ভখত হৈ, দেঙ্গে কহা জবাব॥**
**ভাংগ তামাখু পীবতে চিসম্যো নালি তমাম। সাহিব তেরী সাহিবী, জানে কহাঁ গুলাম॥**
**গউ আপনি অম্মা হৈ, ইস পর ছুরী না বহায়। গরীবদাস জী দুধ কো, সব হী আত্ম খায়॥**

**ভাবার্থ:-** উপরোক্ত বাণীগুলির ভাবার্থ হলো, মানব শরীরে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। অক্সিজেনের স্থানে তামাকের ধোঁয়া অর্থাৎ কার্বনডাই অক্সাইড প্রবেশ করলে কাশির রোগ সৃষ্টি হয়। পিত্ত ও বাতের রোগ দেখা দেয়। হুক্কা পান করা ব্যক্তির বসার স্টাইলের ব্যাপারে বলেছেন যে, হুক্কা পান করা ব্যক্তিরা, দুই একজন তো হুক্কার কাছে বসবে। আর একজন সামান্য দূরে বসে বলবে, একটু ঠেলে দাও এইদিকে। দ্বিতীয় জন তার দিকে হুক্কাটি এগিয়ে দেয়। আর নলে (যে পাইপে মধ্যে দিয়ে ধোঁয়া যায়) গুড়-গুড় শব্দ হতে শুরু করে। নিজেরা তো হুক্কা সেবন করে পাপে ডুবেই রয়েছো। আর ছোট ছোট বাচ্চারাও তাদের দেখাদেখি ঐ পাপ করে নরকের অন্ধকারে ডুববে। যারা তামাক সেবন করে তাদের ভাগ্যে তো সর্বনাশ লেখাই আছে আর অনান্যদেরকেও তামাক খাওয়ার জন্য সাহায্য বা প্রেরণা করে তাদেরকেও নরকের অন্ধকারে ঠেলে দেয়। উপরোক্ত পাপকর্ম করা ব্যক্তি নিজের জীবন এমন ভাবে সর্বনাশ করে, যেমন আগুনে গরম বালির মধ্যে ছোলা ভাজে। তারপর সর্ব কার্য শেষে করে বালিকে গলির পাশে ফেলে দেয়। তেমনই, যে ব্যক্তি উপরোক্ত কুকর্ম গুলি করে, সেও নিজের মানব জীবনকে এইভাবেই ব্যর্থ করে পৃথিবী থেকে চলে যায়। তারপর ঐ জীবকে নরকে এবং অন্য প্রাণীর জীবন রূপী গলিতে ফেলে দেওয়া হবে। যারা উপরোক্ত পাপকর্মগুলি করে, তারা ভগবানের দরবারে কি উত্তর দেবে! অর্থাৎ কিছু বলার যোগ্য থাকবে না।

তারপর বলেছেন যে, গাভী আমাদের মাতার তুল্য। সর্ব ধর্ম বা সর্ব জাতির লোকেরা গাভীর দুগ্ধ পান করে। তাই গাভীকে হত্যা করো না। এখন প্রসঙ্গ চলছে

তামাকের:-

ভক্তি মার্গে তামাক সব চেয়ে বেশি বাধা সৃষ্টি করে। যেমন আমাদের দুই নাকের মাঝে সুঁচেয়ের ছিদ্রের সমান একটি তৃতীয় দ্বার রয়েছে। যারা তামাকের ধোঁয়া নাকের মধ্যে দিয়ে বের করে, সেই ধোঁয়া তাদের ঐ তৃতীয় দ্বারটি বন্ধ করে দেয়। এই পথই উপরের ত্রিকুটির দিকে যায়, যেখানে স্বয়ং পরমাত্মার নিবাস। যে পথ দিয়ে গেলে আমরা পরমাত্মার সাথে মিলবো, সেই রাস্তাকেই তামাকের ধোঁয়া বন্ধ করে দেয়। যারা হুক্কা পান করে তারা হুক্কার নলকে প্রতিদিন লোহার গজ বা সরু কোন শক্ত লোহার তার দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধোঁয়ার জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার করে। নইলে নলের দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে। মানব জীবন পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্যই প্রাপ্ত হয়েছে। আর পরমাত্মা প্রাপ্তির পথ তামাকের ধোঁয়া বন্ধ করে দেয়। তাই তামাক জাতীয় পদার্থ ভক্তদের মহা শত্রু। যারা হুক্কা পান করে তারা নিজেরাও জানে যে তামাকু ভালো বস্তু নয়। ছোট বাচ্চারা তাদের ঠাকুরদা-পিতা, কাকা- জ্যোঠাকে হুক্কা বা বিড়ি সিগারেট ইত্যাদি সেবন করতে দেখে তাদের নকল করে। আর তারপর যখন সেবন করতে শুরু করে, তখন ঐ বড় ব্যক্তিরা যারা নিজেরাই নেশা সেবন করে, তারাই ধমক দিয়ে বলে খবরদার যদি নেশা পান করিস তো! এ একেবারেই ভালো জিনিস নয় এসব খাবি না। যদি আপনারা নেশা পান করাকে ভালো অভ্যাস বলে মনে করেন তাহলে, ছোটদের ও তা করতে দিন। কিন্তু আপনারা তাদের মানা করেন। তারমানে এটা আপনারাও মানেন যে নেশা সেবন করা ভালো অভ্যাস নয়, এটা হানিকারক। একদা শীতকালীন সময়ে একটি ঘরে, ছোটো বাচ্চা সহ কয়েকজন ছিল। তাদের মধ্যে যারা হুক্কা পান করার তারা বসে হুক্কা পান করছিল আর বাচ্চারা ঘুমাচ্ছিল। হুক্কা পান করে স্বয়ং তো পাপ কর্ম করছিলই তার সঙ্গে নিজের পরিবারকেও হুক্কার ধোঁয়া পান করিয়ে পাপের ভাগীদার করে তুলছিলো। বাড়ির ঠাকুরদা-বাবারা বাড়ির ছেলে-মেয়ে, ছোটো বাচ্চাদের নিজের ভাগের দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করে, তাদের ভোলানোর জন্য বলে যে, নে আরোও একটু দুধ খেয়ে নে! দেখ চুল বড় হয়ে যাচ্ছে। আয় আরও একটু খেয়ে নে। এই ভাবে বলে তাদেরকে সম্পূর্ণ দুধের গ্লাসটি শেষ করিয়ে তবেই ছাড়ে। কারণ তারা জানে, বাচ্চাদের জন্য দুধ লাভদায়ক। মানা করার সময় মন বলে, হুক্কা-বিড়ি ইত্যাদি সেবন খারাপ কিন্তু সমাজে এখন এই কুকর্ম খুবই সাধারণ হয়ে গিয়েছে। তখন মনে অনেক আদর যত্ন করে একটু একটু করে পুরো গ্লাস দুধ পান করায়। কারণ দুধ বাচ্চাদের জন্য লাভদায়ক হয়। মন বলে নেশা জাতীয় পদার্থ পান করা খারাপ। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজে এই কুকর্ম খুবই সাধারণ হয়ে গিয়েছে। তাই পাপ হবেনা বলে মনে করি যেমন কিছু আদিবাসী উপজাতিরা। পশু-পাখী শিকার করে তার মাংস খায়। ফলে তাদের বাচ্চাদের কাছে এই ধরনের পাপের কাজ সাধারণ বিষয়।

এই প্রকার তামাক সেবন করাও মহাপাপ, কিন্তু এসব এখন সমাজের পরম্পরা হয়ে গিয়েছে। তাই পাপ হবে না। নেশা সেবন ত্যাগ করা উচিত। ভক্ত হরলাল হুঁকো চিলম ঐ দিনই ভেঙে ফেলে সেইদিন পুরো পরিবারকে এই পাপের বিষয়ে জানায় ও নাম-দীক্ষা দেওয়ায়। ঐ সময় থেকে কয়েক পুরুষ পর্যন্ত ঐ বংশে নেশা করে নাই। পরে সৎসঙ্গের অভাবে ঐ বংশের কিছু ব্যক্তি আবারও দেখাদেখি হুক্কা পান করতে শুরু করেছে।

## “ঘোড়া-গাধাও তামাককে ঘৃণা করে”

একদিন সন্ত গরীবদাস জী (গ্রাম-ছুড়ানী, জেলা-ঝজ্জর) ঘোড়ায় চড়ে জিন্দ

জেলার কোন এক গ্রামে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে গ্রাম মালখোড়ীর (জেলা জীন্দ) কৃষি জমি পড়ে। জমিতে তখন গমের ফসল ছিল। গরীবদাস জী ঘোড়া নিয়ে জমির ফসলের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলেন। জমিতে ফসলের যে রক্ষীরা ছিল, তারা গরীবদাস জীকে মারার জন্য লাঠি নিয়ে দৌড়ায়। আর বলে তোর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে? ফসলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিস, ঘোড়াকে সোজা চালাতে পারিস না! গরীবদাসকে মারার উদ্দেশ্যে লাঠি উঠাতেই রক্ষীদের হাত উপরে লাঠি সহ স্থির হয়ে যায়, আর নীচে নামে না। সকলে নিজ নিজ স্থানে পাথরের মত স্থির হয়ে যায়। পাঁচ মিনিট ধরে ঐভাবেই থাকে। গরীবদাস জী নিজের হাত আশীর্বাদ দেওয়ার স্থিতিতে ওঠালে সবাই চিত হয়ে মাটিতে পড়ে যায় এবং হাত থেকে লাঠিও পড়ে যায়। এমন হয়েছিল যেন প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছে। তাদের বুঝতে সময় লাগলো না যে,এ কোন সাধারণ ব্যক্তি নয়। তাই সকলে কান্না-কাটি করে হাতজোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তখন গরীবদাসজী বলেন, আরে ভালো পুরুষ! পথ চলা ব্যক্তির সাথে এমন ব্যবহার করতে হয়? আগেই তাকে মারার জন্য দৌড়াও। প্রথমে জানা উচিত ছিল কোন কারণে ঘোড়াটি ফসলের মাঝখান দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? তখন কৃষকেরা বলে আপনিই বলেন, ঘোড়া কেন ফসলের মধ্যে দিয়ে গেলো? সন্ত গরীবদাস জী জিজ্ঞাসা করেন, ঐ জমিতে পূর্বে কোন ফসল রোপণ করা হয়েছিল। কৃষক বলে বাজরা। তার পূর্বে কি ছিল? তামাক ছিল। সন্ত গরীবদাস জী বলে ঐ জমি থেকে এখনোও তামাকের দুর্গন্ধ উঠছে। তাই ঘোড়া বিরক্ত হয়ে ঐ জমির পাশের রাস্তা ছেড়ে এই জমির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আর ঐ তামাক তোমরা পান কর। তোমরা তো পশুর থেকেও খারাপ। ধ্যান দিয়ে শোনো! আজ থেকে এই গ্রামের কোন ব্যক্তি হুক্কা পান করবে না। অর্থাৎ তামাক খাবে না। যদি আজ্ঞা পালন না হয় তাহলে গ্রামের অনেক হানী হবে। তখন তো সকলে হ্যাঁ বলে দেয়। কিন্তু সন্ত চলে যাওয়ার পর একজন বললো, হুঁকোটা ভরে নে! যা হবে পরে দেখা যাবে। হুঁকো ভরতে গেলে হাত থেকে পড়ে হুঁকোটি ভেঙে যায়। অন্য একটি হুঁকো আনলে তা হাতের মধ্যেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। জমিতে কৃষকদের কাছে যত হুঁকো ছিল সব ভেঙে ফেটে নষ্ট হয়ে যায়। জমি রক্ষীরা মনে করে যে, এটি হয়তো সন্তেরই কোনো লীলা। গ্রামে যত হুঁকো ছিল সব ভেঙে-ফেটে গেলো। সমস্ত গ্রামে হইচই পড়ে যায়। ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি হয় গেলো। জমি থেকে কৃষকরা গ্রামে আসলে, হুঁকোগুলি নষ্ট হওয়ার কারণ জানতে পারে। ঐ দিনের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই গ্রামে কেউ তামাক সেবন করে না। ঐ গ্রামের নাম 'মালখেড়ী'।

❖ হুক্কা পান করা ব্যক্তি বলে, আমার কাছে কড়া তামাক আছে ওটাকে হুঁকোতে ভর। দ্বিতীয় জন বলে আমারটাও খুব কড়া। সন্ত গরীবদাস জী বলেছেন, যারা এই তিক্ত তামাক পান করে মৃত্যুর পরে যম দূত এদের মুখে প্রস্রাব করবে। যম দূত বলে তুই অধিক তেজের তামাক পান করতে চেয়েছিলি, তাই প্রিয়! এখন কড়া মূত্র পান কর। এই বলে যম ঐ ব্যক্তির মুখ খুলে মুখের ভিতর মূত্র ত্যাগ করে।

সন্ত গরীবদাস জী নেশা জাতীয় বদ অভ্যাস ত্যাগ করানোর জন্য এই লীলা করেছিলেন। কিন্তু একমাত্র সৎসঙ্গের জ্ঞানের প্রভাব দ্বারাই সর্বদার জন্য সমস্ত খারাপ অভ্যাস ত্যাগ হয়ে যায়। সৎসঙ্গ দ্বারাই জ্ঞান হয়। তাই সৎসঙ্গ শোনার রুচি মনে জাগাও আর সৎসঙ্গ শোনো।

**নিবেদন:-** উপরোক্ত সকল খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করো। যাতে জীবনের পথ সহজ ও সুন্দর হয়।

## "নেশা মানুষকে নাশ করে"

যে কোন (মদ, বিড়ি, আফিম, গাঁজা, হিরোইন ইত্যাদি) নেশাই হোক তা মানব জীবনে সর্বনাশের কারণ হয়। নেশা প্রথমে মানুষকে শয়তানে পরিণত করে তারপর শরীরের নাশ করে দেয়। শরীরের চারটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ : ১. ফুস-ফুস ২. লিভার ৩. কিডনী ৪. হৃদপিন্ড। নেশা সর্বপ্রথম এই চার অঙ্গকে নষ্ট করে দেয়। চরস-গাঁজা-আফিম ব্রেনকে সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট করে দেয়। হিরোইন শরীরকে দুর্বল করে দেয়, শরীরের স্বাভাবিক কাজ করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। আর তারপর আফিমের শক্তি দ্বারা শরীর চলতে শুরু করে। রক্ত দূষিত হয়ে যায়। তাই নেশা জাতীয় বস্তু গ্রামে-নগরে তো দূরের কথা বাড়িতেও রাখা উচিত না। আর সেবন করার কথা তো চিন্তাও করা উচিত না।

❖ এক ব্যক্তি দিল্লি পালম বিমানবন্দরে চাকরী করতো। ১৯৯৭ সালের কথা। সেইসময় ঐ ব্যক্তির প্রতি মাসের বেতন ১২ হাজার টাকা ছিল। একদিন দিল্লির এক গ্রামে আমি (রামপাল দাস) সতসঙ্গ করতে যাই। ওখানে এক বৃদ্ধা তার তিন নাতনী-দেরকে নিয়ে সৎসঙ্গের স্থানে আসে। যে বাড়িতে সতসঙ্গ চলছিল, ঐ বৃদ্ধা সম্পর্কে তাদের কাকিমা হয়। বৃদ্ধা গ্রামের বাইরে একটি প্লটে বাড়ি তৈরি করে থাকতো এবং যে ব্যক্তি পালম বিমানবন্দরে চাকরী করতো সেও তারই পুত্র। সে প্রচুর মদ্য পান করতো। ঘরের অবস্থা খারাপ করে রেখেছিল। প্রতিদিন বাড়িতে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া মারপিট অশান্তি করতো। প্রতিদিন যেনো মহাভারত লেগেই থাকত। তার স্ত্রী অত্যা-চার সহ্য করতে না পেরে বাচ্চাদের ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যায়। তখন ঠাকুরমাই বাচ্চাদের দেখাশোনা করত। পরে বৃদ্ধা নিজে গিয়ে পুত্র বধূকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। নিজের ভাসুরের বাড়িতে সৎসঙ্গ থাকায়, ঐ দিন রাত্রে বৃদ্ধা, পুত্রবধূ ও নাতনী সহ সেখানে আসতে হয়। সতসঙ্গে প্রত্যেক বিষয়ের উপর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। পরমাত্মার ভক্তি না করলে যে ক্ষতি হয় এবং ভক্তি করলে যে লাভ হয় তার বর্ণনা বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়। ঐ দিন সেই মাতাল ব্যক্তি প্রথমে বাড়িতে গেলো। বাড়িতে কেউ ছিল না তাই কিছুক্ষণ ঘরে বসে থাকে। পরে এক প্রতিবেশী তাকে জানায় যে, আপনার মাতা সবাইকে নিয়ে আপনার জ্যাঠার বাড়িতে গিয়েছে। ওখানে সৎসঙ্গ হচ্ছে। আজ ওখানেই সকলের খাওয়া দাওয়ার ব্যাবস্থা আছে। পরমাত্মার কৃপা হয় এবং ঐ মাতালও সত্সঙ্গে যায়। সে সবার পিছনে গিয়ে বসে কারণ সে মদ পান করে এসেছিল।

সত্সঙ্গ প্রবচন: সৎসঙ্গে বলা হলো যে, মানব জন্ম প্রাপ্ত করে যে ব্যক্তি ভাল (শুভ) কর্ম করে না, তার ভবিষ্যত নরকে পরিণত হয়। আর যে নেশা করে তার বর্ত-মান ও ভবিষ্যত দুইই নরক হয়ে যায়। নেশা মনুষ্যের জন্য নয়। নেশা মানুষকে রাক্ষসে পরিণত করে। যে ব্যক্তির কাছে পূর্ব জন্মের পুণ্যকর্ম আছে, ঐ পুণ্য কর্মের প্রতিফলে এই জন্মে তার ভালো চাকরী বা ভালো কারবার বা ব্যবসা হয়। যদি ঐ ব্যক্তি বর্তমানে শুভ কর্ম, ভক্তি, দান, ধর্ম না করে তাহলে পরবর্তী জন্মে পশু যোনীতে, গাধা, কুকুর, শুয়োর ইত্যাদি হয়ে নোংরা খেয়ে মহা কষ্ট ভোগ করবে।

যেমন মানব (স্ত্রী/পুরুষ) পূর্বের শুভ কর্ম অনুযায়ী সুন্দর শরীর প্রাপ্ত করে, যখন ইচ্ছা হয় ভালো খাবার খায়, পিপাসা লাগলে জল পান কর, ইচ্ছা করলে, চা, দুধ, ফল, কাজু, বাদাম ইত্যাদি খাও। যদি পূর্ণ গুরুর থেকে নাম উপদেশ নিয়ে সত্য ভক্তি ও সত্সঙ্গ সেবা, দান ধর্ম না করো তাহলে পরবর্তী জন্মে, গাধা, কুকুর, শুয়োর হয়ে দুর্দশা প্রাপ্ত করবে। ঠাণ্ডা, গরম, বর্ষায় কষ্ট ভোগ করবে, মশা, মাছি, কীট-পতঙ্গ থেকে রক্ষার কোনো সাধন থাকবেনা। মানব জীবনে কীট-পতঙ্গের হাত থেকে বাঁচার

জন্য মশারী, অলআউট ইত্যাদি সামগ্রী ব্যবহার করে। ঠাণ্ডা, গরম থেকে বাঁচার জন্যও অনেক ব্যবস্থা আছে। কিন্তু পশুর জন্ম পেলে এই সমস্ত সুবিধা কোথায় পাবে?

সন্ত গরীবদাস জী, পরমেশ্বর কবীর জীর থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানে বলেছেন:-

**গরীব, নর সেতী তূ পশুবা কীজৈ, গাধা বৈল বনাঈ।**
**ছপ্পন ভোগ কহাঁ মন বৌরে, কুরড়ী চরণে জাঈ॥**

**ভাবার্থ:-** মানব শরীর ত্যাগের পর ভক্তিহীন ও শুভকর্ম হীন হয়ে জীব গাধা, গরু ইত্যাদির যোনী (শরীর) প্রাপ্ত করে। তখন মানুষের মত খাবার পায় না। গাধা হয়ে ময়লা (নোংরা) খায়। গরুর নাকে নাথা বাঁধা হবে। দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হবে। পিপাসা লাগলে ইচ্ছামত জল পান করতে পারবে না। ক্ষুধা লাগলে খাবার খেতে পারবে না। মাছি, মশা থেকে বাঁচার জন্য কেবল একটি মাত্র লেজ থাকবে। ঐ লেজকেই পাখা, কুলার, মশারী ইত্যাদি যেমন ইচ্ছা মনে করে ব্যবহার করবে। যে প্রাণীদের পাপ কর্ম অধিক থাকে তাদের লেজের শেষ অংশটিও কেটে যায়। কেবল দেড় ফুটের এক লাঠির মত লেজ থেকে যায়, তাকেই ঘুরাতে থাকে।

এক দিন একটি বলদ গরুর পিছনের পায়ে খুরের মাঝখানে প্রায় দেড় ইঞ্চির একটি লোহার পেরেক ঢুকে যায়। গরু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটতে লাগে। কৃষক চিন্তা করে গরুর পায়ে শিরার উপর শিরা উঠে গিয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে ঠিক হয়ে যাবে। তাই গরুকে বিশ্রাম না দিয়ে হাল চাষ করতে থাকে। কৃষক সারাদিন ঐ গরু দিয়ে হাল চাষ করে। গরু ঠিকমত হাঁটতে পারছিল না। আস্তে আস্তে পা- রাখছিল। বাড়িতে এসে গরু শুয়ে পড়ে। ঘাসও খেলো না। ব্যথার যন্ত্রণায় চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। পা ফুলে যায়। গ্রামের এক পশু ডাক্তারকে ডেকে আনা হয়। ডাক্তার এসে গরুর পা দেখে বলে, বাতের জন্য হাঁটু ফুলেছে আর তাই ব্যথা হচ্ছে। পুরানো গুড় লাগিয়ে পট্টি বেঁধে দেয়। আর বললো ঠিক হয়ে যাবে। লোহা ঢুকেছে খুরের মাঝখানে (পায়ের নীচের দিকে) আর চিকিৎসা হচ্ছে হাঁটুর। প্রায় এক মাস এই ভাবে চলে। একদিন হঠাৎ গরুর খুরের নীচের (তলায়) দিকে পুঁজ বের হতে দেখা যায়। পুঁজ পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখে লোহা। তখন ঐ দেড় ইঞ্চির লোহার পেরেক বের করে। গরু এক সপ্তাহের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়। তখন, পেট ভরে ঘাস খায়।

**বিবেচনা করুন:-** ঐ আত্মা যখন মানব শরীরে ছিল তখন স্বপ্নেও ভাবেনি যে, একদিন গরু হয়ে জন্ম নিতে হবে। এখন গরু হয়ে বলতেও পারছে না কোথায় ব্যথা। তাই কবীর জী বলেছেন:-

**কবীর, জিহ্বা তো বোহে ভলী, জো রটে হরিনাম।**
**না তো কাট কে ফৈঁক দিয়ো, মুখ মেঁ ভলো না চাম॥**

**ভাবার্থ:-** জিহ্বা যেমন শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। জিহ্বা দিয়ে যদি পর-মাত্মার নাম, গুণগান, না করা হয় তাহলে ব্যর্থ। কারণ জিহ্বা দিয়ে কু-বচন বলে জীব পাপ করে। বলবান ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিকে কটু কথা বলে তার আত্মাকে দুঃখী করে। তাই সেই দুর্বল ব্যক্তি মনে মনে অভিশাপ দেয়। এটাও পাপ করা হল। শুনিয়ে বলে না, কারণ এতে মারও খেতে পারে। আবার কারো নিন্দা করে, মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে, মিথ্যা কথা বলে অন্যকে ঠকায়, ব্যবসায় মিথ্যে বলে ঠকিয়ে ইত্যাদি অনেক প্রকা-রের পাপ মানুষ নিজের জিহ্বা দ্বারা করে থাকে। পরমেশ্বর কবীর জী বলেছেন, যদি জিহ্বার সৎ ব্যবহার না করো অর্থাৎ ভালো কথা, শীতল বাণী পরমাত্মার গুণ গান, ধার্মিক গ্রন্থের পাঠ ও ভগবানের নামের জপ যদি না করতে পারো তাহলে এই জিহ্বা

কেটে ফেলে দাও।

(জিহ্বা কাটার কথা একটি উদাহরণ মাত্র, এর অর্থ সতর্ক করা। কারো জিভ কাটতে বলা হয় না। নিজ শুভ বচন, শুভকর্ম শুরু করা। রাম নামের গুণ গান না করলে এই পবিত্র মুখে জিভ রাখার কোনো লাভ নেই।)

❖ মানব শরীর ধারী প্রাণী বর্তমানে (১৯৭০ সাল থেকে) বিশেষ সুবিধাগুলি প্রাপ্ত হয়। যার জন্য ধীরে ধীরে পরমাত্মা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আর তত শীঘ্রই দুঃখ নিকটে আসছে। আর্থিক স্থিতি ভালো হলেও মানসিক শান্তি নাই। তার মুখ্য কারণ হলো নেশা করা। পিতা যখন চাকরিতে যায় তখন বাচ্চারা আশা করে থাকে যে, পিতা আসার সময় আবশ্যক বস্তুগুলি নিয়ে আসবে। সন্ধ্যার সময় পিতাকে আসতে দেখে বাচ্চারা আনন্দে দৌড়ে গিয়ে পিতাকে জড়িয়ে ধরে। যে বাচ্চাদের পিতা নেশা করে সেই ঘরে ঝগড়া কলহ হওয়া স্বাভাবিক। ছোট বাচ্চারা ভয়ে ভীত থাকে। তাদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে বাধা প্রাপ্ত হয়। ঐ ঘর নরকের সমান হয়ে যায়। সমাজে তাদের কোন সম্মান থাকে না। পরবর্তী জন্মে ঐ ব্যক্তি কুকুর হয়ে জন্ম নেবে। মল খাবে, নোংরা নালার জল খেয়ে বেড়াবে। পরে অন্য পশুর যোনীতে মহা কষ্ট ভোগ করবে। তাই জীবনের সর্ব প্রকার নেশা ত্যাগ করে, খারাপ কর্ম ত্যাগ করে প্রকৃত মানুষের মত জীবন যাপন করা উচিত। আর সভ্য সমাজকেও শান্তিতে জীবন যাপন করতে দাও। একজন মাতাল অনেক মানুষকে দুঃখী করে :- নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের, নিজের মাতা, পিতা, ভাই বোন আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীদের এবং স্ত্রীর মাতা-পিতা ভাই বোন সকলকে। মাত্র এক ঘন্টার নেশায় অর্থ নষ্ট, সম্মান নষ্ট, সমস্ত পরিবারের শান্তি নষ্ট করে দেয়। ঐ ব্যক্তি ভবিষ্যতে কি সুখী হতে পারবে? কখনোই না। তার জীবন নরক হয়ে যাবে। তাই কূকর্ম অতি শীঘ্রই ত্যাগ করা উচিত?

**প্রশ্ন:-** পরবর্তী জন্মে কি হবে তা কে দেখেছে?

**উত্তর:-** এক সময় এক অন্ধ ব্যক্তি জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা এক সত্ ব্যক্তি বললো, হে সুরদাস জী (অন্ধ)! ঐ দিকে যেও না। ঐ রাস্তা জঙ্গলের দিকে গিয়েছে। ঐ জঙ্গলে ভয়ঙ্কর বাঘ-চিতা ইত্যাদি হিংস্র পশু রয়েছে। তুমি ফিরে যাও। যদি ঐ অন্ধ ব্যক্তি নেশা না করে থাকে তাহলে সামনের দিকে না গিয়ে পিছনে ফিরে আসবে। আর যদি সে নেশা করে থাকে তাহলে বলবে, কে দেখেছে জঙ্গলে ভয়ঙ্কর বাঘ,চিতা, সর্প ইত্যাদি জন্তু রয়েছে? এই বলে সামনের দিকে এগিয়ে যা।

**বিচার করুন :-** অন্ধ চোখেও দেখে না আবার দৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তির কথা বিশ্বাসও করে না। তবে ঐ সকল অন্ধদের আর কি উপায়ে বোঝানো যাবে? যদি কথা মানে তাহলে ভালো। যদি না মানে তাহলে তার ঐ অবস্থাই যে ব্যাপারে ঐ দৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তি তাকে অবগত করেছিল, যে জন্তু তাকে মেরে ফেলবে।
এই প্রকার সাধু সন্তগণ দৃষ্টিশক্তি যুক্ত (জ্ঞান চোখ) হন। উপরোক্ত জ্ঞান তাঁদেরই বলা। আমরা জ্ঞান নেত্রহীন (আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অন্ধ)। যদি আমরা সন্তদের কথা বিশ্বাস করে রাস্তা না বদলাই তাহলে উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে ভুগতে হবে।

**নর সে ফির পীছে তূ পশুবা কীজৈ, গাধা বৈল বনাঈ।**
**ছপ্পন ভোগ কহাঁ মন বৌরে, কুরড়ী চরণে জাঈ**

কিছু লোকে বলে যে, 'যা হবে পরে দেখা যাবে'। তাদের কাছে অনুরোধ যে, গাধার জন্ম নেওয়ার পর তখন কি দেখবে? তখন তোমাকে কুমোর দেখবে। এই প্র-

কারের প্রবচন সত্সঙ্গে শোনানো হয়।

ঐ মাতাল ব্যক্তিটিও সৎসঙ্গে গিয়ে সকলের পিছনে এসে বসে পড়ে। কারণ বাড়িতে কেউ না থাকায় তালা দেওয়া ছিল। কিছুক্ষণ পরে নেশা কমতে থাকে আর সৎসঙ্গ শুনতে লাগে। সেই দিন থেকে ঐ ব্যক্তি আর কোন ধরনের নেশা করেনি। নিজে নাম দীক্ষা নেয় এবং সমস্ত পরিবারকে নাম দীক্ষা দেওয়ায়। আমরা (লেখক এবং সঙ্গে যাওয়া কিছু ভক্ত) সকালে গ্রামের বাইরে ঘুরতে যাই রাস্তার ধারে ঐ ভক্তের (বিমানবন্দরে কর্মরত) বাড়ি ছিল। গলিতে ঐ (পূর্বের মাতাল) ব্যক্তির মাতা দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে বলে, মহারাজ জী! চা খেয়ে যাবেন।

গ্রামের ভক্তরা বলে, গুরুজী! ঐ বাড়িতে অবশ্যই চলুন, ওদের পুরো পরিবার বরবাদ হয়ে গেছে। আমরা পাঁচজন ছিলাম। উঠানে চার পায়া (দড়ি দিয়ে বোনা খাট) বিছানো ছিল। সেখানে গাছের ছায়ার নিচে বসলাম। মে, মাসের সময় ছিল। মাতা তার পুত্র বধূকে বললো, বৌমা চা বানাও। পুত্রবধূ উনুন জ্বেলে ছোট হাঁড়িতে জল দিয়ে চা বানাতে লাগে। আধা ঘন্টা পরে আমি বলি তাড়াতাড়ি চা দাও আমরা ঘুরতে যাব। অন্য গ্রামে সৎসঙ্গের জন্য যেতে হবে। হাঁড়ির নীচে আগুন জ্বলছিল। দ্বিতীয়বার চায়ের কথা বললে ঐ মহিলা কান্না শুরু করে দেয়।

গ্রামের ভক্তরা উঠে গিয়ে দেখলে জানতে পারে, দুধ, চা- পাতা, চিনি কিছুই নেই। ঐ ব্যক্তির মাও কান্না শুরু করে বলে মহারাজ! আমরা বরবাদ হয়ে গেছি, যদি বাঁচাতে পারেন তাহলে বাঁচান। সেইদিন ঐ ব্যক্তি নাম দীক্ষা নিয়ে, সময় মত নিজের ডিউটিতে চলে গেলো।

কিছুদিন পরে আমি দিল্লির পাঞ্জাবখোড় গ্রামে সৎসঙ্গ করছিলাম। তখন ঐ ব্যক্তি তার স্ত্রী, মা এবং মেয়েদের গাড়িতে বসিয়ে সৎসঙ্গে নিয়ে আসে। আগে তার কাছে একটি ভাঙ্গা মোটর সাইকেল মাত্র ছিল। এখন বাচ্চাদের সুন্দর জামা কাপড় পরানো ছিল। বাচ্চারা বললো, বাবা আর মা এখন ঝগড়া করে না। চাকরির উপার্জিত সব টাকা ঠাকুরমার কাছে দেয়। আমরা এখন স্বর্গের মত থাকতে শুরু করেছি। ঐ বৃদ্ধা বললো, ঐ দিন আপনার এমন দর্শন হলো যে আমি নরক থেকে স্বর্গে চলে এসেছি। তখন আমি বলি মাতাজী! আপনার ছেলে খারাপ ছিল না, ও এই ভাল বিচার, সৎসঙ্গ আগে কোনদিন শোনেনি। যদি কেউ এই কথা শোনাত তাহলে এই খারাপ কাজ সে করত না। এসবই পরমেশ্বর কবীর জীর কৃপা যে, ঐ দিন আপনার ছেলে সৎসঙ্গে এসে সৎসঙ্গ শোনার কারণে আত্মার ময়লা পরিষ্কার হয়ে গেয়েছিল। আর আপনার পরিবার নরক থেকে বের হয়ে এখন স্বর্গে বসবাস করছে। মর্যাদার মধ্যে থেকে যদি পরমা-ত্মার ভক্তি করেন তাহলে কোনদিন কষ্ট হবে না। ভক্তি করতে থাকবেন, তাহলে কয়েক প্রজন্ম উদ্ধার হয়ে যাবে। সৎসঙ্গে মানব উদ্ধার হবে, সমস্ত বিশ্বে শান্তি, প্রেম, অহিংসার বাতাবরন ছড়াবে। তাই সৎসঙ্গ বিচার অবশ্যই শুনবেন। পড়ুন ‘ভক্তির মর্যাদা’ বিষয়েটি এই পুস্তকের 268 নং পৃষ্ঠায়।

## “মাতা পিতার সেবা করা পরম কর্তব্য”

জগতের প্রত্যেক মাতা-পিতা তথা অভিভাবক-অভিভাবিকা হিসেবে তাদের চিরাচরিত মৌলিক চাহিদা বা ইচ্ছা থাকে যে, তাদের সন্তানরা ভালো ও সাবলম্বী হোক। সমাজের লোক যাতে খারাপ বলতে না পারে। তারা যেন সৎ চরিত্র ন্যায় পরায়ন নম্র ও ভদ্র ব্যাবহার সরল মতির হয়। অভিভাবক-অভিভাবকা হিসেবে আমাদের কথা যেনো মেনে চলে। বৃদ্ধাবস্থায় আমাদের সেবা শুশ্রুষা করবে। সংসারে

এমন বৌমা আসবে, যেনো আমাদের কথা মতো চলে। সমাজে যেন আমাদের মান-সম্মান বজায় থাকে। সমাজের সবার সাথে ভালো ব্যবহার করুক। আত্মসম্মান নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচুক। সর্বোপরি আমাদের সন্তান যেন প্রকৃত ধার্মিক প্রবৃত্তির হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, যুগ পর্যন্ত এই মর্যাদা চরম পর্যায়ে ছিল। ঐ সময়ে মানুষ খুব সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করতো। কলিযুগে কিছু সময় পর্যন্ত ঐ ভাব ধারা বজায় ছিল। কিন্তু বর্তমানে স্থিতি বিপরীত হয়ে গিয়েছে। তাই আজ এই ভয়ংকর পরিস্থিতি বদলানোর উদ্দেশ্যেই লেখক (রামপাল দাস) কলম ধরেছেন। আশা রাখি পরমেশ্বর সাথে আছেন, তাঁর কৃপাতে এই জ্ঞানের প্রকাশে সবকিছুই সম্ভব আগেও হয়েছে, এখনো হচ্ছে আর পরেও হবে- এ আমার আত্মার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস।

**⇨ সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসা :-**

এক ১০/১১ বছরের বালক ছিল। সেই সময় তার পিতা মৃত্যু প্রাপ্ত হন। মা তার একমাত্র পুত্রের লালন- পালন করে। মা তাকে পিতা ও মাতা দুই জনেরই ভালবাসা দিয়ে ছেলেকে মানুষ করে, ছেলের যাতে তার পিতার অভাব ও কষ্ট অনুভব না হয়। ছেলে যুবক হয়ে মদের নেশা ও বেশ্যা গমন শুরু করে দেয়। মায়ের কাছ থেকে প্র-তিদিন টাকা নেয় আর ফুর্তি করে উড়িয়ে দেয়। এক দিন মায়ের কাছে টাকা না থাকায় ছেলেকে টাকা দিতে পারে না। মদের নেশায় থাকা ছেলে, মাকে পেটায় আর বেশ্যার কাছে চলে যায়। ঐ দিন তার কাছে টাকা না থাকায় বেশ্যা বলে, যাও তোমার মায়ের হৃৎপিণ্ড বের করে নিয়ে এসো। ছেলে বাড়িতে আসে। মাতা অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। নেশায় মত্ত ছেলে ছুরি দিয়ে কেটে মায়ের হৃৎপিণ্ড বের করে, আবার বেশ্যার কাছে ফিরে গেলো। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ঠোকর লেগে হাত থেকে হৃৎপিণ্ড মাটিতে পড়ে যায়। মায়ের হৃৎপিণ্ড থেকে কণ্ঠ আসে পুত্র! তোর ব্যথা লাগেনি তো।

নেশায় পরিণত শয়তান, মায়ের হৃৎপিণ্ড নিয়ে বেশ্যার কাছে গেলে। বেশ্যা বলে, তুই তোর নিজের মায়ের হিতৈষী হতে পারিস নি, আমার কি করে হবি? লোকের কথা শুনে তো তুই আমাকেও মেরে ফেলবি। আমি তোকে আমার পিছন থেকে দূর করতে চেয়েছিলাম কারণ তুই নির্ধন হয়ে গিয়েছিস। তাই এখন তুই আমার কোন কাজের না। আমি তোর মায়ের হৃৎপিণ্ড নিয়ে আসার শর্ত এই কারণে রে-খেছিলাম, আমি মনে করেছিলাম তুই মায়ের হৃৎপিণ্ড কখনোই আনতে পারবি না কারণ তোর মা তোকে কোনদিন কোনো কষ্ট বা অভাব হতে দেয়নি। কোন জিনিসের জন্য কোনদিন মানা করেনি। তুই একটা শয়তান! চলে যা, চলে যা আমার চোখের সামনে থেকে। এই বলে বেশ্যা ঐ ছেলেকে ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। ঐ শয়তান ছেলেটি ঘরে ফিরে মায়ের মৃত দেহের কাছে বসে বিলাপ করতে লাগলো, হে মা! যদি সম্ভব হয় তাহলে ভগবানের দরবারে আমাকে রক্ষা করো। মায়ের আওয়াজ আসে পুত্র! তোর কিছু হবে না, আমি শুধু তোকে খুশি দেখতে চাই। নগরের লোকেরা থানায় খবর দেয় পুলিশ এসে ঐ অপরাধী ছেলেকে ধরে নিয়ে যায় এবং ফাঁসির সাজা হয়।

ফাঁসি দেওয়ার পূর্বে রাজা ঐ ছেলের অন্তিম ইচ্ছা জানতে চায়। তখন ঐ ছেলে বলে, কিছু জনগণকে ডাকুন আমি আমার কর্ম সকলের সামনে বলতে চাই। নগরের লোকের সামনে ঐ ছেলে নিজের অপরাধ শিকার করে বলে, আমি আমার মায়ের সাথে শয়তানের মত আচরণ করেছি। অন্তিম সময় পর্যন্ত আমার মা আমাকে সুখী দেখার জন্য কামনা করতে থাকে। নেশা আমাকে শয়তানে পরিণত করেছে। বেশ্যা গমন, করে মদের নেশা করে সমাজকে দূষিত করেছি। আপনারা আমার কথা ধ্যানপূর্বক

শুনুন। যে ঘোর পাপ করে আমি আমার মাকে কষ্ট দিয়ে করেছি, তা কেউ কোরো না। এই সংসারে ময়ের মত আপনজন বা হিতকাঙ্খী স্ত্রীও হতে পারে না, সে যতই ভালো হোক। মা নিজের ছেলে মেয়েকে এতটাই ভালবাসে যে, ঠাণ্ডার সময় সন্তান বিছানায় প্রসাব করলে, মা স্বয়ং ভিজে কাপড়ের ওপর শুয়ে পড়ে এবং সন্তানকে শুকনো বিছানার ওপর শোয়ায়। যদি সন্তান ক্ষুধায় কান্না করে তাহলে নিজের খাওয়ার মাঝে উঠে গিয়ে আগে সন্তানকে দুধ পান করিয়ে শান্ত করে।

## "পিতা সন্তানের প্রত্যেক অপরাধ ক্ষমা করে দেয়"

পরমাত্মা কবীর জী বলেছেন, পিতা নিজের পুত্র-পুত্রীর সর্ব অপরাধ ক্ষমা করে দেয় :-

**অবগুণ মেরে বাপ জী, বকশো গরীব নবাজ।**
**জো মৈঁ পূত-কপূত হুঁ, তো ভী পিতা কো লাজ॥**

ভাবার্থ: পরমাত্মা সকল প্রানীর পিতা। পিতার মধ্যে এক বিশেষ গুন থাকে। ছেলে-মেয়েরা অজ্ঞানতার কারণে যদি কোন ভুল করে ফেলে আর তারা পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, পিতা! আমি আর ভুল করব না। তাহলে পিতা তার সর্ব অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

এই জন্য ভক্ত আত্মা পরমাত্মার কাছে প্রার্থনা করে বলে, হে দীন দয়াল! আপনি সকলের পিতা। পিতা হিসেবে আমার সমস্ত (অবগুন) অপরাধ ক্ষমা করে দিন। আমি আপনার (কুপুত) নিষ্কর্মা পুত্র তবুও আপনি পিতার কর্তব্য পালন করে এই অপরাধিকে ক্ষমা করবেন।

রাম ভক্তের পত্নীর মৃত্যু হয়। তখন রাম ভক্তের পুত্রের বয়স তিন বছর। ঐ ব্যক্তির আত্মীয়দের মধ্যে এক ঘটনা ঘটে যায়। সেই ঘটনাই তাকে ভিতর থেকে খুব দুঃখী করেছিল।

ঘটনা এই প্রকার :- রাম ভক্তের মামা, রাম ভক্তের মায়ের থেকে ১০ বছর বড় ছিল। মামার দুই ছেলে। রাম ভক্তের মামীর অকাল মৃত্যুর পরে মামা দ্বিতীয় বিবাহ করে। দ্বিতীয় পত্নীরও এক সন্তান হয়। দ্বিতীয় পত্নী প্রথম পুত্রদের ঈর্ষা করতে লাগে। মামী চিন্তা করে ১৫ একর জমির তিন ভাগ হবে! তাই প্রথম পক্ষের বাচ্চাদের মারার জন্য দুধের মধ্যে ও খাবারের মধ্যে কাঁচ গুঁড়ো করে মিশিয়ে খাইয়ে দেয় এবং আস্তে আস্তে তারা মারা যায়। ডাক্তার বলে এরা কাঁচ খেয়েছে, তাই এদের মৃত্যু হয়েছে। একদিন রাম ভক্তের মামী প্রতিবেশীর কাছে সকল ঘটনা বলে যে, আমি বাচ্চাদের কাঁচ খাইয়ে মেরেছি। আমার ছেলে এখন ১৫ একর জমির মালিক হবে। এই কথা ঐ স্ত্রী আমার মামাকে জানায়। মামা ছোট মামীকে খুব ভালোবাসত এবং বিশ্বাসও করত। মামা ঐ স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করেনি। একদিন ছোট মামী নিজের ভাইয়ের সাথে কথায় কথায় বলে দেয় যে, আমি এই ভাবে ওদের দুই ভাইকে মেরেছি। তোর ভাগ্নে এখন ১৫ একর জমির মালিক হবে। ঐ কথা রাম ভক্তের মামাও শুনছিল। কারণ সে স্বাভাবিক ভাবেই বাইরে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। মামীর ভাই বলে বোন! তুই ঘোর অন্যায় করেছিস। এই পাপ কোথায় রাখবি? আমি আর তোর মুখ দেখতেও আসব না। এই কথা শুনে মামা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। মামা নিজের বাড়ি ছেড়ে বোনের বাড়ি অর্থাৎ আমার (রামভক্তের) কাছে চলে আসে। কয়েক বছর পরে ছোট মামীর ছেলে মারা যায়। পরে ছোট মামী অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে চলে যায়। তারপর একদিন জানা যায় ঐ ব্যক্তি মামীর সমস্ত গহনা (অলংকার) নিয়ে তাকে হত্যা করে কুঁয়োর মধ্যে

ফেলে দিয়েছিল। পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে জেলে পুরে দেয় এবং ফাঁসীর সাজা হয়। এই সর্বনাশা মহাভারতকে মনে করে রামভক্ত দ্বিতীয় বিবাহ করলো। রামভক্ত ছেলেকে নিজের সঙ্গেই রাখত। হাল চাষের সময় ছেলেকে কাঁধে বসিয়ে হাল চাষ করত। বেশি পরিশ্রম হয়ে গেলে গাছের নীচে শুইয়ে দিত। নিজে রান্না করে খেত, ছেলেকে স্নান করানো, জামাকাপড় ধোয়া সব নিজে করত। ছেলে যুবক হলে, ছেলের বিবাহ দেয়। তখনও নিজেই সব কাজ করতো। পরে ছেলেও বাবার কাজে সাহায্য করতে শুরু করে। কিন্তু কঠিন কাজ ছেলে নিজেই করত। রামভক্ত এখন বৃদ্ধ, তাই কাজকর্ম করতে পারে না। পুত্রবধূ রামভক্তকে অতিরিক্ত খরচের বোঝা মনে করতে লাগে। তাই শ্বশুরকে শুকনো রুটি বাসি খাবার দিত। তাও পেট ভরার মত দিত না। ছেলে জিজ্ঞাসা করে বাবা! সেবা ঠিকমত হচ্ছে তো? পিতা বলে হ্যাঁ, সেবায় কোনো ত্রুটি নেই। আমি খুব ভাগ্যবান যে, এমন বৌমা পেয়েছি। আমার খুব সেবা যত্ন করে। এই কথা বৌমাও শুনতে পায়। আর বৃদ্ধকে অধিক কষ্ট দিতে থাকে। সে চিন্তা করে আমার স্বামীও জানতে পারবেনা আর বৃদ্ধ আমার চালাকি বুঝতে পারবে না। একদিন ছেলে দেখে ফেলে পিতাকে ঠিকমত খাবার দেওয়া হচ্ছেনা। এই কথা পত্নীকে বলতে পত্নী চালাকি করে স্বামীকে বোঝায় যে, ঘরের অবস্থা দেখে সবাইকে খেতে দিতে হয়। তোমার তো ঘরের প্রতি কোনো চিন্তা নেই। ঘর কিভাবে চালাতে হয় তা আমিই একমাত্র জানি। সব তো আমাকেই দেখতে হয়! বৃদ্ধ হঠাৎ একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে তার পা ভেঙে যায়। বৈদ্য দেখে বলে খুব দুর্বল, খাবার ঠিকমত পাচ্ছে না। দুই বেলা আধ লিটার করে দুধ দিও। গরম গরম খাবার খাওয়াবে। বাসি খাবার দেবে না। এই বলে ডাক্তার চলে যায়। পত্নী বলে, এবার সংসার দেউলিয়া হয়ে যাবে অর্থাৎ খুব শোচনীয় অবস্থা হবে। এ কথায় ছেলে ও সহমত পোষণ করে। বৃদ্ধের প্রতি কোন চিন্তা তাদের নেই। বৃদ্ধের শ্বশুর বাড়ির লোকেরা পা ভাঙার কথা শুনে দেখতে আসে। তারা জিজ্ঞাসা করে বৌমা ঠিকমতো দেখাশুনা করে কি না? রামভক্ত বলে, কি যে বলো, ভগবান যেন এমন ভাগ্যবান পুত্রবধূ সবাইকে দেয়। আমার কোন কষ্ট হতে দেয় না। আমার কর্ম ভালো না তাই পা ভেঙেছে। রামভক্তের বৌমার বোনেরও ঐ গ্রামেই বিবাহ হয়েছে। যখন রাম ভক্তের আত্মীয়রা ঐ বাড়িতে যায় তখন জানতে পারে রামভক্তের কোন সেবাযত্ন করে না। দুই জনেই নিষ্কর্মা। এই কথা রামভক্তের আত্মীয়দের বিশ্বাস হয় না। কারণ রামভক্ত নিজে বলেছে, খুব ভালো সেবা যত্ন করে, সেবায় কোন ত্রুটি রাখে না। কয়েকদিন পরে তারা আবার রামভক্তের বাড়িতে এসে দেখে সে বাসি রুটি জলে ভিজিয়ে খাচ্ছে। এই সব দেখে রামভক্তের আত্মীয়দের চোখে জল চলে আসে। ছেলেকে ডেকে বলে, তোর লজ্জা করেনা! বাবা তোকে কি ভাবে মানুষ করেছে তা ভুলে গেছিস। এই কথা শুনে বৌমাও চলে আসে। দুজনে বলে আমরা এর থেকে ভালো সেবা যত্ন করতে পারব না। রামভক্ত বলে তোমরা যাও, বাড়িতে ঝগড়া করিও না। আমার কপালে যা লেখা আছে তাই পাচ্ছি, আমি আমার ছেলের দুঃখী দেখতে পারব না। রাম ভক্তের পিসির ছেলে রমনিবাস সত্সঙ্গী ছিল। সে রামভক্তকে বহুবার বলেছে যে, একটু ভগবানের ভক্তি করো। আমার সঙ্গে সন্তের সৎসঙ্গ শুনতে চলো। কিন্তু রামভক্ত বলতো, আমি তো আমার ছেলের পূজা করবো, ছেলে সুখী থাকুক এটাই আমার ইচ্ছা। পিসির ছেলে বলে, ছেলের পূজা অনেক করেছ, পুজো শেষ হয়ে গেলে, মৃত্যুর পূর্বে দুই-চারদিন নিজের কিছু কর্ম বানিয়ে নাও। রামভক্ত তখনও বলে ছেলে বৌমার মুখের দিকে তাকিয়ে বেঁচে আছি। অনেকবার বোঝানোর পরে রামভক্ত পিসির ছেলে রামনিবাসের সঙ্গে সৎসঙ্গ শুনতে যায়। রাম ভক্তকে কয়েক

মাস নিজের কাছে রেখে চিকিৎসা করায়। রামভক্ত ভক্তিতে দৃঢ় হয়ে যায়। একদিন বাড়ি গিয়ে ছেলে ও বৌমাকে বলে, আমি আজ পর্যন্ত তোমাদের কাছে কিছুই চাইনি। আজ এক ভিক্ষা চাইছি। তোমরা একবার আমার সঙ্গে সৎসঙ্গে চলো! বৌমা বলে, তবে গরু আছে, বাচ্চা আছে ওদের কে দেখবে? রাম ভক্ত বলে, ছেলে বাড়িতে থাকবে বাকী সবাই আমার সঙ্গে চলো। তেমনটাই করলো। বৌমা আর নাতি-নাতনি নিয়ে রামভক্ত সৎসঙ্গে যায়। রামভক্তের পুত্র বধূ সৎসঙ্গের বচন শুনলো, সৎসঙ্গে আসা লোকজনকে এবং পুরানো ভক্ত ও ভক্তিমতিরা এমন ভাবে সেবা, আদর-যত্ন করছে, যেন নিজের বাড়িতে কোন আত্মীয় এসেছে। বৃদ্ধ, রোগী, বিকালঙ্গ শ্রদ্ধালুদের বিশেষ সেবা করছিল। সত্সঙ্গে বলা হয় যে, জীবের প্রতি দয়া ভাব রাখলে পরমাত্মা প্রসন্ন হন। দুঃখী ও অসহায়কে সাহায্য করা মানবের পরম কর্তব্য।

**দয়া-ধর্ম কা মূল হৈ, পাপ মূল অভিমান।**
**কহ কবীর দয়াবান কে পাস রহে ভগবান ॥**

**শব্দার্থ:-** যাদের হৃদয়ে দয়া ভাব আছে, তারাই ধর্মের কাজ করে। দয়া হলো ধর্মের মূল। আর যাদের মধ্যে অভিমান ভরা তারাই পাপ করে। অভিমান পাপের মূল কারণ। তাই কবীর পরমাত্মা বলেছেন, দয়ালু ব্যক্তিদের সাথে পরমাত্মা থাকে। অভিমানী ব্যক্তিদের সঙ্গে পরমাত্মা থাকে না।

ভক্ত রামভক্তের পুত্রবধূ সৎসঙ্গে যে ভক্তিমতির কাছে বসে ছিল, সে বললো বোন! তুমিও একটু সেবা করো।

**"সৎসঙ্গ বচন":-** সদগুরুদেব বলেন, যে সেবা-ভক্তি করবে, ফলও সেই পাবে। আমি যদি ভাত খাই তাহলে আমার পেট ভরবে। আর তুমি খেলে তোমার পেট ভরবে। সকল প্রাণী পরমাত্মার সন্তান। তাই সকলকে এক ধনীর সন্তান মনে করে সেবা করো। যেমন এক ধনী ব্যক্তি তার ৮/৯ বছরের মেয়ে ছিল। তার দেখাশোনার জন্য একজন চাকরাণী রাখে। মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যেত ও নিয়ে আসতো। স্কুলে যাতায়াতের সময় স্বয়ং রৌদ্র সহ্য করে বাচ্চার মাথার উপর ছাতার ছায়া দিয়ে নিয়ে যেত এবং নিয়ে আসত। যাতে ধনী ব্যক্তি খুশি হয় আর চাকরানীকে বেতন দিতে থাকে। এই রূপ বিচার করেই আপন-পর সকলের সেবা করতে হবে। শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করা, ছোট-বড়োদের সেবা করা, সবাইকে সম্মান করা, এইসব আমাদের পরম কর্তব্য। যদি নিজের, শ্বশুর-শাশুড়ি, মাতা-পিতা বা অন্য আশ্রিতদের সেবা করো, তাহলে পরমাত্মাও তোমার সেবার ব্যবস্থা করবে। বাচ্চা-বড় সকলকে সঙ্গে করে সতসঙ্গে নিয়ে আসবে। তাহলে বাচ্চাদের মধ্যেও ছোটো-বড় সকলের সেবা করার ও ভালো ব্যবহার করার সংস্কার পাবে। তারপর ঐ বাচ্চা বড়ো হয়ে তোমাদেরও (যখন বৃদ্ধ হয়ে যাবে) সেবা করবে, যেমন তোমরা আজ সেবা করছো। মেয়েরা নিজের মাতা-পিতাকে ছেড়ে নতুন মাতা-পিতার, (শ্বশুর-শাশুড়ির) কাছে যায়। জন্ম দাতা মাতা-পিতা মেয়েকে লালন পালন করে নতুন মাতা-পিতার হতে তুলে দেয়। শাশুড়ির কর্তব্য ঐ মেয়েকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসা দেওয়া। নিজের মেয়ে ও বৌমার মধ্যে ভেদা-ভেদ না করে, তাকে নিজের মেয়ের মতো আদর-যত্ন দেওয়া। পুত্রবধূরও উচিত নতুন বাড়িতে পরিস্থিতি অনুযায়ী চলা। বাপের বাড়ির মত আচরনগুলি কম প্রয়োগ করা। কারণ এখন এই শ্বশুর বাড়িই পুত্রবধূর নিজের ঘর-পরিবার।

**শিক্ষা:-** এক পুত্রবধূ নিজের শ্বাশুড়িকে খুব দুঃখ দিত। যেমন কুকুরকে খাবার দেয় তেমনই মাটির ভাঙ্গা বাসনে খাবার খেতে দিত। মাঝে মধ্যে পরিষ্কার করত। ঐ পুত্রবধূ ছেলের বিবাহ দেয়। নাতির বিবাহের কিছুদিন পরে বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। তখন

শাশুড়ি নিজের পুত্র বধূকে বলে, বৌমা ঐ মাটির ভাঙা বাসনকে ভেঙে ফেলে দাও। পুত্র বধূ বলে, শাশুড়ি মা! আমিও আপনাকে এই মাটির বাসনে খেতে দেব তাই যত্ন করে রেখে দিয়েছি। আপনি বৃদ্ধার সহিত অমানবিক অত্যাচার করেছেন। তখন ঐ স্ত্রী নিজের ভুল বুঝতে পেরে খুব কাঁদে। তবে তার পুত্র বধূ বুদ্ধিমতী ছিল। সন্ধ্যে পর্যন্ত মাটির ভাঙা বসনটিকে ফেললো না। শাশুড়ি ঐ ভাঙা বাসনটিকে তার নিজের শত্রু মনে করতে লাগলো। কয়েক দিন পরে পুত্রবধূ বলে, মাতাজী! আমি সত্সঙ্গ শুনেছি। আমি আমার কর্ম খারাপ করব না। এই বলে ঐ ভাঙা বাসন বাইরে ফেলে দেয়। পাপ কর্মের কারণে শাশুড়ির ক্যান্সার হয়। সারা দিন কষ্টে চেঁচাতে থাকে। পুত্র বধূ সেবার ত্রুটি রাখেনি। পুত্র বধূ বলে শাশুড়ি মা সেবা যত্ন তো আমি মন-প্রাণ দিয়ে করব কিন্তু আমি তোমার পাপের ফলের ভাগ নিতে পারব না। তাই দুঃখ কষ্টের ভোগ তোমাকেই করতে হবে। যদি সতসঙ্গ শুনতে আর ভাল ভাবে চলতে তাহলে তোমার এই অসুখ হতো না। আর এই কষ্টও ভোগ করতে হত না। তখন ঐ নিষ্ঠুর স্ত্রী বলে, বৌমা আমি মহাপাপীনী। আমি কি উদ্ধার হতে পারব বৌমা? আমি দীক্ষা নিতে চাই। পুত্র বধূ সত-সঙ্গী ঘরের মেয়ে ছিল। বৌমা জানত সদগুরুর থেকে দীক্ষা নিয়ে ভক্তি করলে সব পাপ নষ্ট হয়ে যায়। ভয়ঙ্কর পাপী হলেও ভক্তি শুরু করলে লাভ হয় ভক্তিতে পাপ কম হতে থাকে এবং পরবর্তী জন্ম মানব কূলে হয়। মর্যাদায় থেকে আজীবন ভক্তি করলে মুক্তি প্রাপ্ত করা যায়। সত্সঙ্গে গুরুদেব জী উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন, যদি কাপড় কম ময়লা হয়, তাহলে অল্প সাবান লাগালে পরিষ্কার হয়ে যায়। যদি অধিক ময়লা হয়, তাহলে দুই/তিনবার সাবান লাগানোর পরে পরিষ্কার হয়। যে অধিক নোংরা করে রেখেছে বা কোনো খারাপ দাগ লাগিয়ে দিয়েছে তাকে ড্রাই ক্লিনে পরিষ্কার করতে হয়। যদি পরিষ্কার করার দৃঢ় ইচ্ছা হয়, তাহলে যতই ময়লা হোক, এমনকি গাড়ির মিস্ত্রী-দের কাপড়ও পরিষ্কার হয়ে যায়। পুত্র বধূ জানত আমার শাশুড়ির অবস্থা ঐ মিস্ত্রীদের কাপড়ের মত ময়লা। পুত্রবধূ শাশুড়িকে সতগুরুদেবের কাছে থেকে নাম উপদেশ দেওয়ায়। নাম-দীক্ষা নেওয়ার কিছু সময় পর ক্যান্সারের ব্যথা-যন্ত্রণা একটু কমে যায়। সদগুরুদেবের সত্সঙ্গ শুনে অঝোরে কাঁদতে থাকে। আর বলে ছেলে-মেয়ে, বৌমার কাছে তাদের মাতা-পিতারা কি আশা করে? আর আমি আমার শাশুড়ির সাথে কি অমানবিক ব্যবহার করেছি। আমি মহা পাপীনী। আমার এই অসুখ হওয়াই উচিত। এই জ্ঞান যদি আগে শুনতাম তাহলে আমি এই ঘোর পাপ করতাম না। নির্মল জীবন-যাপন করতাম। শাশুড়িমাও খুশি হতো। আর আমার জীবন সফল হয়ে যেত। উপরোক্ত কথা শুনে রাম ভক্তের পুত্রবধূ ঐ মহিলাকে (পুরনো ভক্তিমতি) জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে। আধ ঘন্টা পর্যন্ত কান্না থামলো না। অনেক্ষন কাঁদার পর কান্না থামলে, শ্ব-শুরের সাথে যে অমানুষের মত ব্যবহার করেছে সেই বৃত্তান্ত শোনাতে শুরু করে। সে বলে, আমার শ্বশুর খুব ভালো। আমি যে অত্যাচার করি সেই কথা নিজের ছেলেকেও বলে না সব সহ্য করে নেয়, ছেলে জিজ্ঞাসা করলে বলে, বৌমা আমাকে খুব যত্ন করে, খুব ভালো ঘরের মেয়ে ও খুব বুদ্ধিমান, আমার সৌভাগ্য যে এমন বৌমা আমার বাড়িতে এসেছে। সংসার খুব ভালো ভাবে গুছিয়ে রেখেছে। কিন্তু আমি পাপী যে, এই কথাগুলি শুনেও আমার মনে কোন পরিবর্তন বা দয়া ভাব আসেনি, কারণ আমার আত্মার উপর পাপ কর্মের পর্দা দেওয়া ছিল। দুই-তিন বার সত্সঙ্গ শোনার পরে সব ময়লা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এখন আমি আমার ভুল বুঝতে পারছি। তিন দিনের সতসঙ্গ শেষে রামভক্ত নাতি-নাতনি ও বৌমাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। সত্সঙ্গে ছোট-ছোট সতসঙ্গী বাচ্চাকে জল দেওয়া, খাবার দেওয়া ইত্যাদি সেবা করতে দেখে

রামভক্তের নাতি-নাতনিও সেখানে সেবা করে। আর বাড়ি এসে দুই ভাই-বোন মিলে ঠাকুরদার জন্য জলের বালতি ভরে এনে দিলো। বললো, ঠাকুরদা! স্নান করে নাও। রামভক্ত বলে, এতো ভারি বালতি উঠালে তোমাদের পেটে ব্যথা হবে। আমি নিজে জল ভরে নেব। বাচ্চারা বলে ঠাকুরদা! সতসঙ্গে গুরুজী বলেছেন সেবা করলে লাভ পাওয়া যায়, কোন কষ্ট দুঃখ হয় না, আমি খাবার খেলে আমার পেট ভরবে। তাই আমি যদি সেবা করি তাহলে আমি পুণ্য পাব। যদি কোনো অসুখ হয় তাও সেবা আর ভক্তির দ্বারা ঠিক হয়ে যায়। আশ্রমের বন্ধু ভক্তরা বলেছিল, আমি খুব রোগে ভুগতাম। নাম দীক্ষা নেওয়ার পরে ভক্তি আর সেবা করতে থাকি। সব অসুখ ঠিক হয়ে গেছে। এখন আমি সুস্থ। চার বছর পর্যন্ত ডাক্তার চিকিৎসা করে। ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছিল। এই দেখো আমাদের ওষুধের কাগজ। এখন আমরা কোন ঔষুধ খাইনা। (ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সুক্ত ১৬১ মন্ত্র ২-এ প্রমাণ আছে যদি রুগী মৃত্যুর নিকটেও পৌঁছে যায় অর্থাৎ অসাধ্য রোগ ও হয়, তখনো যদি ঐ ব্যক্তি সদভক্তি করতে লাগে তাহলে পরমাত্মা ঐ ভক্তকে মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরিয়ে এনে সুস্থ শরীর দেয় এবং আয়ু বাড়িয়ে দেয়। -লেখক রামপাল দাস।)

এরই মধ্যে পুত্র বধূ চলে আসে আর বলে পিতা! স্নান করে ধূতি এখানে রেখে দিও। আমি পরিষ্কার করে দেব। রাম ভক্ত বলে বৌমা! তুমি ঘরের কত কাজ করো। খাবার বানাও, গরুদের জল খাওয়াও, ছেলে-মেয়ের দেখাশোনা করো পশুদের দেখাশোনা করা তোমার অনেক কাজ। আমি আমার কাপড় নিজে ধুয়ে নেব। আমার পা এখন ঠিক হয়ে গেছে, সামান্য একটু খুঁড়িয়ে হাঁটি। রামভক্ত স্নান করে ধুতি পরিষ্কার করতে লাগে, তখন নাতি-নাতনী এসে ধুতি কেড়ে নিয়ে মাকে দিয়ে দেয়। পরার জন্য অন্য পরিষ্কার ধূতি পাঞ্জাবী এনে দেয়। ছেলে মাঠের থেকে গরু মহিষের জন্য ঘাস নিয়ে আসে। আর আগের মতো পিতার দিকে তাকিয়ে দেখে কিন্তু কোন কথা না বলে অন্য ঘরে চলে যায়। সে দেখলো পত্নী নির্মলা হালুয়া রান্না করছিল। ছেলে চিন্তা করে আজ হয়তো কোন উৎসবের দিন। নির্মলা তরকারী-ভাত রান্না করে, সর্ব প্রথম গুরু ভগবানকে দুটি বাটিতে ভোগ লাগায়। পরে একটি থালাতে ভাত, বাটিতে হালুয়া ও তরকারী দিয়ে শ্বশুরকে বললো, বাবা! ভোজন খেয়ে নিন। অনেক দূর থেকে এসেন, ক্ষুধা লেগেছে। রামভক্ত বলে বৌমা! এই সব খাবার আমার হজম হয় না। আমাকে শুকানো রুটি দিয়ে দাও। রামভক্ত চিন্তা করতে লাগে, ভগবানের কথায় বৌমা আজ ভালো খাবার দিচ্ছে। কিন্তু ছেলে বৌমাকে ধমকাবে। কারণ ছেলের সৎসঙ্গের জ্ঞান হয়নি, তাই বাড়িতে ঝগড়া না লাগিয়ে দেয়। ছেলে পিতার কথা শুনে পত্নীকে বলে, পিতা ঠিক বলছে, খাবারটা নিয়ে ভিতরে চল। পিতার কামরা গলির দিকে ছিল এবং ছেলে ও বউমা ভিতরের ঘরে থাকত। বৌমা বলে, তুমি চুপ করে থাকো! আমি অনেক পাপ জড়ো করে নিয়েছি। এখন পিতার সেবা আমি নিজে করব। রামভক্তের ছেলে চুপচাপ ঘরে চলে যায়। রামভক্ত নিজের পাত থেকে দুই নাতি-নাতনীর হাতে হালুয়া দিল। পুত্রবধূকে দিতে গেলে সে বললো, আপনি কি খাবেন? ঘরে আর অনেক হালুয়া প্রসাদ আছে। পিতা, আপনি খেয়েনিন। আপনি না খেলে আমার মন কষ্ট পাবে। গুরুদেব ভগবানের স্মরণ করে রামভক্ত ভোজন করে নেয়। ভক্তিমতি নির্মলা (পু-ত্রবধূ) প্রতিদিন নরম নরম ও গরম রুটি-ভাত, তরকারী রান্না করে শ্বশুরকে নিজের হাতে খাওয়ায় এবং প্রতিদিন জামা- কাপড় পরিষ্কার করে দেয় আর বলে পিতা! ভজন করে নিন।

একদিন রামভক্তের পিসির ছেলে ভক্ত রামনিবাস তাদের বাড়ি বেড়াতে আসে।

রামভক্ত ওকে বুকে টেনে নিয়ে বলে ভাই! তোর কৃপায় আমার ঘর আজ স্বর্গে হয়ে গিয়েছে। রামনিবাস বলে, মামা! আমার জন্য কিছু হয়নি, যা কিছু হয়েছে সব গুরুদেবের শব্দ শক্তির চমৎকার। তুমি আর আমি তো অনেক আগে থেকেই একসাথে আছি। যদি আমার কথায় কিছু হত তাহলে অনেক আগেই হয়ে যেত। তোমার এতো কষ্ট কেন হতো। গুরুজী বলেছেন, রামভক্ত পূর্ব জন্মে ভক্ত ছিল। সংসারের মোহ থাকার কারণে মর্যাদাহীন হয়ে গিয়েছিল। এই জন্য ওকে এত দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে। সে মহাদুঃখী ছিল তাই এখানে এসেছে। তা নাহলে এখানে আসত না। তুমি আগেও তো অনেকবার সতসঙ্গে আসার কথা বলেছো, কিন্তু সে শোনেনি। এই কষ্ট আর পুত্র বধূর ব্যবহার রাম ভক্তের জন্য আশীর্বাদ হয়েছে।

কবীরজী বলেছেন:-

**কবীর, সুখ কে মাথে পাথঁর পড়ো, জো নাম হৃদয় সে জায়।**
**বলিহারী বা দুঃখ কে, জো পল-পল রাম রটায়॥**

**ভাবার্থ:-** হে পরমাত্মা! এমন সুখ দিও না যাতে তোমার নাম ভুলে যাই। যে দুঃখে পরমাত্মার কথা ক্ষণে-ক্ষণে মনে থাকে বা স্মরণ করতে পারি সেই দুঃখ দিও। বলিহারি ঐ দুঃখকে (ধন্যবাদ) যে দুঃখের কারণে পরমাত্মার শরণে এসেছি।

ভক্ত রামনিবাসকে তার মামা রামভক্ত বলে, কৃপা করে এবার আমার ছেলে প্রেম সিং কেও সঙ্গে নিয়ে যাও। পরের সতসঙ্গ একমাস পরে ছিল। ভক্ত রাম নিবাস, প্রেম সিংকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার বাহানা করে বাড়ি থেকে সতসঙ্গে নিয়ে যায়। তিনদিন ধরে সত্সঙ্গ শোনে আর পুরানো ভক্তদের সাথে ধর্মকথায় সৎসঙ্গের রঙে রাঙিয়ে যায় এবং নাম উপদেশ নিয়ে বাড়ি ফেরে। ভক্ত রামভক্তের পরিবার একদম বদলে যায়। আর ভক্তি সেবা করে নিজেদের কল্যাণ করায়।

## "সতসঙ্গে ঘরের কলহ সমাপ্ত হয়"

এক মাতাজী নিজের পুত্রবধূর ওপর সব সময় প্রত্যেকটি কথায় রেগে যেত। ছোট খাটো ভুল করলে সেগুলি ছেলের কাছে বাড়িয়ে বলতো! ছেলেও তার স্ত্রীকে ধমক দিত। এইভাবে ঘর যেন নরকের সমান হয়ে গিয়েছিল। পুত্রবধূ শাশুড়ি মা কে মাঝে মাঝে বলত, "মা! আপনি সৎসঙ্গে চলুন। পাশের বাড়ির প্রতিবেশিনীও যায়।" শাশুড়ি মা বলতেন, "যা-তা মহিলা অর্থাৎ চরিত্রহীন মহিলারা, যাদের সমাজে কোন মান সম্মান নেই, যারা ভালো বংশের নয়, তারা যায় সৎসঙ্গে। আমরা ভদ্র পরিবারের সন্তান, আমাদের সৎসঙ্গে কি কাজ?" এমনি ভাবে পুত্রবধূ কয়েকবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু মাতাজী মানতে নারাজ। একদিন কোন কারণবশতঃ গ্রামের কয়েকজন মহিলা তাদের বাড়িতে এসেছিল, তখন শাশুড়ি তার পুত্রবধূকে গালাগালি দিচ্ছিলেন, ধমক দিয়ে বলছিলেন, "আসতে দে তোর স্বামীকে, তাকে দিয়ে আজ তোর গায়ের চামড়া ছাড়াবো।" কারণ কি ছিল, পুত্রবধূ শাশুড়ি মায়ের জন্য চা বানিয়ে গ্লাসে ঢেলে রাখছিল, ঐ সময় ঘরের ভিতরে বাচ্চা ঘুম থেকে উঠে কাঁদতে শুরু করেছিল এবং বাচ্চাকে আনার জন্য পুত্রবধূ ঘরে গিয়েছিল। ইতি মধ্যে কুকুর এসে চায়ের গ্লাস জিভ দিয়ে চাটতে লাগলো, গ্লাসটি প'ড়ে গিয়ে মাটিতে চা ছড়িয়ে পড়ল। শাশুড়ি মা উঠানে ঐ গ্লাস থেকে মাত্র কুড়ি ফুট দূরে খাটের উপর বসে ছিল। শাশুড়ি মার মোটা তাজা শরীর ছিল। মাঠে ঘুরতে বেড়িয়ে বাড়ি আসতো, কিন্তু একটা কাজেও হাত দিত না। এই নিয়ে ঝগড়া করছিল। গ্রামের অন্য পাড়া থেকে আসা মহিলা সৎসঙ্গে যেতেন। সব কথা শুনে তিনি ভতেরী (ঐ শাশুড়ির নাম ভতেরী) কে বললেন, "আপনি সৎসঙ্গে

চলুন।" তখনও একই উত্তর দিল। সৎসঙ্গে যাওয়া ঐ ভক্তিমতি সৎসঙ্গে শোনা কথা অনেকক্ষণ ধরে শোনালেন কিন্তু ভতেরী মানতে রাজী হলেন না। ঘটনাক্রমে ভতেরীর অন্য বোনের বিয়ে ঐ গ্রামের অন্য পাড়াতে হয়েছিল, যে পাড়ায় ঐ সৎসঙ্গী মাতাজী জানকী বাস করতেন। ভতেরীর বোনের নাম ছিল দয়াকৌর। জানকী গিয়ে দয়াকৌর কে বললেন, "তোর বোন ভতেরী তো ঘরকে নরক বানিয়ে রেখেছে। অকারণে ঝগড়া করছে। আমি কোনও কারণবশতঃ তাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। একটা চায়ের গ্লাস কুকুরে ফেলে দেওয়া নিয়ে মহাভারত তৈরি করল। জানকীর বলাতে দয়াকৌরও সৎসঙ্গ শুনতে গিয়েছিল এবং দীক্ষা নিয়েছিল। জানকী বললেন, "যেমন করেই হোক ওকে একবার সৎসঙ্গে নিয়ে চল। যতক্ষণ পর্যন্ত সাধু-সন্তের বিচারধারা না শুনবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি ব্যর্থ চিন্তা (টেনশন) নিজেও করবে এবং ঘরের সদস্যদেরও চিন্তার মধ্যে রেখে দিবে।" দয়াকৌর পরের দিন তার বোনের বাড়ি গেলেন। কোন এক উপলক্ষে (বাহানা)-কে কেন্দ্র ক'রে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। ওখানে অন্য কয়েকজন মহিলা সতসঙ্গে যাওয়ার জন্যে জানকীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দয়াকৌর কে সৎসঙ্গে যেতে বলার জন্য তারা সকলে তার বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে তার বোন ভতেরীকে দেখে তাকেও সৎসঙ্গে যাওয়ার জন্য বললেন এবং ভতেরীও সতসঙ্গে যাওয়ার জন্য রাজী হলেন। ভতেরী জীবনে প্রথম সৎসঙ্গ শুনলেন। আশ্রমে স্ত্রী-পুরুষ কেমন ভাবে থাকে, তা চাক্ষুষ দেখে তার খুব ভালো লাগল। যেসব আজেবাজে কথা শুনতেন, আশ্রমে সে-রকম কিছুই দেখতে পেলেন না। সৎসঙ্গে বলা হল যে, কিছু ব্যক্তি নিজের বোন, বৌ-বেটির তথা অন্য মহিলাগণকে সৎসঙ্গে পাঠায় না এবং নিজেও যায় না। তারা বলেন যে, সৎসঙ্গে গেলে তাদের ঘরের ইজ্জত নষ্ট হয়ে যাবে, তাদের বৌ-বেটি বদনাম হয়ে যাবে। তাদের বিচার করা উচিত, সৎসঙ্গে না গেলে পরমাত্মার বিধান সম্পর্কে জ্ঞান হয় না। ভক্তি না করা স্ত্রী-পুরুষ আগামী জন্মে মহা কষ্ট ভোগ করে।

সূক্ষ্ম বেদে বলা হয়েছে, মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত ক'রে, যে ভক্তি করে না, তার কি ক্ষতি হয়?

**কবীর, হরি কে নাম বিনা, নারী কুতিয়া হোয়।**
**গলী-গলী ভৌকত ফিরৈ, টুক না ডালৈ কোয়॥**

সন্ত গরীব দাস জীর বাণী থেকে :-

**বীবী পড়দৈ রহে থী, ডয়োড়ী লগতী বাহর। অব গাত উধাড়ৈ ফিরতী হৈঁ, বন কুতিয়া বাজার॥**
**বে পড়দে কী সুন্দরী, সুনোঁ সন্দেশ মোর। গাত উধাড়ৈ ফিরতী হৈ করেঁ সরাযোঁ শোর॥**
**নকবেসরনকপরবনি, পহরেথীহারহমেল। সুন্দরীসেকুতিয়াবনী, সুনসাহেব(প্রভু)কেখেল॥**

**ভাবার্থ** :- মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত প্রাণী যদি ভক্তি না করে, তবে সে মৃত্যুর পর পশুপাখি ইত্যাদি যোনী প্রাপ্ত করে, পরমাত্মার নাম জপ ছাড়া নারী পরের জন্মে কুকুরের জীবন প্রাপ্ত করে। তারপর নি:বস্ত্র হ'য়ে উলঙ্গ শরীরে গলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়ায়, ক্ষুধাতে বেহাল অবস্থা হয়, তাকে কেউ রুটির এক টুকরোও দেয় না। যে সময় ঐ আত্মা নারীরূপে কোনও রাজা, রানা অথবা উচ্চ আধিকারিক এর স্ত্রী হয়েছিলেন, সেটা তার পূর্ব জন্মের পুণ্যের ফল ছিল যা কখনো কোন এক জন্মে ভক্তিধর্ম করেছিলেন। সেই সব ভক্তি, সব পুণ্য স্ত্রী রূপে প্রাপ্ত করে, সেই আত্মা উঁচু ঘরের বৌ-বেটি রূপে জন্ম নিয়ে পর্দার ভিতরে থাকতেন, কাজু-কিসমিস দিয়ে হালুয়া খেতেন। তাদের ফেলে রাখা এঁটো ঝিয়েরা খেতো। তাদের সৎসঙ্গে যেতে দেওয়া হত না কারণ তারা উঁচু ঘরের বৌ-বেটি ছিলেন। ঘরের বাইরে যাওয়াকে তাঁরা অসম্মান

মনে করতেন। এতেই বড় ঘরের ইজ্জত ব'লে মনে করা হত, ঘরে পর্দার আড়ালে বৌ-বেটিদের থাকা উচিত। এই সব কুসংস্কারের কারণে, সেই সব পুণ্যাত্মা নারীগণ সৎসঙ্গ-র বিচার না শোনার ফলে ভক্তি থেকে বঞ্চিত রয়ে যেত। এই মানব শরীরে সেই স্ত্রী, গলায় ন লাখ টাকার বহুমূল্য হার পরতেন, নাকে সোনার নোলক পরতেন। এইভাবে সোনার গহনার-সাজগোজেই জীবন ধন্য ব'লে মনে করতেন। ভক্তি না করার ফলে এবার কুকুরের জীবন প্রাপ্ত ক'রে উলঙ্গ শরীরে গলিতে গলিতে এক এক টুকরো রুটির জন্য লালায়িত হয়ে থাকে। আগে শহরের মধ্যে সরাই (ধর্মশালা) থাকত। যাত্রীরা রাত্রিবেলা সেখানে থাকত, সকালে ভোজন করে প্রস্থান করত। সেই পর্দার আড়ালে থাকা সুন্দরী নারী কুকুর হয়ে ধর্মশালায় থাকা যাত্রীদের দেওয়া এক টুকরো খাবার খাওয়ার জন্য ধর্মশালায় ঘেউ ঘেউ ক'রে বেড়াত। রুটির টুকরো ভূমির উপর দেওয়া হলে, তার সাথে কিছু বালি মাটিও লেগে যায়, সেই সুন্দরী রমণী যে কাজু কিসমিস যুক্ত হালুয়া, ক্ষীর খেত, ভক্তি করতো না। এখন এই মাটি-বালি যুক্ত রুটির টুকরোই খাচ্ছে। মনুষ্য শরীর থাকতে যদি পূর্ণ সন্তের কাছে নাম দীক্ষা নিয়ে ভক্তি করতো, তবে আজ এই অভিশপ্ত দিন দেখতে হত না।

## "পুহলো বাই সাধ্বীর উপদেশ"

এক রাজা, ভক্তিমতি পুহলো বাঈর জ্ঞান বিচার শুনে খুবই প্রভাবিত হলেন। ঐ রাজার তিন রানী ছিল। রাজা রাণীদেরকে পুহলো বাঈ এর বিষয়ে বলেছিলেন। রাজা প্রায়ই নিজের রাণীদের সামনে পুহলো বাঈর প্রশংসা করতেন। নিজের স্বামীর মুখে পরস্ত্রীর প্রশংসা শুনতে রানীদের মোটেই ভালো লাগতো না, কিন্তু কিছু বলতে পারতেন না। তাঁরা ভক্তিমতি পুহলো বাঈকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রাজা পুহলো বাঈকে নিজের ঘরে সৎসঙ্গ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি রাজাকে সৎসঙ্গের তিথি এবং সময় জানিয়ে দিলেন। সৎসঙ্গের দিন রানীরা সুন্দর দামী বস্ত্র ও আভূষন পরলেন। নিজেদের রূপ-সৌন্দর্যের ঝলক দেখানোতে কোন ত্রুটি রাখলেন না। রানীরা ভেবেছিলেন যে পুহলো নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী হবে। ভক্তিমতি পুহলো রাজার ঘরে এলেন। তিনি খদ্দরের অতি স্বল্প মূল্যের একটা ময়লা শাড়ি পরেছিলেন! তার উপর মুখের রংও পরিষ্কার ছিল না, হাতে জপের মালা নিয়েছিলেন। তাকে দেখে তিন রাণী পরিহাসের ছলে জোরে জোরে হাসতে লাগলেন আর বললেন, "এই সেই পুহলো! আমরা তো ভেবেছিলাম সে খুব সুন্দরী হবে।" তাঁদের কথা শুনে ভক্তিমতি পুহলো বললেন -

**"বস্ত্র-আভূষণ তন কী শোভা, য়হ তন কাচ্চো ভান্ডো।**
**ভক্তি বিনা বনোগী কুতিয়া, রাম ভজো না রান্ডো॥"**

ভাবার্থ :- সুন্দর বস্ত্র বা আভূষণ শরীরের শোভা বৃদ্ধি করে। এই শরীর যেমন কাঁচা মাটির ঘোড়া। এই শরীর ক্ষণভঙ্গুর। কে জানে কিভাবে, কোন বয়সে, কোন সময় কষ্ট চলে আসে, কুষ্ঠ রোগ হয়ে যায়। ভক্তি না করলে পরবর্তী জন্মে কুকুরের জন্ম পাবে। তারপর নি:বস্ত্র হয়ে ঘুরে বেড়াবে। এইজন্যে বলা হয়েছে 'রান্ডো' অর্থাৎ নারীগণ ভক্তি করো। 'রান্ডো' শব্দটি বিধবাদের জন্য ব্যবহার করা হয় কিন্তু সাধারণভাবে নারীরা তাদের প্রিয় বান্ধবীদের কে ভালোবাসার সঙ্গে সম্বোধন করার জন্য প্রয়োগ করে (ভালোবাসা পূর্ণ গালি)। শিক্ষিত হওয়ার পর বর্তমানে এই শব্দ ব্যবহৃত হয় না। ভক্তিমতি পুহলো সৎসঙ্গ শোনালেন।

**কবীর পরমেশ্বরের সাখি শোনালেন:-**

**কবীর, হরি কে নাম বিনা, নারী কুতিয়া হোয়।**
**গলী-গলী ভোঁকত ফিরে, টুক না ডালে কোয়॥**
**কবীর, রাম রটত্ কোঢ়ী ভলো, চু-চু পড়ে জো চাম।**
**সুন্দর দেহি কিস কাম কী, জা মুখ নাহী নাম॥**
**কবীর, নহী ভরোসা দেহি কা, বিনাশ জায়ে ছিন মাহীঁ।**
**শ্বাঁস-উশ্বাঁস মেঁ নাম জপো, ঔর যত্ন কুছ নাহীঁ॥**
**কবীর, শ্বাস-উশ্বাস মেঁ নাম জপো, ব্যর্থ শ্বাস মত খোও।**
**না জানে ইস শ্বাঁস কা, আবন হো কে না হোয়॥**
**গরীব, সর্ব সোনে কী লঙ্কা থী, রাবণ সে রণধীরম্।**
**এক পলক মেঁ রাজ্য গয়া, জম কে পড়ে জঞ্জীরম্॥**
**গরীব, মর্দ-গর্দ মেঁ মিল গয়ে, রাবণ সে রণধীরম্।**
**কংস, কেসি, চাণুর সে, হিরণাকুশ বলবীরম্॥**
**গরীব, তেরী ক্যা বুনিয়াদ হৈ, জীব জন্ম ধরি লেত।**
**দাস গরীব হরি নাম বিন, খালী রহ জা খেত॥**

**শব্দার্থ :-** কবীর পরমেশ্বর জী অধ্যাত্মিকতার বিধানে (যা, যে নারী ভক্তি করবে না, সে আগামী জন্মে কুকুরের জীবন প্রাপ্ত করে গলিতে-গলিতে ঘেউ ঘেউ করে বেড়াবে। কেউ তাকে ভোজনের গ্রাসও দিবে না। মানব জীবনে সব ভোজন ঠিক সময়ে পাওয়া যাচ্ছিল। ভক্তি না করলে এই দশা হবে।

❖ কুষ্ঠ রোগী ( যার শরীরের চামড়া কেটে কেটে পড়ছে, তার থেকে রক্ত ঝরছে) যদি পরমাত্মার ভক্তি করে, তাহলে খুব উপকার হয়। ভক্তি করলে তার কুষ্ঠ রোগও ঠিক হয়ে যাবে। ভবিষ্যতও উজ্জ্বল হবে। যে ভক্তি করে না, সে সুন্দর শরীরধারী হলেও তার সুন্দর শরীর কোনো কাজের নয়!

❖ এই মানব শরীরের কোন বিশ্বাস নেই, কখন কি কারনে নষ্ট হয়ে যাবে। এটাকে বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে না। এর একটা উপায় আছে, ভক্তি করো। এত বেশি বেশি স্মরণ (জপ) করো, যেন একটা শ্বাসও নামের জপ ছাড়া খালি না যায়।

❖ শ্বাস ছাড়ার সময় এবং নেওয়ার সময়, প্রত্যেক শ্বাসে নাম জপ করো। নামের জপ ছাড়া শ্বাস ব্যর্থ খরচ করো না। এই শ্বাসের কোনো বিশ্বাস নেই, এটা ভিতরে গেলে বেরিয়ে আসবে, কী আসবে না! এই জন্য অবহেলা না করে ভক্তিতে লেগে পড়ো।

❖ যদি আপনার নিকট ধন থাকে এবং অন্যান্য সুবিধাও থাকে, তার কারণে ভক্তি করা ভুলবেন না। শ্রীলঙ্কার রাজা রাবণের নিকট অত্যধিক ধন ছিল। তিনি স্বর্ণের বিল্ডিং নির্মাণ করে রেখেছিলেন এবং নিজেও যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু শ্রী রামচন্দ্রের সাথে যুদ্ধ হয়েছিল। তিনি মারা গিয়েছিলেন এবং স্বর্ণ লুট হয়ে গিয়েছিল। রাজ্যও গেল। এইসব এক পলকে হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের তীরে বিদ্ধ হয়ে মারা গেলেন! কিছু সময়ের মধ্যে সবকিছু নষ্ট হয়ে গেল এবং যমের দূত অর্থাৎ মৃত্যুর দেবতার চাকর ঐ রাবনকে শিকলে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল এবং নরকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

❖ রাবণের মত শূরবীর মাটিতে মিশে গিয়েছে এবং মথুরার রাজা কংস, তার প্রসিদ্ধ পালোয়ান চানুর, কংসের চাকর কেসি রূপধারী রাক্ষস, হিরণ্যকশিপুর মত বলবানও ভক্তি বিনা জীবন ব্যর্থ করে গিয়েছেন। হে সাধারণ প্রাণী! তোমার কি যোগ্যতা আছে অর্থাৎ তুমি কিসের ভিত্তিতে বাঁচবে? তুমি কর্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন জীবের শরীর ধারণ করবে। সন্ত গরীব দাস জী পরমেশ্বর কবীর জীর বলা জ্ঞান থেকে বলেছেন যে, ভক্তি না করলে তোমার এমন ক্ষতি হবে যেমন কৃষক জমিতে বীজ বপন

না করলে ক্ষুধাতে মারা যায়। তার কোন লাভ হয় না। ভক্ত মতি পুহলো এই সংসারের বাস্তবিকতা সম্পর্কে বললেন তথা ভক্তি বিনা আসন্ন কষ্ট সম্পর্কে বললেন। এক টুকরো ছোট রাজ্য প্রাপ্ত করে আপনি এত গর্ব করছেন, এটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। লঙ্কার রাজা রাবণ সোনার বিল্ডিং তৈরি করে রেখেছিলেন। সত্যভক্তি না করার জন্যে রাজ্যও গেল, স্বর্ণ এখানেই থেকে গেল, নরকের ভাগী হলেন। রাজা রানীরা উপদেশ নিয়ে ভক্তি ক'রে জীবন ধন্য করলেন।

**কবীর, হরি কে নাম বিন, রাজা রষভ হোয়।**
**মিট্টি লদে কুম্হার কে, ঘাস ন নীরৈ কোয়॥**

ভগবানের ভক্তি না করায় রাজা গাধার শরীর প্রাপ্ত করে। কুমোরের ঘরে মাটি বহে বেড়ায়, জঙ্গলে গিয়ে ঘাস খেয়ে আসতে হয়।

**ফির পীছে তু পশুআ কিজৈ, দীজৈ বৈল বনায়।**
**চার পহর জঙ্গল মেঁ ডোলে, তো নহীঁ উদর ভরায়॥**
**সির পর সিঙ্গ দিয়ে মন বৌরে, দুমসে মচ্ছর উড়ায়।**
**কান্ধে জুআ জোতৈ কূআ, কোঁদোঁ কা ভুস খায়॥**

**ভাবার্থ** :- গাধার শরীর সমাপ্ত হওয়ার পর, সেই প্রাণী বলদের যোনী প্রাপ্ত হয়। মানব শরীরে এই জীবের কত সুবিধা উপলব্ধ ছিল। খিদে পেলেই খাবার খাও, দুধ পান কর, চা পান কর, পিপাসা পেলে জল পান কর। ভক্তি না করায়, সেই প্রাণী বলদ হয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চার প্রহর অর্থাৎ ১২-ঘন্টা পর্যন্ত জঙ্গলে ঘোরাফেরা ক'রে বেড়ায়, জমি চষার জন্য লাঙ্গলে জোতা হয়। দিনে কেবল দু-বার খাবার খেতে দেওয়া হয়, দুপুর ১২ টা এবং রাত্রিতে। এর মাঝে যদি তার খিদে পায়, চারিদিকে খাবার পড়ে থাকে তবুও খেতে পারে না, চাষী তাকে ঘাস খেতে দেয় না। জলও সময়মতো দিনে দুইবার বা তিনবার দেওয়া হয়। মাথায় শিং ও পিছনে একটি লেজ লাগানো থাকে। যখন মানব শরীরে ছিল তখন ঐ জীব কুলার, পাখা ব্যবহার করতো অথবা এ.সি ঘরে থাকত। আর এখন একটি মাত্র লেজ আছে, এটিকে চাইলে, হয় কুলারের জায়গায় ব্যবহার করো অথবা পাখার জায়গায় ব্যবহার করো। আর ঐ লেজ দিয়েই মশা তাড়ায়।

❖ সৎসঙ্গে এটাও বলা হয়েছে যে, ঘরে কলহের কারণ পরমাত্মার বিধানকে না বুঝে সংসারের ভাবে চলা। ঘরের কোনও সদস্য ঘরের ক্ষতি করতে চায় না। কোনও কারনে যদি কারো দ্বারা কোনও ক্ষতি হয়ে যায়, তা নিয়ে ঝগড়া-অশান্তি করা উচিত নয়। যে ক্ষতি হওয়ার ছিল, তা তো হয়ে গিয়েছে, তা তো আর ঠিক হবে না। বৃথা কলহ করা বুদ্ধিমত্তা নয়। ভুল করে কারো দ্বারা যদি কোন ক্ষতি হয়ে থাকে, তো তাকে বলা উচিত 'হে বেটা-বেটি, মাতা-পিতা, শাশুড়ি-বৌমা! এটা যা হয়ে গিয়েছে, আমাদের ভাগ্যে ছিল। তুমি ইচ্ছাকৃত করো নি'। এই কথায় ঘরে শান্তি বজায় থাকবে। ঝগড়াতে কাল নিবাস করে। ঐ ঘরে ভূত-প্রেতের আশ্রয় হয়। যারা কলহ করে না তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করে। যে ঘরে নামের সুমিরন তথা পরমাত্মার ভক্তি (আরতী-স্তুতি, জ্যোতি যজ্ঞ) হয়, সেই ঘরে পরমাত্মর আদেশে দেবতাদের নিবাস হয়।

সৎসঙ্গ শুনে সকলে নিজের নিজের বাড়ি চলে যায়। সৎসঙ্গ দুপুর ১২ টা থেকে ২ টো পর্যন্ত হয়েছিল। পুত্রবধূ জানতো না যে, শাশুড়ি-মা সৎসঙ্গে গিয়েছিলেন। পরের দিন সকালে গরুর দুধ দুইয়ে পুত্রবধূ দুধের ভরা বালতি ছাদে লেগে থাকা হুকের আংটাতে টাঙাতে লাগল। সে মনে করল, বালতি হয়তো টাঙানো হয়ে গিয়েছে কিন্তু আংটার বিপরীত দিকে বালতির কড়া লেগেছিল। ঠিকঠাক লেগে গিয়েছে ভেবে

পুত্রবধূ বালতিটি ছেড়ে দিল। বালতি ভূমির উপর পড়ে গিয়ে সমস্ত দুধ ছড়িয়ে গেল। শব্দ শুনে ভতেরী এলো। পুত্রবধূ দুধের পরিবর্তে শাশুড়িমা-র দিকে হতাশায় তাকিয়ে থাকল। কিছু বলা উচিত হবে না মনে করল কারণ পুত্রবধু জানত যে শাশুড়ি মা কোনও অজুহাতের কথা শোনেন না। ভাবছিল "আজ সারাদিন অশান্তির মধ্য দিয়ে যাবে। সন্ধ্যাবেলায় স্বামী আসবে,তাকে দিয়েও পেটাই করাবে। হে পরমাত্মা! এটা কি হল? এমন ভুল তো আগে কখনো হয় নি। হে সদগুরু! একটু তো দয়া করো। আমি আপনার ভক্তিও ভুলতে বসেছি। সারাদিন শুধু শাশুড়িমা-র শ্লোক গুলিই মনে থাকে।" ভতেরী বলল, "বেটী! যা হওয়ার ছিল তা হয়ে গিয়েছে, আজ আমাদের ভাগ্যে দুধ নেই। চিন্তা করিস না। এই দুধটাকে উপর উপর হাত দিয়ে তুলে বালতিতে ভরে মহিষকে খাইয়ে দে।" এই ব'লে দীক্ষা মন্ত্র জপ করতে লাগল। পুত্রবধূ তার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ভাবছিল, কি জানি মাতাজি আজ কোন স্টেশন (রেডিও আকাশবাণী) ধরল! এই শীতল বচন ভতেরীর ঝুলিতে ছিল না। এতে ছল কপট ভরা ছিল। আশ পাশ দিয়ে যখন যেতেন, তখনও বিড়-বিড় করে ফোয়ারা বের হত। পুত্রবধূর নাম ছিল নিশা। সে ভাবছিল- **'নিশা আজ নিশিতে (রাতে) তোর ভয়ংকর দশা হবে।'**

নিশার ভাবনা ছিল যে, তার স্বামীকে শাশুড়ী মাতা সমস্তটা বলে দেবে! মায়ের কথা শুনে সে তার স্ত্রীর কোনও কথাই শোনে না। গালাগালি করবে। সারাদিন আর রাত্রি কেঁদে কেঁদে কাটবে। নিশা মাটিতে পড়ে থাকা দুধ বালতিতে ভরে মহিষকে খাইয়ে দিলো। বালতি ধুইয়ে রেখে দিল। ভতেরী এলেন আর বললেন, "বেটি! রুটি খেয়ে নে। চিন্তা করিস না। বেটি! কাল আমি আমার বোন দয়াকৌরের সাথে 'সৎসঙ্গে' গিয়েছিলাম। আমার তো চোখ খুলে গেল। আমি তো খুব ঝগড়ুটে হয়ে উঠেছিলাম। বেটি, পারলে ক্ষমা করে দিস। পূর্বে যা হওয়ার তা হয়েছে, এখন থেকে নিজের মেয়েকে চোখের পাতায় রাখবো। আমার আসল বেটি তো তু-ই। জন্ম দেওয়া বেটি তো অন্যের ছিল, সে চলে গিয়েছে। নিজের সুখ-দু:খ পূর্ব নির্ধারিত (ভাগ্যে) হয়ে আছে। আমার তো একদিনের সৎসঙ্গেই চোখ খুলে গিয়েছে। বেটি! আগামী রবিবার তুও চল, আমিও যাব। ধীরে ধীরে বেটা (নিশার স্বামী)কেও নিয়ে যাব।" ছেলেও দীক্ষা নিয়ে নিল। ঘর স্বর্গে পরিণত হল। নিশা নিজের গুরুদেবের ফটো (স্বরূপ) কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখত। ফটো বের করে, চরণে মাথা ঠেকিয়ে বললো, হে গুরুবর! আজ আপনি আপনার মেয়ের ডাক শুনেছেন। আমার ঘর স্বর্গ বানিয়ে দিয়েছেন। সন্ধ্যায় চত্তরসিং আসলে তার মাতা তাকে দুধ পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো কথা বললো না। কিছুদিন পরে চত্তর সিংকেও নাম উপদেশ দেওয়ায়। পরে একদিন নিশার গুরুজী নিশার বাড়িতে এলেন। নিশা বলে, গুরুজী! আমার শ্বাশুড়ি মা খুব ভালো, নাম দীক্ষাও নিয়ে নিয়েছেন। ভতেরী বলে, মহারাজ জী! নিশা কোনদিন জানায়নি যে, সে নাম দীক্ষা নিয়েছে। সে আমার ঝগড়ার কারণে হয়তো ভয় পেতো। যখন আমি নাম উপদেশ নিয়েছি তখন বলল। ভালোই করেছে। যদি আগে বলত তাহলে আমি আরো বেশি দুঃখী করতাম, অধিক পাপের ভাগী হতাম। নিশার গুরুজী বললেন, ভতেরী! আপনি ভক্তি করছেন ঠিক কিন্তু এ সাধনা শাস্ত্র অনুকূল নয়। আর সত্য সাধনা ছাড়া মুক্তি সম্ভব নয়। যেমন রোগের সঠিক ঔষুধ খেলে তবেই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই প্রকার সত্য সাধনা করলে তবেই জন্ম-মৃত্যুর রূপী রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। নিশা চিন্তা করে, এইসব কথা শুনে শাশুড়ি মা রেগে যাবে। তাই কথার মাঝেই বলে ওঠে, গুরুজী! শুনেছি আপনি নতুন বই লিখেছেন এবং বইটি ছাপানো হয়েছে। ঐ বই

কি আপনার কাছে আছে? গুরুজী বলেন, পুত্রী! তোমাকে দেওয়ার জন্যই এসেছি। এই বলে গুরুজী উঠে ঐ কামরায় গেলেন, যেখানে তিনি থাকছিলেন, সেখানে তাঁর থলে রাখা ছিল। নিশাও গুরুজীর সাথে সাথে গেলো এবং বললো, গুরুদেব! ভীমরুলের বাসা ভাঙবেন না। অনেক কষ্টে শান্ত হয়েছে। গুরুজী বলে, পুত্রী! তোর শ্বাশুড়িমার রুচি এখন সম্পূর্ণ রূপে ভক্তিতে এসে গিয়েছে, এখন সব কথা শুনবে। গুরুজী ঐ বাড়িতে তিনদিন পর্যন্ত থাকেন, ভতেরীকে তত্ত্বজ্ঞান বোঝান। তখন ভতেরী গুরু বদল করে, নিজের কল্যাণ করায়।

সত্সঙ্গ শোনার কারণ ঘর স্বর্গ হয়ে যায়। চারিদিকে শান্তি হয়ে যায়। যেখানে সারাদিন ঝগড়া ঝাটি আর গালাগালের গুলি ছুটত সেই ঘরে আজ পরমাত্মার জ্ঞানের গঙ্গা বয়ে চলেছে। ভক্তিমতি নিশার গুরুদেব স্বয়ং পরমেশ্বর কবীর জী ছিলেন। সত্য ভক্তি প্রচারের জন্য বিভিন্ন বেশে ঘুরে বেড়াতেন। কোন প্রভুর ভক্তি কর উচিত? তা তিনি বলে দিয়েছেন। পড়ুন এই পুস্তকেরই পৃষ্ঠা নম্বর ২০১ এ।

**নিষ্কর্ষ** :- পরমেশ্বর কবীর জী বলেছেন

**মন নেকী কর লে, দো দিন কা মেহমান॥ টেক॥**
**মাত-পিতা তেরা কুটম কবীলা, কোয় দিন কা রল মিল কা মেলা।**
**অন্ত সময়, উঠ চলে অকেলা, তজ মায়া মণ্ডান॥ ১॥**
**কঁহা সে আয়, কঁহা জায়গা, তন ছুটে তব কহাঁ সমায়েগা।**
**আখির তুঝকো কৌন কহেগা, গুরু বিন আত্ম জ্ঞান॥ ২॥ ।**
**কৌন তুম্হারা সচ্চা সাঁঙ্গী, ঝুঠী হৈ য়ে সকল সগাঈ॥**
**চলনে সে পহলে সোচ রে ভাঈ, কহাঁ করেগা বিশ্রাম॥ ৩॥**
**রহট মাল পনঘট জ্যোঁ ভরিতা, আবত জাত ভরৈ করৈ রীতা।**
**জুগন-জুগন তূ মরতা জীতা, করবা লে রে কল্যাণ॥ ৪॥**
**লক্ষ-চৌরাসী কী সহ্ ত্রাসা, উঁচ-নীচ ঘর লেতা বাসা**
**কহ কবীর সব। মিটাউঁ রাসা, কর মেরী পহচান॥ ৫॥**

**ভাবার্থ**:- পরমেশ্বর কবীর জী নিজের মনকে সম্বোধিত করে আমাদের মত প্রাণীদেরকে সতর্ক করেছেন যে, এই সংসারে আমরা দুই দিনের অর্থাৎ খুব কম সময়ের অতিথি। এই অল্প সময়ের মানব জীবনে আত্মজ্ঞানের অভাবে প্রচুর পাপ জোগাড় করে মানব জীবন নষ্ট করে চলে যাই। ধন উপার্জনের বিধি সংসারের মানুষজন বলে দিতে পারে। কিন্তু সদগুরু বিনা, আত্মজ্ঞান কোথায় পাবে? মানুষ্য জীবনের মূল উদ্দেশ্য কি? সদগুরু ধারণ না করলে অর্থাৎ সদগুরু থেকে নাম না নিলে জীবের মানব জন্ম নষ্ট হয়ে যায়, এই কথাও সদগুরু ছাড়া কেউ বোঝাতে পারেন না। বর্তমানে পৃথিবীর রাজা হলেও ভবিষ্যতে সে পশুর জন্মই পাবে। জন্ম-মৃত্যুর চক্র, সদগুরুর জ্ঞান ও দীক্ষা মন্ত্র (নাম) ছাড়া সমাপ্ত হয় না। তাই বলেছেন:-

**য়হ জীবন হরহট কা কুঁয়া লোঈ। যা গল বন্ধা হৈ সব কোঈ।**
**কীড়ী-কুঞ্জর আউর অবতারা। হরহট ডোর বন্ধে কঈ বারা॥**

**ভাবার্থ**:- পূর্বের দিনে রহটের কুঁয়ায় লোহার চক্র লাগিয়ে তার উপর বালতি বা জল উঠানোর পাত্র লাগানো থাকতো। আগের দিনে জমিতে জল দেওয়ার জন্য এই প্রথা ব্যবহার করা হত। বলদ বা উট দিয়ে রহট চালানো হতো। যেমন পোষা বলদ-উঁট কলহু চালায় (আগে অধিক চালানো হতো)। রহটের বালতি কুঁয়ার নীচ থেকে জল ভরে উপরে ফেলে। এই চক্র চলতেই থাকে। এই রূপ জীব ও পৃথিবী রূপী কুঁয়া থেকে পাপ-পুণ্য রূপী বালতি ভরে উপরে স্বর্গ-নরককে খালি করে। এই ভাবে জীব সদা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে থেকে
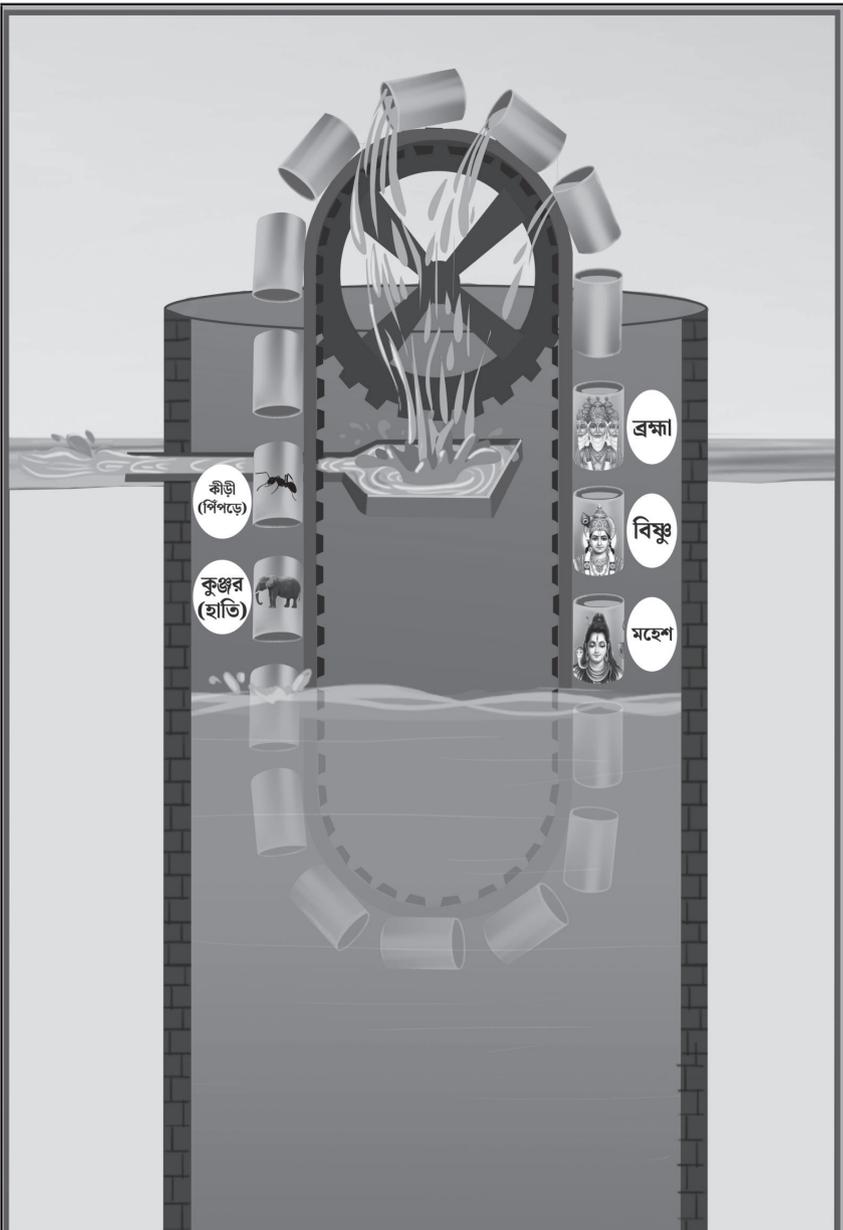
ব্রহ্মা
বিষ্ণু
মহেশ
কীড়ী
(পিঁপড়ে)
কুঞ্জর
(হাতি)
য়োহ হরহট কা কুঁয়া লোই, যা গল বন্ধা হে সব কই ।
কীড়ী কুঞ্জর ওর অবতারা, হরহট ডোরী বন্ধে কই বারা ।।
কাল লোকে জন্ম-মৃত্যু রূপী চক্র (হরহট)

যায়। তাই উপরোক্ত শব্দে বোঝাতে চেয়েছেন যে, ধন-পরিবার সবকিছু এই সংসারেই ত্যাগ করে একদিন একলা চলে যেতে হবে। আবার কর্মের আধারে অন্য স্থানে জন্ম নিয়ে, এই রূপ কর্ম করে চলে যাবে। যদি আপনি বাড়ি থেকে অন্য কোনো শহরে যান।

তাহলে যাওয়ার পূর্বেই নির্ধারিত করে নেন যে, কোথায় যাবেন, কোথায় বিশ্রাম নেবেন। কিন্তু সংসার ছেড়ে যাওয়ার কথা জীব বিচার করে না যে, সংসার ছেড়ে গেলে কোথায় যাব, কোথায় বিশ্রাম নেবো, কোথায় আমার ঠিকানা হবে।

হে জীব! চুরাশী লক্ষ প্রকার প্রাণীর শরীরে কষ্ট সহ্য করে, জন্ম-মৃত্যু (পুনরায় নতুন প্রাণীর জীবন প্রাপ্ত করে) হতে থাকে। কখনো রাজা হয়ে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে। কখনো কাঙ্গাল হয়ে নীচু বলা হতে থাকে। পরমাত্মা কবীর জী বোঝাতে চেয়েছেন যে, অবতার গণ (রাম কৃষ্ণ ইত্যাদি) সত্য সাধনা না পাওয়ার কারণে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পড়ে আছে। সত্য সাধনা আমার কাছে আছে। হে প্রাণী! তুই আমাকে চেনার চেষ্টা কর, আমি সমর্থ পরমাত্মা। আমি তোর জন্ম- -মৃত্যুর সকল ঝঞ্ঝাট সমাপ্ত করে দেব।

**(শব্দ নং. ২)**

**নাম সুমরলে সুকর্ম করলে, কৌন জানে কল কী॥ খবর নহীঁ পল কী (টেক)**

**কোড়ি-২ মায়া জোড়ী বাত করে ছল কি,**
**পাপ পুণ্য কি বান্ধী পোটরিয়া, কৈসে হোবে হলকী॥ ১॥**
**মাতা-পিতা পরিবার ভাঈ বন্ধু,ত্রীরিয়া মতলব কী,**
**চলতী বরিয়াঁ কোঈ না সাথী, যা মাটী জঙ্গল কী ॥২॥**
**তারোঁ বীচ চন্দ্রমা জ্যোঁ ঝলকৈ, তেরী মহিমা ঝলা ঝল্কী,**
**বনৈ কুকরা, বিষ্টা খাবৈ, অব বাত করৈ বল কী॥ ৩॥**
**য়ে সংসার রৈন কা সপনা, ওস বুন্দ জল কী,**
**সতনাম বিনা সবৈ সাধনা গারা দলদল কী॥৪॥**
**অন্ত সময় জব চলৈ একেলা, আঁসু নৈন ঢলকী,**
**কহ কবীর গহ শরণ মেরী হো রক্ষা জল থল কী ॥৫।**

**ভাবার্থ:-** পরমাত্মা কবীর জী বলেছে, হে ভোলা মানব (স্ত্রী-পুরুষ)! পরমাত্মার নাম জপ কর, শুভ (ভাল) কর্ম কর। না জানি কাল অর্থাৎ ভবিষ্যতে কি দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। এখানে এক মুহুর্তেও ভরসা নেই।

ছল-কপট ছাড়া ধন সংগ্রহ হয় না। আবার তার মধ্যে থেকে কিছু ধন, কোনো ধর্ম কাজেও খরচা করে। এই ভাবে পাপ ও পুণ্য দুই প্রকারের বোঝা বেঁধে নেয়। পাপ নরকে থেকে আর পুণ্য স্বর্গে থেকে ভোগ করে এই ভার হাল্কা করতে হয়। মাতা-পিতা, ভাই-পত্নী পরিজন সব নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে। পূর্ব জন্মের কর্ম ফলের জন্য এখন এক পরিবারে এসেছে। যখন যার সময় হবে অর্থাৎ কর্ম সংস্কার সমাপ্ত হবে। তখন সে পরিবার ছেড়ে চলে যাবে। যেমন রেলের কামরা ভিড়ে ভরা থাকে। যে যেই স্থানের টিকিট নিয়ে রেখেছে তাকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে রেল গাড়ি আগে চলে যাবে। অর্থাৎ যখন কর্ম সংস্কার সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন সে পরিবার ছেড়ে চলে যাবে। এই পরিবারও একটি রেল গাড়ির কামরার মতো। মৃত্যুর পরে এই শরীর মাটিতে মিশে যাবে। ঐ সময় তোর পরিবারের কোন সদস্য তোর সাথী হবে না।

এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে খুব ভালবাসতো। বৃদ্ধ বয়সে ব্যক্তির মৃত্যু নিকটে আসতে থাকে। বৃদ্ধ তার স্ত্রীকে বলে, তুমিও আমার সাথে যাবে। স্ত্রী সরাসরি তাকে মানা করে দিয়ে বলে, ‘না, আমি কেনো মরবো তোমার সাথে। তোমার থেকে আমার

বয়স কম।' বৃদ্ধ ব্যক্তি ঐ দিনই বুঝে যায়, শেষ সময়ে কেউ সঙ্গে যায় না। সেই দিন থেকেই স্ত্রীর সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। স্ত্রী কাছে আসলে বৃদ্ধ মুখ ফিরিয়ে নিত, কথা বলতো না। ৬০ বছর বয়সে এই প্রথমবার সে বুঝতে পারে যে, এই সংসারে কেউ কারো নয়। ঐ বৃদ্ধা যদি বৃদ্ধকে সত্যিকারে ভালোবাসতো তাহলে বলতো আমাকেও সাথে নিয়ে চলো, বৃদ্ধ কি আসলেই তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতো! কিন্তু স্ত্রী যদি বলতো হ্যাঁ আমিও যাবো, তাহলে বৃদ্ধ খুশি হয়ে নিশ্চিন্তে মরতে পারতো। সময় না হলে বৃদ্ধাকে কে মারতো? আসলে এসব বাস্তবিক প্রেম নয়। এই সংসারে নিজের স্বার্থের কারণে একে অপরের সাথে সম্পর্ক জড়িত আছে। হে মানব! পূর্ব জন্মের জপ-তপ ও কর্ম সংস্কারের জন্যই বর্তমানে মন্ত্রী, প্রধান মন্ত্রী, উচ্চ অধিকারী হয়ে সমাজকে এমনভাবে সুশোভিত করে রেখেছে। যেমন জ্যোৎস্না রাতে আকাশে চন্দ্রমা সুশোভিত হয়। কিন্তু সত্সঙ্গের বিচার না শোনার কারণে এবং আত্মজ্ঞান না হওয়ায় যদি ভক্তি না করা হয় তবে পরের জন্মে কুকুর হয়ে বিষ্টা (মল-গোবর) খাবে। এখন তুই নিজের বল অর্থাৎ শারীরিক শক্তি, পদ ক্ষমতা ইত্যাদির কথা বলিস, পরে কোনো পশুর যোনীতে জন্ম গ্রহন করে মহাকষ্ট ভোগ করবি।

**নর সে ফির পশুবা কীজৈ, গধা-বৈল বনাঈ।**
**ছপ্পন ভোগ কহাঁ মন বোরে, কুরড়ী চরণে জাঈ॥**

**শব্দার্থ :-** যে মনুষ্য (স্ত্রী/পুরুষ) সত্য ভক্তি শাস্ত্র অনুসারে গুরুর থেকে নাম দীক্ষা নিয়ে করে না, তারা মৃত্যুর পরে পশুর শরীর প্রাপ্ত করে। যখন মানব শরীর ছিল তখন সুস্বাদু খাবার খেত। গাধা হয়ে জন্ম নিলে ভালো খাবার পাওয়া যাবে না। গাধার শরীর ধারণ করে নোংরা জায়গার পচা খাবার বা ঘাস খায়। এই জন্য ভক্তি করো।

হে মানব! এই সংসারে তোমাদের জীবন এমন, যেন সকাল বেলায় শিশিরের জল বিন্দু ঘাসের উপর ঝলমল করতে থাকে, যা কেবল ক্ষণিকের জন্য হয়। তাই পূর্ণ সদগুরুর থেকে সতনাম অর্থাৎ সত্যনাম জপ ভক্তি করে নিজের জীবনের কল্যাণ করাও। শাস্ত্র অনুকূল ভক্তি মন্ত্রের অতিরিক্ত সমস্ত শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা দলদলের (পাঁকের) সমান। দলদলে ফাঁসলে! যতই বের হওয়ার চেষ্টা করবে ততই ফাঁসতে থাকবে। এই শাস্ত্র অনুকূল সাধনা পরমেশ্বর কবীর জীর কাছে ছিল এবং কবীর জী কিছু সন্তদেরও এই সাধনা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি এই নাম অন্য কাউকে দেওয়ার জন্য তাদের পরিষ্কার ভাবে মানা করে দেন। বর্তমানে (সন ১৯৯৭ থেকে) এই জ্ঞান আমার (রামপাল দাস) কাছে আছে। শাস্ত্র অনুকূল বা শাস্ত্র প্রমাণিত ভক্তি মন্ত্র বর্তমানে অন্য কোন সন্ত বা গুরুর কাছে নেই। তাই আসুন এবং নাম দীক্ষা নিয়ে নিজের ও পরিবারের জীবন সফল করুন। যদি আমার (রামপালের) অতিরিক্ত অন্য কোনো গুরু বা সন্তের কাছ থেকে নাম দীক্ষা নেন তাহলেও জন্ম-মৃত্যুর কষ্টও রয়েই যাবে। অর্থাৎ কোনো লাভ হবে না। শাস্ত্র বিরুদ্ধ জ্ঞান গ্রহণ করলে জীবন বিফলে যাবে। এই কুলও যাবে ঐ কুলও যাবে। আমি যখন গ্রামে গ্রামে সত্সঙ্গ করতাম তখন অনেকে আমার সত্সঙ্গ শুনে প্রভাবিত হয়ে আমাকে ছেড়ে অন্য গুরুর কাছ থেকে নাম দীক্ষা নিত। কিন্তু তাদের ভক্তি, শাস্ত্র বিরুদ্ধ হওয়ার কারণ কোন লাভ হলো না। বহু বছর এই ভাবে এইখানে-ঐখানে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ানোর পরে, আমার কাছে এসে নাম দীক্ষা নিয়ে সুখী হয়।

উপরোক্ত সৎসঙ্গ বচনের নিস্কর্ষ হলো যে, যদি সৎসঙ্গের বিচার প্রাপ্ত হয়ে যায় তবে ঘর স্বর্গে পরিণত হয়ে যায়। এই প্রকার বিশ্ব উদ্ধার সম্ভব। অন্যথায় নরকের মত জীবন যাপন করতে হয়। এই ভাবে সকলে প্রেম ভালবাসায় জীবন যাপন করে মোক্ষ প্রাপ্ত করতে পারবে, এটি অনিবার্য।

## বর্তমানের কিছু সত্য কথা

### "ভক্ত সুরেশ দাসের নষ্ট পরিবারকে পরমাত্মা ভালো করেন"

ভক্ত সুরেশ দাস এক নম্বরের নেশাখোর ছিল। মদ, সুল্ফা গাঁজা, আফিম ইত্যাদির নেশা করে সংসার কে বরবাদ করে দিয়েছিল। সুরেশ দাসের পত্নীর অসাধ্য রোগ ছিল। ছোট ছোট দু'টি ছেলে ছিল, তারা পিতাজী কে বাড়িতে আসতে দেখলে খাটের নীচে লুকাতো। সুরেশ দাস নেশা করে প্রতিদিন বাড়িতে ঝগড়া করতো। ভক্তিমতি যশবন্তির এক ভাই হরিয়াণা পুলিশের ডি.এস.পি পদে চাকরী করতো। তার নাম- ভক্ত রাজেন্দ্র সিংহ রাঠি, গ্রাম- ভাপরোদা। তিনি বোনের চিকিৎসার জন্য আ-প্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আমার এক ভক্ত সে ও হরিয়াণা পুলিশে চাকরি করতো। ঐ ভক্তের পিতা জৌহরী সিংহ আর্য সমাজের মহান প্রচারক ছিল। ওর সঙ্গে আমার ছোট ভাই মহেন্দ্র সিংহও পুলিশে চাকরী করতো। ২০১৬-তে সেবা নিবৃত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরমার্থে স্বইচ্ছায় চাকরী ছেড়ে আমাকে সাহায্য করতে লাগে। আমার ভাই এস.পি রোহতক এর ড্রাইভার ছিল। ভক্ত জয়দীপ মালিকও ডি.এস.পির ড্রাইভার ছিল। আর্য সমাজি হওয়ায় প্রথমে জয়দীপ খুব দুঃখী ছিল। আর্য সমাজের সকল গুরুর সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু কোন লাভ হয় না। ভক্ত মহেন্দ্রের সাথে জয়দীপের দেখা হলে পরমাত্মার চর্চা হত। দুঃখী হওয়ার কারণে এবং সত্য কে চোখের সামনে দেখে, শেষ পর্যন্ত সত্য কে মেনে নেয়। এবং ১৯৯৪ সালে আমার কাছ থেকে নাম উপদেশ নেয়। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত ভক্ত রাজেন্দ্র সিংহ রাঠি ঝজ্জরে কার্যরত ছিল। বোন যশবন্তির রোগের মত রোগে রাজেন্দ্রের এক ভাই ১৯৯৫ সালে মারা যায়। সেও হরিয়াণা পুলিশে চাকরি করত। ড্রাইভার হওয়ার কারণে যশবির ও ডি.এস.পি-র সাথে তার বাড়িতে যায়। ডি.এস.পি-র পরিবারের দুর্দশা দেখে ভক্ত যশবির ডি.এস.পি সাহেবের কাছে প্রার্থনা করে বলে, যদি আপনি আপনার পরিবারকে বাঁচাতে চান তাহলে সন্ত রামপাল জীর কাছ থেকে নাম উপদেশ নেন। প্রথমে রাজী ছিল না, কিন্তু যশবিরের দৃঢ় বিশ্বাস দেখে পরীক্ষার জন্য বোন যশবন্তিকে আর ছোট ভাইকে পাঠায়। আমি (শ্রী রামপাল দাস) প্রথমে হরিয়াণা সরকারের সেঁচাই বিভাগে জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার এর পদে কর্মরত ছিলাম। গুরুদেবের আদেশে নামদান ও প্রচার প্রসার শুরু করি। মিশনের উদ্দেশ্যের সাথে পরিচিত হয়ে জনহিত তথা জগতের কল্যাণের জন্য ১৯৯৫ সালে চাকরি থেকে ত্যাগ পত্র দিয়ে প্রচার প্রসারের কাজে মন দিই। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সন্ত গরীব দাস জীর বাণীর অখন্ড পাঠ ও সত্সঙ্গ করতে লাগি। অখন্ড পাঠ ও সত্সঙ্গ তিন দিন চলত। গ্রামের মানুষদের সত্য জ্ঞানের সাথে পরিচিত করিয়ে নামদীক্ষা দিতাম। যার কারণে উপদেশীদের আশ্চর্যজনক লাভ হত। এক দিন দিল্লী পাঞ্জাব খেড়ায় ভক্ত জগদিশের ঘরে পাঠ চলছিল। ভক্ত জগদিশ ডি.টি.সি. তে চাকরি করত, সে এক নম্বরের নেশাখোর ছিল। জগদীশের পত্নীর অসাধ্য রোগ আমার কাছ থেকে নাম দীক্ষা নেওয়ার পরে ভালো হয়ে যায়। আসলে পরমাত্মার শক্তি সন্তের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়। যেমন বিদ্যুৎ তারের মাধ্যমে আসে, কিন্তু তার বিদ্যুৎ নয়। সেইরূপ সন্ত পরমাত্মা না হলেও 'তার' অবশ্যই। যখন যশবন্তিকে সত্সঙ্গ স্থলে নিয়ে আসে তখন ওর জীহ্বা কোনো কাজ করত না অর্থাৎ কথা বলতে পারত না। ভাই সুকবির সন্ধ্যার সময় বোন যশবন্তিকে নিয়ে জগদীশের বাড়িতে আসে। আমাকে সব সমস্যার কথা বলে। যশবন্তিকে নাম উপদেশ দেওয়ায় এবং প্রসাদ খাওয়ায়। দুই ভাই বোন রাত্রে সৎসঙ্গের স্থানে থেকে যায়। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে যশবন্তি ভাইকে

বলে, ভাই আমি কথা বলতে পারছি, আমি ভালো হয়ে গেছি। এই চমৎকার দেখে উপস্থিত লোকদের বলতে লাগে, এমন অদ্ভুত চমৎকার আমি কোন দিনও দেখি নাই। বোনের অসাধ্য রোগ ঠিক হতে দেখে ডি.এস.পি. সাহেব তার সমস্ত পরিবার এবং আত্মীয় স্বজন নিয়ে আমার কাছ থেকে নাম দীক্ষা নেয়। এখন সবাই সুখে-শান্তিতে ভক্তি করছে। ভক্ত সুরেশ প্রথম শ্রেনীর মাতাল ছিলো। স্ত্রী-কে ভালো হতে দেখে ভক্ত সুরেশও সৎসঙ্গে আসতে লাগে এবং সর্ব নেশা ত্যাগ করে নামদীক্ষা নিয়ে ভালো হয়ে যায়। ঐ সময় পর্যন্ত আমার কোনো আশ্রম ছিল না। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সত্সঙ্গ করতাম। সুরেশ চৌধুরী সর্ব নেশা ত্যাগ করে ভক্ত হয়ে যায়। এখন ভক্ত সুরেশের দুই ছেলে দিল্লী পুলিশে এক সঙ্গে চাকরী করে। গ্রামের লোকেরা মনে করে টাকার জন্য দুই ছেলের এক সঙ্গে চাকরী হয়েছে। আসলে চাকরীর জন্য সুরেশের এক টাকাও খরচা হয়নি। দুই ছেলের বিবাহে এক টাকাও দান নেয়নি। যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে মোবাইল নম্বরে ফোন করে দেখতে পারেন। এই ধরনের প্রচুর উদাহরণ আছে। এই কাহিনী বলার উদ্দেশ্য এই যে, গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩ ও ২৪-এ বলেছে শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা করলে পরমাত্মার কোন লাভ পাওয়া যায় না। সদভক্তি করলে সর্ব লাভও মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সুক্ত ১৬১ মন্ত্র ২-এ প্রমাণ আছে, পরমাত্মার ভক্তি করলে অসাধ্য রোগও ভালো হয়ে যায়। রুগী যদি মৃত্যুর নিকটও পৌঁছে যায় এবং সে যদি সদভক্তি করে তাহলে তার মৃত্যু হয় না। ভক্তি করার জন্য পরমাত্ম তাকে অতিরিক্ত আয়ু প্রদান করেন। যেমন পূর্বের দিনে বিদ্যুৎ ছিল না। তখন জাঁতা বা ঢেঁকিতে সব কিছু পেশাই করা হত। বর্তমানে বিদ্যুতের সাহায্যে ঐ কঠিন কাজ সহজ সরল ভাবে করা হয়। শুধু নিয়ম মেনে বিদ্যুতের কনেকশন নিতে হবে। এবং বিদ্যুতের নিয়ম মেনে চলতে হবে। তাহলে বিদ্যুতের সর্ব সুবিধা প্রাপ্ত হবে। অন্যথায় ঐ সুখ দায়ী বিদ্যুৎ মৃত্যুর কারণ হতে পারে। সেইরূপ পরমাত্মার মর্যাদা পালন করে চললে সর্ব সুখ ও মোক্ষ সম্ভব। আর মর্যাদা ভঙ্গ করলে পরমাত্মার শক্তি আসা বন্ধ হয়ে যাবে। আর্য সমাজের চক্রান্ত বুঝতে না পেরে দীঘল গ্রামের মানুষ করৌথা আশ্রমে আসা ভক্তদের বাধা দিতে লাগে। ভক্ত সুরেশ ও ভক্তমতী যশবন্তি হাত জোর করে গ্রামের লোকদের বলে, যদি আমাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হয় তাহলেও আমরা আশ্রমে যাব। কোন শক্তি আমাদের আশ্রমে যাওয়া বন্ধ করতে পারবে না। পরমাত্মা আমাদের ভয়ংঙ্কর বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। পরমাত্মা তাঁর ভক্তদের সত্য ভক্তির ফল অবশ্যই দেন।

ভক্ত সুরেশ দাস,<br>
মো:- ৯০৩৪০২৯৪৯৫

## “সত্সঙ্গ না শুনলে সর্বনাশ হয়”

**কবীর, রামনাম কড়বা লগৈ, মীঠে লাগেঁ দাম।**<br>
**দুবিধা মেঁ দোনোঁ গয়ে, মায়া মিলী না রাম॥**

**শব্দার্থ:-** যে ব্যক্তিরা সত্সঙ্গ শোনে না (স্ত্রী/ পুরুষ) তাদের পরমাত্মার বিষয়ে জ্ঞান হয় না। যে কারণে তাদের পরমাত্মার বিষয়ে চর্চা করতে ভালো লাগে না। ধন সংগ্রহ করতে ভালো লাগে। মৃত্যুর পরে ঐ সব ব্যক্তিরা পরমাত্মাকে পায় না আর ধনও এখানেই থেকে যায়। তাই তাদের দুই হাতই খালি থেকে যায়।

পাঞ্জাব প্রান্তে আমার (শ্রী রামপাল দাস) পূজ্য গুরুদেব জীর আশ্রম ‘তলবণ্ডী ভাঈ’ নামক এক ছোট শহরে ছিল। গুরুদেব সতলোক যাওয়ার পর আমি (রামপাল দাস) প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় রবিবার সৎসঙ্গ করতে যেতাম। আমার গুরুদেবের কিছু

শিষ্য "তলবণ্ডী ভাঈ" শহরের শেঠ ছিল। তাদের এক আত্মীয়, শুক্রবার দিনে এক বৃদ্ধার মৃত্যুতে শোক ব্যক্ত করার জন্য আসে। ঐ ব্যক্তি শনি বার দুপুর দুটোর সময় বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরী হয়। সত্সঙ্গী আত্মীয়রা বলে, আজ রাত্রি থেকে যাও কাল সকাল ৮টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত সৎসঙ্গ হবে। সত্সঙ্গ শুনে প্রসাদ নিয়ে যেও। ঐ ব্যক্তি বলে, কাল রবিবার একটি পার্টি আসবে। তার সঙ্গে আমার এক চুক্তি হবে, তাতে আমার ৫ লাখ টাকা লাভ হবে। এই ঘটনা ১৯৯৮ সালের। সত্সঙ্গীরা অনুরোধ করে আপনি সকাল ১১টার সময় গেলেও ঠিক সময় মত পৌঁছে যাবেন। ফোন করে তাদের জানিয়ে দেবেন একটু দেরিতে আসতে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি মানে না। ওনার পরিবারে মাত্র চার জন সদস্য ছিল। স্ত্রী ও একছেলে একমেয়ে। নিজের মারুতি গাড়ি নিয়ে পুরো পরিবার শনিবার চণ্ডীগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন ।

চন্ডীগড় থেকে কিছু আগে আম্বালা শহরের কাছে পাথর ভরা একটি ট্রাক খারাপ অবস্থায় দাঁড় করানো ছিল। ট্রাকের পিছনের চাকা খুলে জ্যাক লাগিয়ে রেখেছিল। মায়ার (টাকার) লোভে ঐ ব্যক্তি শুধু ৫ লাখ টাকা দেখতে পাচ্ছিল। গাড়ি খুব দ্রুত গতিতে চলছিল। মারুতি গাড়ি ঐ পাথর ভর্তি ট্রাকের ভিতরে ঢুকে যায়। জ্যাক সরে যায়। পরিবার সহ ট্রাকের নীচে চাপা পড়ে মারা যায়। খুব দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে, যদি ঐ ব্যক্তি সত্ সঙ্গ শোনার জন্য থেকে যেত তাহলে এই সর্বনাশ হত না। মায়া ছাড়া (টাকা ছাড়া) কাজ চলে যায়। কিন্তু কায়া ছাড়া চলে না। কারণ শরীর থাকলে পরমাত্মার ভক্তি করে আত্ম কল্যাণ করা সম্ভব। পরমেশ্বর কবীর জী তাই সতর্ক করে বলেছে:-

**কবীর, রামনাম কড়বা লগৈ, মীঠে লাগেঁ দাম।**
**দুবিধা মেঁ দোনোঁ গয়ে, মায়া মিলী না রাম॥**

সৎসঙ্গ না শুনলে পরমাত্মার বিষয়ে জ্ঞান হয় না। যে কারণে তাদের পরমাত্মার বিষয়ে চর্চা করতে ভালো লাগে না।ধন সংগ্রহ করতে ভালো লাগে। তাই তাদের দুই হাতই খালি থেকে যায় অর্থাৎ পরমাত্মা কেও পায় না আর মৃত্যুর পরে ধনও এখানেই থেকে যায়। তাই তারা দুই দিক থেকেই বঞ্চিত হয়।

তাই সর্ব ভাই বোনের কাছে প্রার্থনা, সত্সঙ্গ শোনা বা সত্সঙ্গে যাওয়ার অভ্যাস করো। আত্ম কল্যাণ করাও আর জীবন চলার পথ সহজ সরল বানাও।

## "সতসঙ্গে গেলে বিপদ কেটে যায়"

**কবীর, সন্ত শরণ মে আনে সে, আই টলে বলা।**
**জৈ ভাগ্য মে শুলি হো, কাঁটা মে টল যায়॥**

**ভাবার্থ:-** সমর্থ কবীর পরমেশ্বরের কৃপা পাত্র সত্য গুরু (সদগুরু) থেকে দীক্ষা নেওয়া ভক্ত ভক্তমতিদের পরমাত্মা রক্ষা করেন। যদি পূর্ব জন্মের পাপের কারণে কোন সাধকের মৃত্যু সুলি যন্ত্র দ্বারা ভাগ্যে লেখা থাকে যা অত্যাধিক যন্ত্রণাদায়ক হয় তাহলে পরমাত্মা ঐ মৃত্যুদণ্ড কে সমাপ্ত করে কোন ছোট এক দণ্ড দিয়ে, যেমন পায়ে কাঁটা ফুটিয়ে ঐ পাপ কর্ম নষ্ট করে দেন। ভয়ংকর দণ্ডকে নাম মাত্র দন্ডের মাধ্যমে বদলে দেন যা অনেক বড় দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াতো।

গ্রাম থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে এক সন্তের আশ্রম ছিল। ঐ গ্রামের অনেক পরিবার সাধু, মহারাজের শিষ্য ছিল। তিনি প্রতি বছর দুই বার আশ্রমে আসতেন। সন্তের সাথে কয়েকজন স্থায়ী শিষ্যও আসত, তারা দুই মাস পর্যন্ত আশ্রমে থাকত। পরে অন্য আশ্রমে চলে যেত। সন্তজী নিজের কার্যক্রম অনুসারে দুই মাসের জন্য আশ্রমে আসে। গ্রামের লোকেরা (ভক্তজন) ভান্ডারার ব্যবস্থা নিজের নিজের ঘরে করেছিল। একটি

পরিবার একদিনের ভোজন ভাণ্ডারা বানিয়ে আশ্রমে নিয়ে যেত। প্রত্যেক ভক্তদের ইচ্ছা থাকত গুরুদেবের জন্য ভাল সুস্বাদু ক্ষীর, সবজি, রুটি, ভোজন নিয়ে যাওয়া। একদিন এক ভক্ত পরিবারের দুধ খারাপ হয়ে যায়। ঐদিন গুরুদেবের জন্য তার ভোজন নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। ঐ ভক্তমতির নাম কস্তুরি ছিল। কস্তুরির বাড়ির পাশে এক পরিবার ছিল, তারা কেবল দুই জন ছিল, মা ও ছেলে। ছেলের যখন দুই বছর বয়স তখন রামোর স্বামীর মৃত্যু হয়েছিল। ঐ মহিলার (রমো) পরিবারে এক ঘটনা ঘটে। অন্য এক পরিবারে এক বিধবা মহিলা, সে তার তিন বছরের পুত্র নিয়ে নিজের দেবরকে বিবাহ করে। দেবরও বিবাহিত ছিল। দেবরের থেকে তার একটি পুত্রের জন্ম হয়। দেব রানী ঐ মহিলার সাথে দাসীর মত ব্যবহার করতো। ছেলে বড় হয়ে এইসব দেখে আত্মহত্যা করে। ঐ মহিলাও পাগল হয়ে কোথাও চলে যায়। এই ঘটনার কথা মনে করে ঐ মহিলা (রমো বাঈ) ভাশুর বা দেবরের সাথে বিবাহ না করে ছেলে কর্মপালকে লালন পালন করে বড়ো করে। কিছু জমি ছিল তাতে পরিশ্রম করে চাষ-বাস করতো এবং গাভী পালন করতো। ছেলেকে খুব আদর যত্ন করে ঘি-দুধ খাইয়ে বড় করে। চিন্তা করতো ছেলে বড় হলে তার বিবাহ দেব, সে সংসারের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আমার জীবনে শান্তি আসবে। কিন্তু সৎসঙ্গ ছাড়া জ্ঞান হয় না, জ্ঞান সদগুরুই দেন। ভক্তি ছাড়া জীব সুখী হতে পারে না, সে যত বড়ই ধনী হোক না কেন। মাথার উপর পিতা ছিল না, তাই মায়ের ভালবাসায় ছেলের বিগড়ানো স্বাভাবিক। মায়ের স্বভাব সন্তানকে যেকোনো মূল্যে সুখী করা। কথায় বলে রাণ্ডু (বিধবা) এর ছেলে আর রণ্ডুয়ে (বিধুর) এর মেয়ে ভবঘুরে (আওয়ারা) হয়। কারণ পিতা কাজের ঝামেলায় মেয়ের গতিবিধির উপর নজর দিতে পারে না। আর মা ছেলের গতিবিধি বা চাল চলন দেখে না। মা মেয়েকে নিজের সাথে রাখে। যে কারণে কর্মপাল নেশা করতে লাগে। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে ঘর থেকে ধান,গম ইত্যাদি বের করে নিয়ে বিক্রি করে নেশা করত। মা দিন রাত কাঁদতো আর চিন্তা করতো এ আমার কেমন কর্মফল, যা চিন্তা করেছিলাম তার উল্টো হচ্ছে। এই চিন্তায় চিন্তায় রোগা হয়ে গিয়েছিল। ভক্তমতি কস্তুরী এক দিন রামোর (রাম প্যায়ারীর) বাড়িতে আসে। প্রথমে কুশল মঙ্গল জিজ্ঞাসা করে বলে, ছেলে কি করছে? ছেলে কেমন আছে? এই কথা শুনে রামপ্যায়ারী কান্না শুরু করে। আর বলে, ভালো নেই। ছেলে এক নম্বরের আওয়ারা হয়েছে। কোন কথা শোনে না, নেশা করে। আমি কিছু বললে গালাগালি দেয়। আপনি তো জানেন পরিবার ও গ্রামের লোকেরা আমার উপর কত জোর করেছিল ভাসুর (স্বামীর বড় ভাই) কে বিবাহ করার জন্য। আমি রাজবন্তীর কথা মনে করে ছেলেকে সুখী দেখার জন্য পুনরায় বিবাহ করিনি। আজ সেই ছেলে ওর থেকেও বেশি দুঃখ দিচ্ছে। ইচ্ছা করে কোথাও চলে যাই। না হয় আত্মাহত্যা করি। ভক্তমতী কস্তুরি বলে বোন এসব কথা চিন্তা করাও পাপ। তুমি মরে গেলে তোমার পরিবারের লোকেরা ছেলেকে নেশা করিয়ে মেরে ফেলবে। আর কাকা জ্যাঠারা সমস্ত জমি দখল করে নেবে। তাই এই সমস্ত চিন্তা না করে এক কাজ করো। আমার সঙ্গে সৎসঙ্গে চলো, একা থাকলে মনে এরূপ খারাপ বিচার আসতেই থাকবে। রামপ্যায়ারী বলে না বোন, না, নগরের মানুষ আমাকে সন্দেহের চোখে দেখে। কেউ কোন কাজে আমার বাড়ি আসলে আশেপাশের লোক ছাদের উপর উঠে এক চোখে দেখে। তোমার মাথার উপর তোমার স্বামী আছে। যদি আমি সত্সঙ্গে যাই তাহলে আমার বাঁচা মুশকিল করে দেবে তখন আমাকে মরতে হবে। আরে বোন! তুই কি মনে করে আজ সকাল সকাল আমার বাড়িতে এসেছিস? কস্তুরী বলে তুমি তো জানো আমার গুরুদেব এখন আশ্রমে আছে। আজ আমাকে

গুরুদেবের খাবার নিয়ে যাওয়ার দিন। বোন ক্ষীর বানাচ্ছিল ভেবেছিলাম আমিও ক্ষীর বানাবো। কিন্তু দুধ সব নষ্ট হয়ে গেছে। তাই আমাকে একটু দুধ ধার দাও কাল দিয়ে দেব। এই কথা শুনে রামপ্যায়ারীর শরীর আনন্দে শিউরে উঠে আর বালতিতে রাখা সব দুধ কস্তুরির বালতিতে ঢেলে দেয়। কস্তুরি বলে, বোন সব দিও না তুমি একটু রাখো। রামপ্যায়ারী বলে বোন জানিনা কোন জন্মের পুণ্য কর্মের ফল। আমার মত দুর্ভাগ্যের দুধ আজ পুণ্যের কাজে লাগবে। তুমি সব দুধ নিয়ে যাও আর সন্ত ভক্তদের ভোজন করাও। কস্তুরী আশ্চর্য হয়ে যায়। চিন্তা করে আমি সত্‌সঙ্গী হয়েও সব দুধ কোন মতে দিতে পারতাম না। এক কিলো দু-কিলো রেখে দিতাম। বোন রামোকে সত্‌সঙ্গের প্রেরণা দিতেই হবে। ঐ দিন কস্তুরির সময় ছিল না। তাই চলে যায়। পরের দিন ১০-১১-টায় সময়ে রামপ্যায়ারীর বাড়িতে আসে। গ্রামে মহিলারা ১২-টা থেকে ২-টা পর্যন্ত কথা বলার সময় পায়। দুই ঘন্টা পর্যন্ত সতসঙ্গের প্রবচনের শোনা কথা রামপ্যায়ারীকে শোনায়। কিন্তু লোক লজ্জার ভয়ে রামপ্যায়ারী মানতে রাজী হচ্ছিল না। ভক্তিমতি কস্তুরি বলে, তুমি মীরাবাঈ-এর নাম শুনেছো? রামপ্যায়ারী বলে হ্যাঁ শুনেছি। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি করত। কস্তুরি বলে, সে ঠাকুর পরিবারে জন্ম নিয়েছিল। আর ঠাকুর পরিবারের মেয়ে বৌ'দের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু মীরাবাঈ কোন বাধা মানত না। কৃষ্ণ মন্দিরে পূজা করতে যেত। পরে রাজার সঙ্গে বিবাহ হয়। রাজা রানা ধার্মিক বিচারের ছিল। তাই মীরাবাঈকে মন্দিরে যেতে মানা করেনি। লোক চর্চা থেকে বাঁচার জন্য মীরাবাঈয়ের সাথে তিন-চার জন দাসী পাঠাতো। সব ঠিকঠাক চলছিল। কয়েক বছর পরে মীরার পতির মৃত্যু হয়। রাজসিংহাসনে দেবর বসে। রাজ-বংশের লোকজনের কথা মত মীরাকে মন্দিরে যাওয়ার জন্য মানা করে। কিন্তু মীরাবাঈ কারো কথা শোনে না। সেই জন্য রাজা মীরাকে মারার ষড়যন্ত্র করে। রাজা চিন্তা করে মীরার মৃত্যুও হবে আর আমার বদনামও হবে না। রাজা বিচার করে কি করে মারবে! তাই রাজা এক সাপুড়েকে বলে, একটি এমন সাপ ডিব্বায় বন্ধ করে নিয়ে এসো যে ডিব্বা খুলতেই সাপ ছোবল মারবে আর ঐ ব্যক্তি মারা যাবে। সাপুড়ে রাজার কথামতো একটি বিষাক্ত সাপ নিয়ে আসে। রাজার ছেলের জন্মদিন ছিল। আত্মীয়স্বজন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করে। রাজা দাসীকে সাপের বাক্স দিয়ে বলে এর ভিতরে খুব দামী হার আছে। আজ আমার ছেলের জন্মদিন, আত্মীয় স্বজনেরা আসবে। মীরাকে বল সুন্দর কাপড় পরে এই হার গলায় পরতে। তা না হলে, আত্মীয়রা বলবে বৌদিকে ভালভাবে রাখে না। আমার সম্মানহানী হবে। দাসী ঐ অলংকারের বাক্স নিয়ে মীরাবাঈকে দেয় আর রাজার আদেশ শোনায়। ঐ বাক্সে কাল নাগ ছিলো। মীরা দাসীর সামনে বাক্স খোলে। বাক্সে হীরা মোতি দিয়ে বানানো হার ছিল। মীরা চিন্তা করে যদি হার না পরি তাহলে বৃথা ঝগড়া হবে। আমার জন্য এটাতো মাটি। এই কথা চিন্তা করে মীরা হার গলায় পরে। রাজার উদ্দেশ্য ছিল আজ সাপের কামড়ে মীরার মৃত্যু হবে। সবার বিশ্বাস হবে রাজার কোনো হাত নাই। আমাদের সামনে সাপের দংশনে মীরার মৃত্যু হয়েছে। কিছু সময় পরে রাজা, মন্ত্রী ও কিছু আত্মীয়দের সাথে নিয়ে মীরার মহলে যায়। মীরার গলায় সুন্দর হার দেখে রাজা ক্রোধিত হয়ে মীরাকে বলে চরিত্রহীন নারী এই হার তোকে কে দিয়েছে? মীরার চোখে জল চলে আসে আর বলে আপনি দাসীর কাছে যে হার পাঠিয়েছিলেন এ সেই হার। রাজা দাসীকে ডেকে বলে হারের ডিব্বা কোথায়? দাসী পালঙ্কের নীচ থেকে বের করে দেখায়। রাজা দেখে আর চলে যায়। রাজা চিন্তা করে এবার আমি নিজের হাতে বিষ খাওয়াবো। যদি না খায় তাহলে শিরোচ্ছেদ করবো।

## মীরাকে বিষ দিয়ে মারার ব্যর্থ চেষ্টা

রাজা এক সাপুড়ের থেকে ভয়ঙ্কর বিষ আনে, ঐ বিষ জিভে দেওয়া মাত্র মৃত্যু নিশ্চিত। রাজা মীরাকে বলে এই বিষপান কর। অন্যথায় এই তলোয়ার দিয়ে তোর গলা কাটা হবে। মীরা চিন্তা করে গলা কাটলে কষ্ট বেশি হবে। তার থেকে ভাল বিষ পান করি। মীরা পরমাত্মাকে স্মরণ করে বিষের কাপ নিয়ে বিষ পান করে। কিন্তু মীরার কিছুই হয় না। রাজা সাপুড়েকে ডেকে বলে তুই নকল বিষ দিয়েছিস। সাপুড়ে বলে না মহারাজ আমি সব থেকে ভয়ংকর বিষ দিয়েছি, পেয়ালা কোথায়? ঐ পেয়ালায় দুধ দিয়ে একটি কুকুরকে খেতে দেয়। দ্বিতীয়বার দুধে জিহ্বা লাগানোর আগে কুকুরের মৃতু হয়।

রাজার সর্ব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর রাজা চিন্তা করে এর মৃত্যু নেই। আর মন্দিরে যাওয়াও বন্ধ করবে না। তাই রাজা দাসীদের আদেশ দেয় মীরার সাথে মন্দিরে যাওয়ার জন্য। যাতে কেউ কটু কথা বলতে না পারে।

## "মীরা সদগুরুর শরণ পায়"

যে কৃষ্ণমন্দিরে মীরাবাঈ পুজা করতে যেত ঐ পথে একটি ছোট বাগান ছিল। ঐ বাগানে গাছের ছায়ায় পরমেশ্বর কবীর জী ও সন্ত রবিদাস সতসঙ্গ করতো। সকাল প্রায় ১০টার সময় ছিল। মীরাবাঈ দেখে ওখানে পরমাত্মার কথা চর্চা হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরমাত্মার চর্চা শুনি।

পরমেশ্বর কবীর জী সত্সঙ্গে সৃষ্টি রচনার জ্ঞান শোনায় এবং বলে শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ বিষ্ণুর উপর অন্য সর্বশক্তিমান পরমাত্মা আছে। জন্ম মৃত্যু যদি সমাপ্ত না হয় তাহলে ভক্তি করা না করার সমান। শ্রীকৃষ্ণ (বিষ্ণু) স্বয়ং জন্ম মৃত্যুতে আছে। তার পূজারী কিভাবে মুক্তি প্রাপ্ত করবে? হিন্দু সাধু সন্তরা বলে, গীতার জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ বিষ্ণু অর্জুনকে দিয়েছিল। গীতাজ্ঞান দাতা গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২, অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫, অধ্যায় ১০ শ্লোক ২-এ স্পষ্ট করে বলে, হে অর্জুন! তোর আর আমার অনেক জন্ম হয়েছে তুই জানিস না আমি জানি। এতে প্রমাণিত হয় শ্রীকৃষ্ণের জন্মমৃত্যু হতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ (বিঃ) অবিনশ্বর না। তাই গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে গীতাজ্ঞান দাতা বলছে হে ভারত! তুই সর্ব ভাবে ঐ পরমেশ্বরের শরণে যা। ঐ পরমেশ্বরের কৃপায় তুই সনাতন পরম ধাম তথা পরম শান্তি প্রাপ্ত করবি।

পরমেশ্বর কবীর জীর মুখ কমল থেকে এই সত্য বচন শুনে, পরমাত্মার জন্য ভ্রমিত হওয়া আত্মা নতুন আলোর (জ্ঞানের) সন্ধান পায়। সত্সঙ্গ শেষে মীরাবাঈ প্রশ্ন করে, হে মহাত্মা জী! যদি তোমার আজ্ঞা হয় এক শঙ্কার সমাধানের জন্য প্রার্থনা করি?

কবীরজী বলেন, প্রশ্ন করো বোন!

**প্রশ্ন**:- হে মহাত্মাজী! আজ পর্যন্ত আমি কোন সাধু সন্তের কাছে শুনিনি যে, শ্রীকৃষ্ণের উপরে কোন ভগবান আছে। আপনার মুখে শুনে আমি সন্দেহ মুক্ত। আমি জানি সন্ত মিথ্যা বলে না। পরমেশ্বর কবীরজী বলেন, এসব ধার্মিক অজ্ঞানী গুরুদের দোষ, সদ গ্রন্থের জ্ঞান তাদের নিজেদের নেই, আর অন্যকে জ্ঞান দেয়। দেবী পূরাণের তৃতীয় স্কন্দে, শ্রী বিষ্ণুজী নিজে স্বীকার করেছে আমি (বিষ্ণু), ব্রহ্মা ও শংকর নাশবান। আমাদের আর্বিভাব (জন্ম) ও তিরোভাব (মৃত্যু) হতে থাকে।

মীরাবাঈ বলে হে মহারাজ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন দেয়। আমি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলি। কবীরজী বলেন হে মীরাবাঈ! তুমি এক কাজ কর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা কর, আপনার উপর আর কোন ভগবান আছে? শ্রীকৃষ্ণ কখনো

মিথ্যা বলবে না। মীরাবাঈ চিন্তা করে শ্রীকৃষ্ণের উপর যদি অন্য কোন পরমাত্মা হয় তাহলে আমি পাগল হয়ে যাব। রাত্রে মীরাবাঈ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করে। ত্রিলোকনাথকে মীরা নিজের শঙ্কার সমাধানের জন্য প্রার্থণা করে। ত্রিলোকী নাথ শ্রী কৃষ্ণ প্রকট হন। মীরা বলে, হে প্রভু! আপনার উপর অন্য কোন পরম শক্তি পরমাত্মা আছে? শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মীরা, পরমাত্মা তো আছেন, কিন্তু কাউকে দর্শন দেন না। আমি অনেক সমাধী, সাধনা করে দেখেছি। মীরাবাঈ সতসঙ্গে কবীর পরমাত্মার মুখে শুনেছিল, ঐ পরমাত্মাকে আমি প্রত্যক্ষ দেখাব এবং সত্য সাধনা করিয়ে ঐ পরমাত্মার কাছে সতলোকে পাঠিয়ে দেব। মীরা শ্রীকৃষ্ণকে আবার প্রশ্ন করে, হে ভগবান! আপনি জীবের জন্ম-মৃত্যু সমাপ্ত করতে পারেন? শ্রীকৃষ্ণ বলে ইহা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। কবীরজী বলেছিলেন, আমার কাছে এমন মন্ত্র আছে যাতে জন্ম-মৃত্যু চিরদিনের জন্য সমাপ্ত হয়ে যাবে এবং ঐ পরমধাম প্রাপ্ত হবে, যার বিষয়ে গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোকে ৪ এ বলেছে তত্ত্বজ্ঞান তথা তত্ত্বদর্শী সন্ত প্রাপ্তির পরে পরমাত্মার ঐ পরমধামকে খোঁজ করা উচিত, যেখানে যাওয়ার পর সাধক পুনরায় এই সংসারে ফিরে আসে না। ঐ এক পূর্ণ পরমাত্মার ভক্তি কর। মীরাবাঈ বলে, হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সন্তজী বলেছিলেন, তিনি জন্ম মরণ সমাপ্ত করে দেই। এখন আমি কি করবো? আমি পূর্ণ মোক্ষ চাই। তখন শ্রীকৃষ্ণজী বলে মীরা! ঐ সন্তের শরণ গ্রহণ করো এবং নিজের কল্যাণ করাও। আমার যতটা জ্ঞান ছিল বলে দিয়েছি। মীরা পরের দিন আর মন্দিরে যায়নি। সোজা দাসীদের সাথে ঐ সন্তের কাছে যায়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বার্তালাপের কথা কবীরজীকে বলে এবং নাম দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে।

ঐ সময় ছোঁয়াছুঁয়ি চরম পর্যায়ে ছিল, ঠাকুররা (রাজপুত) নিজেদের সর্বোত্তম মনে করতো। মান বড়াই বা অহংকার করা প্রাণীরা পরমাত্মাকে পায় না। মীরাবাঈয়ের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সন্ত রবিদাসজীকে বলে, তুমি মীরাবাঈ রাঠোরকে প্রথম মন্ত্র দাও। এ আমার আদেশ। সন্ত রবিদাস আদেশ পালন করেন, সন্ত কবীর পরমাত্মা মীরাবাঈকে বলে, ঐ যে সন্ত বসে আছেন, ওনার কাছে থেকে নাম উপদেশ নিয়ে নাও। মীরাবাঈ রবিদাসজীর কাছে গিয়ে বলে, সন্তজী! দীক্ষা দিয়ে কল্যাণ করান। সন্ত রবিদাসজী বলে পুত্রী! আমি চামার জাতির আর তুমি ঠাকুরের মেয়ে। তোমার সমাজের লোক তোমাকে ভালো মন্দ বলে নিন্দা করবে। সমাজের জাতি থেকে বের করে দেবে। তুমি ভালভাবে বিচার এবং চিন্তা করে দেখো। মীরাবাঈ -এর অধিকারী আত্মা ছিল। তাই মীরাবাঈ পরমাত্মার জন্য সর্বদা মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকতো। মীরা বলে সন্তজী! আপনি আমার পিতা, আর আমি আপনার মেয়ে। আমাকে দীক্ষা দিন। ডুবে মরুক এমন সমাজ! কাল যখন কুকুর হয়ে ঘুরে বেড়াব তখন ঠাকুর সমাজ আমার কি করবে? সত্সঙ্গে বড় গুরুজী (কবীরজী) বলেছে:-

**কবীর, কুল করনীকে কারণে, হংসা গয়া বিগোয়।**
**তব কুল ক্যা কর লেগা, জব চার পাও কা হোয়॥**

**শব্দার্থ:**- কবীর পরমাত্মা সতর্ক করছেন যে, হে ভক্ত আত্মা (স্ত্রী-পুরুষ), যে পরিবার লোক লজ্জার ভয়ে ভক্তি করে না, বলে নাম দীক্ষা নিলে বা দণ্ডবৎ প্রণাম করলে অন্য ব্যক্তিরা উপহাস করে বলবে, তুমি দেবী দেবতাদের পূজা করো না, শ্রাদ্ধ-পিণ্ডদান করো না, তোমার লজ্জা করে না? ঐ ব্যক্তি তার নিজের মানব জীবন নষ্ট করছে। ভক্তি না করার জন্য মৃত্যুর পরে কুকুর, গাধা, শুকর ইত্যাদি চার পায়ের পশু যোনীতে যাবে তখন সংসারের ঐ ব্যক্তিরা তোমার কি উপকার করবে? এই জন্য ভক্তি করা অতি আবশ্যক।

সন্ত রবিদাসজী উঠে গিয়ে কবীরজীর পাশে গেলেন আর মীরাবাঈ এর সব কথা বললেন। পরমাত্মা কবীরজী বললেন দেরি না করে ঐ ভক্ত আত্মাকে শরণে নিয়ে নাও। তখন রবিদাসজী মীরাবাঈকে প্রথম মন্ত্রের পাঁচ নাম দান করেন। {এই পাঁচ নাম জপ করলে শরীরের কমল গুলি খোলে, রাধাস্বামী পন্থের এবং দামাখেড়া গদ্দী থেকে দেওয়া পাঁচ মন্ত্র থেকে ভিন্ন এই মন্ত্র মোক্ষদায়ী} মীরাবাঈকে বলেন, এই মন্ত্রগুলি এনাদের পূজা নয়, সাধনা। এনাদের লোকে থাকার জন্য, খাওয়া-দাওয়ার জন্য যে সুবিধা চাই তা এই মন্ত্রে মিলতে থাকবে। এখানের ঋণ শোধ হওয়ার পরে মুক্তির অধিকারী হবে। পরমাত্মা কবীর সাহেব ও রবিদাস ওখানে এক মাস থাকে। মীরা আগে দিনের বেলায় বাড়ির বাইরে যেত। এখন রাত্রেও সত্সঙ্গে যাওয়া শুরু করে। কারণ সত্সঙ্গ রাত্রেই বেশি হয়। দিনের বেলায় ভক্তরা সময় পায়না তাই রাত্রে সত্সঙ্গ হত। মীরার দেবর রানাজী, মীরাকে রাত্রে সত্সঙ্গে যেতে দেখে ক্রোধের আগুনে জ্বলতে লাগে কিন্তু মীরাকে আটকানো আর তুফানকে আটকানো সমান ছিল। তাই রাজা রাণা নিজের মাসি অর্থাৎ মীরার মাকে ডাকে, মীরাকে বোঝানোর জন্য বলে। রাজা বলে এ আমাদের মান সম্মান সব শেষ করে দিচ্ছে। মীরার মা মীরাকে বোঝায়। কিন্তু মীরা সাথে সাথে প্রত্যেক কথার উত্তর দেয়-

**"শব্দ"**

**সৎসঙ্গ মেঁ জানা মীরাঁ ছোড় দে এ, আয়ে ম্হারী লাগে করেঁ তকরার।**
**সত্সঙ্গ মেঁ জানা মেরা না ছুটৈ রী, চাহে জলকৈ মরো সংসার॥ টেক॥**
**থারে সতসঙ্গ কে রাহে মৈঁ য়ে আহে বহাঁ পৈ রহতে হৈঁ কালে নাগ,**
**কোএ কোএ নাগ তনৈ ডস লেবৈ। জব গুরু ম্হারে মেহর করেঁ রী,**
**আরী বৈ তো সর্প গণ্ডেবে বন জাবেঁ॥ ১॥**
**থারে সতসঙ্গ কে রাহে মেঁ এ, আহে বহাঁ পৈ রহতে হৈঁ ববরী শের,**
**কোএ-কোএ শের তনৈ খা লেবৈ। জব গুরুআঁ কী মেহর ফিরৈ রী,**
**আরী ব তো শোরাং কে গীদড় বন জাবৈঁ॥ ২॥**
**থারে সত্সঙ্গ কে বীচ মেঁ এ, আহে বহাঁ পে রহতে হৈঁ সাধু সন্ত,**
**কোএ-কোএ সন্ত তনৈ লে রমৈ এ। তেরে রী মন মৈঁ মাতা পাপ হে রী,**
**সন্ত মেরে মাঁ, বাপ হৈঁ রী, আ রী য়ে তো কর দেঙ্গে বেড়া পার॥ ৩॥**
**ব তো জাত চামার হৈ এ, ইসমৈঁ ম্হারী হার হৈ এ।**
**তেরে রী লেখৈ মাতা চমার হৈ রী, মেরা সিরজনহার হৈ রী।**
**আরী বৈ তো মীরাঁ কে গুরু রবিদাস॥ ৪॥**

**শব্দার্থ:-** মীরাবাঈ এর মা মীরাকে বলে, হে মীরা! তুই সতসঙ্গে যাওয়া বন্ধ করে দে। সংসারের ব্যক্তিরা আমাদের বিষয়ে খারাপ কথা বলে। মীরা বলে, হে মা! সংসারের মানুষ যদি হিংসার আগুনে জ্বলে মারা যায় তাহলেও আমি সতসঙ্গে যাওয়া বন্ধ করতে পারব না। মীরাকে ভয় দেখানোর জন্য মা বলে, তুই রাতে যে রাস্তা দিয়ে সৎসঙ্গে যাস সেই রাস্তায় সাপ ও সিংহ আছে, ওরা তোকে মেরে ফেলবে। মীরা বলে আমার গুরু এতটা সমর্থ যে, তিনি কৃপা করলে সিংহও শৃগালের মত ব্যবহার করবে। আর সর্প নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। যেমন তক্ষক ৬-৭ ইঞ্চি লম্বা এবং আধা ইঞ্চি গোলাকার হয় তারা কামড়ায় না। সৎসঙ্গ স্থানে পুরুষ ভক্তরাও যায় কেউ তোকে নিয়ে গিয়ে খারাপ ব্যবহার করবে। মীরা উত্তর দেয় হে মা! তোমার মনে দোষ ভাব আছে, তাই তোমার মনে এই ধরনের খারাপ বিচার এসেছে। ঐ সন্ত ও ভক্ত আমার মাতা-পিতার সমান। তারা এমন খারাপ কর্ম করে না। অস্পৃশ্যতা বা ছোঁয়াছাতের জন্য মীরার মা

মীরাকে বলে, তোর গুরু রবিদাস নীচু চামার জাতির। এই জন্য আমাদের রাজপুত জাতির অপমানিত হতে হচ্ছে। সৎসঙ্গে যাওয়া বন্ধ করে দে। হে মা! আপনার বিচারে আমার গুরু নীচু জাতির হতে পারে কিন্তু আমার জন্য রবিদাস জী আমার গুরু আমার পরমাত্মা। আমি ওনার মেয়ে আর উনি আমার পিতা। তাই সৎসঙ্গে যাওয়া বন্ধ হবে না।

মীরাবাঈয়ের কথা শুনে রামপ্যায়ারীর চোখ খুলে যায়। পরের দিন কস্তুরির সঙ্গে সৎসঙ্গে যায়। আর একদিন সত্সঙ্গ শুনতেই দীক্ষা নেয়। রামপ্যায়ারী একদিন ভোজনের সেবা চায়। কিন্তু কেউ নিজের সেবা ছাড়তে চায় না। তারা বলে পরবর্তীতে গুরুজী যখন আসবে তখন তোমার সেবা লাগবে। ভক্তমতী রামপ্যায়ারীর এক দিনের দেরি সহ্য হচ্ছিল না, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। চোখে জল ছলছল করতে লাগে। তখন কস্তুরী বলে, বোন যেদিন আমার খাবার দেওয়ার দিন আসবে ঐদিন তুমি গুরুজীকে রাত্রের খাবার দিও, আমি সকালের খাবার দেব। রামপ্যায়ারী খুব খুশি হয়। নির্দিষ্ট দিনে রামপ্যায়ারী ক্ষীর হালুয়া, পুরী, তরকারী, ভাত, পাতলা রুটি বানায় কিন্তু সদগুরুর লীলা, রামপ্যায়ারীর খুব জ্বর আসে। শরীরে আগুনের মতো জ্বালা শুরু হয়। এক পা-ও চলার হিম্মত নেই। ঐ সময় রামোর ছেলে বাড়িতে আসে। ভক্তিমতি রামপ্যায়ারী বলে পুত্র! আজ আমার একটা কাজ করে দে, তাহলে সারাজীবন তোর এই কাজের কথা মনে রাখবো। আমি গুরুধারণ করেছি। তোর জ্যেঠিমা নিজের সেবা ভাগ করে আমাকে সেবা করার সুযোগ করে দিয়েছে। আমার খুব জ্বর। এক পা-ও চলতে পারছি না। শরীর আগের মতো জ্বলে যাচ্ছে। ছেলে বলে আমার সময় নেই আমি ঐ আশ্রমে যেতে পারবো না। তুমিও ঐ আশ্রমে যাওয়া বন্ধ করো। তোমার জন্য আমাকে লোকের কথা শুনতে হয়। ছেলের কথা শুনে ভক্তিমতি রামপ্যায়ারী কাঁদতে লাগে। মায়ের কান্না দেখে ছেলের মনে দয়া আসে, কিন্তু তাও ধমকির সুরে বলে, কোথায় ভোজন, দাও দিয়ে আসছি। রামপ্যায়ারী অনেক কষ্টে উঠে সব ভোজন (খাবার) বেঁধে দেয়। ছেলে ঐ ভোজন একটি ধামায় করে নিয়ে আশ্রমে যায়। রামপ্যায়ারী গুরুজীর কাছে বারবার প্রার্থনা করে গুরুজী ছেলে নেশা করে। কোন কথা শোনে না। বাড়ি ঘরের অবস্থা খারাপ করে রেখেছে। আপনার শরণে নিয়ে নাও মহারাজ! ছেলেকে আশ্রমে দেখে অন্য ভক্ত, ভক্তিমতিরা বলতে লাগে গুরুজী রামপ্যায়ারীর প্রার্থণা শুনেছে। আজ ছেলে নিজে খাবার নিয়ে এসেছে। গুরুজী জানার পরে খুশি হয়ে বলে, পুত্রী রামপ্যায়ারী ঘর এবার ভগবানের কৃপায় ভাল হবে। ছেলে বলে, মহারাজজী! আমার মায়ের জ্বর হয়েছে, তাই আমাকে পাঠিয়েছে। ভোজন করো। সন্তজী ভোজনের জন্য বসে। আর চিন্তা করে ছেলে প্রথমবার এসেছে ওকে একটু জ্ঞানের কথা শোনাই। সন্তজী বলে পুত্র! মাতা-পিতার সেবা করতে হয়। মুক্তির জন্য গুরু ধারন করে ভক্তি করতে হয়। নেশা খুব খারাপ জিনিস। অনেক ধনী ব্যক্তিরা নেশা করে নিজের জীবনের সর্বনাশ করেছে। ছেলের এক মুহুর্তও দেরি সহ্য হচ্ছিল না। সন্তজীর প্রত্যেক কথা সুঁচের মত বিঁধছিল। কারণ আজ রাত্রে সাথীদের সাথে রাজার ঘরে চুরি করতে যাবে। রাত ১২ টার সময় শহরের বাইরে মন্দিরে সব সাথীদের এক জায়গা হওয়ার কথা। ওখান থেকে এক সঙ্গে রাজার ঘরে চুরি করতে যাবে। ছেলে চিন্তা করছিল রানীর দামী দামী হার চুরি করে আনবো, আর মালামাল হয়ে যাব। ছেলে বিরক্ত হয়ে বলে বাবাজী! তাড়াতাড়ি ভোজন খাও। আমার জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। এই শব্দ সন্তজীর ভালো লাগেনি। তাই মনে মনে চিন্তা করে রামো আসলে এই শয়তানের জন্য খুবই দুঃখী। ভোজন শেষ হতেই, থালা বাটি না ধুয়ে ধামা মাথায় নিয়ে দ্রুত গতিতে চলে যায়। অর্ধেক রাস্তা যাওয়ার পরে ঐ ছেলের পায়ে দুই/তিন

ইঞ্চি লম্বা লোহার পেরেক ঢুকে যায়। পায়ের ব্যথায় ঠিকমত চলতে পারছিল না। যেন তিন প্রকারে বাড়ি আসে। থালা ঘটি বাটি উঠনে ফেলে দিয়ে মাকে উল্টো-পাল্টা বেশি কথা বলতে লাগে। আজ তোর গুরুজীর দর্শন করতে গিয়েছি আর আজই আমার ভাগ্য বরবাদ হয়ে গেল। আমার পায়ে কাঁটা ফুটেছে আমি চলতে পারছিনা। আমি আর ঐ দিকে মুখ করেও শোবো না। রামপ্যায়ারীর জ্বর একটু কমেছে। বিছানা থেকে উঠে ছেলের পা পরিষ্কার করে তেলের খোল (তেলের নিচে জমে থাকা ময়লা) দিয়ে পটি বেঁধে দেয়। আর বলে সকালে কাঁটা বের করে দেব। কর্মপালের এমন মনে হচ্ছিল যে চোরদের সঙ্গে সামিল না হওয়ার কারণে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেল। তাই না ঘুমানো পর্যন্ত বক-বক করতে থাকে। সকাল বেলা মা কর্মপালের পায়ের কাঁটা বের করে দেয়। আর মাতা রামো নিজের কাজে মন দেয়। কিছু সময় পরে ব্যাণ্ড বাজার শব্দ আসে। শহরের লোকরা জানতো যে যদি কারো মৃত্যুর সাজা হয় তখন এরূপ এই ব্যাণ্ড বাজানো হয়। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের নিজের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগে, কি কারণে কাকে শুলে চড়ানো হচ্ছে? রাজার সৈনিকরা ঐ চার চোরকে দিয়ে বলাচ্ছে, "আমরা রাজার ঘরে চুরি করতে গিয়েছিলাম। আমরা ঘোর অপরাধ করেছি। আজ আমাদের শূলে চড়ানো হবে। আপনারা ধ্যান দিয়ে শুনুন এ অপরাধ কেউ করবেন না।" বন্ধুদের চিনতে কর্মপালের দেরি হয়নি! আর ঘটনা বুঝতেও বাকি নেই। রামপ্যায়ারী বলে, ভালো হয়েছে, আর করবি চুরি? তোমাদের এই রকম সাজা হওয়া উচিত। কাজ করে খেতে কষ্ট হয়? রামো নিজের বাড়ি চলে যায়। কর্মপাল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগে। মাকে দেখে ঘরের ভিতরে গিয়ে অঝোরে কান্না শুরু করে। রামপ্যায়ারী জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে? কাঁটা তো বের করে দিয়েছি। কাঁটায় ব্যথা হচ্ছে নাকি? কর্মপাল মাকে জড়িয়ে ধরে। আর বলে, মা! ভগবান তোমার গুরুদেবের ভালো করুন। যিনি তোমার ছেলের শুলের সাজা একটি কাঁটা দিয়ে শোধ করে দিয়েছে। মা, আজ তোমার ছেলের শুলের সাজা হত। তুমি কি করে বাঁচতে? রামা বলে, আমার ছেলে কি চোর? কেন শূলিতে যাবে আমার ছেলে? চোরদের শূলির সাজা হয়। কর্মপাল বলে, হ্যাঁ মা! তোমার ছেলে চোর ছিল। আজ আমি প্রতিজ্ঞা করছি, কোনদিন ভুলেও নেশা করবো না। তোমার সাথে সৎসঙ্গে যাব আর জমিতে কাজ করবো। আমি আর আমার মাকে দুঃখী করবো না। রামপ্যায়ারী বলে, আরে নিকম্মা! চুরি করতেও লেগেছিস। ছেলে বলে হ্যাঁ মা আমি পাক্কা চোর হয়ে গিয়েছিলাম। ধন্য তোমার গুরুদেব, ধন্য আমার মা..যে এমন মহাপুরুষের শরণ পেয়েছে। মা আজ চলো আজ আমাকে দীক্ষা দেওয়াও। রামপ্যায়ারী ছেলেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি কস্তুরির কাছে যায়। সব বৃত্তান্ত বলে। কস্তুরি নিজের কাজ ফেলে রেখে মা, পুত্রকে নিয়ে আশ্রমে যায় আর গুরুজীকে ধন্যবাদ দেয়। গুরুজী ছেলেকে নাম উপদেশ দেয়। কিছুদিন পরে অন্য গ্রামের এক সত্সঙ্গী পরিবারের মেয়ের সাথে বিবাহ দেয়। সমস্ত পরিবার সত্সঙ্গে যেতে লাগে। আর সুখ শান্তিতে বসবাস করতে লাগে।

রামপ্যায়ারী সতসঙ্গে ও সতভক্তিতে বিভোর হয়ে যায়। গুরুজী যখন আশ্রমে আসে, তখন রামপ্যায়ারী সকালে আশ্রমে যেত আর সন্ধ্যার পরে বাড়ি ফিরত। গুরুদেবের জামা কাপড় ধোয়া, আশ্রমের কাজকর্ম করা সবই করতো। সত্সঙ্গের একটা শব্দও ছাড়ত না। এক সময় ঠাণ্ডার দিন ছিল। সকাল ১০-টায় সৎসঙ্গ শুরু হয়। গুরুজী রামপ্যায়ারীকে বলে পুত্রী নদী থেকে বস্ত্র ধুয়ে নিয়ে এসো। রৌদ্র বেশি সময় থাকে না। সৎসঙ্গের শেষে রৌদ্র বেশিক্ষণ থাকবে না। রামপ্যায়ারী বালতি ভরে কাপড় নিয়ে নদীতে ধুতে যায়। বালতিতে সোডা ঢেলে কাপড় ভিজিয়ে রামপ্যায়ারী

চিন্তা করে, কাপড় ভালভাবে ভিজতে থাক, আমি ততক্ষণ সতসঙ্গ শুনে আসি। আশ্রম নদীর কাছে ছিল। আশ্রমের বাইরে দেওয়ালের সাথে কান লাগিয়ে রামপ্যায়ারী সতসঙ্গ শুনতে থাকে। যখন সত্সাহেব বলে গুরুজী সত্সঙ্গ সমাপ্ত করে দেয়, তখন রামপ্যায়ারীর মনে পড়ে কাপড় ধোয়া হয়নি। রামপ্যায়ারী ভয়ে নদীর কাছে দৌড়ে যায় আর ভাবে আজ গুরুজীর বচনের অবহেলা হবে। গুরুজী অসন্তুষ্ট হবেন। আমাকে বকাবকি করবেন। আমার সব সেবা ব্যর্থ হয়ে যাবে। হে ভগবান! এখন কি করি? এই চিন্তা করতে করতে নদীর ধারে বালতির কাছে যায়। কিন্তু বালতি খালি ছিল আর কাপড় ঝোপঝাড়ির উপর শুকাচ্ছিল। নদীতে অন্য যে মহিলারা কাপড় ধুয়ে শুকাচ্ছিল রামো তাদের বলে, বোন তোমরা এই কাপড় ধুয়ে শুকাতে দিয়েছো? তখন ঐ মহিলারা বলে, তুমি পাগল তো হওনি। তুমিই তো কাপড় ধুয়ে শুকাতে দিয়েছো। এতো জোরে জোরে কাপড় কাচছিলে যে আমাদের গায়ে ছিটে আসতে লাগে, তাই তোমাকে বলি আস্তে, আস্তে কাপড় পরিষ্কার করো। তুমি নিজে ঐ গাছের ঝোপের উপর কাপড় মেলে দিয়েছো। তুমি কি ভাঁঙ্গের নেশা করেছো? রামপ্যায়ারীর কান্না আসে, আর সব জামাকাপড় তুলে বালতি ভরে আশ্রমে চলে আসে। আশ্রমের এক সেবাদার রামপ্যায়ারীকে অনেকক্ষণ ধরে সতসঙ্গ শুনতে দেখেছিল। ঐ সেবাদার গুরুজীকে বলে আজ আপনার কাপড় শুকাবে না ভিজে থাকবে কারণ রামপ্যায়ারী দেওয়ালে কান লাগিয়ে সত্সঙ্গ শুনছিলো এখন যাচ্ছে কাপড় পরিষ্কার করতে। রামপ্যায়ারী আশ্রমে গিয়ে কাপড় গুরুজীর কাছে রেখে কান্না করতে লাগে। সন্তজী কাপড়ে হাত দিয়ে দেখে কাপড় সব শুকানো। গুরুজী বলে রামো কাঁদছো কেন? তখন রামো বলে হে সদগুরুদেব! আপনি দুঃখী হয়ে স্বয়ং কাপড় ধুয়েছেন, আমি ভুল করেছি। আমি চিন্তা করেছিলাম কিছুক্ষণ সতসঙ্গ শুনে কাপড় ধুয়ে দেব। কিন্তু আমি ভুলে যাই। গুরুজী বলে পুত্রী! পরমাত্মা কবীরজী রামপ্যায়ারী হয়ে কাপড় ধুয়েছে।

**জ্যোঁ বচ্চা গউ কি নজর মেঁ, য়ুঁ সাঁই কুঁ সঁন্ত।**
**ভক্তোঁ কে পীছে ফিরে, ভক্ত বৎসল ভগবন্ত॥**

**শব্দার্থ:-** যেমন গাভী নিজের বাচ্চার দিকে এক দৃষ্টিতে নজর রাখে যাতে পশু পাখী বা মানুষ বাচ্চার ক্ষতি না করতে পারে। এই প্রকার পরমাত্মা তার নিজের ভক্তদের উপর দৃষ্টি রাখে। গাভীর বাচ্চা যেমন লাফা লাফি করতে করতে অন্য দিকে দৌড়ে গেলে বাচ্চার সুরক্ষার জন্য গাভীও পিছনে পিছনে দৌড়ে যায়। নিজের ভক্তের হিতের জন্য এইরূপে পরমাত্মাও সর্বদা তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

পরমাত্মা ইব্রাহীম সুলতানকে নরক থেকে বাইরে বের করার জন্য দাসীরূপে শরীরে চাবুকের মার খেয়েছিল। পুত্রী দুঃখ করিস না, তোমার উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। পরমাত্মা সত্য ভাবের ভিখারী। তখন রামপ্যায়ারী শান্ত হয়। সত্সঙ্গে আসার কারণে রামপ্যায়ারী সুখী জীবন ব্যতিত করে ও মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

**কবীর, সতগুরু শরণ মেঁ আনে সে আঈ টলৈ বলা।**
**জৈ ভাগ্য মেঁ সূলী লিখি হো, কাঁটে মেঁ টল জায়॥**

**শব্দার্থ:-** সামর্থ কবীর পরমেশ্বরের কৃপা পাত্র সদগুরু থেকে দীক্ষা নেওয়া ভক্ত-ভক্তিমতিদের পরমাত্মা রক্ষা করেন। পূর্ব জন্মের পাপের কারণে যদি কোন ভক্ত আত্মার যন্ত্রনাদায়ক মৃত্যুদণ্ড লেখা থাকে তাহলে পরমাত্মা তা সমাপ্ত করে কিছু ছোট দণ্ড দিয়ে যেমন পায়ে কাঁটা ফুটে ঐ পাপ কর্ম নষ্ট করে দেয়। ভয়ঙ্কর দন্ডকে পরমাত্মা নাম মাত্র দন্ডে বদলে দেয়, যা খুব বড়ো ধরনের দন্ড ছিল।

## "চোর কখনো ধনী হতে পারে না"

কবীর পরমেশ্বর নিজের বিধান অনুসারে এক নগরের বাইরে আশ্রম বানিয়ে থাকতেন। কিছুদিন আশ্রমে থেকে সৎসঙ্গ করতেন। পরে ভ্রমনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসতেন। এক জাট কৃষক কবীরজীর শিষ্য হয়। কৃষক নির্ধন ছিল। ঐ কৃষকের কাছে একটি বলদ গরু ছিল। ঐ গরুকে অন্য কৃষকের গরুর সাথে মিলিয়ে জমির চাষবাস করতো। দুই দিন নিজের জমি চাষ করে পরে অন্য কিষাণের জমি চাষ করতো। আবার দুদিন অন্য কৃষক ঐ বলদ নিয়ে নিজের বলদের সাথে জুড়ে চাষ করতো। এইভাবে চলতে থাকে। কৃষক তার কাঁচা বাড়ির উঠানে গরু বেঁধে রাখতো। একদিন ঐ বলদ গরুটাকে চোর চুরি করে নিয়ে যায়। কৃষক খোঁজ করে না পেয়ে আশ্রমে গুরুজীর কাছে গিয়ে নিজের দুঃখের কথা বলে। গুরুদেবজী বলেন, পুত্র! পরমাত্মার উপর বিশ্বাস রাখ আর দান-ধর্ম-ভক্তি করো, পরমাত্মা তোমাকে দুটো বলদ গরু দেবেন। যে চুরি করেছে সে পাপের ভাগী হবে। পরমাত্মার কৃপায় ঐ সময় বৃষ্টি ভাল হয়, আর ভক্তের ফসলও চারগুন বেশি হয়। ভক্ত কৃষক দু'টি বলদ গরু কিনে এনে তাদের ভালো খাবার খাওয়ায়। বলদ গরু দুটি খুব শক্তিশালি ষাঁড়ের মতো হয়। গ্রামে মুখে মুখে ঐ গরুর চর্চা হতে লাগে। এক বছর পর পূর্বের সেই চোর ঐ এলাকায় চুরি করতে আসে। কোথাও চুরির কোন সুযোগ না পেয়ে চোর ঐ কৃষকের বাড়ি যায়। দেখে ষাঁড়ের মত দুটো গরু বাঁধা আছে। চোর গরু দুটো চুরি করে নিয়ে যায়। কৃষক জেগে ছিল তবুও ওনার বলদ চুরি হয়ে যায়। আবার গুরুজী কে গিয়ে বলে যে গুরুজী! আজ আবার চোর আমার দুটো বলদকে চুরি করে নিয়ে গেছে। কৃষক গুরুজীকে গিয়ে বলে, গুরুজী! আজ দুটো গরুই চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে। গুরুজী বলেন, চিন্তা করিস না ভগবান তোকে আরও চারটে গরু দেবে। চোর কখনো ধনী হতে পারে না। পাপের বোঝা বাড়াচ্ছে। পরমাত্মার দয়ায় আর গুরুদেবের আর্শিবাদে বৃষ্টিতে কৃষকের কপাল খুলে যায়। কারণ আগেকার দিনে ফসল বৃষ্টির উপর নির্ভর করতো। ভক্ত কৃষকের পর্যাপ্ত জমি ছিল। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে অল্প পরিমাণে ফসল ফলতো। বৃষ্টি ভাল হয় আর ফসলও খুব ভাল হয়। অন্য জমির ফসল থেকে ঐ কৃষকের জমির ফসল কয়েক গুন ভাল হয়। দুটি বলদ গরু নিজের টাকা দিয়ে কিনে আনে, আর দুটি গরু ঋন করে আনে। হাল চাষ করার জন্য একজন চাকর রাখে। এক বছরের ভিতর সমস্ত ঋন পরিশোধ করে দেয়। এখন কৃষকের ঘর পাকা আর ষাঁড়ের মতো শক্তিশালী দুই জোড়া হালের গরু রয়েছে। দুই বছর পরে ঐ চোর আবার চুরি করতে এসে ঐ কৃষকের অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। চোর দেখে ষাঁড়ের মত চার চারটি গরু শুয়ে আছে আর চোরের ঘরে মাত্র দুই দিনের খাবার আটা মজুত আছে। চোর আগের থেকে আর নির্ধন হয়ে গিয়েছে। চোর কৃষককে ঘুম থেকে জাগায়। কৃষক বলে, ভাই! তুমি কে? চোর বলে আমি চোর! আমি তোমার তিনটি গরু চুরি করেছিলাম। কৃষক বলে, ভাই আমাকে ঘুমাতে দাও তুমি তোমার কাজ করো। পরমাত্মা নিজের কাজ করছেন। চোর কৃষকের পা জড়িয়ে ধরে বলে, হে দেবতা! একটা কথা বলো, চোর তোমার সামানে এসেছে, তুমি তাকে না ধরে চলে যেতে বলছো। হে ভাই, প্রথমে তোমার বাড়ি একটি গরু ছিল। আমি তা চুরি করেছি। দ্বিতীয় বছর দুটো গরু বাঁধা ছিল আমি তাও চুরি করেছি। দুই বছর পর আজ চারটি ষাঁড়ের মত গরু তোমার উঠানে বাঁধা আছে। আর আমি আগের থেকে আরো নির্ধন হয়ে গিয়েছি। ছেলে মেয়ে না খেয়ে থাকে। তোমার যা ইচ্ছা আমাকে তাই করো। কিন্তু তোমার উন্নতির রহস্য আমাকে বলতেই হবে। আমিও জাঠ কৃষক আমারও জমি আছে। কিন্তু আমি গরীব, নির্ধন ও অসহায়। ভক্ত কৃষক বলে, তুমি স্নান করে

খাওয়া দাওয়া করো। চোর কৃষকের কথা মত স্নান করে ভাত খায়। পরে ঐ চোরকে নিয়ে ভক্ত কৃষক আশ্রমে গুরুজীর কাছে যায়। গুরুজীকে সমস্ত ঘটনা বলে। গুরুদেব চোরকে বোঝায়। ভক্ত কৃষক ঐ চোরকে ৭/৮ দিন নিজের ঘরে রাখে আর প্রতিদিন আশ্রমে নিয়ে গিয়ে সতসঙ্গ শোনায়। চোর গুরু দীক্ষা নেয়। গুরুজী বলেন, পুত্র! নতুন ভক্তকে একটি বলদ গরু ধার দাও। চাষ করে তোমার টাকা দিয়ে দেবে। ভক্ত বলে ঠিক আছে গুরুদেব। নতুন ভক্তকে কৃষক একটি গরু দেয়। নুতন ভক্ত প্রতি মাসে আশ্রমে সতসঙ্গ শুনতে আসে এবং পরিবারের সকলকে নাম উপদেশ দেওয়ায়। দুই বছরের মধ্যে ঐ ভক্তের আর্থিক স্থিতি ভাল হয়ে যায়। ঐ ভক্ত, প্রথমে চুরি করা তিনটি গরু এবং একটি ধার দেওয়া গরু এই চারটি গরুর টাকা আর পরিবারকে সাথে নিয়ে ঐ ভক্ত কৃষকের বাড়িতে আসে। চোর ভক্ত কৃষককে সব টাকা দিয়ে বলে, আমাকে মাফ করে দিও ভাই। তোমার উপকার আমি সাত জন্মেও শোধ করতে পারবো না। পুরানো ভক্ত বলে, হে ভাই! এসব সদগুরুদেবের কৃপা। গুরুদেবের বচনের ফল। তুমি এই সব টাকা গুরুজীকে দান করে দিও। গুরুদেব আমাকে আগে থেকেই অনেক কিছু দিয়ে রেখেছেন। এসব আমার কাজের নয়। দুই ভক্ত গুরুজীর কাছে গিয়ে সব ধনরাশি গুরুজীর চরণে অর্পিত করে দেয়। গুরুজী ঐ ধন ভোজন ভাণ্ডারা ও সত্সঙ্গে খরচ করে। "চোরের ধন বাটপারে খায়, আর ভক্ত সদা প্রফুল্লিত হয়।"

⇨ **"সংস্কার সংক্রামক রোগের মত চারিদিকে ছড়ায়" :-**

ভালো ও খারাপ সংস্কার সংক্রমক রোগের মত চারিদিকে ছড়াতে থাকে। ভক্তের হাতের তৈরি ফসলেও ভক্তির সংস্কার প্রবেশ করে। ঐ অন্ন যে খায় তার ভিতরও ভক্তির প্রেরণা হয়।

যদি নেশা করা ব্যক্তি বা অন্য বিচার মন্থন করে কেউ বীজ রোপন করে, তাহলে ঐ ফসলে ঐ বিচারধারা প্রবেশ করে। যদি কেউ ঐ অন্ন খায় তাহলে তাকে ঐ বিচার ধারাই প্রভাবিত করবে।

**উদাহরণ:-** এক মহিলা এক গুরুদেবের কাছ থেকে গুরুদীক্ষা নিয়েছিল। গুরুজী একদিন ঐ ভক্তিমতির বাড়িতে আসে। ঐ দিন ভক্তিমতির বোনও আসে। বোনের মেয়ের স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। তার ছোটো-ছোটো ছেলে-মেয়ে ছিল তাই ঐ মহিলা খুব চিন্তা করতো, কিভাবে ছেলেমেয়েদের পালন পোষণ হবে। ভাশুর-দেবর সবাই নিজের স্বার্থ নিয়ে চলে। হে ভগবান! এখন আমি কি করি? কোন জন্মের পাপের ফল ভুগতে হচ্ছে? ভক্তিমতি ভোজন রান্না করতে লাগে, তখন তার বোনও রান্নায় সাহায্য করে। বেশির ভাগ খাবার ভক্তমতীর বোন রান্না করে। সন্ত ভক্তরা খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ে। সকালে একজন ভক্ত গুরুদেবজীকে বলে, হে গুরুদেব! আজ রাত্রে আমি খুব দুঃখী ছিলাম। আমি স্বপ্নে দেখি আমার জামাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। মেয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে। তাদের চিন্তা হতে লাগে। এই ছেলে মেয়ের এখন কি হবে? কে এদের দেখাশোনা করবে? তখন গুরুজী ঐ শিষ্যাকে জিজ্ঞাসা করে পুত্রী! রাত্রে ভোজন কে তৈরি করেছিল? ভক্তিমতি উত্তর দেয়, আমার ছোট বোন এসেছে, ঐ বোন বানিয়েছে। সন্ত জিজ্ঞাসা করে ওর কোন কষ্ট-দুঃখ আছে নাকি? শিষ্যা উত্তর দেয়, হে গুরুদেব! আমার বোন খুব দুঃখী। মেয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। জামাই মারা গেছে। সমস্ত দিন ঐ চিন্তা করতে থাকে। মাঝে মাঝে বলতে থাকে আমার মেয়ের কি হবে? বাচ্চাদের লালন-পালন কিভাবে হবে?

গুরুজী শিষ্যাকে বলে ঐ মেয়ের বিচার ভোজনে প্রবিষ্ট হয়ে যারা খেয়েছে তাদেরকে প্রভাবিত করেছে। আমিও সারারাত বিভিন্ন দুঃশ্চিন্তায় ছিলাম। তাই যদি

ভক্তি, নাম স্মরণ বা আরতী বা সন্তের বাণী মনে করে ভোজন বানানো হয় তাহলে ভোজন খাওয়া ব্যক্তির মধ্যে ও ভক্তির প্রেরণা হবে। সুচিন্তা ভাবনা ভক্তিতে রুচি বাড়াবে। অনেক কৃষক গান গেয়ে বীজ বপন করে বা রান্না করার সময় গান গেয়ে রান্না করে। ঐ অন্নে ঐ সংস্কার প্রবিষ্ট হয়। ঐ অন্ন খাওয়া ব্যক্তির স্বভাব ঐ প্রকারের হবে, অর্থাৎ অন্ন ভোজন করা ব্যক্তি ঐ চিন্তা ধারায় প্রভাবিত হবে। তাঁর পরিণাম ফল বর্তমানে দেখা যাচ্ছে মানুষ ভাল কাজের থেকে খারাপ কাজে বেশি আকর্ষিত হচ্ছে।

যদি সন্তের বাণী পাঠ-আরতী সুমিরন করার লোক অধিক হয়, তাহলে বাতাবরণও ভক্তিময় হয়ে যাবে। প্রত্যেক ব্যক্তির মনে ভক্তির ভাবনা জাগ্রত হবে। এই রূপ বাতাবরণ তৈরির জন্য বাড়িতে বাড়িতে আরতী, রমৈনী ও নিত্যনিয়ম পাঠ করতে হবে। গুরু দীক্ষা নিয়ে নাম সুমিরণ করতে হবে। যাতে ভক্তির বিচার ও তত্ত্বজ্ঞান অধিক হয়। তখন খারাপ সংস্কার ধীরে ধীরে সমাপ্ত হয়ে যাবে। ভক্তি সংস্কারকে অক্সিজেন মনে করো, আর কার্বন-ডাই-অক্সাসাইডকে খারাপ সংস্কার মনে করো। অক্সিজেন রূপী ভক্তির সিলিন্ডারের পর সিলিন্ডার খুলে যায় অর্থাৎ সদগ্রন্থ সাহেবের পাঠ এবং নিয়মিত তিন সময়ের নিত্য কর্ম (নিত্যনিয়ম, রমৈনী ও সন্ধ্যা আরতী) ও সুমিরন করতে থাকো। ভক্তি করা ভক্তের সংখ্যা যত বাড়বে পৃথিবীর উপর ভক্তি ভাবের বিচারও ততো বাড়বে। প্রত্যেক মানুষের মনে শান্তি আভাস হবে। আমি কোন বাড়িতে প্রথম দিন সৎসঙ্গ করতে গেলে আমার মনও অশান্ত হয়ে যেত। পরে যখন প্রত্যেক ভক্ত নিজের নিজের রমৈনী, সকালের নিত্যনিয়ম, সন্ধ্যার আরতি পাঠ করত তখন সত্সঙ্গ শোনাতাম। তখন ঐ ঘরের কুসংস্কার দুর হয়ে যেত বা সমাপ্ত হয়ে যেত। সুসংস্কার অধিক হলে মন শান্ত হয়। সত্সঙ্গ পাঠ শেষে আমি যখন অন্য গ্রামের উদ্দেশ্যে যেতাম তখন ঐ পরিবারের সকলে কান্নাকাটি শুরু করতো। কারণ সন্ত ও ভক্তের সান্নিধ্যে তারা শান্তি পেত এবং সংস্কারের প্রভাব পরবর্তী মাস পর্যন্ত চলতো। যদি নাম নিয়ে পরিবারের সবাই মিলে প্রতিদিন নিত্যনিয়ম, রমৈনী ও সন্ধ্যা আরতী করে তাহলে সেই পরিবারে সদাশান্তি বিরাজ করে।

যে বিড়ি-তামাক বা অন্য নেশা করে বীজ রোপন করে, সেই অন্নের ভিতর তামাকের বাসনা (সূক্ষ্ম তত্ত্ব) প্রবেশ করে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐ অন্ন খাবে তার ভিতর তামাক বা নেশা করার প্রেরণা হবে। এই কারণে বর্তমানে নেশা করা মানুষের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়ছে। বাচ্চা যতক্ষণ ছোট থাকে, ততক্ষণ, কাকা, জ্যোঠা, দাদা, মাতা, পিতার ভয়ে নেশা করে না। কিন্তু যুবক হওয়ার পরে সংস্কার প্রবল হয় তখন তারা নেশা করা শুরু করে। আমার উদ্দেশ্য মানব সমাজ থেকে নেশা তথা অন্য সর্ব খারাপ কর্মকে নষ্ট করে এই পৃথিবীতে পরমাত্মা কবীরজীর বচনকে সাকার করা। একমাত্র পরমাত্মা কবীরজীর প্রেরণা ও শক্তিতে এই অমূল্য কর্ম সফল হবে। আমি (রামপাল জী মহারাজ) ও আমার শিষ্যরা সত্য ও নিষ্ঠা সহকারে এই মিশনকে সফল বানানোর চেষ্টা চালাচ্ছি। তাই পূর্ণ সফলতার আশা করি।

## "সংসারের ঝামেলার মধ্যে ভক্তি করতে হবে"

এক দারোগাবাবু (থানার বড়বাবু) নিজে এলাকায় কোন কাজে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের দিনে দুপুর একটার সময় ভীষণ রৌদ্রের গরম ছিল। হরিয়াণা প্রান্তের কৃষকেরা রহট (হরহট) দিয়ে ফসলে জল দিচ্ছিল। আমাদের দেশে যেমন গরু দ্বারা কলু (ঘানি) চালায়। সেইরূপ রহট চালানো হত। রহট ব্যবস্থায় পরস্পর অনেক বালতি চেনের ফিতার সাথে লাগানো থাকে, আর চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। রহট চলার

সময় চাঁ-চু শব্দে জোর আওয়াজ হচ্ছিল। দারোগা ও ঘোড়া জলের পিপাসায় ব্যকুল হয়ে জলপান করার জন্য রহটের কাছে আসে। রহটের শব্দে ঘোড়া ভয়ে দূরে চলে যায়। দারোগাবাবু কৃষককে বলে চাঁ-চু শব্দ বন্ধ কর। কৃষক গরুকে দাঁড় করালে রহট চলা বন্ধ হয়ে যায় তখন কুয়া থেকে জল উঠাও বন্ধ হয়ে যায়। বালিমাটি হওয়ার কারণে জমিতে জল বেশিক্ষণ থাকে না। দারোগা ঘোড়াকে নালার কাছে নিয়ে আসার আগে নালার জল মাটি চুষে নেয়। দারোগা বলে, কৃষক! জল ওঠাও। কৃষক বলদ গরুকে চলার জন্য ইশারা করে, রহট চাঁ-চুঁ শব্দের সাথে জল ফেলতে শুরু করে। ঘোড়া চাঁ-চুঁ শব্দ শুনে ২০০ ফুট দূরে চলে যায়। দারগা ঘোড়ার উপর বসেছিল। দারগা আবার বলে, কৃষক আওয়াজ বন্ধ কর। কৃষক গরু দাঁড় করায়, নালার জল জমি চুষে নেয়। দারোগা ঘোড়াকে নালার কাছে নিয়ে আসে দেখে জল নেই। দারগা পুনরায় জল উঠানোর আদেশ দেয়। রহট চালাতেই আওয়াজ শুরু হয় আর ভয়ে ঘোড়া ২০০ ফুট দূরে চলে যায়। কৃষক বলে, দারগাজী! রহট এর চাঁ চু আওয়াজের মধ্যেই জলপান করতে হবে। তা না হলে পিপাসায় মরতে হবে। দারগা ঘোড়ার পীঠ থেকে নীচে নেমে ঘোড়ার লাগাম ধরে ধীরে ধীরে নালার কাছে এনে রহটের শব্দের মধ্যে জলপান করে প্রান বাঁচায়। সেইরূপ সংসারিক কর্ম করতে করতে ভক্তকে ভক্তি দান ধর্ম সুমিরন করতে হবে। তাই অবশ্যই ভক্তি করুন।

### ❖ আয়ু বেশি নেই এখন ভক্তি করে কি হবে?

জেলা জিন্দ, গ্রাম- মনোর পুরে ভক্ত রামকুমারজীর বাড়িতে তিন দিনের পাঠ তথা সত্সঙ্গ চলছিল। হরিয়াণার গ্রামের লোকেরা সত্সঙ্গকে পাখণ্ড মনে করে, কারণ আগেকার দিনে বৃদ্ধারা রাত্রে সত্সঙ্গের আয়োজন করতো আর দিনে পুত্রবধূ, ভাই, ভাইপোকে গালাগালি ও অভিশাপ দিত। কেউ কেউ জ্বালানীর জন্য জ্বালানী চুরি করে নিয়ে যেত, ধরা পড়লে বদনাম হত। তাই ধীরে ধীরে সতসঙ্গের নামে মানুষের মধ্যে এলার্জীর সৃষ্টি হয়। ভক্ত রাম কুমারের সমস্ত পরিবার নাম দীক্ষা নিয়েছিল। তাই রামকুমার জানতো সত্সঙ্গ কেমন হয়। যখন রামকুমারের পিতা জানতে পারে তার বড় পুত্রের বাড়িতে সতসঙ্গ হবে, তখন নিজেকে খুব অপমানিত মনে করতে লাগে, চিন্তা করে গ্রামের লোকেরা কি বলবে? তাই তিন দিন পর্যন্ত বড় ছেলের বাড়িতে আসেনি। ছোট ছেলের খামার বাড়ীতে (ফসল ও গৃহপালিত পশু রাখার জায়গা) তিন দিন থাকে। দিনে জমিতে ঘুরতে যেত আর রাত্রে খামার বাড়ীতে বসে হুক্কা টানে আর দুঃখী হয়ে বলে, হে ভগবান! এ কেমন দিন দেখতে হচ্ছে।

রাত্রে দাস (রামপাল জী মহারাজ) সতসঙ্গ করছিল। মাইক লাগানো ছিল। ভক্ত রামকুমারজীর ছেলে জানতো দাদাজী খামার বাড়ীতে, তাই একটি মাইকের মুখ সেইদিকে ঘুরিয়ে দেয়। নিরুপায় হয়ে বৃদ্ধ সত্সঙ্গ শুনতে লাগে। দুই দিন সৎসঙ্গ শোনার পরে তৃতীয় দিন পাঠের ভোগের সময় বৃদ্ধ রামকুমারের বাড়ি আসে। রাম কুমারের পত্নী বলেছিল, আমি চিন্তা করেছিলাম বৃদ্ধ বিরোধ করার জন্য এসেছে। মহারাজ জীকে উল্টা-পাল্টা কথা বলবে। পাঠের ভোগ লাগানোর পরে বৃদ্ধ আমার সামনে এসে বলে, মহারাজ জী! সৎসঙ্গ হওয়ার জন্য আমি খুব দুঃখী ছিলাম, কিন্তু দুইদিন আপনার প্রবচন শুনে আমার আত্মা কেঁদে ওঠে। আমি আমার মানুষ জীবন নাশ করে দিয়েছি। আমি পরিশ্রম করে ৮ একর জমি কিনেছি, দুই ছেলেকে লালন-পালন করে বড় করেছি। দিন রাত জমির কাজে লেগে থাকতাম। আপনার কথাশুনে বুঝতে পেরেছি আমার মানুষ জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন ৭৫ বছর বয়স আর

ভক্তি করে কি লাভ হবে? এই কথা বলে বৃদ্ধ কান্না শুরু করে। হাঁচি লেগে যায়। আমি সান্তনা দিয়ে বলি আপনি বিশ্বাস করুন এখনো আপনার মানব জীবন শেষ হয় নি। আমার গুরুজীর কাছ থেকে একটি উদাহারণ শুনেছিলাম:- একবার কুঁয়া থেকে জল তোলার সময় বালতির দড়ি হাত থেকে ছেড়ে যায়। আগেকার দিনে কুঁয়া প্রায় ১০০/১৫০ ফিট গভীর হত। হাত থেকে ছেড়ে যাওয়া দড়ির শেষ অংশও যদি ধরা যায় তা হলেও কিছু নষ্ট হবে না। বালতিও থাকবে আর জলও পাওয়া যাবে। সেইরূপ আপনার আয়ুরূপী দড়ির শেষ অংশ এখনো বাকী আছে। এখন দীক্ষা নিয়ে সর্বনেশা ত্যাগ করে মর্যাদার সাথে সাধনা করো, মোক্ষ পেয়ে যাবে। তখন ঐ ভক্ত আত্মা দীক্ষা নেয় আর একাগ্রতার সাথে ভক্তি করে। ৮৫ বছর বয়সে শরীর ত্যাগ করে চলে যায়। ঐ বৃদ্ধ হুক্কা পান করতো, দীক্ষার দিন ছেড়ে দেয়। আজীবন নেশায় হাত লাগায়নি। রামকুমারের ছোট ভায়ের পরিবারও নাম উপদেশ নেয়। বৃদ্ধ নিজে তাদের সঙ্গে নিয়ে আসতো। আর সবাইকে ভক্তি করতে বলতো। মনোরপুর গ্রামের লোক আশ্চর্য হয়ে যায়। যে মানুষ হুক্কা ছাড়া বাঁচতো না, সে কিভাবে হুক্কা ছেড়ে দিল? এমনকি নেশা করা লোকের কাছেও বসতো না।

**এঁকে চোট সিধারিয়া জিন মিলন দা চাহ।**

হরিয়াণার প্রচলিত বাক্য:-

**ঘাম কা ঔর জ্ঞান কা চমকা সা লাগ্যা করৈ॥**

**শব্দার্থ :**- ভাদ্র মাসের রৌদ্রে অধিক গরম হয়। মাঠে কাজ করা কৃষকদের শরীর দিয়ে তখন খুব ঘাম ঝরে। তখন শরীরে তাপ বেড়ে যায় অর্থাৎ জ্বর হয়। ডাক্তার বলে রৌদ্রের তাপ লেগেছে, অর্থাৎ তেজ রৌদ্রে গরম লেগেছে। সেইরূপ যাদের জ্ঞানের প্রভাব পড়ে, তার এক দুই বিন্দুতেই পড়ে যায়, আর ভক্তিতে লেগে যায়।

## “চৌধুরী জীতা জাটের জ্ঞান হয়েছিল”

গ্রাম- খেখড়া, জেলা- বাগপতে (উত্তর প্রদেশ) প্রায় দু'শো পঁচাত্তর বছর পূর্বে জীতারাম নামের এক জাট ছিল। সেই গ্রামের ঐ মুখিয়া তথা ধনী ব্যক্তির প্রায় ৯০০-বিঘা জমি ছিল। তিনি সর্বদা সত্যের পক্ষে থাকতেন। মিথ্যার সঙ্গ দিতেন না। ঐ গ্রামে ঘিসা দাস নামক এক সন্ত সৎসঙ্গ করছিলেন। ঘীসা দাসজী চামার জাতির ছিলেন। তখন ছোঁয়াছুত চরম পর্যায়ে ছিল। পরমেশ্বর কবীরজী ঘীসা দাস জীকে ৭/৮ বছর বয়সে জঙ্গলে দর্শন দিয়েছিলেন। ঘীসা দাসজীকে যথার্থ জ্ঞান ও দীক্ষা দিয়ে অন্তর্ধ্যান হয়ে যান। বড় হয়ে সন্ত ঘীসা দাসজী সত্সঙ্গ শুরু করেন। আশেপাশের লোকজন সতসঙ্গে প্রভাবিত হয়ে দীক্ষা নিয়ে সঙ্কট মুক্ত হতে লাগে। নিজের জীবন নির্বাহের জন্য দিনে কাজ করতেন আর রাত্রে সতসঙ্গ করতেন। মাসে দুই দিন সৎসঙ্গ করতেন। রাত্রের সতসঙ্গে স্ত্রী পুরুষ উভয় আসত। গ্রামে চর্চা শুরু হয়, রাত্রে মেয়ে বউদের সতসঙ্গে যাওয়া ঠিক না। যে কোনো দিন খারাপ ঘটনা ঘটতে পারে। তাই সৎসঙ্গ বন্ধ করা দরকার। খেখড়া গ্রামে শালিশী সভায় সিদ্ধান্ত হয় সৎসঙ্গ বন্ধ করতে হবে। এই সিদ্ধান্তের আদেশ শোনাতে স্বয়ং গ্রামের মুখিয়া (প্রধান) জীতারাম সন্তের বাড়ি যায়। ঐ দিনও সৎসঙ্গ চলছিল। গ্রামবাসীদের সৎসঙ্গ বন্ধ করার সিদ্ধান্তের কথা চরিদিকে ছড়িয়ে পরে। যখন চৌধুরী জীতারাম সত্সঙ্গ স্থলে পৌঁছায় তখন শ্রোতারা চিন্তা করে চৌধুরী জাট গম্ভীর মেজারের তাই সন্তজীর সাথে ঝগড়া করতে পারে। জীতারাম বাড়ি থেকে লাঠি নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সৎসঙ্গে লাঠি নিয়ে যাওয়া শোভা দেয় না। চিন্তা করে, ভক্তরা ঝগড়া করতে পারে না। তাই লাঠি এক বৃক্ষের নীচে

রেখে যায়। সত্সঙ্গ চলছিল তাই জীতারাম চিন্তা করে, কিছুক্ষন সৎসঙ্গের কথা শুনি, তার পর গ্রামের সিদ্ধান্ত জানাব। সতসঙ্গে হরলালজীর প্রসঙ্গ শোনাচ্ছিল। সতসঙ্গের কথা শুনে চৌধুরী ভাবুক হয়ে যায়। চোখে জল চলে আসে। চৌধুরী সাহেব উঠে ঘীসা দাসজীর চরণে মাথা রেখে বলে, হে গুরুদেব! আমি একজন অপরাধী অনেক বড় ভুল করেছি। আমি তুচ্ছ প্রাণী, সৎসঙ্গ বন্ধ করার আদেশ নিয়ে এসেছিলাম। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি এখন মন খুলে সত্সঙ্গ করুন কেউ বন্ধ করতে আসবে না। সন্ত ঘীসা দাসজী বলে চৌধুরী সাহেব আপনি যে কাজ করতে এসেছেন সেই কাজ করুন। জীতা জাট কান্না করতে লাগে। আর বলে আমাকে ক্ষমা করুন আর দীক্ষা দিন। চৌধুরী জীতারাম জাট ভক্ত হয়ে যায় এবং স্বয়ং রাত্রে সতসঙ্গে আসতে লাগে। গ্রাম খেখড়ার ঘরে ঘরে চৌধুরী জীতারামের নিন্দা হতে লাগে। আর বলে সন্ত ঘীসারাম জাদু-মন্ত্র জানে। গ্রামের চৌধুরিকে তন্ত্র-মন্ত্র করে বশ করে নিয়েছে। সন্ত সম্মোহন ক্রিয়া জানে। জীতারামের পরিবারের ভাই, কাকা, জ্যেঠা-দাদুরা ঘোর বিরোধ শুরু করে। গ্রামের লোকেরা বলে, হে চৌধুরী সাহেব! বুড়ো বয়সে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। জীতারাম বলে, হে গ্রামবাসী! আমার চোখ খুলে গিয়েছে, আমি ভক্ত হয়ে গিয়েছি আর তোমাদের নজর বাঁকা হয়ে গিয়েছে। ভগবান করুন যেন আমার মত তোমরাও ভক্ত হয়ে যাও। কিছুদিন পরে আবার গ্রামে মিটিং ডাকা হয় সন্ত ঘীসা দাস ও ভক্ত জীতারামকে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার আদেশ শোনানো হয়। দুই গুরু শিষ্য গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। দূর স্থানে এক গ্রামে সত্সঙ্গ করে জনতাদের বোঝাতে থাকে। সেখানে অনেক ভক্ত হয়ে যায়। এদিকে সন্ত চলে যাওয়ার পর খেখড়া গ্রামে অকাল মৃত্যু শুরু হয়। শালিশী সভার মুখিয়াদের ঘরে পরমাত্মার প্রকোপ শুরু হয়। কারো বাড়ি আগুন লেগে পুড়ে যায়, কারো বাড়ীতে পশু মরা শুরু হয়। কারো পরিবারে ভূত প্রেতের উপদ্রব শুরু হয়, অনেকে অসুখে পড়ে যায়। কারো না কারো মেয়ে বিধবা হয়ে যায়। মোট কথা গ্রামের অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে যায়। গ্রামবাসীরা মহাদুঃখী হয়ে তান্ত্রিক কবিরাজের কাছে দৌড়াতে লাগে। এক গণনাকারী বলে তোমাদের গ্রামে দুই সন্ত ছিল এক গুরু এক শিষ্য তাঁরা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে। তাঁরা যদি গ্রামে ফিরে আসে তাহলে ভালো, অন্যথায় ঐ গ্রাম নষ্ট হয়ে যাবে। ঐ ব্যক্তিরা গ্রামে এসে পঞ্চায়েতে মিটিং করে সব বৃত্তান্ত বলে। তখন গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ঐ সন্ত ও ভক্তকে ফিরিয়ে আনার জন্য ঐ গ্রামে যায়। ভক্ত জীতা দাস গুরু জীকে বলে, হে গুরু দেব! মনে হয় এখান থেকেও তাড়ানোর জন্য গ্রামের লোকজন আসছে। সন্ত ঘীসা দাস বলে, চিন্তা কিসের, কাঁধে চাদর রাখো, আর চলো। ততক্ষণে গ্রামের লোকজন চলে আসে আর নিজের নিজের মাথার পাগড়ী খুলে সন্ত ঘীসা দাস ও জীতা দাসের চরণে রাখে। সবাই মিলে বলে, মহারাজ! ভুল করেছি ক্ষমা করুন। আপনি আসার পর গ্রামের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। যদি সম্ভব হয় তাহলে বাঁচান। তা না হলে আমরাও আপনার সঙ্গে থাকবো। ইতিমধ্যে বর্তমান গ্রামের লোকজনও একত্রিত হয়ে যায়। সর্বঘটনা জানার পরে তারা বলে চৌধুরী ভাই! তোমাদের জন্য আমরা কেন বরবাদ হতে যাব। এই দুই দেবতা আমাদের গ্রামে আসার পরে, গ্রামে ঝগড়া ঝাটি নেই। দু'বার বর্ষা হয়েছে। দেখো জমিতে কত সুন্দর ফসল ফলেছে। খেখড়ার লোকজন বিশেষ ভাবে বিনয় করলে- গুরু শিষ্য ফিরে আসার জন্য হ্যাঁ করে, আর বলে এই গ্রামের ভক্তদের বুঝিয়ে বলো মাঝে মাঝে আমরা তোমাদের গ্রামেও আসবো। প্রত্যেক পূর্ণিমায় আপনারা খেখড়ায় আসবেন। পরমাত্মা কবীরজী সব ঠিক রাখবে। দুই মহাপুরুষ গ্রামে ফিরে আসতেই গ্রামে শান্তি স্থাপিত হয়। পরের দিন ভারী

বর্ষা হয়। কৃষকদের মনে আনন্দ আসে। ৩৬ বিরাদরী অর্থাৎ ৩৬ সম্প্রদায়ের লোক খুশী হয়, ভুত-প্রেতের উপদ্রব বন্ধ হয়ে যায়। এখনো ঐ গ্রামে সন্ত ঘীসা দাস ও ভক্ত জীতা দাসের নামের মেলা বসে।

তাই সন্ত গরীবদাসজী বলেছেন:-

**গরীব, জিস মণ্ডল সাধু নহীঁ, নদী নহীঁ গুঞ্জার।**
**তজ হন্সা বহু দেশড়া, জম কি মোটী মার॥**

যে ক্ষেত্রে সাধু, মহাত্মা, গুরুজন নেই আর নিকটে কোন নদী প্রবাহিত হয় না, হে ভক্ত! ওখানে কালের ভয়ংকর প্রভাব পড়বে তাই ঐ স্থান তাড়াতাড়ি ত্যাগ করা উচিত।

তাই হে পাঠক গণ! যখন, যে বয়সেই হোক যদি সদগুরু মিলে যায় তাহলে ভক্তি শুরু করে দিও। সন্ত গরীবদাস জী বলেছেন :-

**গরীব, চলী গই সো জান দে, লে রহতী কুঁ রাখ।**
**উত্তরী লাব চড়াইয়ো, করো অপুঠী চাক।**

**শব্দার্থ:-** হে মানব! যতটা জীবন সদগুরু ছাড়া চলে গিয়েছে তা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। তার চিন্তা ছেড়ে যে আয়ু এখনো বাকি আছে তা রক্ষা করো অর্থাৎ বাকী আয়ুতে সদভক্তি করো, দান ও সেবায় লাগাও। ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার পরে, সাংসারিক কাজকর্মও সহজ হয়ে যাবে, যেমন কুঁয়ো থেকে জল তোলার সময় বালতির দড়ি কপিকল থেকে উঠে নীচে পড়ে যায়, তখন বালতির দড়ি টানা কঠিন হয়ে যায়। দড়িটিকে পুনরায় কপিকলের উপর তুলে তারপর বালতি টানা খুবই সহজ হয়ে যায়। সৎ গুরুদেবের শরণে আসার পূর্বে দড়ি কপিকল থেকে উঠে নীচে পড়ে ছিল। যে কারণে জল তোলা কঠিন হচ্ছিল ঠিক একই প্রকার সমস্ত কার্য কঠিনতায় ভরা ছিল। ভক্তি শুরু করতেই সমস্ত কার্য সহজে সম্পন্ন হতে শুরু করে, ঠিক যেমন দড়ি কপিকলের উপরে তুলে দেওয়ার পরে জল তোলা সহজ হয়ে গিয়েছিল। এই বিচার করা উচিত নয় যে, এখন আর আয়ু বেশি নেই। এখন আর কি ভক্তি করবো? যখন সতসঙ্গ থেকে জ্ঞান হয়ে যায়, তখন ঐ বয়সেই দৃঢ়তা এবং সত্য ও নিষ্ঠার সাথে ভক্তিতে লেগে যাওয়া উচিত।

**ভাবার্থ:-** যে আয়ু চলে গিয়েছে তার চিন্তা ছেড়ে যে আয়ু এখনো বাকি আছে তা রক্ষা করো অর্থাৎ বাকি আয়ুতে সদভক্তি করো। দান ও সেবায় লাগাও। যেমন আগে কার দিনে কুয়া থেকে জমিতে জল দেওয়ার জন্য চামড়ার চড়স (ব্যাগ) প্রয়োগ হতো। ঐ ব্যাগে ২০০/৩০০ লিটার জল ভরা হতো। কাঠের চক্রীর উপর মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে টানত। যদি দড়ি চক্রী থেকে পিছলে যেত তাহলে এই ব্যাগকে টানা কঠিন হয়ে যেত। তাই যেন-তেন প্রকারে পুনরায় চক্রীর উপর (কাঠের মোটা গোলাকার বস্তু) চড়ানো হত। তখন জলের ব্যাগ বাইরে আনা সহজ হয়ে যেত। আর সহজে জলের লাভ প্রাপ্ত হত। হে মানব! যদি সদগুরুর স্মরণে না থাকো তাহলে তোমার জীবনও ঐ চক্রীর মতো নিস্ক্রিয়। জীবনের প্রত্যেক কর্ম কঠিন পাহাড়ের মত হয়ে দাঁড়াবে। তাকে সহজ সরল করার জন্য সদগুরুর শরণে এসো আর জীবন চলার পথ সুগম ও সুন্দর বানাও।

## "গণিকার (বেশ্যা) উদ্ধার"

❖ সতসঙ্গ শুনতেই জীবনে পরিবর্তন চলে আসে আর জীবন ভালো হয়ে যায়:-

কবীর পরমেশ্বর রাত্রে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সৎসঙ্গ করতেন। জীবন নির্বাহের জন্য দিনের বেলা সব শ্রোতারা ও কবীরজী কাজ-কর্ম করতেন।

একদিন রাত্রে সত্সঙ্গ চলছিল। কাশী শহরে সত্সঙ্গ স্থলের কাছে এক প্রসিদ্ধ বেশ্যার আলিশান ভবন ছিল। ঐ রাত্রে বেশ্যার কোন গ্রাহক ছিল না। তাই গ্রাহকের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু গ্রাহক না থাকায় ঐ বেশ্যা পরমাত্মা কবীর জীর মুখ কমল থেকে নিসৃত অমৃতবাণী শুনছিল। পরমাত্মা সতসঙ্গে বলেন, মানব জীবন অনেক পুণ্য কর্মের ফলে প্রাপ্ত হয়। যে স্ত্রী-পুরুষ ভক্তি করে না, দান, সেবা করে না সে পরমাত্মার চোর। গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১২-তে বলেছে, যে ব্যক্তি পরমাত্মার থেকে প্রাপ্ত ধনের কিছু অংশ দান-ধর্মে না লাগিয়ে নিজের পেট ভরায়, সে পরমাত্মার চোর। যে মানুষ চুরি, ডাকাতি, ঠগ, বেশ্যাগমন করে সে মহা অপরাধী হয়। যে স্ত্রী বেশ্যাবৃত্তি করে সেও মহা অপরাধী। পরমাত্মার দরবারে তাকে কঠিন দণ্ড দেওয়া হবে। মানব জীবন শুভ কর্ম করা তথা ভক্তি করার জন্য প্রাপ্ত হয়।

**কবীর, চোরী জারী বেশ্যা বৃতি, কবহু না করয়ো কোয়।**
**পুণ্য পাঈ নর দেহী, ওচ্ছী ঠৌর ন খোয়॥**

**শব্দার্থ:-** হে মানব! পরস্ত্রী গমন, বেশ্যাবৃত্তি, ধনের লোভে অন্য স্ত্রীর সঙ্গে সম্ভোগ, চুরি-জারি ইত্যাদি অপরাধ কেউ করবে না। এই মানব শরীর অনেক পুণ্যের ফলে প্রাপ্ত হয়। খারাপ স্থানে গিয়ে পাপ কর্ম করে এই শরীরকে নষ্ট করো না। সত গুরু ধারন করে শুভ কর্ম করে নিজের মানব জীবনের কল্যাণ করাও।

মানব শরীর প্রাপ্ত প্রাণীর উচিত সর্ব প্রথমে সদগুরুর শরণে গিয়ে দীক্ষা প্রাপ্ত করা। পরে আজীবন গুরু মর্যাদায় থেকে সাধনা তথা সেবা, দান, ধর্ম করতে থাকা। নিজের দৈনন্দিন কর্ম করো, কিন্তু খারাপ কর্ম ত্যাগ করো। তাহলে তার কল্যাণ অবশ্যই হবে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অভাবে মানব শুধু ধন উপার্জনের জন্য জীবনের মুখ্য লক্ষ্য রেখে জীবন রাস্তায় সফর করে। ছল কপট করে যদি কেউ কোটি-কোটি টাকা সম্পত্তি সংগ্রহ করে আর হঠাৎ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হও তাহলে সারা জীবনের সংগৃহীত ধন থেকে যাবে। এই শরীরও সাথে যাবে না। সাথে যাবে শুধু সারাজীবনের অসৎ উপায়ে ধন সংগ্রহের পাপ।

**কায়া তেরী হৈ নহী, মায়া কহাঁ সে হোয়। গুরু চরণো মে ধ্যান রখ, ইন দোনো কো খোয়॥**
**কবীর, সব জগ নির্ধনা, ধনবন্তা না কোয়। ধনাবান য়হ জানিয়ে, জাপে রাম নাম ধন হোয়।**

**ভাবার্থ:-** মানুষ, যে শরীরের রোগ মুক্তির জন্য নিজের সম্পত্তিকেও বিক্রি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। সেই শরীরও সাথে যাবে না। মায়ার কথা দূরে থাক, তাই পূর্ণ গুরু থেকে দীক্ষা নিয়ে দিন-রাত ভক্তি করো। গুরুজীর বলা জ্ঞানের আধারে জীবনের পথে চলুন। কায়া তথা মায়া থেকে মোহ দূর করে আর ভক্তি ধন সংগ্রহ করুন। হে মানব! রাবণের জীবনের পিছনের ইতিহাস দেখ।

**সর্ব সোনে কী লংকা থী, রাবণ সে রণধীরম্।**
**এক পলক মেঁ রাজ নষ্ট হুয়া, জম কে পড়ে জঞ্জিরম্॥**
**গরীব, ভক্তি বিনা ক্যা হোত হৈ, ভ্রম রহা সন্সার।**
**রতী কাঞ্চন পায়া নহী, রাবণ চলী বার॥**

**ভাবার্থ:-** সন্ত গরীব দাসজী এটাই সমর্থন করেছেন যে, ভক্তি বিনা জীবের কোনো লাভ হবে না, মায়ার চক্রে যুক্ত থাকার জন্য সারা জীবন ঘুরে বেড়ায়। শ্রীলংঙ্কার রাজা রাবণের কাছে এতো ধন ছিল যে সে সোনার মহল বানিয়েছিল। যখন বিনাশ প্রাপ্ত হয় তখন এক রতি সোনাও রাবণ সাথে করে নিয়ে যেতে পারেনি।

সদগুরুর সদভক্তি না করায় যমদুতেরা হাতে হাতকড়ি পরিয়ে যমরাজার কাছে নিয়ে যাবে, আর নরকে পাঠাবে। তাই হে মানব! অশুভ কর্মকে ভয় করো আর

সদগুরু ধারন করে সদভক্তি শুরু করো।

শঙ্কা সমাধানের জন্য পরমেশ্বর কবীরজী সৎসঙ্গে বলেছেন, আধ্যাত্মিক জ্ঞান না হওয়ার কারণে ভালো ব্যক্তিরাও পাপ করে ফেলে। যখন সতসঙ্গ শোনে তখন অপরাধ বা অন্যায় কর্ম ত্যাগ করে সদভক্তি করে নিজের জীবনের কল্যাণ করায়। পরমাত্মা কবীরজী বলেছেন, আমার কাছে সত্ সাধনার যথার্থ মন্ত্র আছে, এই মন্ত্র সমস্ত পাপকে নষ্ট করে দেয়, আর পুণ্য বেঁচে যায়। (যেমন আজকাল বৈজ্ঞানিকরা জমিতে ঘাস মারার জন্য ওষুধ আবিষ্কার করেছে, যা জমিতে দিলে ঘাস মরে যায় কিন্তু ফসলের কোন ক্ষতি হয় না।) এই মন্ত্র আমি আমার লোক থেকে নিয়ে এসেছি।

**সোহম শব্দ হম জগমে লাএ। সার শব্দ হম গুপ্ত ছিপাএ॥**

**ভাবার্থ:-** (ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৯৫ মন্ত্র ২-এ প্রমাণ আছে পরমাত্মা প্রত্যক্ষ রূপে প্রকট হয়ে নিজের অমৃত বাণী দ্বারা মুক্তির সত্য মার্গের প্রেরণা দেন। ঐ পরমাত্মা সর্ব দেবের দেব অর্থাৎ সবকিছুর মালিক, তিনি ভক্তির গুপ্ত নাম আবিষ্কার করেন) যদি কোন মহাপাপী সত্য সাধনা শুরু করে এবং পরে যদি কোন পাপকর্ম না করে, তাহলে তার সর্ব পাপ সমাপ্ত হয়ে যায় তখন সে সদভক্তি করে নিজের কল্যাণ করায়।

উপরোক্ত অমৃত বচন শুনে ঐ ভগিনী বেশ্যার সৎ আত্মা যেন গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠে কাঁপতে থাকে। ঘরে তালা লাগিয়ে সত্সঙ্গ স্থলে চলে আসে আর অন্য মহিলাদের সঙ্গে পিছনে বসে। সত্সঙ্গ সমাপ্ত হলে এক ভক্ত দাঁড়িয়ে বলে যারা গুরু মন্ত্র নিতে ইচ্ছুক তারা গুরুদেবের কাছে চলে এসো। কিছু স্ত্রী ও পুরুষ দীক্ষা মন্ত্র নিতে আসে। বেশ্যাও ওদের সঙ্গে আসে। আর গুরুজীকে নিজের পরিচয় দেয়। বেশ্যা বলে আমি ৪০ বছর বয়সে আজ প্রথমবার এই উপকারী প্রবচন শুনছি। হে পরমাত্মা! আমার মতো পাপী আত্মার কি কল্যাণ সম্ভব? আপনি তো সর্ব শঙ্কার সমাধান সৎসঙ্গে বলে দিয়েছেন। কিন্তু যখন আমি আমার ঘৃনিত জীবনের কথা ভাবি তখন বিশ্বাস হচ্ছে না আমার মত পাপীকে পরমাত্মা কী ক্ষমা করবেন? পরমেশ্বর কবীর জী বললেন :-

**কবীর, জব হী সত্যনাম হৃদয় ধরা, ভয়ো পাপ কো নাশ।**
**জৈসে চিঙ্গী অগ্নি কী, পড়ে পুরানৈ ঘাস॥**

**ভাবার্থ:-** কোটি কোটি টন শুকনো ঘাস এক জায়গায় করে দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে ঐ ঘাসের উপর ফেলে দাও। সমস্ত ঘাসের পাহাড়কে ভষ্ম করে দেয়। হাওয়াতে ঐ ছাইয়ের পাহাড়ও উড়ে যাবে চিহ্নও থাকবে না। সেইরূপ কোটি-কোটি জন্মের পাপ হলেও আমার সত্য নামের জপে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে কোনো ভুল করবে না, তাহলে কল্যাণ হবে।

যজুর্বেদ অধ্যায় ৪ মন্ত্র ৪৩ -এ প্রমাণ আছে পরমাত্মা, নিজের ভক্তের ঘোর থেকেও ঘোর (এনসঃ এনসঃ) পাপ নষ্ট করে দেয় তখন জীবের কল্যাণ হয়। ঐ বোন পাপের কর্ম ত্যাগ করে পরমাত্মা কবীর জীর থেকে নাম দীক্ষা নিয়ে মর্যাদা সহ পালন করে, আজীবন সাধনা করে চম্পাকলী মোক্ষ প্রাপ্ত করে।

## "রঙ্কা-বঙ্কার কথা"

পরমেশ্বর কবীরজীকে ভক্তমতী চম্পাকলী জিজ্ঞাসা করেন, হে ভগবান! এই পাপের সম্পত্তি আর টাকার কি করবো? পরম পিতা পরমেশ্বর কবীর জী বলেন, এই নরকের ধনকে দান করে দাও। বাড়িতে গিয়ে চম্পাকলি চিন্তা করে যদি সর্ব ধন দান করে দেই তাহলে কি খাব? আমার অন্য কোন কাজ নেই। চম্পাকলি অধিক সময় সৎসঙ্গে যেতে লাগে। পরমাত্মা একদিন সতসঙ্গে বলেন:-

রঙ্কা (পুরুষ) ও বঙ্কা (স্ত্রী) পরমাত্মার পরম ভক্ত ছিল। তারা তত্ত্বজ্ঞানকে ঠিকভাবে বুঝেছিল। সেই আধারে (নিয়মে) তারা জীবন যাপন করতো। রঙ্কা-বঙ্কার একটি মেয়ে ছিল তার নাম অবঙ্কা (অম্বিকাকে অবঙ্কা বলা হয়)। একদিন ভক্ত নামদেব গুরুদেবকে বলেন, হে গুরুদেব! আপনার ভক্ত রঙ্কা-বঙ্কা খুব গরীব। ওরা জঙ্গল থেকে কাঠ জোগাড় করে শহরে বিক্রি করে অতিকষ্টে খাবারের ব্যবস্থা করে। আপনি ওদের কিছু ধন দিন। গুরুদেব বলে, নামদেব! আমি ওকে কয়েক বার ধন দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ও সব ধন দান করে দেয়। দুই তিনবার আমি স্বয়ং ছদ্মবেশে জ্বালানি কিনতে যাই। অন্য জ্বালানীর তুলনায় ওদের জ্বালানীর দাম ১০ গুন বেশি দিই। কিন্তু ওদের জ্বালানী প্রতিদিন দুই আনা করে বিক্রি হয়। আমি ১০ টাকা দিই। ওরা চার আনা রেখে বাকি পয়সা আমাকে দান করে দেয়। এখন তুমি বলো আমি কিভাবে ওদের ধন দেব? ভক্ত নামদেব আবার প্রার্থণা করেন আর একবার দিয়ে দেখুন এবার অবশ্যই নেবে। রঙ্কা-বঙ্কা যে রাস্তা দিয়ে কাঠ নিয়ে জঙ্গল থেকে আসতো গুরুজী ঐ রাস্তায় অনেক সোনার আভূষণ ছড়িয়ে দেন, যার দাম লাখ টাকারও বেশি। নামদেব ও গুরুজী এক ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকেন। মাথায় কাঠের বোঝা নিয়ে রঙ্কা আগে আগে চলছিল বঙ্কা পিছনে পিছনে প্রায় ২০০ ফুট দূরত্বে ছিল। ভক্ত রঙ্কা দেখে খুব দামী সোনার অলংকার রাস্তায় পড়ে আছে। বঙ্কা নারীজাতি গহনা দেখে মনে লোভ আসতে পারে আর নিজের কর্ম খারাপ করে দিতে পারে। তাই পা দিয়ে আভূষণের উপর ধূলামাটি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছিল। ভক্তমতী বঙ্কা ও পূর্ণ গুরুর শিষ্যা ছিল। পতিদেবকে গহনার উপর মাটি দিতে দেখে বুঝতে পারে। বঙ্কা ডেকে বলে ভক্তজী চলো! মাটির উপর কেন মাটি দিচ্ছো। রঙ্কা বুঝতে পারে ভক্তমতীর উদ্দেশ্য ঠিক আছে। স্বামী-স্ত্রী লাখ টাকার ধন উপেক্ষা করে নগরে চলে যায়। গুরু জী বলে, দেখ ভক্ত নামদেব! ভক্ত এই রকমই হয়।

একদিন বিকাল ৪-টার সময় গুরুজী সত্‌সঙ্গ করছিলেন। সত্‌সঙ্গ স্থল রঙ্কার ঝোপড়ি (কুড়ে ঘর) থেকে প্রায় চার একর দূরে ছিল। রঙ্কা ও বঙ্কা দুজনে সত্‌সঙ্গ শুনতে গিয়েছিল। মেয়ে অবঙ্কা (বয়স ১৯ বছর) ঝোপড়ির বাইরে গাছের নীচে চারপায়ার (দড়ি দিয়ে বোনা খাটের) উপর বসেছিল। হঠাৎ কুঁড়ে ঘরে আগুন ধরে যায়। সব জিনিস পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অবঙ্কা দৌড়ে মাতা পিতাকে ডাকতে গিয়ে দেখে সতসঙ্গ চলছে। গুরুজী সতসঙ্গ শোনাচ্ছিলেন। শ্রোতারা সতসঙ্গে মগ্ন ছিল। শান্তির পরিবেশ ছিল। অবঙ্কা চিৎকার করে বলে, মা কুঁড়ে ঘরে আগুন লেগেছে সব জিনিস পুড়ে গেছে। বঙ্কা উঠে মেয়েকে এক পাশে নিয়ে বলে কী, কী বেঁচে আছে? মেয়ে অবঙ্কা বলে এক চারপায়া আছে যেটা গাছের নীচে ছিল। রঙ্কাও উঠে আসে। দুইজনে বলে ঐ চারপায়াও আগুনের ভিতর ফেলে দে। আর সত্‌সঙ্গ শুনতে চলে আয়। যদি কুঁড়ে ঘরে না থাকতো তাহলে আগুন লাগত না। আর সৎসঙ্গের আনন্দ ভঙ্গ হত না। অবঙ্কা চারপায়া খাট আগুনের ভিতর ফেলে দিয়ে সত্‌সঙ্গ শুনতে চলে আসে। সতসঙ্গের পরে আশ্রমে ভোজন করে কুঁড়ে ঘরের কাছে যায়। পুড়ে যাওয়া কুঁড়ে ঘরের কাছে একটি গাছের নীচে বিছানা বিছিয়ে নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়ে। ভক্তি করার জন্য সময় মত উঠে দেখে সুন্দর এক কুঁড়ে ঘরের ভিতর, সর্ব বাসন, মাটির হাড়ি, কলসিতে চাল, আটা, ডাল ভরা। তখন আকাশ বাণী হয় ভক্ত পরিবার! এ পরমাত্মার দয়া। তোমরা এই ঘরে থাক। এ তোমার গুরুদেবের আদেশ। ভক্ত পরিবারের সবাই বলে আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন গুরুদেব! সূর্য ওঠার পরে নগরের লোকেরা আশ্চার্য হয়ে যায়। কুঁড়ে ঘরে যেখানে ছিল সেখানে ছাই পড়ে আছে। আর গাছের নীচে সুন্দর

কুঁড়ে ঘর। নতুন ঘর বানাতে কম করে এক সপ্তাহ লাগে। নগর বাসী বুঝতে পারে এ বঙ্কার গুরুদেবের চমৎকার। নগরবাসীরা ঐ দৃশ্য দেখে আর প্রভাবিত হয়ে সংকল্প করে, হাজার হাজার নগরবাসী গুরুদেব জীর থেকে নাম উপদেশ নেয়। (এই লীলা পরমাত্মা কবীরজী কাশী শহরে প্রকট হওয়ার প্রায় দু'শো বছর আগে করেছিলেন)।

উপরোক্ত প্রবচন শুনে চম্পাকলির মনের ভয় সমাপ্ত হয়ে যায়। আর সর্ব সম্পত্তি ও ধন গুরুদেব পরমেশ্বরের শ্রীচরণে দান করে দেয়। পরমাত্মা বলে পুত্রী! যখন তুই আমার মেয়ে হয়েছিস তখন তোর ধনও আমার হয়ে গিয়েছে। তাই আমার সম্পত্তি তোর যতটা দরকার ততটা রাখ বাকী দান করতে থাক। ভক্তিমতী চম্পাকলি তাই করে। শুধু বাড়ি রেখে বাকী সম্পত্তি সত্সঙ্গ ভোজন ভাণ্ডারায় দান করতে থাকে।

## "পরমাত্মা কবীরজী শিষ্যদের পরীক্ষা নেয়"

বন্দীছোড় কবীর পরমেশ্বরের লীলায় প্রভাবিত হয়ে ৬৪ লাখ শিষ্য হয়েছিল। পরমাত্মা, ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সব জানেন। পরমাত্মা জানেন, তাঁর আশীর্বাদের লাভ প্রাপ্ত করার জন্য এবং চমৎকার লীলা দেখার জন্য ভৌতিক লাভের কারণে চারিদিকে জয় জয়কার হচ্ছে। আমার উপর এদের বিশ্বাস নেই যে, আমি পরমাত্মা কিন্তু দেখাদেখি করে বলে যে কবীরজী আমাদের সদগুরুদেব তো স্বয়ং পরমাত্মা। তাই ভক্তরা আমাকে পরমাত্মা বা সদগুরু বলে। এই জন্য পূর্ণ পরমাত্মা পরমপিতা শিষ্যদের পরীক্ষা নেওয়া দরকার বলে মনে করে, যে ভক্তরা তত্ত্বজ্ঞান বুঝেছে কি না? যদি পূর্ণ বিশ্বাস বা মর্যাদায় না থাকে তাহলে মোক্ষের অধিকারী হবে না। তাই শিষ্যদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য নিজের পরম ভক্ত রবিদাসকে ডেকে বললেন, একটি হাতি ভাড়া করো।

কাশী নগরে এক সুন্দরী বেশ্যা ছিল। তার বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে কবীর সাহেবের এক ভক্তের বাড়ি ছিল। কবীর জী ঐ বাড়িতে রাত্রে সৎসঙ্গ করছিলেন। ঐ দিন ঐ বেশ্যার কাছে কোন গ্রাহক ছিল না। তাই সত্সঙ্গ কথা শোনার জন্য চেয়ার নিয়ে ছাদের উপর বসে। সত্সঙ্গ শোনার পর সত্সঙ্গ স্থলে এসে পরমাত্মা কবীরজীকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, গুরু জী আমার মত পাপিণীর কি উদ্ধার হতে পারে? আমি আমার জীবনে প্রথম আজ আত্মকল্যাণের কথা শুনেছি। এখন আমার কাছে দুটো পথ বেঁচে আছে, এক আত্মা কল্যাণ দ্বিতীয়ত আত্মাহত্যা করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা। পরমাত্মা কবীর জী বলেন, পুত্রী! আত্মাহত্যা করা মহাপাপ। ভক্তি করলে পরমাত্মা সর্ব পাপ নষ্ট করে দেন। তুমি আমার থেকে দীক্ষা নিয়ে ভক্তি করো আর পাপ করা থেকে বিরত থাকো। ঐ বোন পাপ না করার প্রতিজ্ঞা করে পরমাত্মা কবীর জীর থেকে দীক্ষা নিয়ে ভক্তি শুরু করে। যেখানেই প্রভু কবীর জী সত্সঙ্গ করতেন ঐ বোন সতসঙ্গ শুনতে সেখানে চলে যেতেন। ঐ বোনের সতসঙ্গে আসা অন্য ভক্তরা পছন্দ করতো না। তাই তারা বলতো তোর জন্য গুরুজীর বদনাম হচ্ছে। তুই সত্সঙ্গে এসে গুরুজীর কাছে বসবি না, আর তুই আর সত্সঙ্গেও আসবি না। এই কথা গুরুজীকে বলে ঐ বোন কাঁদতে লাগে। পরমেশ্বর বলেন পুত্রী! তুমি সৎসঙ্গে আসবে।

পরমেশ্বর কবীর জী সৎসঙ্গ প্রবচনে বলেন, ময়লা কাপড় সাবান আর জলের সংস্পর্শে না আসলে কিভাবে নির্মল হবে? সেইরূপ পাপী ব্যক্তি সত্সঙ্গ বা গুরু থেকে দূরে থেকে আত্মার কল্যাণ কি ভাবে করাবে? ভক্তরা কখনো বেশ্যা তথা রোগীদের ঘৃনা করে না, তাদের ভালবাসে। জ্ঞান চর্চার দ্বারা ওদের মোক্ষ প্রেরণা দেয়। পরমাত্মা কবীর জী বার বার বোঝানোর পরেও ভক্তরা ঐ বোন কে সরসঙ্গে আসতে বারন করতো আর বলতো তোর জন্য কাশীতে গুরুজীর বদনাম ছড়াচ্ছে।

কাশীর মানুষ বলে তোমার গুরুর কাছে বেশ্যাও যায়। ও কেমন গুরু? পরমপিতা পরমাত্মা চম্পাকলিকে বলে, পুত্রী! তুই আগামী দিন সকাল ১০-টার সময় আমার সঙ্গে হাতির পীঠে বসে যাবি। ভক্তিমতি চম্পাকলি বলে, যেমন আপনার আদেশ গুরুদেব! পরের দিন সকাল প্রায় দশটার সময় কবীর সাহেব ও ভক্ত রবিদাস এবং ভক্তিমতি চম্পাকলি হাতির পিঠে বসে কাশী শহরের মূখ্য বাজারের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। রবিদাসজী হাতি চালাচ্ছিল, ভক্তিমতি চম্পাকলি মাঝখানে আর কবীর সাহেব পিছনে বসেছিলেন। কবীর জী একটি বোতলে গঙ্গার জল ভরে মদের মত বারে বারে পান করতে থাকেন। কাশী বাসীরা চিন্তা করে কবীর জী নেশায় মত্ত হয়ে বেশ্যাকে নিয়ে দিনের বেলায় কাশী শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাই বলতে লাগে দেখো, বড়-বড় উপদেশ দেওয়া কবীর জুলাহের আজ মুখোশ খুলে গিয়েছে। এই ব্যক্তি সত্সঙ্গের বাহানায় এমন নীচ কর্ম করে। কাশীর জনতা কবীর সাহেবের শিষ্যদেরকে ধরে ধরে এনে দেখিয়ে বলতে লাগে দেখো! তোমার পরমাত্মার কাণ্ড। মদ খাচ্ছে আর বেশ্যাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই লীলা দেখেই ৬৪ লাখ শিষ্য পরমাত্মাকে ছেড়ে চলে যায় এবং পূর্বের সাধনা করতে থাকে। লোক লজ্জার কারণে গুরু বিমুখ হয়ে যায়।

কবীর জী বিশেষ করে এই লীলা তখন করেন যখন দিল্লীর রাজা সিকন্দর লোধী কাশীতে আসেন। ঐ সময় দিল্লীর রাজা সিকন্দর লোধী কাশীতে উপস্থিত ছিলেন। কাজী, পণ্ডীতরা রাজার কাছে নালিশ করে কবীর জুলাহ (তাঁতী) আমাদের উপর জুলুম করছে। লজ্জা-ঘৃণা ত্যাগ করে প্রকাশ্যে বাজারে হাতির পিঠে বসে বেশ্যার সঙ্গে মদ খেয়ে খারাপ কর্ম করে চলেছে। রাজা! এক্ষুনি কবীরকে ধরে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে মারার আদেশ দেয়। রাজা সিকন্দর নিজে কবীর জীর হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি, গলায় শিকল দিয়ে বেঁধে দেয়। রাজার সৈনিকরা নৌকায় করে মাঝ-গঙ্গায় নিয়ে কবীর সাহেবকে জলের মধ্যে ফেলে দেয়। হাতের হাতকড়ী আর পায়ের বেড়ী আপনা থেকে খুলে জলে পড়ে যায় আর পূর্ণ পরমাত্মা জলের উপর পদ্মাসনে বসে থাকেন। গঙ্গার জল নিচে চক্কর কেটে তেজ স্রোতে বয়ে চলছে আর পরমাত্মা কবীর সাহেব আরামে জলের উপর বসে আছেন। কিছু সময় পরে পরমাত্মা কবীরজী গঙ্গার কুলের কাছে আসেন। তখন শেখতকীর আদেশে কবীর পরমেশ্বরকে ধকে নৌকায় বসিয়ে কোমর, পায়ে, গলায় ভারী পাথর বেঁধে দুই হাতকে পিছমোড়া করে বেঁধে পুনরায় গঙ্গা নদীর মাঝখানে ফেলে আসে। দড়ি নিজে থেকে ছিঁড়ে যায় আর পাথর জলে ডুবে যায়। পরমেশ্বর কবীরজী জলের উপর আরামে বসে থাকেন। কবীর সাহেব জলে ডুবছে না দেখে শেখতকী ক্রোধিত হয়ে রাজাকে জানিয়ে তোপ (কামান) চালানোর আদেশ দেয়। সর্বপ্রথম পরমাত্মাকে পাথর মারে, গুলি মারে, তির চালায় কিন্তু পরমাত্মার শরীরে একটিও লাগে না। তখন শেখতকীর আদেশে কামান দাগানো হয়। চার প্রহর অর্থাৎ ১২ ঘন্টা পর্যন্ত কামানের গোলা চালানো হয় কিন্তু কামানের গোলা কখনো দূরে দিয়ে পড়ে কখনো ডান দিকে কখনো বাম দিকে গিয়ে পড়ে, একটিও গোলা, পাথর, বন্দুকের গুলি পরমাত্মা কবীর জীর কাছে এসে পড়ে না। এতো চমৎকার দেখেও কাশীর পাখণ্ডিরা পরমেশ্বরকে চিনতে পারেনি। পরমেশ্বর কবীরজী দেখেন এদের জ্ঞান সব অন্ধ তাই নিজের ইচ্ছায় গঙ্গার জলে মিশে যান আর রবিদাসের ঘরে গিয়ে প্রকট হন। দর্শকদের বিশ্বাস হয়ে যায় যে কবীর জুলাহা গঙ্গার জলে ডুবে মারা গেছে। সবাই আনন্দে নাচ গান করতে করতে শহরের দিকে চলে আসে। শেখতকী নিজের সভাসদ নিয়ে রবিদাস জীর বাড়িতে সংবাদ দিতে যায়, যে তুমি যাকে পরমেশ্বর বলো সে গঙ্গার জলে ডুবে মারা গেছে। সন্ত রবিদাস জীর বাড়িতে গিয়ে দেখে কবীর সাহেব

একতারা বাজিয়ে গান গাইছেন কবীরজীকে দেখে শেখতকীর মরা-মরা অবস্থা। রাজা সিকন্দরের কাছে গিয়ে বলে কবীর চোখে ধূলা দিয়ে পালিয়ে রবিদাসের বাড়িতে গিয়ে বসে আছে, আর আনন্দে গান গাইছেন। রাজা সিকন্দর রবিদাসের কুটিরে যান। কবীর জী অন্তর্ধান হয়ে পূর্বের ন্যায় গঙ্গায় জলের উপর বিরাজমান হয়ে যান, মনে হচ্ছে সমাধি লাগিয়ে বসে আছেন। রাজা রবিদাস জীকে জিজ্ঞাসা করে কবীর জী কোথায়? রবিদাস জী বলে হে বাদশাহ জী! কবীর জী পূর্ণ পরমাত্মা অলখ আল্লাহ, পরমাত্মাকে চেনার চেষ্টা করুন। পরমাত্মার নিজের ইচ্ছা কখন কোথায় যান কে জানে। তিনি সব সময় সকলের সঙ্গে থাকেন। তখন এক ব্যক্তি এসে বলে রাজা, কবীর জী গঙ্গার জলের উপর বসে ভক্তি করছে। রাজা সভাসদ ও সিপাহিদের নিয়ে গঙ্গার তীরে যান। এক মাঝিকে আদেশ দেন কবীর জীকে নিয়ে এসো। মাঝি কবীর পরমেশ্বরের কাছে গিয়ে বলে, রাজা আপনাকে ডেকেছেন। কবীর সাহেব ঐ জাহাজে (বড়ো নৌকা ) করে মাঝির সাথে তীরে আসেন।

রাজা সিকন্দর কবীর জীকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে হাত, পা বেঁধে খুনি হাতিকে দিয়ে মারার আজ্ঞা দেয়। চারিদিকে দর্শকরা দাঁড়িয়ে ছিল। রাজা সিকন্দর উঁচুস্থানে বসে ছিলেন। পরমাত্মাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে মাটির উপরে ফেলে রেখেছে। মাহুত (হাতির চালক) হাতিকে মদ খাইয়ে কবীর জীকে মারার উদ্দেশ্যে পরমাত্মা কবীর জীর দিকে হাতি নিয়ে যেতে লাগে। কবীর জী এক বব্বর শের (সিংহ) দাঁড় করিয়ে দেন। শুধু হাতি দেখতে পায়। হাতি ভয়ে চিৎকার করে পিছনে চলে আসে। মাহুতের চাকরির ভয় তাই হাতিকে লোহার হুল দিয়ে মারতে লাগে আর কবীর জীকে মারার আদেশ দিতে থাকে। কিন্তু হাতি উল্টো দিকে দৌড়াতে লাগে। তখন মাহুত ও বব্বর শের (সিংহ) কে দেখতে পায়। মাহুতের হাত থেকে ভয়ে অংকুশ পড়ে যায়। আর হাতি দৌড়ে পালায়। পরমেশ্বর বন্ধন মুক্ত হয়ে দাঁড়ান। রাজা সিকন্দর এক প্রকাশমান বিশাল (মনে হচ্ছে আকাশকে ছুঁইছে) শরীর দেখতে পান। রাজা সিকন্দর ভয়ে কাঁপতে লাগে এবং কবীর জীর শ্রীচরণে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে লাগে। হে মালিক, পরমেশ্বর! আমাকে বাঁচাও, রক্ষা করো আমি বড়ো ভুল করেছি। আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনি স্বয়ং আল্লাহ, ভগবান। আপনি পৃথিবীতে এসেছেন। তখন পরমেশ্বর কবীরজী কাশী নগরে এসে ঐ বেশ্যার বাড়িতে চৌকিতে বসে পড়েন। ঐ মেয়ে (গনিকা) কবীর জীর চরন সেবা করতে লাগে। কবীর জীর দুই পা নিজের হাঁটুর উপর রেখে সেবা করতে থাকে।

**নোট:- এই বাণীসমূহের শব্দার্থ উপরে সংক্ষেপে করা হয়েছে।**

**ফির গণিকা কে সঙ্গ চলে, শীশী ভরী শরাব। গরীবদাস উস পুরী মেঁ, জুলহা ভয়া খরাব॥৭২৬॥**
**তারী বাজী পুরী মেঁ, ভ্রষ্ট জুলহদী নীচ। গরীবদাস গণিকা সজী, দো সন্তৌ কৈ বীচ॥৭২৭॥**
**গাবত বৈন বিলাস পদ, গঙ্গাজল পীবন্ত। গরীবদাস বিহ্বল ভয়ে, মতবালে ঘূমন্ত॥ ৭২৮॥**
**ভড়বা ভড়বা সব কহৈঁ, কোঈ ন জানৈঁ খোজ। দাস গরীব কবীর কর্ম, বাঁটত সির কা বোঝ॥ ৭২৯॥**
**দেখো গণিকা সঙ্গ লঈ, কহতে কৌঁম ছত্তীস। গরীবদাস ইস জুলহদী কা, দর্শন আন হদীস॥৭৩০॥**
**শাহ সিকন্দর কূঁ সুনী, ভ্রষ্ট হুয়ে দো সন্ত। গরীবদাস চ্যারোঁ বর্ণ, উঠ লাগে সব পন্থ॥৭৩১॥**
**চ্যার বর্ণ ষট্ আশ্রম, দোনোঁ দীন খুশহাল। গরীবদাস হিন্দূ, তুর্ক কহে, অব জুলাহে কা কাল॥৭৩২॥**
**শাহ সিকন্দর কৈ গয়ে, সুন কবলে অরদাস। গরীবদাস তলঁবা হুঈ, পকড়ে দোনোঁ দাস॥৭৩৩॥**
**কহো কবীর য়ৌহ ক্যা কিয়া, গণিকা লীন্হী সঙ্গ। গরীবদাস ভূলে ভক্তি, পড়য়া ভজন মেঁ ভঙ্গ॥৭৩৪॥**
**সুনৌ সিকন্দর বাদশাহ, হমরী অর্জ অবাজ। গরীবদাস বহ রাখসী, জিন যৌহ সাজ্যা সাজ॥৭৩৫॥**
**জড়িয়া তৌক জঞ্জীর গলে, শাহ সিকন্দর আপ। গরীবদাস পদ লীন হৈ তারী অজপা জাপ॥৭৩৬॥**
**হাথোঁ জড়ী হথকড়ী, পগ বেড়ী পহরায়। গরীবদাস বীচ গঙ্গা মেঁ, তহাঁ দীন্হা ছিটকায়॥৭৩৭॥**

ঝড় গয়ে তোঁক জঞ্জির সব, লগে কিনারে আয়। গরীব দাস দেখে খলক, স্যোঁ কাজী বাদশাহ॥৭৩৮॥
নীচৈ নীচৈ গঙ্গা জল, উপর আসন থীর। গরীবদাস ডূবে নহীঁ, বৈঠে অধর কবীর॥৭৩৯॥
য়ৌহ অচরজ কৈসা ভয়া, দেখেঁ দোনোঁ দীন। গরীবদাস কাজী কহেঁ, বাঁধ দিয়া জল সীন॥৭৪০॥
গল মেঁ ফাঁসী ডার কর, বান্ধো শিলা সুধার। গরীবদাস য়ৌহ জুলহদী, জব ডূবে গঙ্গ ধার॥ ৭৪১॥
শিলা ধরী জব নাব মেঁ, বান্ধী গলে কবীর। গরীবদাস ফন্দ টূট গয়ে, না ডূবে গঙ্গ নীর॥৭৪২॥
শিলা চলী শাহ ঔর কৌ, দেখত কাশী খ্যাল। গরীবদাস কবীর কা আসন অধর হমাল॥৭৪৩॥
তীর বাণ গোলী চলী, তোপ রহ কল্যোঁ শোর। গরীব দাস উস জুলহে কে, এক গঙ্গী নহীঁ ওর॥৭৪৪॥
অধর ধার গোলে বহেঁ, জল কে বীচ গভাক। গরীবদাস উস জুলাহে পর, শস্ত্র ছুটে লাখ॥৭৪৫॥
তোপ রহকলে সব চলে, তীর বাণ কমান। গরীবদাস বহ জুলাহা, জল পর রহ্যা অমান॥৭৪৬॥
অধর ধার অপার গতি, জল উপর লগী সমাধি। গরীবদাস নিজ ব্রহ্ম পদ, খেলৈ আদি অনাদি॥৭৪৭॥
জুল্ম হুয়া ডূবৈ নহীঁ, শস্ত্র লগে ন বাণ। গরীবদাস অব ক্যা কীজৈ, কৈসে লীজে প্রাণ॥৭৪৮॥
লগী সমাধী অগাধ মেঁ, বিচরে কাশী গঙ্গ। গরীবদাস কিলোল সর, ছূটেঁ চরণ গঙ্গ তরঙ্গ॥৭৪৯॥
চ্যার পহর গোলে বগে, ধমী মুলক মৈদান। গরীবদাস পোখর সূখে, রহে কবীর অমান॥৭৫০॥
অপনী করনী সব করী, থাকে দোনোঁ দীন। দাস গরীব কবীর জী, পৈঠ গয়ে জল মীন॥৭৫১॥
ডূব্যা ডূব্যা সব কহেঁ, হো গয়া গারত গোর। গরীবদাস কবলে ধনী, তুম আগে ক্যা জোর॥৭৫২॥
আনন্দ মঙ্গল হোত হৈ, বটেঁ বধাঈ বেগ। গরীবদাস উস জুলাহে পর অব ফির গঈ রেতী রেঘ॥৭৫৩॥
হস্তী ঘোড়ে চড়ত হৈঁ, পান মিঠাঈ চীর। গরীবদাস কাশী খুশ, বূড়ে গঙ্গ কবীর॥৭৫৪॥
জাঔ ঘর রৈদাস কে, হিলকারে হজূর। গরীবদাস খুসিয়াঁ কহো, কহিয়ো নহীঁ কসূর॥৭৫৫॥
ঝালরি ঢোলক বাজত হৈঁ, গাবৈ শব্দ কবীর। গরীবদাস রৈদাস সঙ্গ, দোনোঁ এক হী তীর॥৭৫৬॥
কাজী পণ্ডিত সব গয়ে, শাহ সিকন্দর ঔঠ। গরীবদাস রৈদাস কৈ, ভেখ গয়ে জটজূট॥৭৫৭॥
কোঠী কুঠলে সব ঝকে, বাসন টীন্ডর গোল। গরীব দাস রৈদাস সুনোঁ, কহাঁ গয়ে বহ বোল॥৭৫৮॥
বে প্রত্যক্ষ পূর্ণ পুরুষ হৈঁ অবিনাশী অলখ অল্লাহ। গরীব দাস রৈদাস কহৈ সুনোঁ সিকন্দর শাহ॥৭৫৯॥
সূরজমুখী সুভান সর, খিলে ফূল গুলজার। গরীবদাস কাজী পণ্ডিত, করতা শাহ পুকার॥৭৬০॥
শাহ সিকন্দর ফির গয়ে, উস গঙ্গা কে তীর। দাসগরীব কবীর হরি বৈঠে উপর নীর॥৭৬১॥
বৈঠ মল্লাহ জিহাজ মেঁ, গয়ে ধার কে বীচ। গরীবদাস হরি হরি করেঁ, প্রেম ফুহারে সীঁচ॥৭৬২॥
করী অর্জ মলাহ তহাঁ, দীন দুনি বাদশাহ। গরীবদাস আসন অধর, লগী সমাধী জুলাহ॥৭৬৩॥
ভবঁর ফিরত হৈঁ গঙ্গা জল মে, ফূল উগানেঁ কোটি। গরীবদাস তহাঁ বন্দগী, হরিজন হরি কী ওট॥৭৬৪॥
সাঁকল সীঢ়ী লায় কর, উতরে তহাঁ মল্লাহ। গরীবদাস হম বন্দগী, য়াদ কিয়ে বাদশাহ॥৭৬৫॥
বৈঠ কবীর জহাজ মেঁ, আয়ে গঙ্গা ঘাট। গরীবদাস কাশী থকী, হাণ্ডে বৌহ বিধি বাট॥৭৬৬॥

**শব্দার্থ:- বাণী নং-৭২৬ ও ৭৩০ এর শব্দার্থ:-** শিষ্যদের পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যে পরমাত্মা কবীরজী একটি বোতলে গঙ্গাজল ভরে রবিদাস ও কাশী শহরের প্রসিদ্ধ বেশ্যার সাথে ভাড়া করা একটি হাতির পিঠে বসে কাশী শহরের মূখ্য বাজারের গলিতে ঘুরতে লাগলেন। মদ খাওয়ার মতো বোতলে মুখ লাগিয়ে জল পান করার অভিনয় করছিলেন। পিছনে বেশ্যা বসেছিল। কবির জী বসে কাঁধে হাত রেখে প্রেমিকের মত অভিনয় করছিলেন। এই কাণ্ড দেখে কাশী শহরের লোক জন হাতে তালি বাজাতে লাগে আর বলতে লাগে দেখো! জুলাহা কবীর, নীচ বেশ্যাকে সঙ্গে নিয়ে মদের নেশায় বেশ্যার গলায় হাত দিয়ে মাতালের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরমাত্মা কবীর জী ভক্তির শব্দ ও কবিতার বাণী গাইছিলেন আর মাতালের মতো টাল-মাটাল করছিলেন। সাধারণ জনতারা মনে করছিল, কবীর জী নেশায় মত্ত হয়ে গান করছে আর অভদ্র ভাবে বেশ্যার সাথে এক সঙ্গে মিশে বেশ্যার কাধে হাত রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর তো কোনো লোক লজ্জা নেই। কাশীর অধিবাসিরা কবীর জী কে ব্যভিচারি অর্থাৎ

দুশ্চরিত্র বলতে লাগে। কিন্তু তার এই লীলা কেউ বুঝতে পারে নি। পরমাত্মা কবির জী সদগুরু রূপে অনেক শিষ্যকে নাম উপদেশ দিয়েছিলেন। তাদের পাপের ভার নিজের মাথায় রেখেছিলেন। কিন্তু শিষ্যরা গুরুর আদেশ পালন করতো না। ঐ পাপের ভার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কবির জী এই লীলা করেন। অজ্ঞানি শিষ্যরা এই লীলা দেখে নামদীক্ষা ত্যাগ করে গুরুজীর থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং সত্সঙ্গ শোনা বা সতসঙ্গে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। যে সমস্ত শিষ্যরা নাম ত্যাগ করে ছিল তাদের পাপের ভার কবিরজীর মাথা থেকে নেমে যায়। কাশী শহরের ৩৬ সম্প্রদায়ের মানুষ বলতে লাগে যে, দেখো দিনের বেলায় বেশ্যাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই কবীরের মুখ দেখাও পাপ।

**বাণী নং ৭৩১-৭৫৪ এর ভাবার্থ:-** ঐ সময়ে পুরো ভারতের সম্রাট সিকন্দর লোধী কাশী শহরে ছিলেন এবং তার অধীনে অনেক ছোটো ছোটো রাজ্য ছিল। কাশীর রাজা বীরসিংহ বাঘেলও সম্রাটের অধীনে ছিল। পরমাত্মা কবীর জী বিশেষ করে অনেক লীলা তখন করেন যখন দিল্লীর রাজা সিকন্দর লোধী কাশীতে আসেন। পরমাত্মা তো জানেন সর্ব ধর্ম ও সর্ব জীব তাঁর সন্তান, তাঁর বচনেই উৎপত্তি হয়েছে। জীবের পিতা হওয়ার কারণে পরমাত্মা নিজের সন্তানকে কাল ব্রহ্মের জাল থেকে ছাড়ানোর জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। পরমাত্মা কবীর জী চেয়েছিলেন সিকন্দর লোধী আমার ক্ষমতার বিষয়ে জেনে আমার শরণে এসে নিজের কল্যাণ করাক এবং তার রাজ্যে সত্য জ্ঞান প্রচারে সাহায্য করুক।

ভারতবর্ষের হিন্দু গুরু-ব্রাহ্মণদের ও মুসলমানদের মোল্লা-কাজীদের মধ্যে সর্বদা বিরোধ থাকত। ধর্মের নামে ঝগড়া-ঝাটি ইত্যাদি খাড়া করে থাকতো কিন্তু যখন কবীর জীর ত্রুটি দেখতো বা মিলে যেত তখন নিজেদের ঝগড়া ভুলে এক হয়ে কবীর জীর বিরোধ করে থাকতো। কারণ কবীর জী দুই ধর্মের প্রচারকদের জ্ঞান কে ভুল প্রমাণিত করে বলতেন এই ধর্ম গুরুদের নিজেদের ধর্ম গ্রন্থের জ্ঞান নেই। এরা সবাই শাস্ত্রবিরুদ্ধ জ্ঞান ও ভক্তি প্রচার করতো। এইজন্য সাধকরা পরমাত্মার থেকে কোন কাজ এবং আধ্যাত্মিক লাভ পেতো না।

কবীর জীর থেকে নাম দীক্ষা নেওয়া ব্যক্তিদের তৎক্ষনাৎ ও দ্রুত লাভ হত। এই কারণের জন্য ঐ সময়ে পরমাত্মা কবীর জীর ৬৪ লক্ষ শিষ্য হয়েছিল। ঐ সব শিষ্যরা পূর্বে মহা দুঃখী ছিল। কবীর জীর আর্শীবাদে ও দীক্ষা গ্রহণ করার ফলে সকলের কষ্ট সমাপ্ত হয়ে সুখী হয়েছিল। ঐ সময়ে দুই ধর্মের প্রচুর সংখ্যক লোক কবীর জীর শিষ্য হয়েছিল। তার জন্য ঐ ধর্ম প্রচারকরা ও ধর্মগুরুরা কবীর জীকে তীব্র হিংসা করতো। এই ঘটনায় দুই ধর্মের লোক উৎসাহিত হয়ে হাজার সংখ্যায় একত্রিত হয়ে বিচারের জন্য রাজা সিকন্দরের বিশ্রাম গৃহে গিয়ে দেখা করেন। কারণ জানার পর জনতাদের প্রসন্ন করার জন্য রাজা বলেন কবীরকে বন্দী করে মৃত্যুদণ্ড দাও। রাজার সিপাহী সন্ত রবিদাস ও কবীর জীকে ধরে নিয়ে আসে। কবীর জীকে বলেছিলেন যে, না রবিদাস না গনিকা কারোর কোনো দোষ নেই, সব কিছু আমি করেছি। কবীর জী দোষ স্বীকার করার জন্য রাজা সন্ত রবিদাসকে ছেড়ে দেন। নতুন শিষ্য সিকন্দর লোধীর অসাধ্য রোগ কবীর সাহেবের আর্শীবাদ মাত্র সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। রাজার উপস্থিতিতে কবীরজী এক মৃত বালক কামাল ও বালিকা কামালীকে এবং স্বামী রামানন্দকে (যাকে রাজা সিকন্দর লোধী হত্যা করেছিল) জীবিত করে ছিলেন। রাজা সিকন্দর কবীরজীকে গুরু মানতেন। কিন্তু অধিক জনতা দেখে রাজ্যের বিচার ব্যবস্থা ঠিক রাখার জন্য এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ মনে করে কবীরজীকে গ্রেপ্তার করেন।

তাও গুরু মর্যাদা রাখার জন্য সিকন্দর লোধী বলেন হে কবীর জী! আপনি তো নীতি-আদর্শবান ছিলেন, এই জঘন্য কর্ম কেন করে বসেছেন। আপনি এক বেশ্যাকে সঙ্গে রেখেছেন। আপনি আপনার ভক্তি খন্ডন করে সর্বনাশ করেছেন। কবীর জী উত্তর দেন, হে রাজা সিকন্দর! যে পরমেশ্বর সর্ব ব্রহ্মাণ্ডকে রচনা করে সুরক্ষিত রেখেছেন, তিনি আমাকেও রক্ষা করবেন। জনতাদের শান্ত করার উদ্দেশ্যে রাজা সিকন্দর নিজের হাতে কবীর পরমেশ্বর জীর হাতে হাতকড়ি, পায়ে ও গলায় শিকল দিয়ে বেঁধে দেয়। আর গঙ্গা নদীর মাঝখানে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলার আদেশ শুনিয়ে দেয়।

রাজার সৈনিকরা নৌকায় করে মাঝ গঙ্গায় নিয়ে কবীর সাহেবকে জলের মধ্যে ফেলে দেয়। হাতের হাতকড়ী আর পায়ের বেড়ী আপনা থেকে খুলে জলে পড়ে যায় আর পূর্ণ পরমাত্মা কবীর জী জলের উপর পদ্মাসনে বসে থাকেন। এই কাণ্ড দেখে মোল্লা, কাজীরা বলে কবীর মন্ত্র দিয়ে জলকে বেঁধে রেখেছে তাই সে ডুবছে না। গঙ্গায় জলের স্রোত বয়ে চলছে আর পরমাত্মা কবীর সাহেব আরামে জলের উপর বসে আছেন। কিছু সময় পরে কবীর জীকে গঙ্গার কুলের কাছে আনা হয়, যেখান থেকে নৌকাতে বসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনা দেখানোর সময় হাজার-হাজার লোক উপস্থিত ছিল, ওখানে সিকন্দর রাজাও উপস্থিত ছিল। ব্রাহ্মণ তথা মোল্লা-কাজীরা বিচার করে রাজাকে বলে, কবীরের গলায় ভারী ওজনের পাথর বেঁধে পুনরায় গঙ্গার মাঝখানে ফেলে দিন, তবে ডুবে যাবে। তারপর কবীর জীকে নৌকাতে বসিয়ে গলায় লোহার মোটা শিকলের সাথে ভারি পাথর বেঁধে গঙ্গা নদীর মাঝখানে জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। শিকল নিজে থেকে খুলে যায় আর পাথর জলের উপর দিয়ে দ্রুত গতিতে সিকন্দর রাজার দিকে আসতে লাগে এবং ডুবে যায়। কবীর পরমাত্মা জলের উপর সুখ আসনে আরামে বসে আছেন আর নিচ দিয়ে জলের স্রোত বয়ে চলছে। পরমাত্মা কবীর জী জলে ডুবে যায়নি গঙ্গার জলের ঢেউ কবীর জীর চরন স্পর্শ করে উথলে উঠে কোলাহল করে খেলা করছিল। রাজা তির মেরে এইটার অন্ত বা শেষ করার আদেশ দেয় যখন বহু সময় ধরে তির ও বাণের সাহায্যে মারা যাচ্ছে না দেখে তোপ মারার যন্ত্র আনার আদেশ হল। তোপের গোলা এবং তির দুটোই ছোঁড়া হল কিন্তু একটিও পরমেশ্বরের দিকে যায়নি। কোনো গোলা নদীর পাশে গিয়ে পড়লো আর কোনো গোলা দূরে গিয়ে পড়লো। কোনো গোলা দূরের পুকুরের মধ্যে পড়ে পুকুরের জল শুকিয়ে দিল। তোপের কিছু গোলা ডান বা বাঁ দিকে পড়ছিল। পরমেশ্বর কবীর জীর নিকট একটিও গোলা বা তির-বাণ যায়নি। চার প্রহর অর্থাৎ ১২ ঘন্টা পর্যন্ত এইরূপ চলছিল, কিন্তু কবীর মারা গেলেন না। পূর্ণ পরমাত্মা কবীর জী হলেন অবিনাশী। অবিনাশীকে কেউ কি মারতে পারে? পরমাত্মা লীলার মাধ্যমে নিজের সামর্থতা দেখাচ্ছিলেন কিন্তু  কাল ব্রহ্ম সকলের বুদ্ধি ভ্রমিত করে রেখেছিল। এতো চমৎকার দেখানোর পরেও কারো মধ্যে এমন বিচার আসেনি যে এ কোনো সাধারণ মানুষ নয়। রাজা ও প্রজারা কবীরজীকে মারার জন্য এক সঙ্গে সব ধরনের চেষ্টা করে কিন্তু সবচেষ্টা বিফলে যায়, তাই রাজা প্রজা বলতে থাকে কি করে একে মারা যায়? সমস্ত কু-চেষ্টা ও অত্যাচার ব্যর্থ হওয়ার পরে কবীর জী গঙ্গা জলে ডুব দেন। উপস্থিত জনতারা বলতে লাগলেন এবং মেনে নিলেন যে কবীর জলে ডুবে মারা গেছে। কবীর জীর মৃত্যুর খুশিতে ব্রাহ্মণ, মোল্লা ও কাজীরা আনন্দে নাচ-গান করে একে অপরকে মিষ্টি খাওয়াতে লাগে এবং ঢোল বাজাতে লাগে। রাজা বিশ্রাম গৃহতে চলে গেলেন। কাজী মোল্লা ও পণ্ডিতরা মিলে কবীর জীর মৃত্যুর খবর দিতে রবিদাসে কুঠিরে যায়, ওখানে রবিদাসের কুঠির থেকে কবীর জীর আওয়াজ শোনা

যাচ্ছিল। কবীরজী রবিদাসের বাড়িতে বসে পরমাত্মার মহিমার বাণী গাইছিলেন। এই দৃশ্য দেখে ঐ পাখণ্ডিরা ফিরে এসে রাজা সিকন্দরকে বলে, হে রাজন! কবীর জুলাহা মরেনি। ওতো রবিদাসের ঘরে বসে আছে। হাজার হাজার সংখ্যায় কাশী নগরের কাজী মোল্লা ও পণ্ডিতরা রবিদাসের ঘরে গেলেন। ওখানে কবীর জীকে দেখতে না পেয়ে রবিদাস জীকে জিজ্ঞাসা করে, কবীর কোথায়? রবিদাস জী বলেন এতক্ষণ আমার কাছে বসেছিলেন। বলছিলেন গঙ্গা থেকে স্নান করে আসি। জনতা ও রাজা নদীর সেই স্থানে গিয়ে দেখে কবীরজী পূর্বের ন্যায় নদীর মাঝখানে জলের উপরে বসে আছেন। ঐ সময়ের ছোট সামুদ্রিক জাহাজে চালক ও কিছু জনতা কবীরজীর কাছে গিয়ে বলে রাজা সিকন্দর আপনাকে ডাকছে। কবীরজী সিঁড়িতে চড়ে জাহাজে বসে নদীর বাইরে এলেন। আসা মাত্রই কবীরজীকে গ্রেপ্তার করে নিল।

## "খুনি হাতি দিয়ে কবীর পরমেশ্বরকে মারার কু-চেষ্টা"

**খূনী হাথী মস্ত হৈ, পগ বাঁধে জঞ্জীর। গরীবদাস তহাঁ ডারিয়া, মসক বান্ধ কবীর॥৭৬৭॥**
**সিংহ রূপ সাহিব ধরয়া ভাগে উলটে ফীল। গরীবদাস নহীঁ সমঝতী, য়াহ দুনিয়া খলীল॥৭৬৮॥**
**বনে কেহরী সিং জিত, চঁবর শিখর অসমান। গরীবদাস হস্তী লখ্যা, দীখে নহীঁ জিহান॥৭৬৯॥**
**কূটৈ শীশ মহাবন্ত, অংকুশ শীর গরগাপ। গরীবদাস উলটা ভাগৈ, তারী দীজে থাপ॥৭৭০॥**
**ভালে কোখোঁ মারিয়েঁ, চরখী ছুটেঁ লাখ। গরীবদাস নহীঁ নিকট জায়, কিলকী দেবৈঁ লাখ॥৭৭১॥**
**জৈসী ভক্তি কবীর কী, এস্যী করে ন কোয়। গরীবদাস কুঞ্জর থকে, উলটে ভাগে রোয়॥৭৭২॥**
**দুঁম গোবৈ মুণ্ডী ধুনৈ, সৈন ন সমঝৈ এক। গরীবদাস দীখে নহীঁ, আগে খড়া অলেখ॥৭৭৩॥**
**পীলবান দেখ্যা তবৈ, খড়া কেহরী সিংঘ। গরীবদাস আয়ে তহাঁ, ধর মৌলা বহু রংগ॥৭৭৪॥**
**উতরে মৌলা কবীর অর্শ তেঁ, ভাবভক্তি কে হেত। গরীবদাস তব শাহ লখে, কবীর পুরুষ তন সেত॥৭৭৫॥**
**লীলা কী কবীর নে, দো রূপ মেঁ রহে দীস। দাস গরীব কবীর কে, পাস খড়ে দীখে জগদীশ॥৭৭৬॥**
**জংভাঈ অঙ্গড়াঈয়াঁ লী কবীর, লম্বে ভয়ে দয়াল। গরীবদাস শাহ সিকন্দর কূঁ মানোঁ দরশ্যা কাল॥৭৭৭॥**
**কৌটি চন্দ্র শশি ভান মুখ, গিরদ কুণ্ড দূম লীল। গরীবদাস তহাঁ না টিকে, ভাগ গয়ে রণফীল॥৭৭৮॥**
**নৈন লাল ভৌঁহ পীত হৈঁ, ডূঙ্গর নক পহার। গরীবদাস উস শাহ কূঁ, ফির সিংহ রূপ দীদার॥৭৭৯॥**
**মস্তক শিখর স্বর্গ লগ, দীর্ঘ দেহ বিলন্দ। গরীবদাস হরি উতরে, কাটন জম কে ফন্দ॥৭৮০॥**
**গিরদ নাভি নির্ভয় কলা, দুদকারে নহীঁ কোয়। গরীবদাস ত্রিলোক মেঁ, গাজ তাস কী হোয়॥৭৮১॥**
**জ্যুঁ নরসিং প্রহ্লাদ কৈ, য়ূঁ বহ নরসিংহ এক। গরীবদাস হরি দয়া করী, রাখী ভক্তি কী টেক॥৭৮২॥**
**বার-বার সতায় কর, মস্তক লীনা ভার। গরীবদাস শাহ য়োঁ কহৈ, বকসৌ ইবকী বার॥৭৮৩॥**
**তহাঁ সিংহ ল্যোলীন হুয়া, পরচা ইবকী বার। গরীবদাস শাহ য়োঁ কহৈ, অল্লহ দিয়া দীদার॥৭৮৪॥**
**সুনোঁ কাশী কে পণ্ডিতো, কাজী মুল্লা পীর! গরীবদাস ইসকে চরণ ল্যোঁহ, য়ো অল্লহ অলেখ কবীর॥৭৮৫॥**
**য়ৌহ কবীর অল্লাহ হৈ উতরে কাশী ধাম। গরীবদাস শাহ য়োঁ কহৈ, ঝগড় মরে বেকাম॥৭৮৬॥**
**কাজী পণ্ডিত রূঠিয়া, হম ত্যাগ্যা য়ৌহ দেশ। গরীব দাস ষটদল কহৈঁ জাদূ সিহর হমেশ॥ ৭৮৭॥**
**ইন জাদূ জন্তর কিয়া, হস্তী দিয়া ভগায়। গরীবদাস ইত না রহৈঁ, কাশী নগরী বিডরী জায়॥৭৮৮॥**
**কাশী বিডরী চহোঁ দিশা, থাম্ভন হারা এক। গরীবদাস কৈসে থম্ভৈ, বিডরে বৌহত অনেক॥ ৭৮৯॥**

**শব্দার্থ:-** বাণী নং-৭৬৭-৭৮৯:- পরমাত্মা কবীরজীকে হাত-পা বেঁধে একটি ময়দানে ফেলে দেয়, যেখানে ঘোর অপরাধীদেরকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হতো। ময়দানটি বর্তমানের স্টেডিয়ামের মতো বড়ো হতো। রাজা ও পদাধিকারীরা স্টেজে বসতেন আর দর্শকরা ময়দানের চারিপাশে দাঁড়াত। মানুষকে মারার জন্য হাতিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। হাতিকে রক্তের সঙ্গে মদ খাওয়ানো হতো মাথায় চক্কর আনার জন্য। ঐ হাতিকে খুনী হাতি বলা হয়। রাজা সিকন্দর এবং অন্যান্য মন্ত্রীগণ বসে স্টেডিয়ামে।

প্রজারা চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। খুনী হাতির মাহুত (হাতিকে বশ করে চালানো ব্যক্তি বা প্রশিক্ষক) কবীরজীকে মারার জন্য আনা হলে, পরমেশ্বর কবীরজী এক সিংহের রূপ ধরেন যেটা কেবল মাত্র হাতি দেখতে পায়। হাতিকে মদ খাইয়ে রাখা হয়েছিল তাই হাতি সিংহের রূপ দেখে ভয়ে উল্টোদিকে দৌড়াতে লেগে গেল। মাহুত হাতিকে অঙ্কুশ (লোহার রুল) দিয়ে মারতে থাকে, কবীরজীকে মারার জন্য, কিন্তু হাতি কবীরজীর দিকে যায় না। পরমাত্মা কবীর জী কেও সিংহের রূপ দেখিয়ে দেয়। মাহুত ভয়ে হাতি থেকে নেমে পড়ে যায়। হাতি ভয়ে পালিয়ে যায়। পরমাত্মা কবীর জীর বন্ধন খুলে যায় এবং পরমাত্মা সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন কবীরজীর শরীর ক্রমশ বড় হতে থাকে। লম্বা হতে হতে আকাশ ছুঁয়ে ফেলার মত হতে লাগে। শরীর থেকে অসংখ্য সূর্যের আলোর প্রকাশ ও ঝলকানি দেখা গেল যা কেবলমাত্র রাজা সিকন্দর দেখতে পায়। রাজা ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং মাঠের মধ্যে প্রবেশ করে কবীর জীর শ্রীচরণে পড়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রার্থনা জানায় ও নিজের ভুল স্বীকার করে। রাজা বলে আমার পরমাত্মার দর্শন হয়ে গিয়েছে জনতা কে উদ্দেশ্য করে রাজা বলে "কবীরই হলো আল্লাহু আকবর, কবীর রূপে পৃথিবীতে এসেছেন"। কবীর জীর চরণ স্পর্শ করে সবাইকে নিজের কল্যাণ করাতে বলে। রাজা পরমেশ্বর কবীর জীর স্মরণে আসেন। রাজার অনুরোধ সত্ত্বেও কাজী মোল্লা ও পন্ডিতরা বলে কবীর জাদু-মন্ত্র করে হাতিকে তাড়িয়েছে এই কথা বলে উপস্থিত পাপী আত্মারা চলে যায় পরমাত্মা আবার নিজের শরীরকে পূর্ব রূপ সামান্য আকারে আনেন এবং সিংহকে অদৃশ্য করে দিয়ে নিজের কুটিরে চলে আসেন।

## "দীক্ষা গ্রহণের পর"

পূর্ণ গুরুদেবের থেকে নাম দীক্ষা নেওয়ার পর পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে গুরুদেব দ্বারা বলা সাধনা পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে করতে হবে।

⇨ কবীরজী বলেছেন:-

**১. ধৈর্য ধরো:-**

**কবীর, ধীরে-ধীরে রে মনা, ধীরে সব কুছ হোয়।**
**মালী সীঁচে সৌঁ ঘড়া, সময় আয়ে ফল হোঁয়॥**

**ভাবার্থ:-** যেমন মালী আম গাছের বীজ লাগায়। বীজ লাগালে সেচ দেওয়া হয় কিছুদিন পরে অঙ্কুর দেখা দেয়। মালি সময় মত জল দিতে থাকে এবং গাছের চার পাশে কাঁটার বেড়া লাগায়। একটি আমের বীজ থেকে আমগাছ তৈরি করতে ৮/১০ বছর লেগে যায়। ততদিন মালী সময় মত জল দিতে থাকে। যখন গাছ বড় হয়ে যায় তখন গাছে অনেক ফল আসে। নিজেদের পরিবারের লোকেরা খায়, পাড়া প্রতিবেশীকে দেয় এবং বিক্রিও করে। এইরূপ ভক্তি রূপী বীজকে লাগিয়ে অর্থাৎ দীক্ষা নিয়ে তার স্মরণ, দান ও সেবা রূপী সেচ করতে থাকলে আমের গাছের মত ভক্তিরূপী গাছ হবে অর্থাৎ সুখের সাম্রাজ্য হবে। তাই যেমন আম গাছ থেকে টন-টন আম পাওয়া ও খাওয়া যায় এবং বিক্রি করে অর্থ আয় হয়, তেমন ভক্তকে ধৈর্য রাখতে হবে। ধীরে ধীরে ভক্তির পরিনাম আসতে লাগবে।

⇨ **২. বিশ্বাস:-**

পরমাত্মার ভক্তিতে লাভ সেই পায় যে ভক্ত পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে পরমাত্মার ভক্তি করে।

## "পরমাত্মার জন্য কোন কিছুই অসম্ভব নয়"

এক শহরের (নগর) বাইরে জঙ্গলে দুই মহাত্মা সাধনা করছিল। একজন ৪০ বছর ধরে গৃহত্যাগ করে সাধনা করছিল। অন্য জনের সাধনার বয়স মাত্র দুই বছর। পরমাত্মার দরবারের এক দেব দূত এই দুই মহাত্মার কাছে প্রতিদিন এসে কিছু সময় ব্যতিত করতো। দুই সাধকের আশ্রম যথাক্রমে গ্রামের পূর্বে ও পশ্চিমে ছিল। বয়সে বড়ো সাধকের আশ্রম গ্রামের পশ্চিম দিকে আর অন্য জনের স্থান গ্রামের পূর্বদিকে জঙ্গলে ছিল।

দেবদূত প্রতিদিন এক এক ঘন্টা করে দুই মহাত্মার কাছে বসতো পরমাত্মার কথা চর্চা চলতো। দুই সাধকের সময় ভালোই ব্যতিত হচ্ছিল। একদিন দেবদূত ভগবান বিষ্ণুজীকে বলে ভগবান! কপিলা নগরীর বাইরে আপনার দুই পরম ভক্ত আছে। বিষ্ণুজী বলে ঐ দুই ভক্তের মধ্যে একজন পরমভক্ত অন্যজন ব্যর্থ সময় ব্যতিত করছে। দেবদূত চিন্তা করে যে ৪০ বছর ধরে সাধনা করছে সেই আসল ভক্ত হবে। কারণ ৪০ বছর কম নয়, সাধকের লম্বা লম্বা দাড়ি, মাথায় বড় জটা। তাই দেবদূত বলে হে ভগবান! যে ৪০ বছর ধরে আপনার ভক্তি করছে সেই আপনার পরমভক্ত হবে? প্রভু বললেন না। যে দুই বছর ধরে আমার সাধনা করছে সেই আমার পরম ভক্ত। প্রভু বলে দেবদূত! আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? দেবদূত বলে প্রভু! আমার বুদ্ধি বলছে, যে বেশিদিন ধরে সাধনা করছে সেই পরম ভক্ত। তখন বিষ্ণুজী বলেন কাল তুমি দেরি করে পৃথিবীতে যাবে। দু'জনের কাছে যাবে। দু'জনই দেরি করে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলবে, প্রভু আজ এক সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে হাতিকে বের করছিলেন। আমি সেই লীলা দেখে আসলাম। তাই আজ আসতে দেরী হয়েছে। তারা যে উত্তর দেবে তাতে তুমি বুঝতে পারবে, পরম ভক্ত কে? দেবদূত প্রতিদিন সকাল ৮টার সময় বেশী সময় ধরে সাধনা করা সাধকের কাছে যেত। আর ১০ টার সময় দুই বছর ধরে সাধনা করা সাধকের কাছে যেত। পরের দিন দেবদূত প্রায় ১২ টার সময় বেশিদিন ধরে সাধনা করা সাধকের কাছে যায়। দেরি করে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে দেবদূত বলেন আজ ১১.৩০ মিনিটে ভগবান এক লীলা করেছিলেন তাই দেখার জন্য দেরি হয়েছে। ৪০ বছর ধরে সাধনা করা মহাত্মা বলে কি লীলা করেছেন প্রভু? আমাকেও শোনাও। দেবদূত বলে শ্রী বিষ্ণু কামাল করে দিয়েছেন। সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে হাতি বের করেছেন। এই কথা শুনে ঐ সাধু বলে দেবদূত! এমন মিথ্যা কথা বলো যা বিশ্বাস যোগ্য হয়। এটা কি করে সম্ভব, সুইয়ের ভিতর দিয়ে হাতি বের হয়ে যায়? আমার সামনে বের করে দেখাও। দেবদূত বুঝতে পারে ভগবান ঠিকই বলেছেন। এ তো পশু। পরমাত্মার উপর যার বিশ্বাস নেই সে পরমাত্মার ভক্ত না। যে কাজ মানুষ করতে পারে না, তাহা পরমাত্মা করতে পারে। পরমাত্মার কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই। এই বিশ্বাস যার নেই তার ভক্তি লোক দেখানো বা ব্যর্থ। দেবদূত নমস্কার করে ছোট ভক্তের কাছে আসে। ভক্ত দেবদূতকে দেরি করে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। দেবদূত লজ্জিত ভাবে বলে ভক্ত জী কি বলবো? পরমাত্মা আজ কামাল করে দিয়েছেন। সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে হাতি বের করেছেন। ভগবানের এই লীলা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। এই কথা শুনে ছোট সাধু বলে দেবদূত! এতে আশ্চর্যের কি আছে? হাতী তো দূরের কথা পরমাত্মা ইচ্ছা করলে সমস্ত পৃথিবী সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে বের করতে পারেন। দেবদূত ভক্তকে আলিঙ্গন করে বলে ধন্য তোমার মাতা পিতা। যে তোমার মত ভক্তকে জন্ম দিয়েছে। পরমাত্মার প্রতি তোমার অটল বিশ্বাস দেখে আমি প্রফুল্লিত। পাঠকগণ ইহা এক উদাহরণ মাত্র। আসলে পরমাত্মার উপর

ভক্তের পূর্ণ বিশ্বাস হওয়া উচিত। পরমাত্মার যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। যদি কেউ বলে পরমাত্মা এটা করতে পারেন না ওটা করতে পারবেন না। সে ভক্তির অধিকারী নয়। সে ভক্তির নাটক করে ব্যর্থ সময় নষ্ট করছে। পরমাত্মার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে ভক্তির পথে চললে তাড়াতাড়ি মঞ্জিল প্রাপ্তি হয়।

**⇨ ৩.পরমাত্মা যা করেন তা ভালোর জন্যই করেন :-**

দীক্ষা নেওয়ার পরে ভক্তের উপর যতই কষ্ট আসুক না কেন, মনে রাখবে পরমাত্মা যা করবেন তা ভালোর জন্যই করবেন।

**কথা:-** এক রাজা ও রাজার মহামন্ত্রী একই গুরুর শিষ্য ছিল। পরমাত্মার প্রতি মন্ত্রীজীর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। রাজা সতসঙ্গ না শোনার কারণে তত্ত্বজ্ঞানের সহিত অপরিচিত থাকায় পরমাত্মার বিধান জানত না। কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত ভক্তি করতো। এক মন্ত্রী এই কথা নিয়ে মহা মন্ত্রীকে হিংসা করতে লাগে। ঐ মন্ত্রীর ইচ্ছা মহামন্ত্রী হওয়ার তাই রাজার নজরে মহামন্ত্রীকে হেয় করার জন্য তার নিন্দা করতে লাগে। মন্ত্রী বলেন রাজন মহামন্ত্রী বিশ্বাসের পাত্র নয় যে কোন সময় বিশ্বাস ঘাতকতা করতে পারে। একদিন রাজা, মহামন্ত্রী ও ঐ চাপরাশি মন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা অন্য শহরে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে মহলের ভিতর দাঁড়িয়ে ছিল। রাজা নিজের তরোয়াল বের করে তরোয়ালের ধার পরীক্ষা করছিল আর অন্যদের সঙ্গে কথাও বলছিল। হঠাৎ তরোয়ালে রাজার একটি আঙুল কেটে পড়ে যায়। চাপরাশি মন্ত্রীকে বলে রাজন কি হয়েছে? হে ভগবান! আমাদের রাজা কত সুন্দর ছিল, আজ আমাদের দুঃখের দিন। হায়! একি হয়ে গেল? প্রজাদের কর্মফল আমাদের রাজাকে ভুগতে হচ্ছে? মহামন্ত্রী বলে যাহা হয়েছে ভালোই হয়েছে। পরমাত্মা যা করে ভালোর জন্যই করে। রাজা ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ে। মহামন্ত্রীর এই শব্দ শুনে রাজা ক্রোধের আগুনে জ্বলে উঠে সৈনিকদের আদেশ দেয় মহামন্ত্রীকে কারাগারে নিক্ষেপ করো। তেমনটাই করা হল রাজার আদেশে। চাপরাশি যুগল খোর মহাশয় পদে নিযুক্ত হল। রাজার আঙুল ঠিক হতে প্রায় ছয় মাস লেগে যায়। আঙুলের জখম শুকিয়ে ঠিক হয়ে যায় কোন ব্যথা যন্ত্রণা নেই। রাজা নতুন মহামন্ত্রীর প্রতি প্রসন্ন ছিল। মন্ত্রী রাজাকে বলে হে রাজন আমি অনেকবার বলেছি ঐ মহামন্ত্রী বিশ্বাস যোগ্য নয় আপনার আঙুল কেটেছে আর মহামন্ত্রী বলে ভালো হয়েছে। আপনার মৃত্যু হলে ও খুশি হত। রাজা ঐ চাপরাশির প্রত্যেক কথা সত্য মনে করতে লাগে। একদিন রাজা নতুন মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে শিকার খেলতে যায়। দুইজন ঘুরতে ঘুরতে জঙ্গলের গভীরে চলে যায়। ঐ দিকে ভীল নামক জঙ্গলী মানুষ থাকতো। ঐ দিন জঙ্গলীদের পূজার দিন ছিল। ভীলরা রাজা ও মন্ত্রীকে বন্দী করে পুরোহিতের কাছে নিয়ে যায়। ঐ পূজায় নরবলি দিতে হয়। তাই তারা বলি দেওয়ার জন্য মানুষের খোঁজ করছিল। দুই জনকে এক সঙ্গে পেয়ে জঙ্গলীরা খুব আনন্দ করে। পুরোহিতও খুশি হয় বলে দুটোকে এক সঙ্গে বলি দিলে দেবী অধিক প্রসন্ন হবে। কিন্তু এদের সর্বাঙ্গ ভাল করে দেখে নাও। যদি কোন অঙ্গ হানি বা কানা, খোঁড়া, বধির থাকে তাহলে তাকে বলি দেওয়া যাবে না। পরীক্ষা করে দেখে এক ব্যক্তির চারটে আঙুল আর এক ব্যক্তি কোন খুঁত নেই। পুরোহিত বলে যার আঙুল কাটা ওকে ছেড়ে দাও। অন্যকে এনে বলি দাও। তখন ভীলরা রাজাকে ছেড়ে দেয় আর চাপরাশি মহামন্ত্রীকে দেবীর সামনে বলি দেয়। রাজা পরমাত্মাকে স্মরণ করতে করতে রাজমহলে এসে প্রথমে কারাগারে গিয়ে মহামন্ত্রীকে মুক্ত করে আলিঙ্গন করে। রাজা বলে, আপনি ঠিক বলেছিলেন। ভগবান যাহা করে ভালোর জন্যই করে। একথা সত্য। যদি ঐ দিন আমার আঙুল না কাটত তাহলে আজ আমার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। রাজা পুনরায় বলেন, আমার

জন্য তো ভালো হয়েছে। কিন্তু আপনাকে বিনা কারণে জেলের ভিতর ছয় মাস সাজা কাটতে হল। আপনার কি ভালো হয়েছে। মহামন্ত্রী বলে হে রাজন! আমি যদি আজ জেলে না থাকতাম তাহলে আপনার সঙ্গে আমি যেতাম। আর আজ আমার গর্দান কাটা যেত। ছয় মাসের জেলে পরমাত্মা আমার জীবন দান দিয়েছেন। তাই আমার জন্য ভালো হয়েছে। সেইরূপ ভক্ত আত্মাদের উচিত পরমাত্মার প্রতি বিশ্বাস রেখে জীবনের রাস্তা চলা।

**❖ এক লেবা এক দেবা দুতং। কোঈ কিসী কা পিতা ন পুতং।**

এক কৃষকের ঘরে এক পুত্রের জন্ম হয়। পুত্র জন্ম নেওয়ার ৮ বছর পর পত্নীর মৃত্যু হয়। কৃষকের ১৬ একর জমি ছিল। কিছু বছর পরে কৃষক দ্বিতীয় বিবাহ করে। তার গর্ভে ও এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। কয়েক বছর পরে কৃষকের দ্বিতীয় স্ত্রীও মৃত্যুকে প্রাপ্ত করে। কৃষক প্রথম পুত্রকে ১৬ বছর বয়সে বিবাহ দেয়। ছেলের বিবাহের কিছুদিন পরে কৃষকের মৃত্যু হয়। ছোট ছেলের যখন ১০/১২ বছর বয়স তখন তার অসুখ হয়। বড় ছেলে কিছুদিন চিকিৎসা করায় কিন্তু কৃষকের ছোট ছেলে ভালো হয় না। বড় ভাই (মাসির ছেলে) আর তার স্ত্রী পরামর্শ করে, অসুখের পিছনে টাকা খরচ করে কি লাভ? যদি ছোট ভাই মরে যায় তাহলে ৮ একর জমি আমাদের থেকে যাবে। তাই চিকিৎসার জন্য অন্য গ্রাম থেকে এক কবিরাজ কে ডেকে আনে। কবিরাজ কে বলে আমার ভাই কে ওষুধের ভিতর বিষ দিয়ে মারার জন্য আপনি কত টাকা নেবেন। ছোট ভাই কে মারার জন্য কবিরাজের সঙ্গে ৫০০ টাকার চুক্তি হয়। কবিরাজ ৫০০ টাকার লোভে ওষুধের ভিতর বিষ দেয়। ঐ ওষুধ খেয়ে কৃষকের ছোট ছেলে মারা যায়। গ্রামের লোকেরা চিন্তা করে অসুখের জন্য মৃত্যু হয়েছে। কারো মনে কোন সন্দেহ হয় না।

ঐ মাসির ছেলের মৃত্যুর এক বছর পরে বড় ভাইয়ের এক পুত্র সন্তান হয়। পুত্র জন্ম নেওয়ার খুশিতে গ্রামের লোককে নিমন্ত্রন করে খাওয়ায় এবং খুব আনন্দ করে। একমাত্র পুত্রকে খুব আদর যত্ন সহকারে লালন পালন করে। ঘি, দুধ ইত্যাদি পুষ্টিকর খাবার খাইয়ে বড় করে। এবং ১৬ বছর বয়সে বিবাহ দেয়। ঐ সময় বাল্য বিবাহকে গর্বের কথা মনে করা হত। কিছুদিন পর ঐ ছেলের অসুখ হয়। ভালো নামী দামী বৈদ্য (কবিরাজ) ডাকা হয়, দামী দামী ওষুধ খাওয়ানো হয় কিন্তু রোগের কোন পরিবর্তন হয় না সোনা, রূপা ও মতির ভগ্ন অংশ ওষুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ায়। ছেলের চিকিৎসার জন্য ৮ একর জমি বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু রোগ বাড়তে থাকে। ছেলে এখন অন্তিম দিনের অপেক্ষায়, তাই ছেলের পিতা ছেলের বিছানার পাশে দুঃখী মনে বসে ছিল। হঠাৎ ছেলে বলে ভাই সাহেব! এক কাজ কর। পিতা বলে আমি তোর পিতা তুই ভুল বকছিস কেন। ছেলে বলে আমি তোমার সেই ভাই, যাকে তোমরা বিষ দিয়ে মেরেছিলে। আমি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তোমাদের ছেলে হয়ে জন্ম নিয়েছি। ঐ সময় ছেলের মাও আসে। ছেলে বলে আমার ভাগে ৮ একর জমি ছিল, সেই ৮ একর জমি আমি নষ্ট করে দিয়েছি। এখন শুধু কফনের কাপড় আর কাঠের হিসাব বাকি। এই কথা শুনে স্বামী স্ত্রী খুব দুঃখ করে। কিন্তু পরমাত্মার বিধান অটল। বড় ভাই পুত্র রূপে ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করে, আমি লোভের জন্য পাপ কর্ম করেছিলাম। পরমাত্মা আমাকে ফল দিয়েছে। যে জন্য তোমাকে মেরে ছিলাম সেই ৮ একর জমিও চলে গিয়েছে। আমার অন্য কোন সন্তান নেই। তাই বাকী জমিও অন্য কেউ পাবে। আমার কুলের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তোমার পত্নীরূপে যে এসেছে তার কি দোষ? এই নিষ্পাপ মেয়েকে এখন তোমার চিতায় জীবিত জ্বালানো হবে। (ঐ সময় সতীদাহ

প্রথা ছিল)। তখন ঐ ছেলে বলে, আমার মৃত্যুর দুই বছর পরে ঐ কবিরাজের মৃত্যু হয়েছিল। যে আমাকে ওষুধের মধ্যে বিষ দিয়ে মেরেছিল। আমার পত্নী ঐ কবিরাজের আত্মা। তাই ওকে কর্মফল ভোগ করতে হবে। এখন জীবিত আগুনে পুড়ে মরবে।

প্রিয় পাঠকগণ! বিচার করুন, পরমাত্মার দৃষ্টি থেকে কিছুই লুকানো যায় না। যেমন কর্ম করবে তেমনই ভোগ করতে হবে। প্রত্যেক পরিবার এই রূপ সংস্কারের সহিত যুক্ত। কেউ পূর্ব জন্মের ঋণ পরিশোধ করতে জন্ম নিয়েছে আবার কেউ ঋন নেওয়ার জন্য জন্ম নিয়েছে।

**উদাহরনের জন্য** :- এক পিতা ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করে বিবাহ দেয়। কিছুদিন পরে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। ঐ ছেলে, পিতার থেকে ঋণ নিতে এসেছিল। আবার ছেলে বড় হয়ে কাজ কর্ম করে সংসার শুরু করে। পিতার অসুখ হয় তখন ছেলে লাখ লাখ টাকা খরচ করে কিন্তু পিতা মারা যায়। ঐ পিতা পূর্বজন্মের কিছু ঋণ দিতে এবং কিছু নিতে এসেছিল। আবার এক পিতা মেয়ের বিবাহে অনেক দান দহেজ (যৌতুক) দেয়। দুই বছর পরে মেয়ের মৃত্যু হয়। ঐ জামাই পূর্ব জন্মের ঋণের কারণ মেয়ে এবং ধন দুটোই প্রাপ্তি করে। যদি কেউ বর্তমানে ফাঁকি দিয়ে কারো কাছে থেকে ধন প্রাপ্তি করে তাহলে পরের জন্মে মেয়ের জামাই হয়ে সুদে আসলে হিসাব নেবে। এটা পরমাত্মার অটল বিধান। বুদ্ধিমানদের জন্য সংকেতই যথেষ্ট। উপরোক্ত কথা শুধু উদাহরণ নয়, আসলে বাস্তব সত্য। অনেকে বলবে এসব মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য গল্প মাত্র। কে দেখেছে, আগে কি হবে? চোরকে ভদ্র লোকেরা বলে, ভাই! চুরি করো না। যখন ধরা পড়বে, তখন প্রথমে জনতা মারধর করবে, পুনরায় পুলিশ পেটাবে আর জেলের ভিতরেও কষ্ট করতে হবে। যদি কেউ বলে এতো চোরকে ভয় দেখানোর জন্য বলা হয়। এই ভয়ে যে চুরি করা ছেড়ে দেয় তাহলে তারই ভালো। লোকনিন্দা ও সাজা থেকে বাঁচবে। তাই উপরোক্ত কথা বোঝানোর জন্য বা দেখানোর জন্য যদি কেউ গল্প মনে করে সেটা তার দুর্ভাগ্য হবে। এই কথা ততটা সত্য যতটা চোরকে সতর্ক করা।

❖ লেখক উপরোক্ত কথা ১৯৭৮ সালে এক পশু ডাক্তারের কাছে শুনেছিল। ডাক্তার এই কথা নিজের কাছে আসা যাওয়া করা ব্যক্তিদের শোনাতো। কিন্তু নিজে কখনো তা অনুসরণ করে চলতেন না। ঐ ডাক্তারের সাথে সন্ধ্যার সময় দেখা হলে নিজের কৃতকর্মের কথা বলতো। দশ টাকার ইঞ্জেকশন লাগিয়ে ২০০ - ৩০০ টাকা নিত। ডাক্তার বলতো যদি কম টাকা নিই তাহলে মনে করবে ডাক্তার ভালো ওষুধ দেয়নি। পশু তো ১০ টাকার ওষুধে ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু ইঞ্জেকশন দেখানোর জন্য লাগাই। কারণ পশুর মালিক চিন্তা করবে ডাক্তার ভালো ওষুধ বা ভালো চিকিৎসা করেছে। চিন্তা করুন এই সব ব্যক্তিদের কথা এবং কাজের মধ্যে কতটা পার্থক্য। এই সব ব্যক্তিদের মুখের কথায় কোন প্রভাব পড়ে না। তাই গরিবদাসজী মহারাজ বলেছেন:- এ বাতে কহন-সুনন কী নহীঁ হৈঁ, কর পাড়নে কী হৈঁ অর্থাৎ এই কথা অন্য লোককে তখন শোনাবে যখন নিজে বুঝবে বা পালন করবে। তাই পরমাত্মার বিধানকে জেনে নির্মল জীবন যাপন করে জীবনের পথের কাঁটা মুক্ত করুন।

## "এক লেবা, এক দেবা দুতাং"

এক সময় শ্রী শিবজী অমরনাথ নামক স্থানে এক শুকনো বৃক্ষের নীচে বসে পত্নী পার্বতীকে নাম দীক্ষা (অমরমন্ত্র) দিয়েছিলেন। তখন ঐ বৃক্ষের এক কোটরে (গাছের ভিতর গর্ত) একটি মাদী তোতা পাখী ডিম দিয়েছিল। ভালো ডিম গুলো ফুটে বাচ্চা হয়ে উড়ে চলে যায়, কিন্তু একটি ডিম খারাপ ছিল তাই ঐ জীব ডিম থেকে বের হতে

পারেনি। যখন শিবজী পার্বতীকে দীক্ষামন্ত্র শোনায় তখন সেই মন্ত্রের প্রভাবে খারাপ ডিম ভালো হয়ে তোতার বাচ্চা উৎপন্ন হয় এবং উড়ার যোগ্য হয়ে যায়। শিবজীর কথা শুনতে শুনতে পার্বতীজীর সমাধীস্থ হয়ে যায়। তাই হ্যাঁ হ্যাঁ করা বন্ধ করে দেয়। তখন শিবের কথায় তোতা হ্যাঁ হ্যাঁ করতে লাগে। কিছুক্ষণ পরে শিবজী দেখে পার্বতীর তো সমাধি লেগেছে। তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ শব্দ কে করছে? ধ্যান দিয়ে দেখে গাছের গর্তের ভিতরে এক তোতাপাখী হ্যাঁ-হ্যাঁ করছে। শিবজী তোতা পাখীকে মারতে চাইলে তোতা উড়ে যায়। শিবজীও নিজের সিদ্ধি শক্তি দিয়ে মারার জন্য তোতার পিছনে পিছনে উড়ে যায়। শ্রী ব্যাসদেবজীর পত্নী হাই তুলছিল তোতা সুযোগ বুঝে শরীর ত্যাগ করে ব্যাসজীর স্ত্রীর পেটে চলে যায়। শ্রী শিবজী ব্যাসজীর পত্নীকে বলে, আমার জ্ঞান চুরি করে এক তোতা শরীর ত্যাগ করে তোমার গর্ভে লুকিয়েছে। আমি ঐ চোরকে মৃত্যু দণ্ড দেব। আমি ওকে হত্যা করব। ঋষি ব্যাসদেবজী সব শুনছিলেন। তিনি এসে জিজ্ঞাসা করেন হে ভগবান! কে, আর কেমন চোর? শিবজী বলে, আমি পার্বতীকে দীক্ষা দিয়ে শরীরের ভিতরে যে কমল আছে তার ভেদ বলছিলাম। ঐ জ্ঞান তোতা শুনেছে। যদি অধিকারী ছাড়া অন্য কাউকে বলে দেয় তাহলে সে অমর হয়ে জনতাকে কষ্ট দেবে। ঐ পাখি অমর হয়ে গিয়েছে। তাই আমি এই জীবকে মারব। শ্রী ব্যাসজী বলে, হে ভগবান! ঐ জীব যখন অমর হয়ে গিয়েছে তখন আপনি কি করে মারবেন? এই কথা শুনে শ্রী শিব, পার্বতীর কাছে ফিরে আসে। পার্বতীকে সব খুলে বলেন ব্যাসজী দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখে যে পত্নীর গর্ভে পুত্র সন্তান। ১২ বছর পরে পুত্রের জন্ম হয়। মা বলতো পুত্রের নাম শুকদেব রাখবে। পুত্র গর্ভে আসার পরে আমার কোন কষ্ট দুঃখ হয় নি। মনে সর্বদা খুশি থাকতো। আনন্দের আভাস হত। তাই গর্ভে থাকাকালীন পুত্রের নাম শুকদেব রাখে। তোতা শরীর ছেড়ে মানব জীবন প্রাপ্তি করার জন্য ব্রাহ্মনরা শুকদেব বলতে (তোতা মানে শুক) তোতা বোঝে।

শ্রী শুকদেব ঋষি জন্ম নিতেই ১২ বছরের শরীর প্রাপ্তি করে আর জঙ্গলের দিকে চলে যায়। শ্রী ব্যাসদেবজী বলে হে পুত্র! কোথায় যাচ্ছো? শুকদেব জী নিজের মাতা-পিতাকে পিছন ফিরে বলে, আপনার আর আমার এতোটাই সংস্কার ছিল। ঋষি ব্যাসদেব বলে, হে পুত্র শুকদেব! তোমার জন্মের জন্য আমরা ১২ বছর প্রতিক্ষা করেছি, আজ আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ। একবার তোমার মুখটা তো দেখিয়ে দাও। শুকদেব ঋষি বলে, হে ঋষিজী! আপনি বহুবার আমার পিতা হয়েছেন, আর আমিও আপনার পিতা হয়েছি। এ সব ঝঞ্ঝাট ছাড়া কিছু নয়। তাই আমি আপনার দিকে তাকাতে চাই না, কারণ আপনাদের থেকে আমার মধ্যে মায়া মোহের সৃষ্টি হয়ে যাবে। সন্ত গরীবদাসজী নিজ বাণীতে বলেছেন:-

**এক লেবা এক দেবা দুতম্, কোঈ কাহু কা পিতা না পুতম্।**
**ঋণ সম্মন্ধ জুড়া এক ঠাঠা, অন্ত সময় সব বারা বাটা।**

**ভাবার্থ:-** শুকদেবজী বলতে চাইছেন যে পরিবারের যে সদস্য, মাতা-পিতা,পুত্র, কন্যা, ইত্যাদির যে সম্পর্ক তা পূর্বে জন্মের কর্মফলের লেনদেন। মৃত্যুর পরে সব নিজের কর্ম আধারে অন্য স্থানে অন্য শরীর ধারন করে। তাই এই সংসারে কেউ কারো পিতা-পুত্র নয়।

উপরোক্ত কৃষক পুত্রের কথায় পড়েছেন বড় ভাই ছোট ভাইয়ের ৮ একর জমির লোভে ছোট ভাইকে মেরে দেয়। পরে ঐ জীব বড় ভাইয়ের ছেলে হয়ে জন্ম নিয়ে নিজের হিসাব বরাবর করে মৃত্যু প্রাপ্ত করে।

এই জন্য বলা হয় যে, এক লেবা (ঋণ নেওয়া ব্যক্তি) এক দেবা (ঋণ দেওয়া

ব্যক্তি) দূতম্। কই কহু কা পিতা না পুতং (কেউ কারো না পুত্র না পিতা)। ঋণ সম্বন্ধ জুড়া এক ঠাঁঠা অর্থাৎ ঠাট-বাট (খুব স্টাইলে) দেখা যায় আর হঠাৎ মৃত্যু হয়। অন্ত সময় বারাবাটা অর্থাৎ মৃত্যু পরে ১২ বাট (রাস্তা)-এ চলে যাবে। অন্য কোথাও জন্ম নেবে, পিতার সঙ্গে এই বার্তালাপ করে শুকদেব আকাশে উড়ে অন্য স্থানে চলে যায়। প্রিয় পাঠক! তাই ভক্তি করো আর জীবের কল্যাণ করো। শুধু পরিবারের চিন্তায় মগ্ন থেকে নিজের জীবন নষ্ট করো না। পরমাত্মার ভক্তিতে সরল ভাবে সমস্ত ঋণ শোধ হয়ে যাবে।

## "কথা এবং কাজের পার্থক্য ঘাতক হয়"

এক প্রসিদ্ধ কথা বাচক ছিল। যিনি প্রতিদিন রামায়ণ পাঠ করতেন। একদিন কোন কারণে ঐ কথাবাচককে শহরে যেতে হয়। ঐ কথাবাচকের সাথে তার সাথীও ছিল। গ্রাম থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে ছিল রেল স্টেশন। সকাল ৫ টার সময় গাড়ি চড়েছিল। তাই সকালে স্নান করে স্টেশনে পৌঁছে যায়। চিন্তা করে গাড়িতে বসে রামায়ণ পাঠ করব। গাড়িতে ওঠে কিন্তু যে কামরায় দু'জন চড়েছিল সেই কামরায় লোকের ভিড় ছিল। কিছু লোক দাঁড়িয়ে ছিল কোনো সিট খালি ছিল না। গাড়ি চলা শুরু করে। কিছুক্ষণ পরে, ঐ কথাবাচক সিটে বসা দুই ব্যক্তিকে বলে দাদা! কৃপা করে আমাকে একটি সিট দেন আমি রামায়ণ পাঠ করব। আজ শীঘ্র গাড়ি ধরার জন্য বাড়িতে পাঠ করতে পারি নি। ভদ্রলোক পুরা সিট খালি করে নিজেরা দাঁড়িয়ে যায় আর বলে, হে বিপ্র জী (ব্রাহ্মণ)! আজ আমাদের সৌভাগ্য যে পবিত্র রামায়ণের অমৃত জ্ঞানের পাঠ শুনতে পারব। পণ্ডিতজী উচ্চস্বরে পাঠ শুরু করেন। প্রসঙ্গ ছিল ভরত নিজের ভাই রামচন্দ্রের রাজ্য নিতে অস্বীকার করে। শ্রীরামচন্দ্র বনবাস পূর্ণ করে না আসা পর্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রের জুতা (খড়ম) সিংহাসনে রেখে নিজে সিংহাসনের সামনে বসে রাজকার্য চালায়। যখন ভাই রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে আসে, তখন তাকে রাজ্য ফিরিয়ে দেন। একেই বলে ভাই। সব শ্রোতারা পণ্ডিতজীকে বাহবা দিতে লাগে। এক যাত্রী বাবার বাৎসরিক ক্রিয়ার জন্য এক দিনের রামায়ণ পাঠ করাবে। কিন্তু কোন পাঠককে খুজে পাচ্ছিল না। আগামীকাল বাৎসরিক কাজ ঐ ব্যক্তি বলে হে গুরুজী! কাল আমার পিতার ক্রিয়া কর্ম তাই আগামীকাল কৃপা করে আমার বাড়িতে রামায়ণ পাঠ করে দেন। পণ্ডিতজী বলে আগামীকাল হবে না। তখন উপস্থিত যাত্রীরা বলে, পণ্ডিতজী আপনার তো এটাই কাজ। আপনার তো আর অন্য কোনো কাজ নেই। এই দুঃখী ব্যক্তিকে সংকট থেকে উদ্ধার করুন। কিন্তু পণ্ডিত পরিষ্কার ভাবে মানা করে দেয় আগামীকাল হবে না। তখন উপস্থিত লোকরা বলে আপনার এতো কি জরুরী কাজ যে আগামীকাল পাঠ করতে পারবেন না। পণ্ডিত বলে, তেমন কোন কারণ নেই। পণ্ডিত কথাকে অন্যদিকে নেওয়ার চেষ্টা করে। পণ্ডিতজীর সাথী বলে আমি একটি সত্য কথা বলছি, আগামীকাল পণ্ডিতজী কেন পাঠ করতে পারবেন না। তার কারণ পণ্ডিতজী নোংরা ফেলানোর ৫০ গজ জমির গর্তের জন্য নিজের ভাইয়ের উপর মোকদ্দমা করে রেখেছে। আগামীকাল সেই কেসের তারিখ। আমি ঐ কেসের সাক্ষী। উপস্থিত ব্যক্তিরা বলে, পণ্ডিতজী! কথা তো খুব ধর্মের শুনিয়েছেন কিন্তু আপনি কি করছেন? আপনি মেনে চলছেন না। এই রূপ ব্যক্তির দ্বারা পাঠ বা কথা করায় শ্রোতাদের উপর কেমন প্রভাব পড়বে?

কবীরজী বলেন:-

**কবীর, করনী তজ কথনী কথৈঁ, অজ্ঞানী দিন রাত।**

**কুকর (কুত্তা) জোঁ ভোঁকত ফিরৈঁ, সুনী সুনাঈ বাত॥ (১)**

(১) গরীব দাসজীও বলেছেন:-

**গরীব, বীজক কী বার্তাঁ কহৈঁ, বীজক নাঁহী হাথ।**
**পৃথ্বী ডোবন উতরে, য়ে কহ কহ মীঠী বাত॥ (২)**

(২) **শব্দার্থ:-** যে ব্যক্তিরা জ্ঞানের কথা বলে অন্যকে শিক্ষা দেয় যে খারাপ কর্ম করবে না, অন্যকে দুঃখ দেবে না। কিন্তু স্বয়ং খারাপ কর্ম করে। ঐ আধ্যাত্মিক গুরু সেই কুকুরের সমান যে কুকুর বিনা কারণে ডাকতে থাকে। সেইরূপ ধর্ম গুরুরা একজন অন্য জনের শোনা কথা শিষ্যদের শোনায়। কিন্তু নিজে মানে না। (১)

**বাণী নং ২:-** ঐ অজ্ঞানী গুরু তত্ত্বজ্ঞান বলে মিথ্যা জ্ঞানের প্রচার করে। কারণ ওনার তত্ত্ব জ্ঞানের বিষয়ে জানা নেই। ঐ অজ্ঞানীরা মানবের অমূল্য জীবন নাশ করার জন্য পৃথিবীতে জন্ম নেয়।

## "সৎসঙ্গে ভক্তির রাস্তা মেলে"

সন্ত নিত্যানন্দ জীর ছোট বেলার নাম নন্দলাল ছিল। তিনি ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম নিয়ে ছিলেন। তিনি সন্ত গরীবদাস জীর (গ্রাম ছুড়ানী, জেলা ঝজ্জর, হরিয়াণা) কিছু সময় সমকালীন ছিলেন। সন্ত গরীবদাসজীর জীবন ১৭১৭-১৭৭৮ সাল পর্যন্ত ছিল। ঐ সময় ব্রাহ্মণদের বিশেষ সম্মান করা হত। সর্বোচ্চ জাতি মানা হত। যার কারণে তাদের গর্ব হওয়া স্বাভাবিক ছিল। নন্দলালজীর মাতা পিতা স্বর্গবাসী হয়ে গিয়েছিল। ঐ সময় নন্দলালজী ৭/৮ বছরের ছিল। নন্দলালজীর দাদু নারনৌলার নবাবের কার্যালয়ে উচ্চপদে চাকরি করতো। নন্দলালজীর পালন পোষণ দাদু-দিদিমা করতো। পড়াশুনা শেষ করে দাদু নিজের নাতি নন্দলালকে নারনৌলায় তহশীলদারের পদে নিযুক্ত করে। প্রথমে ব্রাহ্মণ জাতি, দ্বিতীয়ত তহশীলদারের পদ তাই অহংঙ্কার হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তহশীলদারজীর বিবাহ দাদু-দিদিমা দিয়েছিলেন। তহশীলদারের বাড়ী থেকে কিছু দূরে এক ভক্তের বাড়িতে বৈষ্ণব সন্ত শ্রী গুমানী দাস সৎসঙ্গ করতে আসেন। তিনি বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। সর্ব সন্তগণ সতসঙ্গে পরমাত্মা কবীরজীর অমৃতবাণীর সহযোগ অবশ্যই নেয়। সন্তজী বলে ভক্তি করার জন্য মানব শরীর প্রাপ্তি হয়। কিন্তু সতসঙ্গ না শোনার কারণে সাংসারিক ঝামেলায় ভ্রমিত হয়ে মানুষ তার অমূল্য জীবন সমাপ্ত করে দেয়। অজ্ঞানতার কারণে মানব জাতি ধন ও পদের অভিমান করে, নিজের জীবন নষ্ট করে পরবর্তী জীবনে গাধা, কুকুর ইত্যাদি পশু যোনীতে কষ্ট পায়। তাই অভিমান ত্যাগ করে পূর্ণ সন্তের কাছ থেকে নাম দীক্ষা নিয়ে নিজের কল্যাণ করানো উচিত। অন্যথায় দুঃখের পাহাড়ে কষ্ট ভুগতে হবে।

সৎসঙ্গের শব্দ শুনে তহশীলদারজী বাড়ির ছাদের উপর চেয়ার নিয়ে বসে পড়েন এবং মনোযোগ সহকারে সৎসঙ্গ শোনেন। তখন নামদীক্ষা নেওয়ার প্রবল ইচ্ছা হয়। কিন্তু জাতি আর পদের অহংকার বাধার সৃষ্টি করে। মনে মনে ভাবে ব্রাহ্মণদের কত সম্মান! আমি কিভাবে সতসঙ্গে যাব। কি করে আশ্রমে যাব! আমার লজ্জা করবে। তাছাড়া আমি তহশিলদার, সৎসঙ্গে সামান্য লোকেরা যায়। সন্ত জী সৎসঙ্গ করে আশ্রমে চলে যান। তিনি প্রতিদিন ভোরে কিছুক্ষণ সময় ভ্রমণ করতেন। একদিন নন্দলালজী সকালে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। গুমানী দাসজী ঐ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। নন্দলালজী ব্রাহ্মণ হওয়ার কারণে ব্রাহ্মণদের কুসংস্কারে বিশ্বাস করতো। কোনো কাজে যাওয়ার সময় সম্মুখে টাক মাথার মানুষকে দেখলে অশুভ মানা হতো এবং যাত্রা বন্ধ করে দিত। যাত্রা পথে টাক মাথা দেখে নন্দলালজী

ক্রোধিত হয়ে যায়। নন্দলালজী চিন্তা করে এই শুভ অবসর হাতছাড়া করা যাবে না, নামদীক্ষা নিতেই হবে; কিন্তু এই অশুভকে কাটতে হবে। তাই নিজে সমাধান বের করে নিয়ে ঠিক ক'রে অশুভ টাক মাথায় হাতের আঙ্গুলের উল্টা ভাগ দিয়ে টোকা দেওয়ায় অশুভ সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্যে সে ঘোড়া নিয়ে ঐ ব্যক্তির (সন্ত গুমানীদাস জী) পাশে গিয়ে দাঁড়ায় এবং নন্দলালজী বলে, হে অপদার্থ! আজই মাথা টাক করে আমার সামনে আসার দরকার ছিল? আজ আমি আমার জীবনের সর্বোত্তম কাজে আশ্রমে যাচ্ছি। এই বলে গুমানীজীর মাথায় টোকা মেরে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আশ্রমের দিকে চলে যান। সন্তদের সাথে এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই হতে থাকে, তাই অধিক ধ্যান না দিয়ে সন্তজী বলেন, মনে হচ্ছে লোকটা উচ্চ পদের ও উচ্চকূলের কিন্তু কাজটা করল অশিক্ষিত অজ্ঞানীর মত। তহশিলদার আশ্রমে গিয়ে শিষ্যদের সঙ্গে দেখা করে রাম-রাম বলেন, এবং আশ্রমে আসার উদ্দেশ্য বলেন। ঘোড়া গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে নন্দলালজী সন্তজীর আসনের কাছে গিয়ে বসেন। গুমানী জী ভ্রমণ করার পরে স্নান করে এসে আসনে বসেন। ঘোড়া দেখে সন্তজীর বুঝতে দেরি হয়নি। সন্তজীকে দেখে লজ্জায় নন্দলালজীর মাথা নীচু হয়ে যায়। আশ্রমের ভক্তরা সন্তজীকে বলে, তহশিলদারজী নাম দীক্ষা নিতে এসেছে। তহশিলদার সন্তজীর চরণ ধরে ক্ষমা প্রার্থণা করে এবং টাকে টোকা মারার কারণ বলেন। সন্ত গুমানী দাসজী বলেন, হে ভক্ত! যখন আমরা কুমোরের কাছে থেকে হাড়ি কিনতে যাই তখন হাড়িকে টোকা মেরে বাজিয়ে দেখি, যে কাঁচা না পাকা, ভাঙা না ফাঁটা। তুমি জীবনের ব্যবসা (সৌদা) করতে এসেছো। গুরুজীকে বাজিয়ে দেখেছো, তুমি কোনো পাপ করোনি। নন্দলালজী সন্তজীর শীতল স্বভাব দেখে আর বেশী প্রভাবিত হয় এবং নামদীক্ষা নেয়। সন্ত গুমানী দাস শিষ্যের নাম পরিবর্তন করে নিত্যানন্দ রাখেন। যখন জীবনে চলার পথ পায়, তখন নিত্যানন্দ বলেন :-

**ব্রাহ্মণ কূল মেঁ জন্ম থা, মৈঁ করতা বহুত মরোড়।**
**গুরু গুমানি দাস নে, দিয়া কুবুদ্ধি গড় তোড়॥ (১)**

পরে নিত্যনন্দজী কতটা অধীন হয় তা এই বাণীতে বোঝা যায়:-

**সির সোঁপা গুরুদেব কো, সফল হুয়া য়হ শীশ।**
**নিত্যানন্দ ইস শীশ পর, আপ বসৈ জগদীশ॥ (২)**

**ভাবার্থ:-** যতক্ষণ মানুষ সৎসঙ্গের বিচার না শোনে ততক্ষণ ভুলবশতঃ অহংকারের আগুনে জ্বলতে থাকে। যখন জ্ঞান হয়ে যায় যে আজ আমি রাজা কিন্তু পরবর্তী জন্মে যখন পশু যোনীতে কুকুর গাধা হবো, তখন আমার এই অহংকার কোথায় যাবে? তাই ভক্তরা ঐ অহংকারকে ত্যাগ করে ভক্তির পথে চলে আর সফলতা প্রাপ্ত করে।

শ্রীলংকার রাজা রাবণ খুব ভক্তি সাধনা করেছিল কিন্তু অহংকার যায়নি, তাই তার বিনাশ হয়। রাবণও ব্রাহ্মণ ছিল; আর নিত্যানন্দও ব্রাহ্মণ ছিল। সত্সঙ্গ শুনে নিত্যানন্দ নির্মল হয়ে যায়। রাবণ সত্সঙ্গ শোনেনি তাই তাঁর জীবন ব্যর্থ হয় আর জীবনকে অমচোনীয় (কলঙ্কিত) করে ও স্বর্ণলংকাও চলে যায়। নিত্যানন্দজী বলেছে আমার জন্ম ব্রাহ্মণকূলে হওয়ার কারণে খুব অহংকারী ছিলাম। যখন গুরু গুমানী দাসজীর সত্সঙ্গ বচন শুনি, তখন জাতি অহংকার রূপী কুবুদ্ধি সমাপ্ত হয়ে যায় এবং জীবন সফল হয়।

**বাণী নং ২-এর ভাবার্থ :-** সতসঙ্গ শুনে নিত্যানন্দ জীর মনে খুব বিনয়ী ভাব

আসে। তিনি সমস্ত অহংকার ত্যাগ করেন। বলতেন, আমি আমার মাথা গুরুজীকে দান করে দিয়েছি; গুরুজী যেমন রাখবেন তেমনই থাকবো। এখন আমার মাথায় পরমাত্মার নিবাস, আমার রক্ষা পরমাত্মা'ই করবে। আমার কোনো চিন্তা নেই।

**নিত্যানন্দজীর শব্দ:-**

**ঔর বাত তেরে কাম না আবৈ সন্তোঁ শরণৌ লাগ রে।**
**ক্যা সোবৈ গফলত মেঁ বন্দে জাগ-জাগ নর জাগ রে॥**
**তন সরায় মেঁ জীব মুসাফির করতা রহে দিমাগ রে।**
**রাত বসেরা করলে ডেরা চলৈ সবেরা ত্যাগ রে। ঔর বাত........।**
**উমদা চোলা বনা অনমোলা লগে দাগ পর দাগরে।**
**দো দিন কী গুজরান জগত মেঁ জলৈ বিরানী আগ রে। ঔর বাত........।**
**কুবদ্ধ কাঁচলী চঢ রহী চিত পর তু হুআ মনুষ সে নাগ রে।**
**সূঝৌ নহী সজন সুখ সাগর বিনা প্রেম বৈরাগ রে। ঔর বাত........।**
**হর সুমরৈ সো হংস কহাবৈ কামী ক্রোধী কাগ রে।**
**ভঁবরা না ভরমৈ বিষ কে বন মেঁ চল বেগমপুর বাগ রে। ঔর বাত........।**
**শব্দ সৈন সতগুরু কী পহচানী পায়া অটল সুহাগ রে।**
**নিত্যানন্দ মহবুব গুমানী প্রকটে পূর্ণ ভাগ রে। ঔর বাত..........।**

(আসলে এই শব্দ কবীর সাহেব জীর আমাদের উদ্দেশ্য জ্ঞান প্রাপ্ত করার)

**শব্দার্থ:-** হে মানব (স্ত্রী/পুরুষ)! পরমাত্মার চর্চা ছাড়া অন্য কোনো চর্চা তোমার কোন কাজে লাগবে না, কারণ তোমাদের তত্ত্বজ্ঞান নেই। তোমরা অজ্ঞানতার কারণে মোহ, মায়া - মমতার অধীন হয়ে ঘুমিয়ে আছো অর্থাৎ পরমাত্মাকে ভুলে গিয়েছো। জাগ জাগ অর্থ সৎসঙ্গ শুনে জেগে ওঠো আর নিজের আত্ম কল্যাণ করাও। যাত্রীরা যেমন, হোটেলের ঘর ভাড়া করে রাত ব্যতিত করে - সকালে নিজের কাজে চলে যায়, এই মানব শরীরে জীবও সেইরূপ। এই মানব শরীর রূপী হোটেলে জীব যাত্রীর সমান। যখন মৃত্যুর সময় আসবে তখন সকাল হবে অর্থাৎ মানব শরীর রূপী হোটেল ত্যাগ করার সময় হয়ে যাবে। এখন শরীর ত্যাগ করে ভক্তি না করার জন্য খালি হাতে যেতে হবে।

❖ মানব শরীর রূপী বস্ত্র, অমূল্য তত্ত্ব জ্ঞানের অভাবে ভক্তি না করে, পাপের উপর পাপ করে, শরীর রূপী বস্ত্রে দাগ লাগাচ্ছ। এই সংসারে আয়ু বেশি নেই। নিজের পরিবার পোষনের জন্য অসৎ উপায়ে বা দুঃখ কষ্ট করে যে ধন সংগ্রহ করছো সেই ধন এবং পরিবার মৃত্যুর পরে অপরের হয়ে যাবে। ঐ ধন সংগ্রহের পাপ তোমাকে নরকের আগুনে জ্বালাবে। তাই অন্যের জন্য পাপ করে নিজে জ্বলে নরক ভোগ করে মরো না।

❖ সত্সঙ্গ না শুনলে পাপ পুণ্য বা শিষ্টাচারের জ্ঞান হয় না। মানুষের বুদ্ধি শয়তানের মত হয়ে যায়। তাই মানবতাকে ভুলে নিজের শক্তি দ্বারা দুর্বলকে দুঃখ দিয়ে সাপের মত কর্ম করে নিজের জীবন নাশ করার কারণ হয়ে যাচ্ছে। হে সজ্জন পুরুষ! প্রেম বা নিষ্ঠা সহকারে সৎসঙ্গ না শুনলে এই জ্ঞান প্রাপ্তি হয় না।

❖ যে ব্যক্তি ভক্তি করে, তাহাকে ভক্ত বলা হয় অর্থাৎ হংস পাখীর মত অহিংসাবাদী বলা হয়। কারণ, ভক্ত অন্যকে কষ্ট দেয় না। হংস পাখীরাও সরোবরে মাছ বা পোকা-মাকড় খায় না, শুধু মতি খায়। কাক পাখী নিজের পেট ভরার জন্য অন্য জীবিত পশু-পাখীর মাংস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খায় এবং কষ্ট দেয়। সেইরূপ সৎসঙ্গ না শোনা ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অভাবে নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের ধন চুরি করে কষ্ট দিয়ে পাপ ভোগ করে। হে জীব রূপী ভ্রমরা! কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ রূপী বিষয়ের বিষবনে ভ্রমণ করো না। এই কালের লোক তো কষ্টের ঘর। সেই সতলোকে

চলো যেখানে কোন কষ্ট নেই, শুধু সুখের বাগান।

❖ নিত্যানন্দজী বলছেন, আমি আমার গুরুজির সতসঙ্গ শুনেছি, তার সংকেত আমি বুঝে গিয়েছি, যেটা আমি পরে বলেছি। আমি আমার জীবন ধন্য করে নিয়েছি। আমি আমার প্রিয় গুরুজী গুমানি দাসের সাক্ষাৎ পেয়েছি। আমার পূর্ব জন্মের কর্ম ফলে এই পরমাত্মা স্বরূপ গুরু পেয়েছি।

**শব্দ**

**তন মন শীশ ঈশ আপনে পৈ, পহলম চোট চড়াবৈ।**
**জব কোএ রাম ভক্ত গতি পাবৈ, হো জী॥ টেক॥**
**সতগুরু তিলক অজপা মালা, যুক্ত জটা রখবাবৈ।**
**জত কোপীন সত্ কা চোলা, ভীতর ভেখ বনাবৈ॥ ১॥**
**লোক লাজ মর্যাদ জগত কী, তৃণ জ্যোঁ তোড় বগাবৈ।**
**কামনি কনক জহর কর জানৈ, শহর অগমপুর জাবৈ॥ ২॥**
**জ্যোঁ পতি ভ্রতা পতি সে রাতী, আন পুরুষ না ভাবৈ।**
**বসে পীহর মেঁ প্রীত প্রীতম মেঁ, ন্য কোএ ধ্যান লগবৈ॥ ৩॥**
**নিন্দা স্তুতি মান বড়াঈ, মন সে মার গিরাবৈ।**
**অষ্ট সিদ্ধি কী অটক ন মানৈ, আগৈ কদম বঢ়াবৈ॥ ৪॥**
**আশা নদী উল্ট কর ডাটৈ, আঢা বন্ধ লগাবৈ।**
**ভবজল খার সমুদ্র মেঁ বহুর না খোড় মিলাবৈ॥ ৫॥**
**গগন মহল গোবিন্দ গুমানী, পলক মাঁহি পহুঁচাবৈ।**
**নিত্যানন্দ মাটী কা মন্দির, নূর তেজ হো জাবৈ॥ ৬॥**

**শব্দার্থ:-** সন্ত নিত্যানন্দজী ভক্তিকে সফল বানানোর বিধিতে বলেছেন, গুরুজীর থেকে দীক্ষা নেওয়ার পরেই পরমাত্মার প্রতি পূর্ণ রূপে সমর্পিত হওয়া উচিত, আর তন-মন-ধনে পরমেশ্বরের প্রতি পহলাম চোট চঢ়াবৈ অর্থাৎ শুরু থেকেই সমর্পিত ভাব হওয়া উচিত। তাহলে ভক্তের গতি অর্থাৎ মুক্তি হবে।

❖ **বাণী নং ১:-** কিছু সাধক বেশ ধারণ করে যেমন, কপালে তিলক লাগায়, মালা দিয়ে মন্ত্র জপ করে, মাথায় লম্বা-লম্বা চুল রাখে, বিশেষ ধরনের পোষাক পরে, কোপিন পরে, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কুর্তা পরে। এই সমস্ত লোক দেখানো ঢং না করে নিজের সদগুরুকে সম্মান করো। গুরুর শিষ্য হয়ে গুরুর আদেশকে শিরোধার্য করে মর্যাদার সাথে পালন করে জনতাদের মধ্যে উদাহরণ হও - যে ভক্ত এই রকমই হয়, যেমন মাথার তিলক দেখা যায়, ইহাই ভক্তের পরিচয় তাই বাইরের রং-ঢং না করে শুভ কর্ম ক্রিয়া করে নিজেকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা উচিত। শ্বাসের দ্বারা অজপা জপ করে। মাথায় জটার স্থানে সত্ গুরুর বানীকে দৃঢ় ভাবে পালন করে, কৌপিন পরে লাভ হয় না, যতি ভাব নিতে হবে। ওটাই নিতে হবে। যুবতী মেয়ে দেখে মনে দোষ ভাব আসতে দেবে না। সদা সত্য কথা বলো। এটাই ভক্তদের আসল পোশাক। তত্ত্ব জ্ঞানে বোঝা যায় যে, সে সত্য ভক্তি করছে, না শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা করে জীবনকে নষ্ট করছে।

❖ সংসারের লোকের কথায় বা লোক লজ্জার ভয়ে ভক্তিতে বিচলিত হবে না। পরম্পরাগত সাধনা, ভক্তি বা লোক-লাজকে ত্যাগ করে সৎসঙ্গে যাও, দণ্ডবত্ প্রণাম করো। এই লোক লাজকে নগন্য জিনিস রূপে এমন ভাবে ফেলে দিতে হবে যে, লোক লাজ যেন কোনো বাধা না হয়। কনক অর্থাৎ সোনা, কামিনী অর্থাৎ সুন্দরী স্ত্রী দেখে মনে দোষ ভাব আনবে না। এগুলোকে বিষের মতো মনে করো, তাহলে সাধক সতলোকে

যেতে পারবে। (২)

❖ নিজের ইষ্ট দেবের প্রতি পতিব্রতা স্ত্রীর মত সমর্পিত হবে; যেমন পতিব্রতা স্ত্রী অন্য কোন পুরুষকে স্বামী রূপে দেখার ইচ্ছা করে না - সে যতই সুন্দর বা ধনী হোক না কেন। আপনি পরমাত্মার প্রতি ভক্তি কখনো ভুলবে না। লোক দেখানো ঢং না করে অনন্য মনে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা পরমাত্মার নাম সুমিরন করতে থাকো। ভক্ত স্ত্রী বা পুরুষ যাই হোক না কেন, যেমন পতিব্রতা স্ত্রী বাপের বাড়িতে চলে গেলেও পতির কথা মনে করতে থাকে। এই প্রকার সাধকও পরমাত্মার প্রতি নিজের প্রভুর চিন্তায় ধ্যান লাগায়। (৩)

❖ পূর্ণ সদগুরু থেকে নাম দীক্ষা নেওয়ার পরে যদি কেউ ঐ ভক্তের নিন্দা করে তাহলে তার খারাপ লাগা উচিত নয়। আর যদি কেউ প্রশংসা করে তাহলে তাতে খুশি হওয়া উচিত নয়। শাস্ত্র অনুসার বিধি নিয়ম মেনে সত্য ভক্তি করলে সাধকের কিছু সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, এই সিদ্ধি মোক্ষের সহায়ক হয় না। এই সিদ্ধির সংখ্যা আট (৮)। এই সিদ্ধির দ্বারা সাধক অন্যকে লাভ দিয়ে, অন্যের হানি (ক্ষতি) করে নিজের ভক্তি ধন নষ্ট করে দেয়। সিদ্ধির চমৎকার দেখিয়ে সাধক প্রসিদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তার ভবিষ্যৎ নরক হয়ে যায়; পশু পাখীদের যোনী প্রাপ্তি করে। এই জন্য আট (৮) সিদ্ধির প্রভুতায় না ভুলে একে ত্যাগ করে, মোক্ষ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যকে আগে রেখে এগিয়ে চলো। (৪)

❖ এই পৃথিবী লোকের ধন-দৌলত রাজ্য-সম্পত্তি ইত্যাদি আশা রূপী নদীকে রুখে দাও। আশার নদীতে মজবুত বাঁধ লাগাও, যাতে আশার জন্য এই দুঃখ রূপী সংসারে জন্ম নিয়ে ফিরে আসতে না হয়।(৫)

❖ গুরু যে ইষ্টের ভক্তি বলেন, আকাশে অবস্থিত সেই ইষ্ট ধামে পৌঁছানোর জন্য গুরু পূর্ণ সহযোগিতা করেন। নিত্যানন্দজীর গুরু শ্রী গুমানীদাস জী শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত ছিলেন। নিত্যানন্দজীও তার মহিমার কথা বলেছেন। নিজের সাধনার শক্তিকে সুরক্ষিত রাখলে সুক্ষ্ম শরীর (যা স্থূল শরীরের ভিতর), ভক্তির শক্তিতে তেজোময় যুক্ত হয়ে যায়। যদি ভক্তি না করো, তাহলে এ শরীর মাটির সমান। এই শব্দে এটা প্রমাণিত হয়, যেমন জেলা স্তরের খেলোয়াড়ের নিয়ম আর অন্তরাষ্ট্রীয় খেলোয়াড়ের নিয়মও খেলা এক হয়। নিত্যানন্দজী রাজ্য স্তরের খেলা খেলে সফল হয়েছেন। আমরা পরমাত্মা কবীর জীকে ইষ্ট রূপে ভক্তি করি। ঐ একই নিয়ম। কিন্তু আমরা অন্তরাষ্ট্রীয় স্তরের খেলোয়াড়।(৬)

সন্ত নিত্যানন্দজী নিজের জীবনের অন্তিম শ্বাস পর্যন্ত জটেলা সরোবরে ভক্তি করে শরীর ত্যাগ করেন। জটেলা সরোবর বর্তমানে দাদরী অর্থাৎ ঝর্ঝর জেলার কয়েকটি গ্রামের সীমানায় অবস্থিত (গ্রাম-মাজরা, বিগোবা ইত্যাদি সীমার উপর অবস্থিত)। নিত্যানন্দজী শ্রী বিষ্ণুর (শ্রীকৃষ্ণের) ভক্তি করতো। গুরু শ্রী গুমানী দাসজী দিল্লীর সন্ত শ্রীচরণ দাস বৈষ্ণবের শিষ্য ছিলেন। পাঠকগণ কৃপা করে পড়ুন সৃষ্টি রচনা এই পুস্তকের 219 পৃষ্ঠায়। আপনারা বুঝতে পেরেছেন শ্রী নিত্যানন্দজীর কোন শ্রেণীর মুক্তি হয়েছে। সন্ত গরীবদাস জীকে পরমাত্মা কবীর সাহেব দেখা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, সন্ত বা ভক্ত যে কোনো ভগবানের ভক্তি করুক না কেন, তিনি অবশ্যই আদরনীয় (সম্মানীয়)। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ সদগুরু না পায়, যে দুই অক্ষরের সঠিক সতনাম দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো গুরু বা শিষ্যের মুক্তি হবে না।

**গরীব, সাধ-সাধ সব নেক হৈঁ, আপ আপনী ঠৌর।**
**জো নিজ ধাম পহুঁচাবহীঁ, সো সাধু কোঈ ঔর॥**
**গরীব, সাধ হমারে সগে হৈঁ, না কাহূ কো দোষ।**

**জো সারনাম বতাবহীঁ, সো সাধু সির পোষ॥**

**শব্দার্থঃ-** সন্ত গরীবদাসজী বলেছেন, যে সন্ত পরমাত্মার সত্ মার্গ এর কথা বলে- সে ভালো আত্মা। তার উদ্দেশ্য খারাপ নয়। যে, যেখানের জ্ঞান রাখে তাহা ঐ স্থান পর্যন্ত ঠিক। যেমন কেউ শ্রী বিষ্ণুর সাধনার কথা বলে, কেউ শিবের সাধনার কথা বলে, কেউ ব্রহ্মার সাধনা বেদ অনুসার করে ও করায়। ঐ সাধনা ঐ স্থিতি পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু ঐ সাধনায় নিজ ধাম অর্থাৎ সতলোক প্রাপ্তি হবে না। যে সন্ত সতলোক প্রাপ্তির মার্গের দর্শন করান, তিনি উপরোক্ত সন্ত থেকে পৃথক হন।

যে সন্ত পরমাত্মার জন্য যত্নশীল হয়, পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে, সেই সব সন্ত আমার নিজের আত্মীয়, আমার সাথী। আমি তাদের দোষ দেখি না, কারণ তাদের পূর্ণ মোক্ষ মন্ত্র 'সার নাম'র জ্ঞান নেই। এই সমস্ত সন্তদের শিষ্য হলেও পূর্ণ মুক্তি হয় না, জন্ম-মৃত্যুতে থাকতে হয়। যে সন্ত সার নামের দীক্ষা দেয় সেই সন্ত আমার মাথার মুকুট এবং সম্মানীয় থাকে মাথায় রাখার জন্য।

শ্রী বিষ্ণুর স্বয়ং জন্ম মৃত্যু আছে, তার উপদেশির বা উপাসকের মুক্তি হতেই পারে না। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ এ বলেছে, তত্ত্বদর্শী সন্ত থেকে জ্ঞান প্রাপ্তির পরে ঐ পরমাত্মা পরমেশ্বরের খোঁজ করা উচিত; যেখানে যাওয়ার পরে সাধক পুনরায় এই সংসারে ফিরে আসে না। তাই ঐ পরমেশ্বরের ভক্তি করো, যে এই সংসার রূপী বৃক্ষের রচনা করেছেন এবং সংসারের বিস্তার যার মাধ্যমে হয়েছে।

হিন্দু সমাজের গুরুজন বলেন, গীতার জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শুনিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিষ্ণুর অবতার হিসাবে পরিচিত। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫-এ গীতা জ্ঞানদাতা বলছেন, হে অর্জুন! তোর আর আমার অনেক জন্ম হয়েছে, তুই জানিস না, আমি জানি। ইহাতে পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হয়, শ্রী বিষ্ণু নাশবান তারও জন্ম মৃত্যু হতে থাকে। শ্রী দেবী পুরাণের তৃতীয় স্কন্দে স্বয়ং বিষ্ণু বলেছেন, আমি (বিষ্ণু), ব্রহ্মা ও শংকর জন্ম-মৃত্যুতে আছি অর্থাৎ আমাদের জন্ম - মৃত্যু হয়। আমাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব (মৃত্যু) হতে থাকে। এতে স্পষ্ট যে, বিষ্ণু অবিনাশী নয়। গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১৭, গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ -তে অবিনাশী পরমাত্মা তো গীতা জ্ঞানদাতা থেকে অন্য কথা বলেছেন। আবার গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২-তে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন, হে ভারত! তুই সর্বভাব থেকে ঐ পরমেশ্বরের শরণে যা। ঐ পরমেশ্বরের কৃপায় তুই পরম শান্তি তথা সনাতন পরমধাম প্রাপ্ত করবি।

এই প্রমাণে সহজেই বোঝা যায় নিত্যানন্দজীর গীতায় বর্ণিত পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্তি হয়নি। পরমাত্মা কবীরজী বলেছেন :-

**জো জাকি শরণা বসৈ, তাকো তাকী লাজ।**
**জল সৌহী মছলী চড়ে, বহ জাতে গজরাজ॥**

**ভাবার্থঃ-** যে ভক্ত, যে দেবী দেবতার ভক্তি করে, সেই ইষ্ট নিজের ভক্তকে সাহায্য অবশ্যই করে; তা সাধারণ ব্যক্তির জন্য অসম্ভব মনে হয়। উদাহরণ যদি কোন ব্যক্তি দারোগাবাবুকে সেবা করে অর্থাৎ বন্ধুত্ব রাখে আর দারোগা নিজের বন্ধুকে নিজের চেয়ারে বসিয়ে চা বিস্কুট ইত্যাদি খাওয়ায়, এটা সাধারণ ব্যক্তির জন্য অসম্ভ ব মনে হয়। যদি কেউ এস.পি -এর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাহলে দারোগার থেকে বেশি লাভ পাবে। যদি কেউ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখে তাহলে অনেক বেশী লাভ প্রাপ্তি করতে পারবে - যা অন্য কর্মচারিদের জন্য অসম্ভব। আর যদি কেউ প্রধানমন্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখে তাহলে তার লাভের তুলনা অন্যদের সঙ্গে হয় না।

লেখক বোঝাতে চাইছেন, যদি কেউ দেবী-দেবতাদের ভক্তি করে, সে লাভ তো

পাবে, কিন্তু পূর্ণ পরমাত্মার ভক্তিতে যে লাভ হয় তা অন্য কোথাও হবে না। যদি কেউ প্রধানমন্ত্রীর মিত্র হয়, তাহলে দেশের সর্ব মন্ত্রী অধিকারী সকলের সাথে সুসম্পর্ক থাকে এবং সবাই তাকে সহযোগিতা করে। কেউ বিরোধের চিন্তাও করে না। সেইরূপ পূর্ণ পরমাত্মার ভক্তকে ব্রহ্মাণ্ডের সব দেবী-দেবতা সহযোগিতা করে। তারা ঐ ভক্তকে যথাসম্ভব সাহায্য করে, বাধার সৃষ্টি করে না। যদি কোনো ভূত, প্রেত, ভৈরব, বেতাল, পূর্ণ পরমাত্মার ভক্তকে বিরক্ত বা ক্ষতি করার চিন্তা করে তাহলে ঐ দেবী দেবতারাই তাকে দুর করে দেয়- আর বলে, তোমার কি জানা আছে যে, এই ভক্ত পূর্ণ পরমাত্মার শরণে আছে? তখনই ঐ শয়তান আত্মা বা শক্তি ভয়ে ভক্তের কাছে আসে না। যদি কোনো অশুভ শক্তি পরমাত্মার ভক্তকে দুঃখী করে, তাহলে পরমাত্মার গণেরা তাকে ধরে নিয়ে যায় গিয়ে মরধর করে জেলে বন্ধ করে দেয়। পরমাত্মা কবীরজী বলেছেন:-

**এঁকে সাধৈ সব সধৈ, সব সাধেঁ সব জায়। মালী সীঁচৈ মূল কো, ফূলৈ - ফলৈ অদ্যায়॥**

**শব্দার্থ:**- আম বা অন্য বৃক্ষের চারা মাটিতে গর্ত করে রোপন করতে হয়। চারা গাছের গোড়ায় জল দিলে গাছের সর্ব অঙ্গ বিকশিত হয়, ধীরে ধীরে গাছ বড় হয়ে ফুল ও ফল ধারন করে ছায়া দেয়। যদি আপনি গাছের ডাল মাটিতে গর্ত করে লাগিয়ে জল দেন তাহলে ঐ গাছ নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন মালি গাছের মূলকে মাটিতে রোপন করে প্রয়োজন অনুযায়ী জল সেচ দিয়ে লাভ প্রাপ্ত করে। সেইরূপ তত্ত্বদর্শী সন্ত এই সংসার রূপী বৃক্ষের মূল পরম অক্ষর ব্রহ্মকে ইষ্ট রূপে পূজা করে ও করান। তিনি একজনের পূজার দ্বারা সবাইকে সন্তুষ্ট করেন। সমস্ত দেবতা ঐ সত্ পুরুষের আদেশে চলে সাধকের কার্য সিদ্ধ হয়। যদি ঐ সব দেবতাদের পূজা কর তাহলে সত পুরুষ রুষ্ট হয়ে যাবে। তাঁর আদেশ ছাড়া দেবতা কিছুই করতে পারে না। সাধকের সাধনা শাস্ত্র বিরুদ্ধ হওয়ায় কোন লাভ হয় না।

এই জন্য পূর্ণ পরমাত্মার ভক্তি করো। বর্তমানে এই বিশ্ব সংসারে একমাত্র আমার (রামপাল দাস) কাছে সত্য জ্ঞান আছে, তাছাড়া বিশ্বে কারো সত্য জ্ঞান নেই। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নাম দীক্ষা নিয়ে নিজের, পরিবারের, মানব জীবনের কল্যাণ করান।

## “কথাবাচক মনিরাম পণ্ডিতের কর্ম”

মনিরাম নামের এক প্রসিদ্ধ কথাবাচক ছিল। হরিয়াণা প্রান্তের এক গ্রামে রামায়ন পাঠের আয়োজন করে। রামায়নের পাঠ খুব বেশি হলে এগারো দিনে সমাপ্ত হয়ে যায়। মনিরাম দান দক্ষিনার লোভে ত্রিশ দিনে পাঠ সমাপ্ত করে। কিন্তু ত্রিশ দিনে মনিরাম মাত্র ত্রিশ টাকা দক্ষিনা পায়। কারন, গ্রামের কিছু যুবক ছেলেরা মনিরামের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে রামায়ন পাঠের সমাপনের দিন দিল্লী থেকে এক প্রসিদ্ধ নর্তকী চম্পা কলিকে নাচ গান করার জন্য নিয়ে আসে। সমস্ত গ্রামবাসী চম্পা কলির নাচ গান দেখতে চলে যায়। দুই ঘন্টায় চম্পাকলি পাঁচশত টাকা পায়, আর মনিরামজী ত্রিশ দিনে মাত্র ত্রিশ টাকা পায়। পণ্ডিতজী খুব দুঃখী হয়। মনিরামজী দুঃখী মনে গ্রাম ছুড়ানির রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। মনিরামজী জানতেন ঐ গ্রামে গরীব দাস নামের এক পরম সন্ত আছে। তাই চিন্তা করে সন্তজীর সঙ্গে দেখা করে আগে যাই। যখন মনিরামজী গরীব দাসজীর কাছে যায়, তখন ওখানে আসে পাশের ১০-১২ জন ভক্ত বসে ছিল। মনিরামজী সন্ত গরীব দাসজীকে রাম রাম বলেন, গরীব দাসজীও রাম রাম বলে আসন গ্রহন করতে বলেন। সন্তজী কুশল মঙ্গল জিজ্ঞাসা করলে মনিরামজী বলে হে মহারাজ! এখন ঘোর কলিযুগ এসে গেছে। ধর্মের নাশ হয়ে গেছে, ধর্মের প্রতি মানুষের আর বিশ্বাস নেই। যদি পৃথিবী আকাশ ফেটে যায় তাহলেও অবাকের কিছু নেই। উপস্থিত ভক্তরা জিজ্ঞাসা করে,

হে পণ্ডিতজী! এমন কি হয়েছে? মনিরামজী বলে কি আর হবে। তখন ভক্তরা সন্ত গরীব দাসজীকে বলে, হে গুরুজী! পণ্ডিতজী এমন কথা কেন বলছেন। গরীব দাসজী অন্তর্যামী ছিলেন। তাই বলেন-

**গরীব, ফুটি আঁখ বিবেক কি, অন্ধা হে জগদীশ।**
**চম্পা কলী কো পাঁচ সৌ, মনিরাম কো তীস॥**

**ভাবার্থ-** যারা জগদীশের ভোগের দিনে জেনে বুঝে নাচ গানের প্রোগ্রাম করে তারা জ্ঞানের নেত্রহীন অন্ধ। গ্রামের লোকেরাও বিবেকহীন হয়ে গেছে। ধর্ম কথার শুভ কাজে এই রূপ বিরোধ করা উচিত নয়। হে ভক্ত! এগারো দিনে সমাপ্ত হওয়া রামায়ন কথা মনিরামজী টাকার লোভে ত্রিশ দিনে শেষ করে। গ্রামের কিছু ব্যক্তি মনিরামের এই উদ্দেশ্যের সাথে পরিচিত ছিল। তাই পণ্ডিতজীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নর্তকী এনে এই পাপের কাজ করে। এই সত্য কথা গরীব দাসজীর মুখ থেকে শুনে মনিরামজী হতবম্ভ হয়ে যায়। মনিরামজী চিন্তা করে আমি ১১-টা ৩০ মিনিটে ভোগ লাগিয়ে সোজা এখানে চলে আসি। সন্ত গরীবদাসজী এই কথা কি করে জানলেন। এতো স্বয়ং পরমাত্মা-উনি তো সব জানেন। মনিরামজী নিজের আসন থেকে উঠে গরীব দাসজীর চরনে প্রণাম করে বলে, হে প্রভু! আপনি ঠিক বলেছেন আমি লোভের কারণে ৩০ দিন কথা করেছিলাম। আপনি তো সব জানেন। হে প্রভু! ধর্ম, কর্ম তথা জীবনের সত্য রাস্তা দেখাও। তখন গরীবদাসজী সতসঙ্গ করে ঐ পুণ্যাত্মা মণিরামকে বলেন:-হে মনিরামজী! আপনি পাঠ করে জনতার থেকে ধন প্রাপ্তি করলে ঋণী হয়ে যাচ্ছেন। পরবর্তীকালে সুদ সহ ফেরত দিতে হবে। আপনার যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেই। আপনি কথা পাঠ তথা সৎসঙ্গ করার অধিকারীও নন। আপনি মানুষকে আকর্ষিত করার জন্য গলায় কণ্ঠী (এক দানা তুলশীর মালা) ধারণ করেছেন। এক মালা অর্থাৎ ১০৮ দানার রুদ্রাক্ষের মালা গলায় ধারন করেছেন। যা মন্ত্র জপ (সুমিরনের) করার জন্য ব্যবহার করা হয়। মাথায় তিলক আর হলুদ বস্ত্র ধারন করেছেন। এ সব লোক দেখানোর জন্য।

সন্ত গরীবদাসজী নিজের বাণীতে বুঝিয়েছেন যে :-

**কণ্ঠিমালা সুমরণী, পহরে সে ক্যা হোয়।**
**উপর ডুণ্ডা সাধ কা, অন্তর রাখা খোয়॥**

**ভাবার্থ:-** হে মনিরাম জী! উপরের সাজে আপনাকে সাধু মনে হয়, বাইরের আড়ম্বর চমৎকার রেখেছেন। আপনার সাজ পোশাক দেখে সমাজের লোক আকৃষ্ট হবে কিন্তু ভক্ত সমাজ কেঁদে-কেটে মরে যাবে। আপনার ভিতর সাধুর গুণ নেই। লোভের কারণে মনকে মলীন রেখেছেন, সাধুতা হারিয়ে গিয়েছে, সাধুভাব নেই। তাই কণ্ঠিমালা, সুমরণী গলায় নিলে সাধু হওয়া যায় না। আত্মকল্যাণের জন্য পূর্ণ সন্ত থেকে দীক্ষা নিয়ে আজীবন মর্যাদায় থেকে ভক্তি করলে কল্যাণ হবে। অধিকারী বিনা পাঠ করার অর্থ যজমানদের ধোকা দেওয়া। আপনার পূর্বজ ঋষিগণ আসলে পণ্ডিত ছিলেন। বিদ্বান পুরুষ ছিলেন। তাঁরা এ ধরনের ভুল করতেন না। সন্ত গরীবদাসজী উদাহরণ দিয়ে বলেছেন-

## "রাজা পরীক্ষিতের উদ্ধার"

ঋষির অভিশাপের জন্য ৭ দিন পরে রাজা পরীক্ষিতকে তক্ষক সর্পে দংশন করবে। তাই রাজা পরীক্ষিতের উদ্ধার ও আত্মকল্যাণের জন্য শ্রীমদ ভাগবত (সুধাসাগর) এর কথা সাত দিন ধরে শোনানোর সিদ্ধান্ত হয়। তারা আসলে পণ্ডিত ছিল। তাই তারা

পরমাত্মার বিধানকে জানত। তারা এও জানত সপ্তম দিনে পরিনাম সকলের সামনে আসবে। বিশ্বের সমস্ত বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিরা সপ্তম দিনে কি হবে তাই নিয়ে সবাই চিন্তিত ছিল। কারণ পৃথিবীর সর্ব সন্ত শ্রীমদ ভাগবতের কথা শোনাতে অস্বীকার করেছিল। তারা বলেছে আমরা অধিকারী নই। আমরা কোনো মানব জীবনের সাথে খেলা বা ছলনা করে পাপের ভাগী হতে পারবো না। যে বেদ ব্যাসজী শ্রীমদ্ভাগবত লিখেছিলেন তিনিও পাঠ করে কথা শোনাতে অস্বীকার করে দেন। তখন সর্ব ঋষি মিলে সিদ্ধান্ত নেয় যে স্বর্গ থেকে শুকদেব ঋষিকে ডেকে আনা হোক, কারণ সে কথা শোনানোর অধিকারী ছিল। রাজা পরীক্ষিতের জন্য স্বর্গ থেকে শুকদেব ঋষিকে ডেকে আনা হয়। কিছু সময় নরক ভোগ করার পরে যুধিষ্ঠির স্বর্গে পুণ্য ফল ভোগ করছিলেন। মোহ-এর কারণে অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতকে উদ্ধার করবার জন্য নিজের কিছু পুণ্য শুকদেব ঋষিকে দান করে। ঐ পুণ্যফল নিয়ে শুকদেব ঋষি বিমানে বসে পৃথিবীতে এসে রাজা পরীক্ষিতকে ভাগবত কথা শোনায়। সাতদিন কথা শোনার পর রাজা পরীক্ষিতের রাজ্য তথা সংসারের মোহমায়া সমাপ্ত হয়। কথা বলার সময় তক্ষক সর্প রাজা পরীক্ষিতকে দংশন করে। তখন রাজার মৃত্যু হয়। কিন্তু কথা শোনার কারণে রাজার মন সংসার ছেড়ে স্বর্গ সুখের প্রতিলীন ছিল। রাজা থাকার সময় বড়ো বড়ো ধর্ম যজ্ঞ করেছিল। যার কারণে রাজার অনেক পুণ্য হয়। পরমাত্মা বাণীতে বিধান দিয়েছে:-

**কবীর, জহাঁ আশা তহাঁ বাসা হোঙ্গ। মন কর্ম বচন সুমরিয়ো সোঙ্গ॥**

**শব্দার্থ:**- গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৬-এ প্রমাণ আছে যে, হে ভারত! পরমাত্মার এই বিধান আছে অন্ত সময়ে যার মধ্যে যেমন ভাব থাকবে অর্থাৎ যার স্মরণ করে মৃত্যুকে প্রাপ্তি করবে, সে তাকেই প্রাপ্তি করবে। এই বিধান অনুসারে রাজা পরীক্ষিত স্থুল শরীর ত্যাগ করে (সাপের বিষে মারা গিয়েছিল) সুক্ষ্ম শরীর নিয়ে শুকদেব ঋষির সাথে বিমানে বসে স্বর্গে চলে যান।

সন্ত গরীবদাসজী (গ্রাম-ছুড়ানী, জেলা-ঝজ্জর) মনিরামকে বলে- শুকদেব ঋষির কথা শুনে রাজা পরীক্ষিতের মনে স্বর্গ প্রাপ্তির প্রবল ইচ্ছা জাগে। যার কারণে মৃত্যুর পরে ঐ জন্মে রাজত্বের সময় করা পুণ্য ফল স্বরূপ স্বর্গে চলে যায়। জন্ম-মৃত্যুর চক্র এখনো সমাপ্ত হয়নি। কাল ব্রহ্মের লোকের স্বর্গ ও মহাস্বর্গ প্রাপ্তিকে অনেকেই উদ্ধার হওয়া মনে করে। ইহাই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অভাব। কাল ব্রহ্ম লোকের প্রাপ্তিকে উদ্ধার মনে করা, এই পৃথিবীর ঋষি পণ্ডিতদের জ্ঞান। কারণ ঐ পণ্ডিতদের পাঠ বা ভক্তিতে অহংঙ্কার এবং দ্বেষ ইত্যাদি সমাপ্ত হয় না। একজন অন্যজনের থেকে প্রসিদ্ধ হওয়ার প্রতিযোগীতায় লেগে থাকে। শুকদেবজী সন্ত রাজা জনকের শিষ্য ছিলেন। রাজা জনককে পূর্ণ পরমাত্মা দেখা দিয়েছিলেন, 'সোহম' মন্ত্র দিয়েছিলেন। আর রাজা জনকের প্রিয় শিষ্য শুকদেব ঋষি ছিলেন, তাই এক মাত্র শুকদেব ঋষিকে এই মন্ত্র দিয়েছিলেন। সেই জন্য শুকদেবজী অনেক সময় পর্যন্ত স্বর্গে থাকবে। রাজা জনককে কাল ধোঁকা দেয়। রাজা জনক তার অর্ধেক পুণ্য বারো (১২) কোটি নরকে ভোগা আত্মাদের দান করে দেয়। আর রাজা জনকের স্বর্গে থাকার সময় কম হয়ে যায়। তাই রাজা জনককে পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়। ১৪৬৯ সালে পাঞ্জাব প্রান্তে (ভারতে) শ্রী কালুরাম মেহতার (অরোড়া পরিবারে) ঘরে শ্রী নানক নামে জন্ম গ্রহণ করেন। (বর্তমানে পাকিস্তান দেশে) পৃথিবীতে শুকদেবজীর মধ্যে কোন অহংকার, দ্বেষ এবং মান বড়াই ছিল না। তাই তার দ্বারা ধর্মগ্রন্থের পাঠের প্রভাব রাজা পরীক্ষিতের মনকে প্রভাবিত করে। যার কারণে রাজার স্বর্গ বাস হয়। যদি অন্য ঋষি পাঠ করতো তাহলে রাজার মনে কোন প্রভাব পড়তো না। রাজা সংসারে মায়ায় বদ্ধ থাকত এবং পুনর্জন্ম

নিয়ে পৃথিবীতে এসে কর্ম ফল ভোগ করতো। আবার রাজা হয়ে ঐ পুণ্য নষ্ট করতো।

সন্ত গরীবদাসজী বলেছেন, হে মনিরাম! জীবের জন্ম মৃত্যু যতক্ষণ সমাপ্ত না হয় ততক্ষন পরমশান্তি প্রাপ্ত হয় না। পুণ্যের ফলে রাজা হয়ে লাভ হানির আগুনে জ্বলতে থাকে, পরে নির্ধন হয়ে কষ্ট ভোগ করে। আবার পশু পক্ষী ইত্যাদির জন্ম পেয়ে কষ্ট ভোগ করতে হয়।

আপনি শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রী বিষ্ণুর ভক্ত (বৈষ্ণব, সাধু শ্রী বিষ্ণুকে ইষ্ট রূপে মানে)। আপনি এটাও মনে করেন শ্রী গীতার জ্ঞান বিষ্ণু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিয়েছিলেন। গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২-তে স্পষ্ট বলেছে আমার থেকেও অন্য পরমেশ্বর আছেন। হে ভারত! তুই সর্ব ভাবে ঐ পরমেশ্বরের শরণে যা। ঐ পরমেশ্বরের কৃপায় তুই পরম শান্তি তথা সনাতন পরমধাম (সতলোককে) প্রাপ্ত করবি।

গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৯- এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছে, যে সাধক জরা (বৃদ্ধাবস্থা) তথা মরন (মৃত্যু) থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। (কাল ব্রহ্ম লোকের রাজ্য তথা মহাস্বর্গের ইচ্ছাও করে না) সে তত্ ব্রহ্মের সম্পূর্ণ অধ্যাত্মের অর্থাৎ সর্ব কর্মের সাথে পরিচিত হয়।

❖ গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১- এ অর্জুন গীতা জ্ঞানদাতাকে তত্ ব্রহ্ম-এর বিষয়ে প্রশ্ন করেছে, অধ্যায় ৭ এর শ্লোক ২৯ এ বলেছে যে, ঐ তত্ ব্রহ্ম কি? তার উত্তর গীতা জ্ঞানদাতা গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩- এ বলেছে, তিনি পরম অক্ষর ব্রহ্ম।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৫ ও ৭ এ গীতা জ্ঞান দাতা বলেছে, আমার ভক্তি করলে আমাকে প্রাপ্ত করবি, আবার গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৮, ৯, ১০ এ নিজের থেকে অন্য পরম অক্ষর ব্রহ্মের ভক্তি করতে বলেছে, তাহলে ঐ পরম অক্ষর ব্রহ্মের প্রাপ্তি হবে।

গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২, অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫, অধ্যায় ১০ শ্লোক ২ -এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছে, হে অর্জুন! তোর আর আমার অনেক জন্ম হয়েছে, পরেও হবে।

গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১৭ -তে অবিনাশী পরমাত্মার কথা বলা হয়েছে। তথা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬, ১৭ তে তিন পুরুষের (প্রভু) কথা বলা হয়েছে আবার অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে অবিনাশী পরম অক্ষর ব্রহ্মের বিষয় বলেছে। তাঁকে উত্তম পুরুষ, সর্বশ্রেষ্ঠ পরমাত্মা বলা হয়। তিনি তিনলোকের পালন পোষণ করেন। বাস্তবে তিনি অবিনাশী। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪-এ গীতা জ্ঞানদাতা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তত্ত্বদর্শী সন্ত পাওয়ার পরে পরমেশ্বরের ঐ পরম পদের খোঁজ করা উচিত- যেখানে যাওয়ার পরে সাধক পুনরায় এই সংসারে ফিরে আসে না। ঐ পরমাত্মার ভক্তি করা দরকার-যার থেকে এই সংসার রূপী বৃক্ষের বিস্তার হয়েছে অর্থাৎ পরমাত্মাই এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেছেন। (গীতা উল্লেখ সমাপ্ত)।

সন্ত গরীবদাসজী মনিরামকে বলেছেন, পরম অক্ষর ব্রহ্ম ও তত ব্রহ্মের ভক্তি আমার কাছে আছে। আপনি যদি পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্তি করতে চান তাহলে দীক্ষা নিয়ে নিজের কল্যাণ করান। গীতার সর্ব শ্লোক মনিরামজীর কণ্ঠস্থ ছিল। তাই তখন সমস্ত পাখণ্ড পূজা বা ভক্তি ত্যাগ করে গরীবদাসজীর থেকে নাম উপদেশ নিয়ে নিজের আত্মকল্যাণ করায়।

## "পণ্ডিতের সংজ্ঞা"

বিদ্বানকে বলা হয় পণ্ডিত। আমার পূজ্য গুরুদেব ব্রাহ্মন জাতিতে (গ্রাম বড়পৈতাবাস, তহশিল চরখী দাদরী, জেলা ভিবানী) হরিয়াণতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কখনো নিজেকে পণ্ডিত বলতেন না।

আমার দাদাগুরু (আমার গুরুজীর গুরু) গ্রাম-ছবলা (দিল্লী নজফগড় এর কাছে) জাট জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অল্প বয়সে সন্ত গঙ্গেশ্বরানন্দ সতসঙ্গে প্রভাবিত হয়ে তার সঙ্গে হরিদ্বারে চলে যান। সন্ত গঙ্গেশ্বরানন্দ ওনাকে কাশী বিদ্যাপীঠে পড়ার জন্য পাঠান। তিনি খুব মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছিলেন। চার বিষয়ে আচার্যের ডিগ্রী প্রাপ্তি করেন। তাই তিনি জাট হলেও পণ্ডিত চিদানন্দজী নামে সুপরিচিত ছিলেন। পণ্ডিত চিদানন্দজীর আশ্রম গোপালপুর (তহশিল-খরখোদা, জেলা-সোনিপত, প্রান্ত-হরিয়াণা ছিল। ব্রাহ্মণ ভাইরা যাতে দুঃখ না পায় তাই পণ্ডিতের সংজ্ঞা বলার প্রয়োজন ছিল তাই বলেছি।

## "সুদামা পণ্ডিত ছিলেন"

সুদামাজী ব্রাহ্মণ কূলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি খুব গরীব (নির্ধন) ছিলেন। কোনো কোনো দিন ছেলে মেয়েকে নিয়ে না খেয়ে ঘুমাতেন। সুদামাজীর ধর্মপত্নী জেনেছিল সুদামাজীর সাথে দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ মিত্রতা আছে। পত্নী অনেক বার বলেছে আপনার মিত্র রাজা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে কিছু ধন চেয়ে নিয়ে এসো। সুদামাজী বলতেন, পণ্ডীতরা অন্যের কাছে চায় না। পরমাত্মার নিয়ম অনুসারে জীবন-যাপন করতে হয়।

গরীবদাসজী বলেছে:-

**গরীব, নট পেরণা কাঞ্জর সাঁসী, মাঙ্গত হৈঁ ভঠিয়ারে।**
**জিনকী ভক্তি মেঁ লৌ লাগী, বো মোতী দেত উধারে॥**
**গরীব, জো মাঙ্গে সো ভড়ূবা কহিএ, দর- দর ফিরৈ অজ্ঞানী।**
**জোগী জোগ সম্পূর্ণ জাকা, মাঙ্গ না পীবৈ পানী॥**

**শব্দার্থ:-** 'নট' যারা লোক জনের মধ্যে খেলা দেখায়, যেমন একটি লম্বাবাঁশ মাটিতে না পুঁতে তার উপরে উঠে খেলা দেখায় এটা খুব কঠিন এবং কষ্টকর কাজ। পরিশ্রম করে খেলা দেখানোর পরে হাতে বাটি নিয়ে উপস্থিত খেলা দেখা ব্যক্তিদের কাছে টাকা পয়সা চায়। অন্য জাতির লোকেরা ও যেমন কঞ্জর, সাংসী, যাযাবর, ভাঠিয়ারে ইত্যাদি জাতির লোক একই ভাবে বিভিন্ন কলা দেখিয়ে বাজরা, চাউল, গম, চানা, টাকা, পয়সা ইত্যাদি চায়। যদি কোন সাধক এই ভাবে নিজের সিদ্ধি শক্তি প্রদর্শন করে ধন একত্রিত করে তাহলে তার সাধনা ঠিক নয়। যদি সত্য সাধনা হত তাহলে শিষ্যদের আর্শীবাদ রূপী মতি দিয়ে ধনী করত যা ঐ ভক্তের ভাগ্যে ছিল না। যদি সন্ত দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে, তাহলে সে অজ্ঞানী। তার কাছে শাস্ত্র অনুসার সাধনা নেই, সে সন্ত নয়, ভন্ড। ভন্ডের অর্থ নির্লজ্জ। সেই সব সাধকদের ভক্তি সম্পূর্ণ মানা হয়, যারা অন্যের কাছে কিছু চায় না। উদাহরন স্বরূপ বলা হয় ঐ সাধক বস্তু তো নয় এমনকি জলও চেয়ে পান করে না।

কিন্তু পত্নীর বার বার আগ্রহ করায় বিপ্র সুদামাজী নিজের মিত্র শ্রীকৃষ্ণের কাছে চলে যায়। শ্রীকৃষ্ণ সুদামার বিশেষ সৎকার করে। সুদামা এক মুষ্ঠি চাল (খুদ) নিয়ে গিয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণ তা আনন্দের সহিত খায়। শ্রীকৃষ্ণ নিজের হাতে সুদামার-পা ধুয়ে কুশল-মঙ্গল জিজ্ঞাসা করে। তখন পণ্ডিত সুদামা বলে, হে ভগবান! আমার কোনো বস্তুর প্রয়োজন নেই। আপনার দয়ায় জীবন নির্বাহ ঠিক ভাবে চলছে। এক সপ্তাহ ধরে শ্রীকৃষ্ণজীর কাছে থেকে সুদামা পণ্ডিত বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তিনি একবারও বলেননি কিছু ধন দাও। কারণ তিনি জানতেন যে-

**কবীর, বিন মাঙ্গে মোতী মিলেঁ, মাঙ্গে মিলে ন ভীখ।**

**মাঙ্গন সে মরনা ভলা, য়হ সতগুরু কী সীখ॥**

শব্দার্থ কবীর পরমাত্মা বলেছেন, যে পূর্ণ পরমাত্মার সদভক্তি করেন সে কারো কাছে চায় না। চেয়ে নিলে পরমাত্মা রুষ্ট হয়ে যায়, তাঁর ভিক্ষাও মেলে না। যদি বিশ্বাস করে পরমাত্মার কাছে ঐ সাধক না চায়, তাহলে মতি মুক্তার মতো বহু মূল্যবান বস্তুও পরমাত্মা দিয়ে দেয়। পূর্ণ সন্ত বা গুরু এই শিক্ষা দেয়, যে ব্যক্তি জীবিত থেকেও মৃতের সমান হয়ে যায়। চেয়ে নেওয়ার থেকে মরা ভাল। এর মানে আত্মহত্যা করা নয়, এখানে নিজের ইচ্ছাকে দমন করে মৃতের মত থাকতে বলা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণজী রাজা ছিলেন। নিজের মিত্রের পরিস্থিতি বুঝে বিশ্বকর্মাজীকে আদেশ দিয়ে এক সপ্তাহের ভিতর সুন্দর রাজপ্রাসাদ তৈরী করে দেয় এবং প্রচুর ধন দেয়। পণ্ডিত সুদামাজী নিজের ধর্মে দৃঢ় ছিলেন তাই তিনি লাভ প্রাপ্তি করেন। একেই বলে পণ্ডিত। যে চেয়ে নেয় তাকে ভন্ড বলা হয়। এটাই পণ্ডিতের পরিভাষা বা সংজ্ঞা।

**প্রসঙ্গ চলছিল**:- দীক্ষা (নাম নেওয়ার) পরে ভক্তের ভাব সংসার ও পরমাত্মার প্রতি কেমন হওয়া উচিত। এই বিষয়ে পবিত্র কবীর সাগর গ্রন্থের অধ্যায় 'অনুরাগসাগর'-এ পরমেশ্বর কবীরজী নিজের প্রিয় আত্মা ধর্মদাসজীকে বলেছে:-

## অধ্যায় “অনুরাগ সাগরের” সারাংশ

অনুরাগ সাগরের পৃষ্ঠা ৩ থেকে ৫ এর সারংশ:-

**প্রশ্ন**:- হে প্রভু, দীক্ষা প্রাপ্ত করার পরে পরমেশ্বরের প্রতি কেমন ভাব হওয়া উচিত?

**উত্তর**:- পরমেশ্বর কবীরজী বলেন, যেমন মৃগ ধুনের প্রতি আসক্ত হয়, সেইরূপ পরমাত্মার প্রতি সাধকের আসক্ত হওয়া দরকার।

❖ যারা হরিণ ধরে তারা এক বিশেষ ধরনের যন্ত্র দিয়ে শব্দ করে, যা হরিণের অত্যন্ত প্রিয়। ঐ শব্দ হরিণের কানে গেলে, হরিণ ঐ শব্দকে লক্ষ করে চলতে থাকে। যে শিকারী শব্দ করে তার সম্মুখে বসে মুখ মাটিতে রাখে অর্থাৎ নিজে সমর্পিত হয়ে যায়। সে নিজের জীবনের চিন্তা করে না। এইরূপ উপদেশীকে পরমাত্মার প্রতি সমর্পিত হওয়া দরকার। নিজের জীবনকে সমর্পিত করে দেওয়া উচিত।

❖ **দ্বিতীয় উদাহরণ**:-

আলোর প্রকাশ পতঙ্গের (পাখাওয়ালা-পোকা) খুব প্রিয় হয়। নিজের প্রিয় বস্তুকে প্রাপ্ত করার জন্য সে দীপক (প্রদীপ), মোমবাতী, বিজলীর গরম লাইটের উপর আসক্ত হয়ে পড়ে, তাকে প্রাপ্ত করার জন্য স্বচ্ছায় মৃত্যু বরণ করে। সেইরূপ পরমাত্মার প্রতি (মর মিটনা) সমার্পিত হতে হবে। পরম্পরাগত সাধনা এবং অন্য শাস্ত্র বিরুদ্ধ রীতি রেওয়াজ সত্য সাধনায় বাধার সৃষ্টি করে। দৃঢ়তার সহিত এই বাধাকে অতিক্রম করতে হবে। পিছনে হাঁটলে চলবে না। তার জন্য যে কোন বলিদান স্বীকার্য করতে হবে।

❖ **তৃতীয় উদাহরণ**:-

আগেকার দিনে পত্নীর আগে পতির মৃত্যু হলে পত্নী চিতার আগুনে পুড়ে জীবন দিত। কারণ পতিকে এতো ভালোবাসতো যে পতি ছাড়া বেঁচে থাকা বৃথা মনে করত। তখন বাড়ির বা বংশের লোকেরা বোঝাত তোমার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। এদের পালন পোষন কে করবে? কাকা, দাদু কেউ কাউকে পালন করে না। মাতা-পিতা, জীবিত থাকলে বংশের আত্মীয় স্বজন বাচ্চাদের আদর স্নেহ করে। বাস্তবে প্রেম তো মাতা-পিতা করে। তুমি এই বাচ্চাদের দিকে দেখ ওরা পিতার জন্য কান্না করছে। বাচ্চারা মায়ের আঁচল ধরে থাকে। ঐ স্ত্রীকে তার গহনা, অলংকারও দেখানো হত। এ

সব জিনিসের কি হবে। কত সুন্দর মূল্যবান আভুষণ। ছেলে মেয়েদেরকে সঙ্গে নিয়ে থাক। কিন্তু স্ত্রী পতির প্রেমের জন্য চিতার আগুনে জীবন দেয়। পিছনের দিকে পা ফিরিয়ে আনে না বা পিছনে তাকায় না। পূর্বে এইভাবে এক দুইজন সতী হত। পরে এই রীতি রেওয়াজ কূলের মর্যাদার রূপ নেয়। আর পতির মৃত্যুর পরে পত্নীকে জোর করে চিতার আগুনে ফেলে দিতে লাগে (একে সতীদাহ প্রথা বালা হত)। পরবর্তীকালে অনেক সংঘর্ষের পরে তা বন্ধ হয়। এই কথার সারাংশ এই যে, এক পত্নী তার পতির বৈরাগ্যে জীবিত অবস্থায় আগুনে পুড়ে মারা যেত। মুখে রাম রাম বলে চিতার আগুনে জ্বলে মরত।

**জগত মেঁ জীবন দিন-চার কা, কোঈ সদা নহীঁ রহে।**
**য়হ বিচার পতি সংগ চালি কোঈ কুছ কহৈ॥**

**শব্দার্থ:-** বহু পুরাণো দিনে স্ত্রী মৃত পতির সঙ্গে চিতার আগুনে জ্বলে মারা যেত। ঐ সময় পতি ছাড়া অন্য কোন ধনসম্পত্তি বা ছেলে, মেয়ের প্রতি আস্থা থাকত না। তারা চিন্তা করত আজ না হয় কিছুদিন পরে সংসারে মৃত্যু হবে। সংসারের ব্যক্তিরা কে কি করে তাতে সে ধ্যান দিত না, বা চিন্তা করত না। এই ধরনের বিচার করে পতির সঙ্গে মৃত্যু বরণ করত। এটা একটা কু- রীতি, এক সময় এই রীতির খুব মান্যতা ছিল। অশিক্ষিত সমাজ এই কু-নিয়ম কে বা অমানবিক অত্যাচারকে বিশেষ মান্যতা দিত। বর্তমানে শিক্ষিত সমাজ এই জুলুম এই কুরীতি বন্ধ করেছে। ভক্তির দৃঢ়তা উৎপন্ন করার জন্য এটা সঠিক উদাহরণ। ভক্তদেরও ঐ স্ত্রীদের মত পরমাত্মা প্রাপ্তির প্রতি আস্থা রাখতে হবে। সংসারের অন্য ব্যক্তিদের উপর ধ্যান না দিয়ে মর্যাদার সহিত দৃঢ় ভাবে ভক্তি করতে হবে। মর্যাদা পালন করতে হবে, নীচের বাণীতে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন। সত্ পুরুষের প্রাপ্তির জন্য এই রূপ লগন (একাগ্রতা) লাগাতে হবে, সব কিছু ভুলে এক পরমাত্মার ধ্যান করতে হবে।

**হে ধর্মদাস! ভক্তের বিচার এমন হওয়া দরকার:-**

**ঐসে হী জো সতপুরুষ লৌ লাবৈ। কুল পরিবার সব বিসরাবৈ॥ ১॥**
**নারি সুত কা মোহ ন আনে। জগত রূ জীবন স্বপন কর জানৈ॥ ২॥**
**জগ মেঁ জীবন থোড়া ভাঈ। অন্ত সময় কোঈ নহীঁ সহাঈ॥ ৩॥**
**বহুত প্যারী নারি জগ মাঁহী। মাতা-পিতা জা কে সম নাহীঁ॥ ৪॥**
**তেহী কারণ নর শীশ জো দেহী। অন্ত সময় সো নহীঁ সংগ দেহী॥ ৫॥**
**চাহে কোঈ জলৈ পতি কে সংগা। ফির দোনোঁ বনেঁ কীট পতঙ্গা॥ ৬॥**
**ফির পশু-পক্ষী জন্ম পাবৈ। বিন সতগুরু দুঃখ কৌন মিটাবে॥ ৭॥**
**ঐসী নারি বহুতেরী ভাঈ। পতি মরৈ তব রুধন মচাঈ॥ ৮॥**
**কাম পূর্তি কী হানি বিচারৈ, দিন তেরহ ঐসে পুকারৈ॥ ৯॥**
**নিজ স্বার্থ কো রোদন করহী। তুরন্ত হী খসম দুসরো করহী॥ ১০॥**
**সুত পরিজন ধন স্বপন স্নেহী। সত্যনাম গহু নিজ মতি এহী॥ ১১॥**
**স্ব তন সম প্রিয় ঔর ন আনা। সো ভী সংগ নহীঁ চলত নিদানা॥ ১২॥**
**ঐসা কোঈ না দিখ ভাঈ। অন্ত সময় মেঁ হোয় সহাঈ॥ ১৩॥**
**আদি অন্ত কা সখা ভুলায়া। ঝূঠে জগ নাতো মেঁ ফিরৈ উমাহয়া ॥ ১৪॥**
**অন্ত সময়া জম দুত গলা দবাবৈ। তা সময় কহো কৌন ছুড়াবৈ ॥ ১৫॥**
**সতগুরু হৈ এক ছুড়াবন হারা। নিশ্চয় কর মানহূ কহা হমারা॥ ১৬॥**
**কাল কো জীত হংস লে জাহী। অবিচল দেশ জহাঁ পুরুষ রহাহী॥ ১৭॥**
**জহাঁ জায় সুখ হোয় অপারা। বহুর ন অবৈ ইস সংসারা॥ ১৮॥**

ঐসা দৃঢ় মতা করাহী। জৈসে সূরা লেত লড়াঈ॥ ১৯॥
টূক-টূক হো মরৈ রণ কে মাঁহী। পূঠা কদম কবহূ হটাবৈ নাঁহী॥ ২০॥
জৈসে সতী পতি সংগ জরহী। ঐসা দৃঢ় নিশ্চয় জো করহী॥ ২১॥
সাহেব মিলৈ জগ কীর্তি হোঈ। বিশ্বাস কর দেখো কৌঈ॥ ২২॥
হম হৈঁ রাহ বতাবন হারা। মানৈ বচন ভব উতরৈ পারা॥ ২৩॥
ছল কপট হম নহীঁ করাহী। নিঃস্বার্থ পরমার্থ করৈঁ ভাঈ॥ ২৪॥
জীব এক জো শরণ পুরুষ কী জাবৈ। প্রচারক কো ঘনা পুণ্য পাবৈ॥ ২৫॥
কোটি ধেনু জো কটত বচাঈ। এতা ধর্ম মিলৈ প্রচারক তাঁহী॥ ২৬॥
লাবৈ গুরু শরণ দীক্ষা দিলাবৈ। আপা না থাপৈ সব কুছ গুরু কো বাতাবৈ॥ ২৭॥
জো কোঈ প্রচারক গুরু বনি বৈঠে। পরমাত্মা রূঠে কাল কান ঐঠে॥ ২৮॥
লাখ আঠাইস ঝূঠে গুরু রোবৈঁ। পড়ে নরক মেঁ না সুখ সোবৈঁ॥ ২৯॥
অব কহে হৈঁ ভূল ভঈ ভারী। হে সতগুরু সুধ লেবো হমারী॥ ৩০॥
বোঐ ববূল আম কহাঁ খাঈ। কোটি জীবন কো নরক পঠাঈ॥ ৩১॥
ঐসী গলতী না করহূঁ সুজানা। সত্য বচন মানো প্রমানা॥ ৩২॥

**শব্দার্থ :-** উপরোক্ত বাণীর ভাবার্থ:-

যখন ছেলে যুবক হয় তখন ওর বিবাহ হয়ে যায়। বিবাহের পরে মাতা-পিতার থেকে পত্নীর প্রতি প্রেম ভালবাসা বেশি হয়। পরে সন্তানদের প্রতি মমতা হয়ে যায়। যদি পতির মৃত্যু হয় তাহলে পত্নী সাথে যায় না। কিছুদিন পরে অর্থাৎ ১৩ দিনের ক্রিয়া কর্মের পরে স্বামীর ছোটো-বড়ো ভাইয়ের সাথে বিবাহ করে নতুন করে জীবন শুরু করে। এই প্রথা এখনও হিন্দী ভাষীদের মধ্যে আছে। স্বামীকে সম্পূর্ণ রূপে ভুলে যায়। যদি কেউ নিজের স্বামীর চিতার আগুনে পুড়ে মারা যায় তাহলে পরবর্তী জন্মে পশু-পাখীর জন্ম নিয়ে দুজনে ঘুরে বেড়াবে।

যে নারীর জন্য পুরুষ নিজের জীবন সমর্পিত করে দেয়, গলা কেটে দেয়। যেমন, যদি কেউ তার স্ত্রীর দিকে খারাপ নজরে তাকায়, মানা করা সত্ত্বেও যদি না শোনে, না মানে তাহলে স্বামী তার স্ত্রীর জন্য ঝগড়া মারা-মারি করে মরে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পরে ঐ স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে সম্পর্ক বানায়। যদিও এটা সময় সাপেক্ষ কিন্তু ভক্তদের জন্য এ এক কঠিন শিক্ষা।

এইরূপ কোন পুরুষের পত্নীর মৃত্যু হলে কিছুদিন পরে ঐ পুরুষও পুনরায় বিবাহ করে দ্বিতীয় পত্নী নিয়ে আসে। স্বামীর জন্য স্ত্রী নিজের ঘর মাতা-পিতা, ভাই-বোন ছেড়ে চলে আসে। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পরে নিজের স্বার্থের জন্য কেঁদে চোখের জল ফেলে। কিন্তু যখন অন্য ব্যক্তি বিবাহ করার জন্য বলে তখন পূর্বের কথা ভুলে বিবাহের জন্য তৈরি হয়ে যায়। পরে নতুন স্ত্রী ঘরে নিয়ে আসে।

**ভাবার্থ:-** এই সব নিজের স্বার্থের সম্পর্ক। তাই সদভক্তি করে সতলোকে চলো যেখানে জরা (বৃদ্ধবস্থা) এবং মৃত্যু হয় না।

পরমাত্মা সর্তক করে বলেছেন, হে ভক্ত! নিজের শরীর থেকে প্রিয় অন্য কিছু নেই। নিজের শরীরের স্বার্থে কোনো অসুখ হলে লাখ-লাখ টাকা চিকিৎসার জন্য খরচ করে দাও। চিন্তা করো জীবনে বেঁচে থাকলে পরিশ্রম করে টাকা উপার্জন করতে পারব। কিন্তু মারা গেলে টাকা কোন কাজে লাগবে? তখন সঙ্কট থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনে নিজের জমি জায়গাও বিক্রি করে দিতে হবে।

পরমেশ্বর কবীরজী বলেছেন, ধর্মদাস!

**স্ব তনু সম প্রিয় ঔর ন আনা। সো ভী সঙ্গ ন চলত নিদানা॥**

**শব্দার্থ:-** নিজের শরীর থেকে প্রিয় অন্য কিছু বস্তু হয় না, সেই শরীরও আপনার সাথে যাবে না। তাই তুই অন্য কোন জিনিসকে নিজের মনে করে গর্ব করে ভগবানকে ভুলে যাচ্ছিস! এই সমস্ত সম্পত্তি এবং পরিবার ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্নের সাথীর মত। কবীর পরমেশ্বরজী বলেছেন, আমার উপদেশ এই যে, পূর্ণ সন্ত থেকে সত্যনাম (সত্য সাধনার মন্ত্র) নিয়ে নিজের আত্মার কল্যাণ করাও আর যতক্ষন তুমি এই সংসারের স্বপ্নের আছো ততক্ষন স্বপ্ন দেখতে দেখতে পূর্ণ সন্তের শরণে গিয়ে সতনাম প্রাপ্ত করে, নিজের মোক্ষ করাও। সমস্ত প্রাণী জীবন রূপী রেল গাড়িতে ভ্রমণ করছে। যে বগিতে (কম্পার্টমেন্টে) বসে আছো, তা তোমার শহর বা এলাকা মনে করো। যে সিটে বসে আছো তা তোমার পরিবার। যার যাত্রা সমাপ্ত হয়ে যাবে সে তার নিজের নিজের স্টেশনে নেমে যাবে। যাত্রীরা জানে যে আমরা কিছু সময়ের সাথী। সভ্য ব্যক্তিরা যাত্রার সময় প্রেম ভাব বানিয়ে রাখে। একে অন্যকে সহযোগ করে। এইরূপ আমাদের স্বপ্ন রূপী মানব জীবন করতে হবে। যে দিন স্বপ্ন ভেঙে যাবে অর্থাৎ শরীর থেকে আত্মা বের হয়ে যাবে (মৃত্যু হবে) সেই দিন বুঝতে পারবে, এটা কি ছিল? আসল সত্য কি? সেই পরিবার, সম্পত্তি কোথায়, যা সংগ্রহ করার জন্য নিজের অমূল্য মানব জীবন নষ্ট করে দিয়েছো। সংসারের ভিতর পরমাত্মার অতিরিক্ত এমন কিছু নেই, যে মৃত্যুর পরে যম দূতদের কণ্ঠ বন্ধ করে দেবে বা আপনাকে কোন প্রকার সাহায্য করবে। পরমেশ্বর ঐ ব্যক্তিকেই সাহায্য (মদদ) করে যে পূর্ণ সন্ত থেকে দীক্ষা নিয়ে রেখেছে। তাই পূর্ণ সন্ত থেকে দীক্ষা নিতে হবে, পরমেশ্বর ঐ পূর্ণ সন্তের (সদগুরু) রূপ ধরে উপদেশি আত্মাকে সাহায্য করে। সত গুরুর শরণে আসার পরে এমন লগন লাগাও যেমন-১) মৃগ, ২) পতঙ্গ, ৩) সতী ও ৪) শুরবীররা লাগায়, অর্থাৎ নিজের উদ্দেশ্য থেকে পিছু হাঁটে না। শুরবীর টুকরো টুকরো হয়ে পৃথিবীতে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া শ্রেষ্ঠ মনে করে কিন্তু পরাজয় স্বীকার করে না, বা পিছে হাঁটে না। পুরাণ তথা শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৩৮-এ বলেছে, হে অর্জুন! যদি সৈন্য যুদ্ধে মারা যায় তাহলে সে স্বর্গতে সুখ প্রাপ্ত করে। ভক্ত যদি ভক্তি মার্গে সংঘর্ষ করে ভক্তি করে শরীর ত্যাগ করে, তাহলে সে সৎলোকের সুখ সাগরে অনন্তকালের জন্য সুখী হয়ে যায়। জন্ম-মৃতুর সংস্কট চিরকালের জন্য সমাপ্ত হয়ে যায়। যেমন আমাদের পৃথিবীতে জন্ম হয়েছে, আমরা জানতাম না, আমাদের জ্ঞান ছিল না যে, কোথায় কার ঘরে কার (সন্তান) পুত্র-পুত্রী রূপে জন্ম নেব। কবে কোনদিনে কার সঙ্গে আমার বিবাহ হবে? আমরা এও জানি না আমাদের ঘরে পুত্র সন্তানের জন্ম হবে, না মেয়ে সন্তানের জন্ম হবে? যে সন্তানেরই জন্ম হোক না কেন, সেই সন্তানের সাথে পরিবারের সকলের প্রেম ভালবাসা হয়ে যায়। সর্বদা এক সাথে থাকতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এটাই পূর্ব জন্মের কর্ম সংস্কারে চলতে থাকে। আমরা চিন্তা করি কেউ যাতে না মরে। কিন্তু এই কাল ব্রহ্মাণ্ডের লোকে কেউ অমর নয়। এক এক করে আগে পিছনে সকলকে মরতে হবে। আর সারা জীবনে যে সম্পত্তি একত্রিত করেছিলে তাও থেকে যাবে। সবাইকে (জীবকে) খালি হাতে যেতে হবে। কিন্তু যে পূর্ণ সন্তের কাছ থেকে সত্য নাম নিয়ে সদভক্তি করবে, সে সতলোক চলে যাবে। ওখানে পৃথিবীর মতই জন্ম হবে, পরিবার হবে। ওখানে কোন কর্ম করতে হয় না। সর্ব খাদ্য পদার্থ অফুরন্ত আছে। সতলোকে সদাবাহার গাছপালা, সুন্দর সুন্দর ফল ফুলের বাগান (কাজু, মেওয়া, মনুখা, কিসমিস ইত্যাদি) দুধের সমুদ্র (ক্ষীর সমুদ্র)। সতলোকে বৃদ্ধ অবস্থা আসে না। মৃত্যুও হয় না। একেই অক্ষয় মোক্ষ বলা হয়, অর্থাৎ পূর্ণমুক্তি। গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তথা অধ্যায়

১৫ শ্লোক ৪ এ বলা হয়েছে, যে সিদ্ধি মোক্ষ শক্তিকে 'নৈষ্কর্ম' সিদ্ধি বলেছে যার বর্ণনা গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ৪, অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৪৯ থেকে ৬২ পর্যন্ত আছে। এই কাল ব্রহ্ম অর্থাৎ জ্যোতি নিরঞ্জনের একুশ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রে সর্ব প্রাণীকে কর্ম করে আহার প্রাপ্তি করতে হয়। সতলোকে এমন হয় না (সতলোকে কর্ম ছাড়া সর্ব পদার্থ ও সর্বসুখ প্রাপ্ত হয়)। যেমন ফলে ভরা বৃক্ষের বাগান, শুধু গাছ থেকে তুলে খেতে হবে। সর্ব প্রকারের আনাজও এইরূপ জন্মায়। যা ইচ্ছা বানাও আর খাও। ওখানে সদা বাহার। ওখানে রান্না করারই দরকার হয় না। নিজের ইচ্ছামত (যেমন সিদ্ধি শক্তিতে হয়) খাবারের ইচ্ছা করলে, নিজে থেকে তৈরি হয়ে যায়। এসব পরমেশ্বরের শক্তিতে হয়। ঐ সতলোককে প্রাপ্ত করার জন্য আপনাকে সতী তথা সুরমার মত কুরবান অর্থাৎ বলিদান দিতে হবে। ভাবার্থ এই যে, নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ মুক্তি প্রাপ্তির জন্য সংসারে সর্ব লোভ ও লাভ ত্যাগ করার প্রয়োজন হলেও ত্যাগ করতে হবে। যদি সতগুরুর শরণ গ্রহণ না কর তাহলে যখন শেষ সময় আসবে তখন যমদূতেরা ভক্তিহীন প্রাণীর কণ্ঠ বন্ধ করে দেবে। তখন পরিবারের কোন ব্যক্তি যমের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। একমাত্র সতগুরু ঐ সময় সাহায্য করতে পারে।

এজন্য পরমেশ্বর কবীর জী বলেছেন:-

**অন্ত সময় জম দূত গলা দবাবেঁ। তা সময় কহো কৌন ছুড়াবে॥**
**সদগুরু এক ছুড়াবন হারা। নিশ্চয় কর মানহু কহা হমারা।**

**শব্দার্থ:-** শব্দার্থ উপরে দেওয়া হয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান কে বুঝে উপদেশ প্রাপ্ত করে এবং অন্য কোন জীবের সাথে ভক্তি মার্গের চর্চা করে সদগুরুর কাছে এনে নাম উপদেশ দেওয়ায় তাহলে ঐ ভক্তের প্রচুর পুণ্য প্রাপ্ত হয়। এক কোটি গাভীকে কসাইয়ের হাত থেকে বাঁচালে যে পুণ্য প্রাপ্ত হয়, এক জন মানুষ রূপ ধারী প্রাণীকে মুক্তির পথে নিয়ে আসলে সেই পুণ্য প্রাপ্ত হয়, এক মানবের জীবনে এইরূপে বহু মূল্য পুণ্য প্রাপ্ত হয়। যদি কোনো মূর্খ প্রচারক মান-বড়াই করে স্বয়ং দীক্ষা দেয় তাহলে সে মহা অপরাধী হয়। এতে পরমাত্মা রুষ্ট হয়ে যায়, তখন কাল ঐ আত্মাকে কান ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়, যেমন ছাগলের কান ধরে কসাই টেনে নিয়ে যায়। কবীর সাগর অধ্যায় 'অম্বুসাগর' পৃষ্ঠা ৪৮-এ প্রমাণ আছে:-

**তব দেখা দূতন কহঁ জাঈ। চৌরাসী তহাঁ কুণ্ড বনাঈ॥**
**কুণ্ড-কুণ্ড বৈঠে জমদূতা। দেত জীবন কহঁ কষ্ট বহুতা॥**
**তহাঁ জায় হম ঠাড (খড়ে) রহাবা। দেখত জীব বিনয় বহুত লাবা॥**

"ঝুঠে কড়িহার (নকল সদগুরু)-এর দশা"

**পড়ে মার জীব করেঁ বহু শোরা। বাঁধ-বাঁধ কুণ্ডন মেঁ বোরা॥**
**লাখ অঠাইস পড়ে কড়িহারা। বহুত কষ্ট তহাঁ করত পুকারা॥**
**হম ভূলে স্বার্থ সঙ্গী। অব হমরে নাহী অর্ধঙ্গী॥**
**হম তো জরত হৈঁ অগ্নি মঞ্ঝারা। অঙ্গ-অঙ্গ সব জরত হমারা॥**
**কৌন পুরুষ অব রাখে ভাঈ। করত গুহার চক্ষু ঢল জাঈ॥**

"জ্ঞানী (কবীর জী) বচন"

**করুণা দেখ দয়া দিল আবা। অবে দূত ত্রাস ভাস দিখাবা॥**

এই শব্দ বানানো শব্দ, বাস্তবিক (আসল শব্দ) নীচে দেওয়া হল।

**দুর্দশা দেখ দয়া দিল আবা। অবে দূত তুম জীবন ভ্রমাবা॥**

**জীব তো অচেত অজ্ঞানা। বাকো কাল জাল তুম বন্ধানা॥**
**চৌরাসী দূতন কহঁ বান্ধা। শব্দ ডোর চৌদহ যম সান্ধা॥**
**তব হম সবহন কহঁ মারা। তুম হো জালিম বটপারা॥**
**হমরে ভগতন কো তুম ভ্রমাবা। পল পল সুরতি জীবন ডিগাবা॥**
**গহি চোটি দূত ঘসিয়াএ। যম রূ দূত বিনয় তব লাএ॥**

“দূত (যে নকল গুরু হয়) বচন”

**চুক হামারী ক্ষমা কর দীজৈ। মন মানে তস আজ্ঞা কীজৈ॥**
**হম তো ধনী (কাল) কহয়ো জস কীন্হা। শো বচন মান হম লীন্হা॥**
**অব নহীঁ জীব তুম্হারা ভ্রমাবৈঁ। হম নহীঁ কবহূ গুরূ কহাবৈঁ॥**

“জ্ঞানী (কবীরজী) বচন”

**সুন জ্ঞানী বহুতে হঁসাঈ। দূতন দুষ্ট বন্ধ ন ছোড়ো জাঈ॥**
**পল ইক জীবন সুখ দীনা। তব সংসার গমন হম কীন্হা॥**

**ভাবার্থ:-** কবীর পরমেশ্বর বলেছেন যে, যারা নকল (মিথ্যা) গুরু সেজে মান বড়াই বা লোভের কারণ কাল প্রেরণায় সাদাসিধে জীবকে ভ্রমিত করে, তাদেরও দণ্ড ভোগ করতে হয়। ঐ সব গুরুদের নরকে অত্যাধিক যাতনা (অত্যাচার) ভোগ করতে হয়। তার শিষ্যরাও গুরুর সাথে ঐ নরকে পতিত হয়। আমি ঐ নরকের পাশে যাই, সেখানে মান সম্মানের জন্য ক্ষুধার্ত নকল গুরুরা মিথ্যা মহিমা করে লাখ লাখ শিষ্যকে সঙ্গে করে নরকে নিয়ে গিয়েছে। পরমেশ্বরের বিধান অনুসারে ঐ অপরাধী আত্মা নরকে ছিল। ঐ নরক ক্ষেত্রে কুণ্ড বানানো আছে। প্রত্যেক কুণ্ডে জীবকে যমদূতরা যাতনা দিচ্ছিল। ২৮ লক্ষ নকল সতগুরু আমাকে দেখে প্রার্থণা করে, আমাদের বাঁচান প্রভু! কারণ, যে যমদূতরা নরকে জীবকে কষ্ট যন্ত্রণা দিচ্ছিল তারা কবীর পরমেশ্বরের সামনে ভয়ে কাঁপতে থাকে। তাই নকল গুরুরা চিন্তা করে এ কোন শক্তিশালী দেব হবে। পরমেশ্বর কবীরজী বলেন, তোমরা ভোলা জীবদেরও ভ্রমিত করেছ। তোমরা জানতে তোমাদের কাছে নাম দীক্ষা দেওয়ার অধীকার নেই। তবুও নিজেকে সদগুরু রূপে পরিচয় দিয়েছো। পূর্ণ মোক্ষ কি? তোমরা তাও জানো না। নিজের স্বার্থের জন্য কোটি কোটি জীবের আমূল্য মানব জীবন নাশ করে দিয়েছ। তারা সকলে কাল জালে ফেঁসে আছে। পরে আমি ঐ দুত (কালের দূত) ও অন্য যমদূতদের টিক্কি (চৌটী-মাথার মাঝখানের চুল) ধরে টেনে আনি। তখন নকল সদগুরুরা বলে, আমরা আমাদের ভগবান অর্থাৎ মালিক কাল ব্রহ্মের আদেশ পালন করেছি। এখন আপনি যেমন বলবেন তেমনই কবর। তখন আমি বলি এখন তোমাদের ছাড়া যাবে না। যারা ঐ নকল গুরুদের শিষ্য হয়েছিল তারাও তাদের গুরুদেবের সাথে ঐ নরকে কষ্টভোগ করছিল। যতক্ষণ আমি ঐ নরকে ছিলাম (কবীর পরমেশ্বর) ততক্ষণ জীবদের কোন কষ্ট ছিল না। আমি কিছু সময়ের জন্য ওদের শান্তি দিয়ে সংসারে চলে আসি। আমি ফিরে আসার পরে ঐ নকল গুরু-শিষ্যদেব পুনরায় নরক যন্ত্রনা শুরু হয়। তাই উপরোক্ত বানীতে বলেছে, যদি কোন প্রচারক স্বয়ং গুরু হয়ে জগত কে ভ্রমিত করে, তাহলে পরমেশ্বর রুষ্ট হয়ে যায়। তখন কালের দেওয়া কষ্ট ভোগ করতে হয়। ভালো আত্মারা কখনো এই ধরনের ভুল করে না। আমি এই সত্য কথা প্রমাণের সহিত বলছি।

## "ভক্তের স্বভাব কেমন হয়?"

(অনুরাগ সাগরের পৃষ্ঠা ৬ বাণী নং ৭ থেকে ১৭)

ধর্মদাস বচন

**মৃতক ভাব প্রভু কহো বুঝাঈ। জাতে মনকী তপনি নসাঈ॥**
**কেহি বিধি মৃতক হো য়হ জীবন। কহো বিলোয় নাথ অমৃতধন॥**

কবীর বচন - মৃতকের দৃষ্টান্ত (উদাহরণ)

**ধর্মদাস য়হ কঠিন কহানী। গুরূগম তে কোঈ বিরলে জানী।**

ভৃঙ্গীর দৃষ্টান্ত (উদাহরণ)

**মৃতক হোয় কে খোজহিঁ সন্তা। শব্দ বিচারি গহেঁ মগু অন্তা।**
**জৈসে ভৃঙ্গ কীট কে পাসা। কীট গহো ভৃঙ্গ শব্দ কী আশা॥**
**শব্দ ঘাতকর তেহী মহেঁ ডারে। ভৃঙ্গী শব্দ কীট জো ধারে॥**
**তব লৈগৌ ভৃঙ্গী নিজ গেহা। স্বাতী দেহ কীন্হো সমদেহা॥**
**ভৃঙ্গী শব্দ কীট জো মানা। বরণ ফের আপন করজানা॥**
**বিরলা কীট জো হোয় সুখদাঈ। প্রথম অবাজ গহে চিতলাঈ॥**
**কোই দূজে কোই তীজে মানৈ। তন মন রহিত শব্দ হিত জানৈ॥**
**ভৃঙ্গী শব্দ কীট না গহঈ। তৌ পুনি কীট আসরে রহঈ॥**
**এক দিন কীট গহেসী ভৃঙ্গ ভাষা। বরণ বদলৈ পূরবৈ আশা॥**

**'মৃতকের অন্য দৃষ্টান্ত'**

(অনুরাগ সাগরের পৃষ্ঠা ৭ বাণী নং ৭ থেকে ২০ পর্যন্ত)

**সুনহু সন্ত ইয়হ মৃতক সবাউ। বিরলা জীব পীব মগ ধাউ॥**
**ঔরৌ সুনহু মৃতক কা ভেবা। মৃতক হোয় সতগুরূ পদ সেবা॥**
**মৃতক ছোহ তজৈ শব্দ উরধারে। ছোহ তজৈ তো জীব উবারে॥**

**'পৃথিবীর দৃষ্টান্ত'**

**জস পৃথ্বী কে গঞ্জন হোঈ। চিত অনুমান গহে গুণ সোঈ॥**
**কোঈ চন্দন কোঈ বিষ্টা ডারে। কোঈ কোঈ কৃষি অনুসারে॥**
**গুণ ঔগুণ তিন সমকর জানা। তজ বিরোধ সুখমানা॥**

**'উখ-এর দৃস্টান্ত'**

**ঔরো মৃতক ভাব সুনি লেহূ। নিরখি পরখি গুরূ মগু পগু দেহূ॥**
**জৈসে ঈখ কিষাণ উগাবৈ। রতী রতী কর দেহ কটাবে॥**
**কোল্হূ মহঁ পুনি তাহী পিরাবৈ। পুনি কড়াহ মেঁ খূব উঁটাবে॥**
**নিজ তনু দাহে গুড় তব হৌঈ। বহুরি তাব দে খাণ্ড বিলোঈ॥**
**তাহূ মাঁহি তাব পুনি দীন্হা। চীন তবৈ কহাবন লীন্হা॥**
**চীনী হোয় বহুরিত তন জারা। তাতে মিসরী হ্বৈ অনুসারা॥**
**মিসরীতে জব কন্দ কহাবা। কহে কবীর সবকে মন ভাবা॥**
**য়হী বিধিতে জো শিষ করহী। গুরূ কৃপা সহজে ভব তরঈ॥**

**ভাবার্থ:-** অনুরাগ সাগর পৃষ্ঠা ৬-এ লেখা পংক্তি (লাইন) ৭ থেকে ১৭-এর ভাবার্থ, হে প্রভু! আমাকে বোঝাও মৃতকের স্বভাব কেমন হয়? জীবিত মৃত কি প্রকার হয়? হে অমর পরমাত্মা! হে স্বামী! নিষ্কর্ষ বের করে আমাকে ঐ অমৃত ধন অর্থাৎ অমর হওয়ার মার্গ (রাস্তা) বলুন।

"পরমেশ্বর কবীরজীর বচন = মৃতকের দৃষ্টান্ত"

পরমেশ্বর কবীরজী বলেন, হে ধর্মদাস! যে প্রশ্ন তুমি করেছো তা জটিল ও কঠিন কথা প্রসঙ্গ। সদগুরুর শরণে থাকা জ্ঞান পিপাসুকরাই ঠিকমত বুঝতে পারে।

**"ভৃঙ্গীর দৃষ্টান্ত"**

সন্ত বা সাধক গণ জীবিত মরা হয়ে পরমাত্মাকে খোঁজ করে। শব্দ বিচার অর্থাৎ যথার্থ নাম মন্ত্র ঠিকমত বুঝে ঐ মার্গের অন্তিম (শেষ) পর্যন্ত পৌঁছায় অর্থাৎ পূর্ণ মুক্তি প্রাপ্ত করে। যেমন- এক ভৃঙ্গ, (পাখাওয়ালা নীল রং-এর এক প্রকারের পোকা) যাকে ভ্রমর বলে, যাকে ইঞ্জিনহারি ইত্যাদি ইত্যাদি নামে জানা যায় যে, ভীঁ-ভীঁ শব্দ করে। এই পোকা স্ত্রী পুরুষের মিলনে বাচ্চা উৎপন্ন করেনা। এই পোকা অন্য কীট পতঙ্গের কাছে গিয়ে ভী-ভীঁ শব্দ করে। যে পোকা এই শব্দে প্রভাবিত হয়, কুমহার পোকা তাকে ধরে এনে নিজের তৈরি মাটির ঘরে রাখে। কুমোর পোকার বাসা প্রায় দুই ইঞ্চি পরিধির এক বা দুই মুখের হয়। তিন, চারটি পোকা ধরে এনে ঐ মাটির বাসার ভিতরে রাখে আর উপর দিয়ে ভীঁ-ভীঁ শব্দ করতে থাকে। আবার কুয়াশা বা শিশিরের জল নিয়ে মুখে এনে ঐ পোকার মুখে ঢালে। ঐ ভ্রমরীর বারবার আওয়াজ শুনে ঐ কীট ওর মত রঙের হয় এবং ওর মত পাখা বার হয়। ঐ পতঙ্গ একই রূপ আওয়াজ ভীঁ ভীঁ আওয়াজ বার করে এবং ভ্রমরী হয়ে যায়। সেইরূপ পূর্ণ সন্ত ও নিজের জ্ঞানকে কুমোর পোকার মত বার বার বলে সাধারণ সামান্য ব্যক্তিদের ভক্ত বানায়। পরে ঐ ভক্ত সতগুরু থেকে শোনা জ্ঞান অন্য ব্যক্তিদের শোনাতে লাগে। সংসারের পূর্ব রীতি-নীতি ত্যাগ করায় অন্য ব্যক্তিরা বলে এর রং-ঢং বদলে গিয়েছে, এতো সাধু অর্থাৎ ভক্ত হয়ে গিয়েছে। কুমোর পোকার আওয়াজে কোনো কোনো পোকারা শীঘ্র সক্রিয় হয়ে যায়। আবার অন্য পোকাকে সক্রিয় করার জন্য বার-বার চেষ্টা করে। সেইরূপ সদগুরু বার-বার সত্সঙ্গ শোনাতে থাকে। পুণ্য বা ভালো আত্মারা শীঘ্র বুঝে যায়। তারা এক-দুইবার সত্সঙ্গ শুনে সত্য মার্গ গ্রহণ করে। আর নাম উপদেশ নিয়ে সদভক্তি করে। এই রূপে কিছু পোকারা কিছুদিন পর নিজের স্বভাব বদলে ফেলে । যে পোকারা ভৃঙ্গী হয় না, তারা যদি ভৃঙ্গীর শরণে থাকে তাহলে অবশ্যই এক দিন না এক দিন পরিবর্তন হয়ে ভৃঙ্গীর স্বভাবের হয়ে যাবে। পরমেশ্বর কবীরজী বলেছেন হে ধর্মদাস! শিষ্য যদি এইরূপে সদগুরুর বিচার শুনতেই থাকে, তাহলে ঐ ভৃঙ্গী পোকার মত প্রভাবিত হয়ে বর্তমান সাংসারিক ভাব বদলে ভক্ত হয়ে হংস দশা প্রাপ্ত করে।

**পৃষ্ঠ ৭ এর লাইন ৭ থেকে ২০ পর্যন্ত শব্দের ভাবার্থ:-**

কবীরজী বলেছেন- হে সন্ত! মৃতকের ভাব শোন। এই ভাব কোন ভাগ্যবান জীব অনুসরণ করে। সে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার মার্গ পায়। উপরোক্ত ভৃঙ্গী-এর উদাহরণ ছাড়া আরো বলছি শোন। মৃত ভাবের প্রাণী তারা, যারা জীবিত মৃত ভাবের হয়ে সদগুরুর পথ অনুসরণ করে সাধনা করে।

**"পৃথিবীর উদাহরণ"**

পৃথিবীতে যেমন সহনশীলতা বা সহ্য ক্ষমতা আছে। এই সহ্য ক্ষমতার গুণ যে গ্রহণ করবে, সে বেঁচে থেকেও মৃত আর সেইও সফল হবে। পৃথিবীর উপর নোংরা ফেলে, পায়খানা করে, কেউ চাষ করে, গর্ত করে, আবার কেউ পৃথিবীর (ধরতীর) পূজা করে, পৃথিবী কিন্তু কারো দোষ-গুণ দেখে না। যার যেমন ভাবনা সে তেমনি করে। এই চিন্তা বিচার, প্রতিবাদ না করে পৃথিবী সুখী থাকে।

ভাবার্থ এই যে, মাটি যেমন সহনশীল তেমন সন্ত বা একজন ভক্তের স্বভাবও সেইরূপ হওয়া উচিত। যদি কেউ ভুলে বলে বা কথা বলে, অসম্মান করে বা সম্মান

করে, সেই দিকে না দেখে নিজের উদ্দেশ্যে দৃঢ় থেকে তার লক্ষ্যে অটল থেকে সফলতা প্রাপ্ত করতে হবে।

**"আখ (ইক্ষ) এর দৃষ্টান্ত (উদাহরণ)"**

যেমন কৃষক আখ লাগায়। কৃষক আখকে ছোট ছোট এক ফুটের টুকরো করে মাটিতে লাগায়। আখ হওয়ার পরে কোলহুতে (ঘান) পিসে রস বের করে কড়াইতে দিয়ে আগুনে জ্বালানো হয়। তখন গুড় তৈরি হয়। আবার এই গুড়কে অধিক তাপ দিলে খাণ্ড তৈরি হয়। যা গুড় থেকেও সু-স্বাদু। এই খাণ্ডকে অধিক তাপ দিলে চিনি তৈরি হয়। আর চিনিকে তাপ দিলে মিশ্রী (মিছরি) হয়ে যায়। মিছরি থেকে খন্ড তৈরী হয় যা খুব সুস্বাদু হয়। পরমেশ্বর কবীর জী বলেছেন, হে ধর্মদাস! যে ভক্ত এইরূপ ভাবে ভক্তিমার্গের কষ্টকে সহ্য করে, সেই ভক্ত পরমাত্মার কাছে ততই বহু মূল্যের হয়।

(८) 132 अनुरागसागर

मृतकभाव कौन धारण कर सकता है ! छन्द

मिरतक भाव है कठिन धर्मनि, लहे विरलशूरहो ॥
कादर सुनतेहि तनमन दहै,पाछे न चितवतकूरहो॥
ऐसे शिष्य आप सम्हारे, नाव सही गुरुज्ञानको ॥
लहै भेदी भेद निश्चय, जाय दीप अमानको ॥६॥

मृतक ही साधु होता है

सोरठा–मृतक हो सो साधु, सो सतगुरुको पावई॥
मेटे सकल उपाध, तासु देव आसा करें ॥ ६ ॥

साधु किसे कहते हैं

साधूमार्ग कठिन धर्मदासा । रहनी रहे सो साधु सुवासा ॥
पांचों इन्द्री सम करि राखे ।नाम अमीरसनिशिदिन चाखे॥

चक्षुर्वशीकरण

प्रथमहिं चक्षु इन्द्री कहँ साधे। गुरु गम पंथ नाम अवराधे ॥
सुन्दर रूप चक्षुकी पूजा । रूप कुरूप न भावे दूजा ॥
रूप कुरूपहिं सम करजाने । दरस विदेह सदा सुख माने ॥

श्रवणवशीकरण

इन्द्री श्रवण वचन शुभ चाहै । उत्कट वचनसुनत चित दाहै॥
बोल कुबोल दोउ सह लेखे । हृदय शुद्ध गुरुज्ञान विशेखे ॥

नासिकावशीकरण

नासिका इन्द्री बास अधीना । यहि सम राखे संत प्रवीना॥

जिह्वावशीकरण

जिभ्या इन्द्री चाहै स्वादा । खट्टा मीठा मधुर सवादा ॥
सहज भावमें जो कछु आवे । रूखा फीका नहिं बिलगावे ॥
जो कोई पंचामृत लै आवे । ताहि देख नहिं हरष चढ़ावे॥
तजे न रूखा साग अलूना । अधिक प्रेमसौं पावैं दूना ॥

अनुरागसागर 133 (९)

शिश्नवशीकरण

इन्द्री दुष्ट महा अपराधी ।कुटिलकाम होई विरलेसाधी॥
कामिनि रूप कालकी खानी । तजहु तासु सँग हो गुरुज्ञानी॥

कामवशीकरण

जबही काम उमंग तन आवै । ताहि समय जो आप जुगावै॥
शब्द विदेह सुरत लै राखे । गहिमन मौन नामरसचाखे ॥
जब निहतत्त्वमें जाय समाई । तबहीं काम रहै मुरझाई ॥

कामदेव लुटेरा है । छन्द

काम परबल अति भयंकर, महा दारुण काल हो॥
सुरदेव मुनिगणयक्षगंधर्व,सबहि कीन्ह बिलास हो॥
सबहिं लूटे विरल छूटे, ज्ञान गुण निज दृढ गहे ॥
गुरुज्ञान दीप समीप सतगुरु,भेदमारग तिन लहे॥७॥

कामलुटेरेसे बचने का उपाय

सोरठा–दीपक ज्ञान प्रकाश,भवन उजेरा करि रहो॥
सतगुरुशब्द विलास,भाज चोर अँजोरा जब॥७॥

अनलपक्षिका दृष्टान्त

गुरू कृपासों साधु कहावै । अनलपच्छ ह्वै लोक सिधावै॥
धर्मदास यह परखो बानी ।अनलपच्छ गम कहों बखानी॥
अनलपच्छ जो रहै अकाशा ।निशि दिन रहै पवनकी आशा॥
दृष्टिभाव तिनरति विधिठानी ।यहविधिगरभ रहेतिहिजानी ॥
अंडप्रकाश कीन्ह पुनि तहवां । निराधार आलंबहिं जहवां ॥
मारग माहिं पुष्ट भो अंडा । मारग माहिं विरह नौखण्डा॥
मारग माहिं चक्षु तिन पावा । मारग माहि पंख पर भावा॥
महि ढिग आवा सुधि भइताहीं। इहां मोर आश्रम नहिं आहीं॥
सुरति सम्हार चले पुनि तहवां ।मात पिताको आश्रम जहवां॥

অনুরাগ সাগরের পৃষ্ঠা ৮ ও ৯-এর সারাংশ এই যে, ঐ হল সাধক সঠিক যে নিজের সর্ব ইন্দ্রিয়কে সংযমে রাখে। যেমন মিলে যায় তেমন পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে। সুন্দর রূপ দেখে সেটাতে আকর্ষিত হয় না। খারাপ (কু-রূপ) রূপ দেখে ঘৃণা করে না। দুই জনকে দিব্য নজরে দেখে, যে উপরের চামড়া সাদা বা কালো হোক না কেন শরীরের হাড় মাংস একই রকম, রোগ হলে পচে গলে দুর্গন্ধ বের হয়। যদি কেউ সম্মান করে বা প্রেমের সাথে বলে, তাহলে খুশি অনুভব করা উচিত না। যদি কেউ কু-বচন বলে, তাহলে দুঃখ না করা উচিত। ঐ ব্যক্তির বুদ্ধির গভীরতা বা অন্তর জেনে শান্ত থাকো। যদি কেউ সুস্বাদু ভোজন ক্ষীর-খাণ্ড, হালুয়া দেয় তাতে প্রভাবিত হবে না। সে তার

কর্মফল পাবে। যদি কেউ রুখা-সুখা ভোজন দেয় তা অধিক প্রেমের সাথে খাওয়া উচিত। কাম বাসনাকে (সেক্স) গুরুত্ব দেবে না। এই ধরনের গুণের ভক্ত পরমেশ্বরকে প্রাপ্তি করে। যদি কাম বাসনা বিরক্ত করে তাহলে মনকে ভক্তি নাম স্মরণে লাগিয়ে আনন্দ প্রাপ্ত করো। তখন কাম বাসনা নিজে থেকে শান্ত হয়ে যাবে।

কামনা নাশ করার উপায়:-

**কবীর, পরনারী কো দেখিয়ে, বহন বেটী কা ভাব।**
**কহ কবীর কাম নাশ কা, য়হী সহজ উপায়॥**

## "মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য অনল পাখীর মত লক্ষণ হওয়া দরকার"

যেমন, অনল পাখী (অলল পক্ষী) আকাশে থাকত। এই পাখী এখন দেখা যায় না। বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই পাখীর চারটি পা, সামনের পা দুটো ছোটো আর পিছনের পা দুটো বড়ো। এই পাখী আকারে খুব বড় হয়। ডানাও খুব লম্বা লম্বা। যুবক পাখী অর্থাৎ পরিপূর্ণ পাখী চার বড় হাতিকে উঠিয়ে এক সাথে আকাশে নিজের পরিবারের কাছে নিয়ে যেত।

অনল পাখী উপরে আকাশে বাতাসে থাকত। ওখান থেকে মাদী অনল ডিম উৎপন্ন করে। ডিম দেওয়ার সময় কলা গাছের বন দেখে মাদী পাখী ডিম ছাড়ে, কারণ কলাগাছের বন খুব ঘন হয় অর্থাৎ কলাগাছ একটার সাথে একটা লাগানো থাকে। তাছাড়া কলা গাছ নরমও হয়। কলাগাছ হাতিদের খুব পছন্দ তাই দলে দলে হাতি কলা বনে থাকত এবং মজা করে কলা গাছ খেতো আর ওখানে বিশ্রাম করত। অনল পাখীর ডিম বাতাসের ভিতর দিয়ে আসার সময় বাতাসের ঘর্ষণের তাপে ডিমের ভিতর বাচ্চা তৈরি হয়ে যেত এবং কলাগাছের উপর পড়ত। কলাগাছ নরম ও ঘন হওয়ার কারণে ডিমের বাচ্চার কোন ক্ষতি হত না। হাজার হাজার কলাগাছের উপর ঐ ডিম পড়লে কলা গাছ ভেঙে মাটিতে মিশে যেত আর ডিম ভেঙে বাচ্চা বের হত। তীব্র গতিতে কলাগাছের উপর ডিম পড়ায় ডিমের গতিও কম হয়ে যেত এবং বাচ্চা সুরক্ষিত থাকত। অনল পাখীর ডিম খুব শক্ত এবং বড় হত। ডিমের কভারের ভিতরের দিকে নরম স্পঞ্জের মত পদার্থ থাকত যার জন্য পৃথিবীর উপর পড়লে ও বাচ্চার কোন ক্ষতি হত না। অনল পাখীর বাচ্চা পৃথিবীর পাখীদের সাথে ওড়ার অভ্যাস করত। কিন্তু অনল পাখীর বাচ্চা বুঝতে পারত এ আমার থাকার জায়গা না। আমার ঘর পরিবার আকাশে। তাই আমাকে আকাশে যেতে হবে। যখন অনল পাখীর বাচ্চা বড় হয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন হাতির দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর চার হাতিকে চার পায়ের পাঞ্জায় দৃঢ় ভাবে ফাঁসিয়ে নিজেদের খাবার সহ নিজের পরিবারের উদ্দেশ্যে আকাশে উড়ে যেত।

পরমেশ্বর কবীর সাহেব সঠিক উদাহরণ দিয়ে ভক্তদের মার্গদর্শন করাতেন। তিনি বলতেন, তোমরা এই সংসারের স্থায়ী বাসিন্দা নও। তোমাদের এই লোক ছেড়ে চলে যেতে হবে। তোমাদের স্থায়ী পরিবার উপরে সতলোকে আছে। ভুল করে এই পৃথিবীতে এসেছো। তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত ভক্তের মন অনল পাখীর মত হওয়া উচিত। যতক্ষণ সতলোকে যাওয়ার সময় না হয় ততক্ষণ সংসারের সকলের সহিত মিলে শিষ্টাচার পূর্বক থাকতে হবে। কিন্তু যাওয়ার সময় এদের প্রতি কোন মায়া ভাব বা চাহিদা থাকবে না। নাম সুমিরণের কামাই ও ধর্ম পুণ্যের কামাই সাথে নিয়ে উড়ে যেতে হবে নিজের পরিবারের কাছে, নিজের ঘর সতলোকে।

**অনুরাগ সাগরের পৃষ্ঠা ১৫২ এর সারাংশ:-**

এই পৃষ্ঠায় পরমেশ্বর শরীরের ভিতরের গুপ্ত ভেদ বলেছে। এই মানব শরীরে

৭২-টি নাড়ি আছে। তার মধ্যে তিনটি (ইড়া, পিঙ্গলা, সুস্মনা) মূখ্য। আরও একটি প্রধান নাড়ি আছে 'ব্রহ্ম রন্ধ্র'।

পরমেশ্বর কবীরজী বলেছেন হে ধর্মদাস! মনই জ্যোতি নিরঞ্জন। বাজীগর (মাদারী) যেমন বান্দরকে নাচায় কাল ব্রহ্ম জ্যোতি নিরঞ্জন ও জীবকে সেইরূপ নাচায়। এই শরীরের ৫ তত্ত্ব ২৫ প্রকৃতি ও তিনগুণ কালের এজেন্ট বা প্রতিনিধি। এরা জীবকে ভ্রমিত করে বা ধোঁকায় রাখে। এই শরীরে কাল নিরঞ্জন (মন) ও জীব আত্মা দুই জনেরই মূখ্য ভূমিকা আছে। কাল নিরঞ্জন মন রূপে পাপ কর্ম করাতে থাকে। আর ঐ পাপ জীব আত্মাকে ভোগ করতে হয়।

অনুরাগ সাগরের পৃষ্ঠা ১৫৩ সারাংশ:-

কাল মানুষকে এমন ভাবে ভ্রমিত করেছে যে তারা পরমাত্মাকে ভুলে গিয়েছে।

## "মন কিভাবে পাপ-পুণ্য করায়"

মন কালের পাক্কা এজেন্ট। মনই জীবকে নাচায়। যেমন সুন্দর স্ত্রীকে দেখলে মনে ভোগ বিলাসের ইচ্ছা জাগে। স্ত্রী ভোগের আনন্দ কাল জ্যোতি নিরাঞ্জন (মন) ভোগ করে, আর পাপের ফল আত্মাকে ভোগ করতে হয়।

{বর্তমান সরকার কঠিন আইন বানিয়েছে। যদি কোন পুরুষ কোন মেয়ের সাথে বলাৎকার (ধর্ষণ) করে, তাহলে তার দশ বছরের সাজা হবে। যদি নাবালিকাকে ধর্ষণ করে তাহলে আজীবন কারাবাস হবে অর্থাৎ জেল হবে। মনের প্রেরণায় দুই মিনিট আনন্দ আর পাহাড় প্রমাণ দুঃখ তাই প্রথমে মনকে জ্ঞানের লাগাম লাগানোই ভালো।}

অনুরাগ সাগর পৃষ্ঠা ১৫৪-এর সারাংশ:-

অন্যের ধন দেখলে মন ঐ ধনকে আত্মসাৎ করার প্রেরণা করে। তখন চুরি করে আর জীব দণ্ড ভোগ করে। পরের নিন্দা, পরের ধন ধোকা দিয়ে নিলে পাপ হয়। কাল এইভাবে জীব আত্মাকে কর্ম জলে ফাঁসিয়ে রাখে। সন্তের সাথে বিরোধ বা শত্রুতা করা গুরুদ্রোহী, এই সব মনরূপে কালই করে, এটা ঘোর অপরাধের কাজ।

## "নিরঞ্জনের চরিত্র = কালের জাল"

পরমেশ্বর কবীরজী বলেছেন, হে ধর্ম দাস! আমি তোমাকে ধর্মরায় (কাল)-এর জালের বিষয় বলছি। কাল নিরঞ্জন শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে গীতার জ্ঞান দিয়েছিল। অর্জুনের কর্ম যোগকে উত্তম বলে অর্জুনকে দিয়ে যুদ্ধ করায়। আর জ্ঞান যোগের কথা বলে ভ্রমিত করে দেয়। অর্জুন প্রথমে সত্ কথা বলেছিল অর্থাৎ জ্ঞানের কথা বলেছিল। অর্জুন বলেছিল, যুদ্ধ করে নিজের কুলের ভাই, ভাইপো, শালা, শ্বশুর, কাকা, জ্যেঠা-কে মারার থেকে ভিক্ষা করে জীবন নির্বাহ করা অনেক ভাল। পাপ কর্মে প্রাপ্ত রাজ্যের আমার প্রয়োজন নেই। তখন অর্জুনকে ভয় দেখিয়ে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যুদ্ধ করিয়ে নরকের ভাগী বানায়। জ্ঞান যোগের বাহানা করে কর্ম যোগের উপর জোর দিয়ে মহাপাপ করায়।

অনুরাগ সাগর পৃষ্ঠা ১৫৫-এর সারাংশ:-

ধর্ম দাসজী প্রশ্ন করে, হে প্রভু! আপনি কালের জালের কথা বলেছেন কিন্তু আপনাকে প্রাপ্ত করার জন্য জীবকে কি করতে হবে, তা কৃপা করে বলুন।

## "সতগুরু (কবীরজী) বচন"

## "ভক্তের ১৬ গুণ (আভূষণ)"

পরমেশ্বর কবীরজী বলেছেন হে ধর্মদাস! ভবসাগর অর্থাৎ কাল লোক থেকে পার হওয়ার জন্য ভক্তির শক্তি প্রয়োজন। পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য জীবের ১৬ গুণের

লক্ষণ অনিবার্য। একে আত্মার ১৬ শৃঙ্গার (অলঙ্কার) বলা হয়।

১. জ্ঞান ২. বিবেক ৩. সত্য ৪. সন্তোষ ৫. প্রেমভাব, ৬. ধৈর্য ৭. কারো সাথে প্রতারণা না করা ৮. দয়া ৯. ক্ষমা ১০. শীল (শীতলতা) ১১. নিষ্কর্মা ১২. ত্যাগ ১৩. বৈরাগ্য ১৪. শান্তি নিজের ধর্ম ১৫. ভক্তি করে নিজের জীবকে উদ্ধার ১৬. সবার সঙ্গে মিত্র সমান ব্যবহার (চিত ধরৈ)।

**ভাবার্থ:-** পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য ভক্তের মধ্যে এই ১৬ গুন থাকা অনিবার্য।

১. তত্ত্বজ্ঞান ২. বিবেক ৩. সত্য ভাষণ ৪. পরমাত্মা যা দেয় তাতেই সন্তুষ্ট থাকা এটাকে পরমাত্মার ইচ্ছা মনে করা ৫. প্রেম ভাবে ভক্তি করা অন্যের সাথে মৃদু ভাষায় কথা বলা। ৬. ধৈর্য্য রাখা, সদগুরু জ্ঞান দিয়েছেন, তাড়াতাড়ি ফলের আশা না করে দৃঢ়তার সাথে সাফল্যের দিকে অগ্রসর হওয়া। ৭. কারো সাথে ছল চাতুরী না করা। ৮. দয়া ভাব রাখা ৯. ভক্ত তথা সন্তের অলংকার ক্ষমা জানো। শত্রুকে ক্ষমা করা উচিত। ১০. শীতল স্বভাব হওয়া উচিত। ১১. নিষ্কাম ভাবে ভক্তি করো। সাংসারিক লাভের উদ্দেশ্যে ভক্তি করা উচিত নয়। ১২. ত্যাগের ভাবনা অত্যন্ত জরুরী, ১৩. বৈরাগ্য ভাব হওয়া দরকার। সংসারকে অসাড় ও নিজের জীবনকে অস্থায়ী জেনে পরমাত্মার প্রতি বিশেষ ভাব হওয়া অত্যন্ত জরুরী। ১৪. ভক্তের বিশেষ গুণ শান্তি প্রিয় হওয়া অনিবার্য ১৫. ভক্তি করা, অর্থাৎ ভক্তি করে নিজের আত্মার কল্যাণ করাও ১৬. প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে মিত্রের সমান ব্যবহার করা উচিত।

উপরোক্ত সমস্ত গুণের অধিকারী হলে সতলোকে যাওয়া যাবে। তাছাড়া গুরু সেবা ও গুরু পদ্ধতিতে বিশ্বাস রাখতে হবে। পরমাত্মার ভক্তি ও সাধু-সঙ্গ করা অনিবার্য।

**অনুরাগ সাগরের পৃষ্ঠা ১৫৬ ও পৃষ্ঠা ১৫৭-এর সারাংশ:-**

এখানেও ঐ একই জ্ঞান দেওয়া আছে। বিষয়, বিকার ত্যাগ করলে ভক্তি সফল হবে।

**অনুরাগ সাগরের পৃষ্ঠা ১৫৮- ১৫৯ এর সারাংশ:-**

পরমেশ্বর বলেছেন উপদেশিকে ১৫ দিনে কোন ধার্মিক অনুষ্ঠান অর্থাৎ পাঠ করা দরকার। যদি ১৫ দিনে না করাতে পারে তাহলে মাসে একবার অবশ্যই করা দরকার। নির্ধনের জন্য বলেছেন যদি কেউ নির্ধন হয় তাহলে বছরে দুইবার কর, যদি দুইবার করতে অসমর্থ হয়, তাহলে একবার অবশ্যই করো। যদি এক বছরে একবার গুরু দর্শন বা পাঠ না করো তাহলে ঐ ভক্তকে সাকট (ভক্তি ভাব হীন) বলা হবে। বছরে একবার পাঠ করলেও জীবের মুক্তিতে বাধা আসে না।

শ্রদ্ধার সহিত কবীরজীর নাম জপ করতে হবে এবং গর্বের সাথে পরমেশ্বর কবীরজীর নাম নিতে হবে। যদি কেউ বলে কবীর পরমাত্মা নয় তাহলে এই ধরনের ব্যক্তির কথায় লজ্জাবোধ না করে পরমাত্মার নামের সাথে নিজের নামও গর্বের সাথে বলবে।

**ভাবার্থ:-** আদরনীয় ধর্মদাসের সঙ্গে পরমাত্মা ছিলেন, ধর্মদাসের আত্মাকে সতলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং নিজের যথার্থ পরিচয় দিয়েছিলেন। ধর্মদাসজী নিজের চোখে দেখে ও পরমেশ্বর কবীর সাহেবের মুখ থেকে উচ্চারিত বাণী শুনে (কবীর সাহেব বলেছেন, আর ধর্মদাস নিজের কানে শুনে তা লিপিবদ্ধ করেছেন)। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পুস্তক কবীর সাগর, কবীর বাণী, কবীর বীজক, কবীর শব্দাবলী ইত্যাদি পুস্তক মানব কল্যাণের জন্য লেখা হয়েছে। তাই ধর্মদাসজীরও মহিমা গাইতে হবে।

সঠিক ভক্ত ভক্তি সাধনা গুরু মর্যদায় থেকে অন্তিম শ্বাস পর্যন্ত করে। যেমন বীর যোদ্ধারা যুদ্ধের ময়দানে শত্রুকে হত্যা করে, না হয় নিজে মৃত্যু বরণ করে। তারা পলায়ণ করে না। সন্ত-ভক্তদের রণক্ষেত্রই হল ভক্তি মন্ত্র, জপ আর মর্যাদা। যে শিষ্য গুরু থেকে বিমুখ হয়ে নাম খণ্ডিত করে দেয়। সে সদগুরুর মধ্যে দোষ বার করে, যার কারণে সে নরকের অগ্নিকুণ্ডে পড়ে। যদি সদগুরুর প্রতি বিমুখ হয়ে নাম ছেড়ে দেয় তাহলেও তার অনেক ক্ষতি হয়।

**উদাহরণ:-** যেমন ইনভার্টরকে চার্জে লাগালে চার্জ হয়। যদি মাঝখানে ইনভার্টরের চার্জার খুলে দেওয়া হয়, তাহলে ইনভার্টর যতটা চার্জ হয়েছে ততটা সময় চালু থাকবে বা লাভ দেবে। পাখা, লাইট ইত্যাদির সুবিধা পাবে। পরে হঠাৎ সকল সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে। সেইরূপ অবস্থা ঐ শিষ্যদের হয়। গুরু মর্যাদায় থেকে যতদিন ঐ আত্মা ভক্তি করেছে, সেই ভক্তি শক্তি তার আত্মায় জমা আছে, অর্থাৎ ভক্তি অনুসারে আত্মা চার্জ হয়েছে। যে দিন গুরু বিমুখ হবে সেই দিন থেকে তার ভক্তির শক্তি আসা বন্ধ হয়ে যাবে। গুরু বিমুখ (গুরু থেকে বিরোধ করে গুরু ত্যাগ করা) হয়ে গুরুর দ্বারা বলা মন্ত্র সাধনা করলেও কোন লাভ হয় না। যেমন বিজলীর কানেকশন কেটে দিলে পাখা, মোটর, বাল্ব ইত্যাদির বাটন টিপতে থাকলেও কোন লাভ হয় না। এইরূপ অবস্থা গুরু বিমুখ সাধকের। পুনরায় নরকের ভাগী হবে। কবীর সাহেব বলেছেন:-

**কবীর, মানুষ জন্ম পাকর খোবৈ, সতগুরু বিমুখা যুগ-যুগ রোবৈ।**
**কবীর, গুরু বিমুখ জীব কতহু ন বচৈ। অগ্নি কুণ্ড মে জর বর নাচৈ॥**
**কোটি জন্ম বিষধর কো পাবৈ। বিষ জ্বালা সহী জন্ম গমাবৈ।**
**বিষ্টা (পায়খানা) মাঁহী ক্রমি জন্ম ধরঈ। কোটি জন্ম নরক হী পরহী॥**

**ভাবার্থ:-** গুরুকে ত্যাগ করা জীব কিছুতেই বাঁচবে না। গুরুদ্রোহী জীব ঘোর নরকে পরে যুগ যুগ ধরে কষ্ট পায়। গুরু বিমুখ জীব নরকে অগ্নি কুণ্ডের আগুনে পুড়ে কষ্ট পায়। আগুনের ভিতরে নাচ অর্থাৎ লাফালাফি বা ছটফট করবে। পরে বিষাক্ত সাপ হয়ে কোটি জন্ম প্রাপ্ত করবে। বিষাক্ত সাপ নিজের বিষের তেজে খুব কষ্ট পায়। গরমের মৌসুমে বিষাক্ত সাপ বিষের জ্বালা থেকে বাঁচার জন্য শীতল স্থান বা চন্দন বৃক্ষে জড়িয়ে থাকে। পরে ঐ গুরু বিমুখ ব্যক্তি ক্রিমির জন্ম প্রাপ্ত করে। নকল গুরুকে ত্যাগ করে পূর্ণ গুরুর শরণে আসলে কোন পাপ হয় না।

**কবীর, গুরু দয়াল তো পুরুষ দয়াল। জেহি গুরু ব্রত ছুএ নহীঁ কাল॥**

**ভাবার্থ:-** হে ধর্ম দাস! যদি শিষ্যের প্রতি সতগুরু দয়াবান হন অর্থাৎ গুরুর মনে শিষ্যের ভালো ছবি থাকে বা ভাবনা হয়, তাহলে পরমাত্মাও ঐ শিষ্যের প্রতি প্রসন্ন হন। অন্যথায় উপরোক্ত কষ্ট ভোগ করতে হয়।

পৃষ্ঠা ১৬০-এর সারাংশ:-

এই পৃষ্ঠায় গুরু মহিমা এবং কোকিলের চানক্য নীতির আলোচনা করা হয়েছে।

## কালের দ্বারা প্রভাবিত জীব সত্‌গুরুর জ্ঞান মানে না

**'কোকিল ও কাক' এর উদাহরণ:-** কোকিল পাখী কখনো নিজে বাসা তৈরি করে ডিম দেয় না। কারণ কোকিলের ডিম কাক খেয়ে ফেলে, তাই কোকিল এই নীতি ব্যবহার করে যাতে তার ডিমের ও বাচ্চার কোন ক্ষতি না হয়। কোকিল ডিম দেওয়ার সময় কাকের বাসা খোঁজ করে এবং খেয়াল রাখে স্ত্রী কাক (Female Crow) কখন তার নিজের বাসায় ডিম পাড়ে। যে কাকের বাসায় ডিম থাকে, কোকিল সেই বাসায়

ডিম দেয়। যে সময় কাক পাখী আহার করার জন্য বাসা থেকে দূরে চলে যায় তখন সুযোগ বুঝে কোকিল পাখী কাকের ঐ ডিমের মধ্যে ডিম পাড়ে আর দূরে চলে যায় বা আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে থাকে।

কাক নিজের বাসায় এসে দেখে আগের থেকে বেশি ডিম রয়েছে। কিন্তু ডিম একই রকমের হওয়ার কারণে কাক চিনতে পারে না। তাই সব ডিমকে তাপ দিয়ে বাচ্চা উৎপন্ন করে। কোকিল নিজের বাচ্চাদের দিকে, লক্ষ্য রাখে, কিন্তু চিনতে পারে না। কারণ কাক আর কোকিলের বাচ্চার রং একই রকম কালো। যে সময় বাচ্চা উড়তে লাগে তখন কোকিল ঐ কাকের বাসার নিকট কোন গাছের ডালে বসে কুহু, কুহু শব্দে ডাকতে লাগে। কোকিলের ডাকে কোকিলের বাচ্চারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু কাকের বাচ্চাদের কোন পরিবর্তন হয় না। কোকিলের কুহু কুহু ডাক শুনে কোকিলের বাচ্চা কোকিলের কাছে চলে যায়। কোকিল কুহু কুহু রবে উড়তে থাকে। আর কোকিলের বাচ্চা ঐ শব্দের পিছনে উড়তে উড়তে অনেক দূরে চলে যায়। কাকও পিছনে পিছনে কিছু দূর যায়। কিন্তু অন্য বাচ্চাদের কথা চিন্তা করে কাক ফিরে আসে। যে অন্য পাখীরা বাসার বাচ্চাদের ক্ষতি না করে। কোকিলের বাচ্চা এই ভাবে তার কূল বা পরিবারের সাথে মিলে যায়।

পরমেশ্বর কবীরজী ধর্মদাসজীকে বলেন, যে, হে ধর্মদাস! তোর ছেলে নারায়ণ দাস কাক অর্থাৎ কালের পুত্র। তোর ঐ ছেলের উপর আমার বচনের কোন প্রভাব পড়বে না। তুমি দয়ালের (করুণাময় সত্পুরুষের) অংশ। তোমার উপর আমার প্রত্যেক বাণীর প্রভাব পড়েছে তাই তুমি থাকতে না পেরে আমার কাছে চলে এসেছো। নারায়ণ কালের অংশ, তাই আমার কথায় ও প্রভাবিত হবে না। প্রত্যেক পরিবারে এই একই অবস্থা। যে অঙ্কুরিত হংস আত্মা অর্থাৎ পূর্বে কোন জন্মে পরমেশ্বর কবীর পন্থে দীক্ষিত হয়েছিল কিন্তু মুক্তি পায় নি। সেই আত্মা যে পরিবারই জন্ম গ্রহণ করুক, সে সতগুরু কবীরজীর বাণী শুনলেই আকর্ষিত হবে। আর সদগুরুর থেকে দীক্ষা নিয়ে নিজের কল্যাণ করাবে। ঐ পরিবারের এমন লোকও আছে যারা কোন মতে এই সত্য ভক্তিকে মানে না। যারা অন্য উপদেশি ভক্তের বিরোধ ও উপহাস করে, তাঁরা কালের অংশ। তারা নারায়ণ দাসের মত কালের দূত দ্বারা দেওয়া শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা করে।

পৃষ্ঠা ১৬১ অনুরাগ সাগরের অংশ:-

কবীর পরমেশ্বর বলেছেন হে ধর্মদাস! বীর যোদ্ধা ও কোকিলের বাচ্চা যেমন চলার সময় পিছনে তাকিয়ে দেখে না, সেইরূপ কোন ভক্ত যদি সর্ব বাধাকে অতিক্রম করে পরিবারের, মোহ মায়া ত্যাগ করে (দৌড়ে) আসে, তাহলে আমি তার একশো এক পীড়ি পার করে দেব।

**কবীর, ভক্ত বীজ হোয় জো হংসা। তারূঁ তাস কে একোতর বংশা॥**
**কবীর, কোয়েল সুত জৈসে শূরা হোঈ। য়হী বিধি ধায় মিলৈ মোহে কোঈ॥**
**নিজ ঘর কী সুরতি করৈ জো হংসা। তারোঁ তাসকে একোতর বংশা॥**

## "হংস (ভক্ত)-এর লক্ষণ"

যে মানুষ কাকের মত খারাপ প্রবৃত্তি ত্যাগ করে, সে হংস অর্থাৎ ভক্ত হয়ে যায়। কাক নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের ক্ষতি করে। কোন পশুর শরীরে ঘা হলে কাক ঐ ঘায়ে ঠোঁট মেরে মেরে মাংস বের করে খায়, ব্যথার যন্ত্রণায় পশুর চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। কাকের ডাক কর্কশ (অপ্রিয়) হয়। হংস বা ভক্ত হতে হলে কাকের স্বভাব ত্যাগ করা দরকার। নিজের স্বার্থে অন্যকে কষ্ট দেবে না। কোকিলের মত মৃদু

ভাষা বলতে হবে। এটাই ভক্তের লক্ষণ।

## "জ্ঞানী অর্থাৎ সতসঙ্গীর লক্ষণ"

সদগুরুর জ্ঞান প্রাপ্ত করে অর্থাৎ দীক্ষা গ্রহণ করে যদি জগতের ন্যায় চলাফেরা করে তাহলে সে মূর্খ। সে ভক্তির লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। সে ভক্তি পথে আগে বাড়তে পারবে না এবং সে সার শব্দের প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না। যদি কোন অন্ধ ব্যক্তির পা নোংরা বা গোবরের উপর পড়ে তাহলে কেউ তার উপহাস করবে না। আর যদি ভালো দৃষ্টি যুক্ত ব্যক্তির পা নোংরায় পড়ে অর্থাৎ পরনারী গমন, চুরি করা, মর্যাদাহীন হয়, বর্হিভুত কাজ ইত্যাদি করে, তাহলে সে নিন্দার পাত্র হয়।

অনুরাগ সাগর পৃষ্ঠা ১৬২ ও ১৬৩ এর সারাংশ:-

## "ভক্ত পরমার্থী হওয়া দরকার"

যেমন গাভী স্বয়ং জঙ্গল থেকে ঘাস খেয়ে জল পান করে আসে এবং মানুষকে অমৃতের মত দুধ দেয়। দুধের থেকে ঘি তৈরি হয়। গাভীর (গরু) বাচ্চা বলদ গরু হাল চালিয়ে ফসল উৎপন্ন করতে সাহায্য করে প্রাণীদের পোষন করে। গাভীর পায়খানা (গোবর) মানুষের কাজে ব্যবহৃত হয়। মৃত্যুর পরে গাভীর চামড়া দিয়ে জুতা তৈরি হয়। জুতা মানুষের পা-কে কাঁটা, কাঁকড় থেকে সুরক্ষা দেয়। মানব জন্ম প্রাপ্ত প্রাণী পরমাত্মার সংস্পর্শে না এসে, ভক্তি না করে, ভক্তি থেকে বঞ্চিত থেকে পাপ করে এবং অমূল্য জীবন নষ্ট করে দেয়। মানুষ মাংসাহারী নর রাক্ষস, গাভীকেও মেরে খায়, আর মহাপাপের ভাগী হয়। পরমেশ্বর কবীরজী নিজের বাণীতে বলেছেন:-

## "পরমার্থী গাভীর দৃষ্টান্ত"

**গউকো জানু পরমার্থ খানী। গউ চাল গুণ পরখহু জ্ঞানী॥**
**আপন চরে তৃণ উদ্যানা। অঁচবে জল দে ক্ষীর নিদানা॥**
**তাসু ক্ষীর ঘৃত দেব অধাহীঁ। গৌ সুত নর কে পোষক আহীঁ॥**
**বিষ্ঠা তাসু কাজ নর আবে। নর অধ কর্মী জন্ম গমাবে।**
**টীকা পুরে তব গৌ তন নাসা। নর রাক্ষস গোতন লেত গ্রাসা॥**
**চাম তাসু তন অতি সুখদাঈ। এতিক গুণ ইক গোতণ ভাঈ॥**

### "পরমার্থী সন্তের লক্ষণ"

**গৌ সম সন্ত গহে য়হ বাণী। তো নহিঁ কাল করৈ জিবহানী॥**
**নরতন লহি অস বুদ্ধি হোঈ। সতগুরু মিলে অমর হ্ব সোঈ॥**
**সুনি ধর্মনি পরমার্থ বাণী। পরমারথতে হোয় ন হানী॥**
**পদ পরমার্থ সন্ত অধারা। গুরু সম লেঈ সো উতরে পারা॥**
**সত্য শব্দ কো পরিচয় পাবৈ। পরমার্থ পদ লোক সিধাবৈ॥**
**সেবা করে বিসারে আপা। আপা থাপ অধিক সন্তাপা॥**
**য়হ নর অস চাতুর বুদ্ধিমানা। গুন শুভ কর্ম কহে হম ঠানা।**
**উঁচা কর্ম অপনে সির লীন্হা। অবগুণ কর্ম পর সির দীন্হা॥**
**তাত হোয় শুভ কর্ম বিনাশা। ধর্মদাস পদ গহো বিশ্বাসা॥**
**আশা এক নামকী রাখে। নিজ শুভ কর্ম প্রকট নহীঁ ভাখে॥**
**গুরুপদ রহে সদা লৌ লীনা। জৈসে জলহি ন বিসরত মীনা॥**
**গুরু কে শব্দ সদা লৌ লাবে। সত্য নাম নিশদিন গুণগাবে॥**

**জৈসে জলহি ন বিসরে মীনা। ঐসৈ শব্দ গহে পরবীনা॥**
**পুরূষ নামকো অস পরভাউ। হংসা বহুরি ন জগমহঁ আউ॥**
**নিশ্চয় জায় পুরুষ কে পাসা। কূর্মকলা পরখহু ধর্মদাসা॥**

**ভাবার্থ:-** পরমেশ্বর কবীর সাহেব জী ধর্মদাসের মাধ্যমে মানব সমাজকে বার্তা দিয়েছেন। মানবকে গাভীর মতো উপকারী হওয়া দরকার। যে সেবা করে সে নিজের নামের আশা করে না এবং যে সদগুরুর শরণে এসেছে সে অমর হয়ে যাবে। ঘোর পাপের হাত থেকে বেঁচে যাবে। যদি মান-বড়াই, অহংকার করো তাহলে তার অধিক কষ্ট হবে। শুভ কর্ম নষ্ট হয়ে যাবে।

উপদেশী যেন কেবল এক নামের আশা করে। মন থেকে মান বড়াই-এর মহিমা ও অহংকার ত্যাগ করে দেয়। নিজের শুভ কর্ম (দান বা অন্য সেবা) অন্য কাউকে শোনায় না। গুরুজীর শ্রীচরণের শরণে এমন ভাবে থাকে যেমন মাছ জলে থাকে। মাছ এক মূহুর্তও জল ছাড়া থাকতে পারে না, শীঘ্র মারা যায়। সেইরূপ গুরু শরণের মহত্ব দেবে। গুরুজীর দেওয়া ভক্তি মন্ত্র সত্ নাম অর্থাৎ বাস্তবিক ভক্তি মন্ত্রে সদা লীন থাকতে হবে যে ইহা পরমাত্মার ভক্তি মন্ত্র। এই মন্ত্রে এতো শক্তি যে সাধক পুনরায় এই সংসারে জন্ম মৃত্যুর চক্রে ফিরে আসে না। কারণ সে সনাতন পরম ধামে চলে যায় যেখানে পরম শান্তি আছে। তাই সাধক সনাতন পরম ধামের থেকে আর এই লোকে ফিরে আসে না।

এই প্রমাণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২-তে আছে। গীতা জ্ঞানদাতা বলেছে হে অর্জুন! তুই সর্বভাবে ঐ পরমেশ্বরের শরণে যা, ঐ পরমেশ্বরের কৃপায় তুই পরম শান্তি তথা সনাতন পরম ধাম (শাশ্বত স্থান) প্রাপ্ত করবি। (অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২)

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪-এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছে যে, তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির পর পরমেশ্বরের ঐ পরম পদের খোঁজ করা দরকার যেখানে যাওয়ার পরে সাধক এই সংসারে কোনদিন ফিরে আসে না। যে পরমেশ্বর এই সংসার রূপী বৃক্ষের রচনা করেছেন তার ভক্তি করো। (অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪)।

গীতা জ্ঞানদাতা নিজের নাশবান স্থিতি অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর স্থিতি গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২ অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫ ও ৯ এ তথা অধ্যায় ১০ শ্লোক ২-এ স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ওখানে বলেছেন, হে অর্জুন! তোর আর আমার বহু জন্ম ও মৃত্যু হয়েছে। তুই জানিস না, আমি জানি। পাঠকগণ! গীতায় পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে গীতার জ্ঞান (কাল ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে বলেছিল) দাতা নাশবান। অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর চক্রে আছে, তাহলে তার উপাসকদের এরূপ স্থিতি হতে পারে? গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তথা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪-এ বর্ণিত লাভ প্রাপ্ত হবে না। দ্বিতীয়ত এটা প্রমাণিত হয় যে, গীতা জ্ঞানদাতা থেকে অন্য কোন সমর্থ তথা সর্ব লাভ দায়ক পরমেশ্বরের শরণে যাওয়ার কথা গীতা জ্ঞানদাতা অর্থাৎ কাল ব্রহ্ম স্বয়ং বলেছেন। ঐ পরমেশ্বরই কবীর বন্দীছোড়। তিনি নিজের মহিমা নিজেই বলেছেন। আপনারা কবীর সাগরে পড়ে দেখুন। পরমেশ্বর অনুরাগ সাগরের পৃষ্ঠা ১৩ তে বলেছেন, সত্পুরুষ দ্বারা সৃষ্টির বিষয়ে বলা কথার সাক্ষী তিনি স্বয়ং নিজেই। কারণ সকলের উৎপত্তি অনেক পরে হয়েছে। প্রথমে সত পুরুষ একলা ছিল। এখানে চিন্তার বিষয় এই জ্ঞান কবীর জীর কি করে হয়েছে? সৃষ্টি রচনার সময় আমরা ছিলাম না। এতে প্রমাণিত হয় স্বয়ং পূর্ণ পরমাত্মাই সকল সৃষ্টির সৃজন হার। যে সব মহান আত্মারা কবীর জীর দর্শন লাভ করেছে তাঁরাও ঐ একই সাক্ষী দিচ্ছেন:-

**গরীব, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড কা, এক রতি নহীঁ ভার।**
**সদগুরু পুরুষ কবীর হৈঁ, কুল কে সিরজনহার॥**

ভাবার্থ এই বাণী থেকেই স্পষ্ট।

"কুর্ম কলা পরখো ধর্ম দাসা" এর ভাবার্থ এই যে, যেমন কচ্ছপ বিপদের সময় নিজের মুখ ও পা শরীরের ভিতর লুকিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আর বিপদ কেটে গেলে সক্রিয় হয়ে নিজের মার্গে চলা শুরু করে। এইরূপ যদি কেউ ভক্তির মার্গে বাধা উৎপন্ন করে তাহলে উল্টো জবাব না দিয়ে নিজের ভক্তি ভাবকে লুকিয়ে সুরক্ষিত রাখো। আর স্থিতি সামান্য হলে পূর্বের গতিতে সাধনা করো। এই ভাবে করলে, "**নিশ্চয় জায় পুরুষ কে পাসা**" সেই সাধক নিশ্চয়ই পরমাত্মার কাছে চলে যায়। অনুরাগ সাগর পৃষ্ঠা ১৬৩ (২৮১) :-

**সোরঠা :- হংস তহাঁ সুখ বিলসহীঁ, আনন্দ ধাম অমোল।**
**পুরুষ তনু ছবি নিরখহিঁ, হংস করেঁ কিলোল॥**

**ভাবার্থ:-** উপরোক্ত জ্ঞানের আধারে সাধনা করে সাধক অমর ধামে চলে যায়। ওখানে আনন্দ ভোগ করতে থাকে ঐ সতলোক খুবই মূল্যবান। ওখানে সত্‌পুরুষের শরীরের শোভা দেখে, আর আনন্দ করতে থাকে।

## "দীক্ষা নিয়ে নাম স্মরণ (সুমিরন) করা অনিবার্য"

অধ্যায় "বীর সিংহ বোধ" পৃষ্ঠা ১২৩ এ :-

রাজা বীর সিংহের ছোট রানীর নাম সুন্দরদেঈ ছিল। তিনি পরমেশ্বর কবীরজীর থেকে দীক্ষা বা নাম উপদেশ নিয়েছিলেন। রানী খুব সতসঙ্গ শুনতেন। কিন্তু বিশ্বাস কম ছিল। নাম জপও করতেন না। রানীর শেষ সময়ে যমদূতরা রাজ ভবনে প্রবেশ করে, রানীর শরীরে প্রবেশ করে। আর রানীর শেষ শ্বাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগে। ঐ সময় রানী সুন্দরদেঈ-র শরীরে জ্বলন হতে লাগে। রানী যম দূতদের দেখতে পায়। রাজা রানীকে জিজ্ঞাসা করে কি হয়েছে? রানী বলেন আমার কিছুই ভালো লাগছে না, রাজপাট, মহল, আভূষণ সবই বৃথা মনে হচ্ছে, সাধু ভক্তদের ডেকে পরমাত্মার চর্চা করাও। সাধু তথা ভক্তরা এসে পরমাত্মার চর্চা শুরু করে। কিন্তু কোন লাভ হয় না। রানীর শরীরে কষ্ট বেড়ে যায়। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, আধা-আধা শ্বাস খুব কষ্টে নিতে লাগে, আত্মা (জীব) ভয়ে হৃদয় কমল ছেড়ে ত্রিকূটির দিকে যায়। যমদূতরা চারিদিক দিয়ে ঘিরে ধরে বলে, এখন চলো! হরি (প্রভু) তোমাকে ডেকেছে। তখন রানীর আত্মার সতসঙ্গের কথা মনে পড়ে। রাণী যমদূতদের বলে, (চিটিংবাজ)! হে শয়তান! তুমি কি করে এখানে এসেছো? আমার সদগুরু আমার মালিক। তোমরা আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না। আমার সদগুরু আমার মালিক আমাকে নাম দীক্ষা দিয়েছে। আমার গুরুজী আসলে আমি যাব। এই কথা শুনে যমদূতরা বলে তোমার কোন প্রভু (ধনী-স্বামী) যদি থাকে, তাহলে তাকে ডাক। নতুবা আমাদের সঙ্গে পরমাত্মার দরবারে চলো। তখন রানীর জীব (আত্মা) বলে:-

**ধরনী (পৃথ্বী) আকাশ সে নগর নিয়ারা। তহাঁ নিবজৈ ধনী হমারা॥**
**অগম শব্দ জব ভাখৈ নাউঁ। তব যম জীব কে নিকট নহীঁ আউঁ॥**

**ভাবার্থ :-** সতগুরু যে জ্ঞান সত্‌সঙ্গে শোনাতন তা রানীর বিশ্বাস হত না। রানী চিন্তা করত শুধু গল্প। কারণ রানীর সব সুবিধা উপলব্ধ ছিল। আদেশ দেওয়া সাথে

সাথে দাস-দাসী দৌড়ে আসতো। ইচ্ছামত খাবার খেত, সুন্দর সুন্দর বস্ত্র অলংকার ব্যবহার করত। রানী চিন্তা করত সর্বদা এই রকমই আনন্দ থাকবে। আসলে পূর্ব জন্মের ব্যাটারী চার্জ ছিল। বর্তমানে চার্জার ছিল (নাম দীক্ষা) কিন্তু চালু করেনি অর্থাৎ সাধনা করেনি। ব্যাটারীর চার্জ সমাপ্ত হয়ে গেলে ব্যাটারী ডাউন হয়ে যায় এবং সর্ব সুবিধা বন্ধ হয়ে যায়। যতই সুইচ অন করো, কোনো ফল হয় না। সেইরূপ জীবের পূর্ব জন্মের ভক্তি ধন সমাপ্ত হলে সকল সুবিধা কেড়ে নেওয়া হয়। আর জীব আত্মাকে নরকে পাঠানো হয়। তখন তার জ্ঞান হয়। ঐ সময় কিছুই করার থাকে না। আফশোস আর কান্না করা ছাড়া কিছুই করা যায় না। রানী সুন্দরদেঈ সত্সঙ্গ শুনেছিলেন। পূর্ণ সতগুরু থেকে নামদীক্ষাও নিয়েছিলেন। কিন্তু সাধনা করেননি। নামের কামাই ছিল না। রাণী গুরুদ্রোহী ছিল না ও গুরুনিন্দা করতো না। সতগুরুকে স্মরণ করে বলে, হে গুরুদেব! হে আমার মালিক! যমদূতরা আমাকে ঘিরে ধরেছে। এই অধম দাসীকে বাঁচাও প্রভু। আমি তোমার থেকে নামদীক্ষা নিয়েছি। আজ আমি বুঝতে পেরেছি আজ সংঙ্কটের সময় পতি-পত্নী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, আত্মীয় রাজা প্রজা কেউই সাহায্য করে না। রানীর হৃদয় থেকে সদগুরুকে স্মরণ করে। সদগুরু কবীর সাহেব শীঘ্র প্রকট হন। রানী দৌড়ে সতগুরু দেবের চরণে পড়ে যায়। যমদূতরা রানীকে ছেড়ে পালায়। ধর্মরাজের কাছে গিয়ে বলে রানীর সদগুরু আসার পরে ওখানে তেজ প্রকাশ হয়ে যায়। ঐ জীব সত্ সুকৃত নাম জপ করছিল। যম দূতদের যতটুকু মনে ছিল তাই বলে। এই জন্য আমরা রানীকে আনতে পারিনি। সদগুরু কবীরজী রানীকে যম দূতদের হাত থেকে রক্ষা করে আয়ু বাড়িয়ে দেন। সত গুরুদেব পুঃনরায় সতনাম ও সার নাম প্রদান করেন। তখন রানী তন মন দিয়ে ভক্তি শুরু করে। রানীর কাছে সংসার অসাড় হয়ে যায়। রাজা, রাজ্য, ধন, পরিবার সব পর মনে হতে লাগে। কারণ মৃত্যুকে নিকটে দেখতে পাচ্ছিল। তাই রানী তন মন ধন সদগুরুর চরণে সমর্পিত হয়ে ভক্তি করে, সতলোকে চলে যায়। ওখানে পরমেশ্বর (সতপুরুষ) রানীর আত্মার সামনে অন্য রূপধারী সতগুরুকে প্রশ্ন করে, হে (তারনহার)! আমার আত্মাকে যম দূতরা কেন ধরেছিল? সতগুরু রূপী কবীরজী বলেন, হে পরমেশ্বর! এই জীব দীক্ষা নিয়ে ভক্তি করে নি। তাই যম দূতরা ধরেছিল। আমি গিয়ে মুক্ত করি। পরমেশ্বর বলেন তুমি ভক্তি কেন করো নি? কিভাবে সতলোকে এসেছো?

মাথা নীচু করে রানীর জীব বলে, প্রথমে আমি বিশ্বাস করতাম না। পরে যম দূতদের যাতনা (অত্যাচার) দেখে আপনার কথা মনে পড়ে। আপনার জ্ঞান সত্য ছিল। তাই আপনাকে ডাকি, আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন। আমাকে পুনরায় জীবন দান দিয়েছেন। তারপর আমি পূর্ণ মর্যাদা সহকারে মন প্রাণ দিয়ে ভক্তি করি। আপনার কৃপায় আর গুরুদেবের সহযোগে আপনার শ্রীচরণে এসেছি। সতলোকে যাওয়া ভক্তকে অন্য ভক্তের কাছে পাঠানো হয়। ওখানে সুন্দর তেজময় অমর শরীর প্রাপ্ত হয়। সত লোকে থাকার জন্য মহল, উঠানে বিমান দাঁড় করানো থাকে। সিদ্ধি সমূহ আদেশের অপেক্ষায় থাকে। আদেশ মিলতেই সক্রিয় হয়ে যায়। যেমন বিজলীর সুইচ টিপতেই বিজলী চালিত যন্ত্র কাজ করতে লাগে। সেইরূপ ওখানে বচনের বাটন। যে জিনিসের দরকার শুধু বলো, সাথে সাথে হাজির হয়ে যাবে। যেমন খাওয়ার ইচ্ছা হলে রান্না ঘরে থালা, গ্লাস, খাবার, জিনিস সব সিদ্ধি শক্তিতে চলে আসবে ঘোরার ইচ্ছা হলে বিমানের নিকট গেলে দরজা খুলে যাবে। বিমানে বসে আর যে দ্বীপে যাওয়ার ইচ্ছা হবে বিমান সেইদিকে চলতে লাগবে। ফল খাওয়ার ইচ্ছা হলে তাজা ফল তোমার সম্মুখে রাখা পাবে।

সত্যলোকে এখানের মতই স্ত্রী পুরুষের পরিবারে আছে। কাল রাজা এখানে সতলোকের ডুপ্লিকেট বানিয়ে রেখেছে। সতলোকে দুই প্রকারে সন্তান উৎপত্তি হয়। তা হংস আত্মার উপর নির্ভর করে। শব্দ শক্তিতে সন্তান উৎপত্তির স্থান সত্ পুরুষের আসে পাশের ক্ষেত্রে হয়। নর-নারীর পরিবার এই ক্ষেত্রের পরে হয়। বচন শক্তি দিয়ে সন্তান উৎপন্ন শুধু নর করে। সতলোকে বৃদ্ধা অবস্থা হয় না। নর নারীর ক্ষেত্রে মেয়ে ও ছেলে দুরকম উৎপন্ন হয়। যে বাচ্চা উৎপন্ন হয় সেও কাল লোক থেকে মুক্ত হওয়া জীব। বিবাহ বচনের মাধ্যমে হয়। কাল লোকে যাওয়া জীবই বাচ্চারূপে জন্ম নেয়। কিন্তু ওখানে কেউ মরে না আর বৃদ্ধ অবস্থাও আসে না। কাললোক থেকে যে সতলোকে যায় তাকে সর্ব প্রথম সত্পুরুষের দর্শন করানো হয়। এখানের শরীরের স্বরূপ সতলোকে তখনো অপরিবর্তীত থাকে। কিন্তু তার তেজ প্রকাশ ১৬ সূর্যের মত হয়। সত পুরুষের ওখানে জীব যুব অবস্থায় ফিরে আসে এবং তার শরীরের প্রকাশ ১৬ সূর্যের মত হয়। যারা এখান থেকে যুবক অবস্থায় যায়, তারা যুবকই থাকে আর বৃদ্ধা হলে বৃদ্ধ, বালক হলে বালক অবস্থায় থাকে। পরে ওখান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে কিছু আত্মাকে সত পুরুষের বচন শক্তিতে স্ত্রী, বা নর শরীর দেওয়া হয়। কিছু বীজ রূপে সত পুরুষ দ্বারা বচন শক্তির সৃষ্টি নারীর গর্ভে জন্ম নেয়। কাল লোক থেকে যাওয়া আত্মাই ওখানে জন্ম নেয়। ৯০ শতাংশ স্ত্রী নর মিলনে উৎপত্তি হয় আর বচন শক্তিতে ১০-শতাংশ হয়।

সতলোকে স্ত্রী ও নর এর শরীরের প্রকাশ ১৬ সূর্যের প্রকাশের মত হয়। জীব সর্ব প্রথম মিনি সতলোকে অর্থাৎ মানস সরোবরে যায়। ওখানে দুজনের শরীরের প্রকাশ চার সূর্যের প্রকাশের মত। যখন জীব পরম ব্রহ্মের লোকে অষ্ট কমলে পৌঁছায় তখন হংস তথা হংসিনীর জীব আত্মা ১২ সূর্যের প্রকাশের সমান হয়। পরে সতলোকের ভবঁর গুফায় প্রবেশ করলে ১৬ সূর্যের প্রকাশের সমান তেজোময় শরীর প্রাপ্ত হয়। প্রমাণ কবীর সাগর অধ্যায় মোহম্মদ বোধ পৃষ্ঠা ২০, ২১ ও ২২ এ দশ মুকামী রেখতা:-

## "দশ মুকামী রেখতা"

পৃষ্ঠা ২১ থেকে কিছু অংশ লিখছি :-

**ভয়া আনন্দ ফন্দ সব ছোড়িয়া পঁহুচা জহাঁ সত্যলোক মেরা॥**

{হংসনী (নারী রূপ পুণ্যাত্মা) হংস (নর রূপ পুণ্যাত্মা)}

**হংসনী হংস সব গায় বজায় কে সাজি কে কলশ মোহে লেন আএ॥**
**যুগন যুগন কে বিছুড়ে মিলে তুম আয় কৈ প্রেম করি অঙ্গ সে অঙ্গ লাএ॥**
**পুরুষ দর্শ জব দীন্হা হংস কো তপত বহু জন্ম কী তব নশায়ে॥**
**পলিটকর রূপ জব এক সা কীন্হা মানো তব ভানু ষোড়শ (১৬) উগায়ে॥**
**পহুপ কে দীপ পযূষ (অমৃত) ভোজন করেঁ শব্দ কী দেহ সব হংস পাঈ॥**
**পুষ্প কা সেহরা হংস ঔর হংসনী সচ্চিদানন্দ সির ছত্র ছাএ॥**
**দ্বীপৈ বহু দামিনী দমক বহু ভান্তি কী জহাঁ ঘন শব্দ কো ঘমোড় লাঈ॥**
**লগে জহাঁ বরসনে ঘন ঘোর কৈ উঠত তহাঁ শব্দ ধুনি অতি সোহাঈ॥**
**সুন্ন সোহৈঁ হংস-হংসনী যুথ (জোড়ে-ঝুন্ড) হৈ একহী নূর এক রংগ রাগৈ॥**
**করত বিহার (সৈর) মন ভাবনী মুক্তি মে কর্ম ঔর ভ্রম সব দূর ভাগে॥**
**রংক ঔর ভূপ (রাজা) কোঈ পরখ আবৈ নহী করত কোলাহল বহুত পাগে॥**
**কাম ঔর ক্রোধ মদলোভ অভিমান সব ছাড়ি পাখণ্ড সত শব্দ লাগে॥**
**পুরুষ কে বদন (শরীর) কৌন মহিমা কহূঁ জগত মেঁ উপমা কছু নাহীঁ পায়ী॥**

**চন্দ ঔর সুর (সূর্য) গণ জ্যোতি লাগৈ নহীঁ এক হী নখ প্রকাশ ভাঈ॥**
**পরবানা জিন নাদ বংশ কা পাইয়া পহুচিয়া পুরুষ কে লোক জায়ী॥**
**কহ কবীর য়হী ভাঁতি সো পাইহো সত্য পুরুষ কী রাহ সো প্রকট গায়ী॥**

**ভাবার্থ:-** এই অমৃত বাণীতে স্পষ্ট করেছে পরমেশ্বর কবীর জী সত্পুরুষ রূপে এই পৃথিবী থেকে ধর্ম দাসজীকে সতলোকে নিয়ে যাওয়ার সময় ৯ স্থান অতিক্রম করেছিলেন। যেমন নাসুত, মলকুত, এ ফরাশী শব্দ। এই ৭ আকাশের উপর বিষ্ণুলোক ইত্যাদি লোক পার করে সত্যলোক পৌঁছায়। ধর্ম দাসজী বলছেন। আমি সতলোকে পৌঁছানোর পর আনন্দের সাথে সতলোকের হংস (নর) হংসিনী (নারী) নাচ-গান করতে করতে আসে, নারীরা মাথায় কলশ নিয়ে বাজনা বাজিয়ে আনন্দের সহিত আমাকে নিতে আসে তাদের সকলের শরীর ১৬ সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত ছিল। তখন আমার শরীরের প্রকাশও ১৬ সূর্যের মত হয়।

যে হংস আত্মা পৃথিবীলোক থেকে মোক্ষ প্রাপ্ত করে যায়। তাকে পুহপ দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে সর্ব সুখ আছে। পুহপ দ্বীপ সতলোকের এক স্থানের নাম। কাল লোক থেকে যাওয়া জীবকে সর্বপ্রথম পোহপ দ্বীপে রাখা হয়। ওখানের দৃশ্য বলা হয়েছে। জীব ঐ স্থানে অন্য পরিবারে জন্ম নেয় পরে নিজের পরিবার হয়। ওখানে নর নারীর জোড়া সুখ শান্তিতে বসবাস করে। মেঘ গর্জালে ফোয়ারা পড়ে। সতলোক বাসী বিভিন্ন স্থানে পিকনিক অর্থাৎ আনন্দ করতে যায়। কিছু স্থান এমনও আছে সেখানে মেঘও হয় আর বর্ষাও হয়।

❖ দীক্ষার পশ্চাৎ সাধকের কি করা উচিত? তাঁর বিষয়ে কবীর সাগর অধ্যায় "ধর্ম বোধ" এ আছে।

কৃপা করে "ধর্ম বোধের" সারাংশ পড়ুন:-

কবীর সাগরের ৩৩ অধ্যায় "ধর্ম বোধ" পৃষ্ঠায় ১৭৭ (১৫২১) আছে। এই অধ্যায়ে পরমেশ্বর কবীরজী ধর্ম করার বিশেষ জ্ঞান দিয়েছে। দিনে তিন বার সন্ধ্যা আরতির বিষয় স্পষ্ট করে বলেছে। সন্ধ্যার অর্থ দুই সময়ের মিলন। যেমন সকাল দিন আর রাত্রির মিলন। রাত্রির বিদায়ের আর দিনের শুভারম্ভ। দ্বিতীয় সন্ধ্যা, দিনের ১২ টার সময় হয় ঐ সময় দিনের মধ্য ভাগ। ঐ সময় সূর্য অর্থাৎ দিন ওঠা শেষ সূর্য অস্ত যাওয়ার দিকে, অর্থাৎ রাত্রের দিকে অগ্রসর হয়। তৃতীয় সন্ধ্যা সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় দিন আর রাত্রির মিলন। সাধারণ মানুষ ঐ সময়কে সন্ধ্যা বলে। সন্ধ্যার অর্থ পরমাত্মার স্তুতি করা। বেদে প্রমাণ আছে যে জগতের তারনহার হবে, সে তিনবার সন্ধ্যা করবে এবং করাবে। সকালে সন্ধ্যায় পূর্ণ পরমাত্মার স্তুতি আরতি আর দুপুরে সর্বদেবী দেবতার স্তুতি। প্রমাণের জন্য দেখুন:- ঋদ্বেদ মণ্ডল নং ৮ সুক্ত ১ মন্ত্র ২৯ ও যজুর্বেদ অধ্যায় ১৯ মন্ত্র ২৬ এ। কবীর সাগর এ ধর্ম বোধের অধ্যায়ের এ পৃষ্ঠা ১৭৭-এ ও প্রমাণ আছে।

**সাঁঝ সকার মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা তিনোঁ কাল।**
**ধর্ম কর্ম তৎপর সদা কিঁজে সুরতি সম্ভাল॥**

**ভাবার্থ:-** ভক্তগণের উচিত তিন সময় সন্ধ্যা (আরতী) করা। আরতী করার সময় সুরতি অর্থাৎ আরতীতে বলা শব্দের প্রতি ধ্যান রাখে আর ধর্ম কাজে অলস না করে।

ধর্মবোধ পৃষ্ঠা ১৭৮ (১৫২২) এ :-

**কবীর, কৌটিন কঁটক ঘেরি জ্যোঁ নিত্য ক্রিয়া নিজ কীন্হ।**
**সুমিরণ ভজন একান্ত মেঁ মন চঞ্চল গহ লীন॥**

**ভাবার্থ:-** ভক্তের উপর যতই কষ্ট আসুক না কেন নিত্য ক্রিয়া (তিন সময়ের

আরতী) অবশ্যই করা উচিত। চঞ্চল মনকে শান্ত রেখে একান্তে বসে পরমাত্মার দীক্ষা দেওয়া নাম জপ করতে হয়।

**কবীর, ভক্ত অরূ গুরু কি সেবা কর শ্রদ্ধা প্রেম সহিত।**
**পরম প্রভু (সত্য পুরুষ) ধ্যাবহী করি অতিশয় মন প্রীত॥**

**ভাবার্থ:-** নিজের গুরুদেব তথা সতসঙ্গে বা বাড়িতে আসা ভক্তকে আদরের সাথে সেবা করো। শ্রদ্ধা ও প্রেমের সহিত সেবা করো। পরম পুরুষ অর্থাৎ পরম অক্ষর পুরুষের ভক্তি অত্যাধিক প্রেমের সাথে করো।

## "ভক্ত যতী ও সতী হওয়া উচিত"

"যতি পুরুষের লক্ষন"

**পুরূষ যতী সো জানিয়ে, নিজ ত্রিয়া এক বিচার।**
**মাতা বহন পুত্রী সকল, ঔর জগ কী নার॥**

**ভাবার্থ:-** যতি পুরুষ তাকে বলে যে নিজের স্ত্রী ছাড়া অতিরিক্ত অন্য স্ত্রীর প্রতি পতি পত্নী ভাব রাখে না। পর স্ত্রীকে বয়স অনুসারে মা, বোন, মেয়ের মত দেখে।

"সতী স্ত্রীর লক্ষণ"

**স্ত্রী সো জো পতিব্রতা ধর্ম ধরৈ, নিজ পতি সেবত জোয়॥**
**অন্য পুরুষ সব জগত মেঁ পিতা ভ্রাত সুত হোয়॥**
**আপনে পতি কি আজ্ঞা মেঁ রহৈ, নিজ তন মন সে লাগ॥**
**পিয়া বিপরীত ন কছু করে, তা ত্রিয়া কো বড় ভাগ॥**

**ভাবার্থ:-** সতী স্ত্রী নিজের পতির সহিত পতি পত্নীর সম্পর্ক রাখে। নিজের পতি ছাড়া সংসারের অন্য পুরুষদের বয়স অনুসারে পিতা, ভাই ও ছেলের মত দেখে। নিজের পতির আজ্ঞা পালন করে চলে। তন মন দিয়ে সেবা করে। পতির মনে কষ্ট দিয়ে কোন কাজ করে না।

**"দান করা কতটা প্রয়োজন"**

**কবীর, মনোকামনা বিহায় কে হর্ষ সহিত করে দান।**
**তাকা তন মন নির্মল হোয়, হোয় পাপ কি হান॥**
**কবীর, যজ্ঞ দান বিন গুরু কে, নিশ দিন মালা ফের।**
**নিষ্ফল বহ করনী সকল, সতগুরু ভাখৈ টের॥**
**প্রথম গুরু সে পূছিয়ে, কীজৈ কাজ বহোর।**
**সো সুখদায়ক হোত হৈ, মিটৈ জীব কা খোর॥**

**ভাবার্থ:-** কবীর পরমেশ্বর বলেছে, মনোস্কামনা ছাড়া যে দান দেয় ঐ দানে দুই ধরনের ফল দেয়। বর্তমান জীবনে কার্য সিদ্ধ হবে আর ভবিষ্যতের জন্য পুণ্য জমা হবে। মনস্কামনার জন্য যে দান করা হয় তাহা ঐ কার্য সিদ্ধির পরে সমাপ্ত হয়ে যায়। মনস্কামনা ছাড়া দান আত্মাকে নির্মল করে। পাপকে নাশ করে।

❖ প্রথমে গুরু ধারন করো, পরে গুরুদেবের নির্দেশ অনুসার দান করো। গুরু ছাড়া যতই দান করো আর নামের মালা জপ করো সব নিষ্ফল যাবে। সতগুরু সবাইকে ডেকে ডেকে এই কথা বলেন।

❖ প্রথমে গুরুর আজ্ঞা নেওয়ার পরে নিজের নতুন কর্ম শুরু করো। ঐ কার্য সুখদায়ক হবে এবং মনের সমস্ত ভ্রমকে মিটিয়ে দেবে।

**কবীর, অভ্যাগত আগম নিরখি, আদর মান সমেত।**

**ভোজন ছাজন, বিত যথা, সদা কাল জো দেত॥**

**ভাবার্থ:-** তোমার বাড়ি কোন অতিথি আসলে প্রেমের সহিত নিজের স্থিতি অনুসারে ভোজন ভাণ্ডারা করাও।

**সৌহ ম্লেচ্ছ সম জানিয়ে, গৃহী জো দান বিহীন।**
**য়হী কারণ নিত দান করে, জো নর চতুর প্রবিন॥**

**ভাবার্থ:-** হে বুদ্ধিমান মানুষ! নিত্য দান করো। যে গৃহস্থী দান করে না, সে দুষ্ট ব্যক্তির সমান।

**পাত্র কুপাত্র বিচার কে তব দীজৈ তাহি দান।**
**দেতা লেতা সুখ লহ অন্ত হোয় নহীঁ হান॥**

**ভাবার্থ:-** কুপাত্রকে দান দেওয়া উচিত না। আনন্দের সহিত সুপাত্রকে দান দেওয়া উচিত। সদগুরুদেব সুপাত্রের কথা বলেছেন। যদি কেউ অনাহারে ক্ষুধায় কষ্ট পায় তাকে ভোজন করাও। অসুখের চিকিৎসার জন্য টাকা না দিয়ে ওষুধ কিনে দাও। বন্যা কবলিত দুর্দশা গ্রস্ত ব্যক্তিকে নিজের হাতে দান করো। এই দানে হানি হয় না। সুপাত্রকে দান করলে ব্যর্থ যায় না।

**"ধর্ম বোধ পৃষ্ঠা ১৭৯ - এর সারাংশ"**

**কবীর , ফল কারণ সেবা করৈ, নিশদিন যাচৈ রাম।**
**কহ কবীর সেবা নহীঁ, জো চাহৈ চৌগুনে দাম॥**

**ভাবার্থ:-** যদি কেউ কোন কার্য সিদ্ধির জন্য সেবা করে এবং দিন রাত পরমাত্মার কাছে তা চাইতে থাকে তার জন্য পরমেশ্বর বলেছেন, যে সেবার বদলে ৪ গুন দামের ইচ্ছা করে তাকে সেবা বলা যায় না।

**কবীর, সজ্জন সগে কুটম্ব হিতু, জো কোঈ দ্বারৈ আব।**
**কবহু নিরাদর ন কীজিয়ে, রাখৈ সব কা ভাব॥**

**ভাবার্থ:-** ভদ্র পুরুষের বাড়িতে নিজের আত্মীয় স্বজন, বা হিতৈষী আসলে তাকে অনাদর করবে না। তার সহিত ভালো ব্যবহার করো।

**কবীর, কোড়ী-কোড়ী জোড়ী কর কীনে লাখ করোর।**
**পৈসা এক না সঙ্গ চলৈ, কেতে দাম বটোর॥**

**ভাবার্থ:-** অনেকে দান ধর্মে পয়সা না দিয়ে করে কোটি কোটি টাকা জমা করে রাখে। কিন্তু সংসার ছেড়ে যাওয়ার সময় এক টাকাও সাথে যায় না।

**জো ধন হরিকে হেত, ধর্ম রাহ নহীঁ লগাত।**
**সো ধন চোর লবার গহ, ধর ছাতী পর লাত॥**

**ভাবার্থ:-** যে ধন পরমাত্মার নিমিত খরচ হয় না অর্থাৎ কখনো ধর্ম, কর্মে লাগায় না। ঐ ধন চোর, ডাকাতরা বুকে লাথি মেরে লুটে নিয়ে যায়।

**সত্ কা সৌদা জো করৈ দম্ভ ছল ছিদ্র ত্যাগৈ।**
**অপনে ভাগ কা ধন লহৈ, পরধন বিষ সম লাগৈ॥**

**ভাবার্থ:-** মনুষ্য জীবনে পরমাত্মাকে ভয় করে সত্যের আধারে সর্ব কর্ম করা উচিত। যে ধন ভাগ্যে লেখা আছে, তাতে সন্তোষ করা ভালো। পরের ধন বিষের সমান জানো।

**ভূখা জহি ঘরতে ফিরৈ, তাকো লাগৈ পাপ।**

**ভূখো ভোজন জো দেত হৈ, কটেঁ কোটি সন্তাপ॥**

**ভাবার্থ:-** যে বাড়ি থেকে কেউ ক্ষুধার্ত ফিরে যায় তার পাপ সেই বাড়ির ওপর লাগে। আর যে ক্ষুধার্তকে ভোজন অর্থাৎ খাবার দেয় তার কোটি সংকট দূর হয়ে যায়।

**প্রথম সন্ত কো জীমাইয়ে। পিছে ভোজন ভোগ।**
**এস্যে পাপ কো টালিয়ে, কটে নিত্য কা রোগ॥**

**ভাবার্থ:-** যদি বাড়িতে কোন সন্ত (ভক্ত) আসে তাহলে প্রথমে তাকে খাওয়ানো উচিত। পরে নিজে খাবে। তাহলে নিজের মাথার উপরের দৈনন্দিন সংকট দূর হয়ে যাবে।

ধর্ম বোধ পৃষ্ঠা ১৮০ এর সারাংশ:-

**কবীর, যদ্যপি উত্তম কর্ম করি, রহৈ রহিত**
**অভিমান। সাধু দেখি সির নাবতে, করতে আদর মান॥**

**ভাবার্থ:-** অভিমান ত্যাগ করে, শ্রেষ্ঠ কর্ম করা উচিত। সন্ত, ভক্তকে দেখে মাথা নীচু করে প্রণাম বা সম্মান করা উচিত।

**কবীর, বার-বার নিজ শ্রবণতেঁ, শুনে জো ধর্ম পুরান।**
**কোমল চিত উদার নিত, হিংসা রহিত বখান॥**

**ভাবার্থ:-** ভক্তদের নিজের চিত্ত কে কোমল রেখে ধর্ম-কর্মের বিষয়ে বারবার সত্ সঙ্গের জ্ঞান শোনা উচিত। অহিংসা পরম ধর্ম। তাই অহিংসার বিষয়ে প্রবচন শোনা উচিত।

**কবীর, ন্যায় ধর্মযুক্ত কর্ম সব করৈঁ, ন করনা কবহূ অন্যায়।**
**জো অন্যায়ী পুরুষ হৈঁ, বন্ধে যমপুর জায়েঁ॥**

**ভাবার্থ:-** সর্বদা ন্যায় যুক্ত কর্ম করা উচিত। কখনো অন্যায় করা উচিত না। যে অন্যায় করে, সে যম রাজের লোকে নরকে যায়।

ধর্মবোধ পৃষ্ঠা ১৮১ এর সারাংশ:-

**কবীর, গৃহ কারণ মেঁ পাপ বহু, নিত লাগৈ সুন লোয়।**
**তাহিতে দান অবস্য হৈ, দূর তাহিতে হোয়॥**
**কবীর, চক্কী চৌঁকে চুল্হ মে, ঝাড়ু অরূ জলপান।**
**গৃহ আশ্রমী কো নিত্য য়হ, পাপ পাঁচে বিধি জান॥**

**ভাবার্থ:-** গৃহস্থী চাক্কীতে গম, ডাল, চাউল ইত্যাদি পেসাই করে, উনুনে আগুন দিয়ে রান্না করে, বাড়ি-ঘর মোছামুছি করে ঝাড়ু লাগায়, খাবার খাওয়ায় বা পান করা ইত্যাদিতে পাঁচ প্রকারের পাপ লাগে। হে সংসারের জীব! শোনো! এই কারণে তোমাদের নিত্য পাপ হয়। তাই দান করা অতি প্রয়োজন। দান করলেই এই পাপনাশ হয়।

**কবীর, কছু কটেঁ সত্সঙ্গ তে, কছু নাম কে জাপ।**
**কছু সন্তকে দর্শতে , কছু দান প্রতাপ॥**

**ভাবার্থ:-** ভক্তের পাপ কয়েক প্রকারের ধার্মিক ক্রিয়ায় সমাপ্ত হয়। কিছু সত্সঙ্গ কথায় জ্ঞান যজ্ঞের কারণে, কিছু নাম মন্ত্র জপে। কিছু সন্ত দর্শনে এবং কিছু পাপ দানের প্রভাবে সমাপ্ত হয়।

যেমন জামা কাপড় ব্যবহার করলে ধুলা-মাটি লেগে ময়লা হয়ে যায়। সেই ময়লা পরিষ্কার করার জন্য জল, সাবান ব্যবহার করা হয়। সেইরূপ নিত্য কর্মে পাপ লাগা স্বাভাবিক। তাই সৎসঙ্গের কথা, নাম স্মরণ, দান, সন্ত দর্শন রূপী জল-সাবান দিয়ে নিত্য পরিষ্কার করলে বা ধূইলে আত্মা নির্মল থাকে, মন ভক্তিতে লেগে থাকে।

**কবীর, জো ধন পায় ন ধর্ম করত, নাহীঁ সদ্ ব্যৌহার।**

**সো প্রভু কে চোর হৈঁ। ফিরতে মারো মার॥**

**ভাবার্থ:-** পরমাত্মা যে ধন মানবকে দিয়েছেন, তার থেকে যে দান করে না এবং ধনের সৎ ব্যবহার করে না, সে পরমাত্মার চোর। সে ধন সংগ্রহের নেশায় পাগল হয়ে ঘুরে বেড়ায়। সন্ত গরীবদাসজী বলেছেন :-

**জিন হর কী চোরী করী ঔর গয়ে রাম গুণ ভুল।**
**তে বিধনা বাগুল কিয়ে, রহে উর্ধ মুখ ঝূল॥**

এই প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১০ থেকে ১৩ তে বলেছে, যে ধর্ম-কর্ম করে না, বা পরমাত্মা দ্বারা দেওয়া ধন থেকে দান ধর্মের কাজ করে না, সে পরমাত্মার চোর। সে নিজের শরীর পোষণের জন্য অন্ন পাকায়। ধর্মতে লাগায় না। সে পাপ অন্ন খায়।

**“বাচ্চাদের অবশ্যই শিক্ষা দেওয়া উচিত ”**

**কবীর, মাত পিতা সো শত্রু হৈঁ, বাল পঢ়াবৈঁ নাহিঁ।**
**হংসন মেঁ বগুলা যথা, তথা অনপঢ় সো পণ্ডিত মাহীঁ॥**

**ভাবার্থ:-** যে মাতা পিতা ছেলে মেয়েকে লেখা পড়া শেখায় না, তারা ঐ বাচ্চাদের শত্রু। শিক্ষিত আর অশিক্ষিতদের মধ্যে পার্থক্য যেমন হংস ও বগুলা। এখানে পড়ানোর তাৎপর্য ধার্মিক জ্ঞান করানো। যা সত্সঙ্গ শুনলে হয়।

যে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেই, সে শুভ-অশুভ কর্মের বিষয়ে জানতে পারে না। যার কারণে পাপ করতে থাকে। যে সত্সঙ্গ শোনে তার আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয়ে যায়। তাই সে পাপ কর্ম করে না। সে হংস পাখীর মত সরোবর থেকে শুধু মুক্ত খায়। জীব, জন্তু মাছ প্রভৃতি খায় না। এর বিপরীত অ্যাধ্যাত্মিক জ্ঞানহীন ব্যক্তির স্বভাব বগুলা পাখীর (বক পাখী) মতো হয়। বক, মাছ, পোকা মাকড় ইত্যাদি খায়। দুই পাখীর শরীর (হংস এবং বক) দেখতে একই রকম সাদা রঙের হয়। দেখে চেনা যায় না কিন্তু তাদের কর্মে চেনা যায়। সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান যুক্ত প্রাণীকে শুভ কর্মের দ্বারা আর তত্ত্বজ্ঞান হীন প্রাণীকে অশুভ কর্মের দ্বারা চেনা যায়।

**কবীর, পহলে অপনে ধর্ম কো, ভলী ভাঁতি সিখলায়।**
**অন্য ধর্ম কী সীখ সুনি, ভটকি বাল বুদ্ধি জায়॥**

**ভাবার্থ:-** সন্তান বা পরিবারের অন্য সদস্যদের সর্বপ্রথম স্বধর্মের জ্ঞান পূর্ণ রূপে করানো উচিত। যার নিজের ধর্ম অর্থাৎ ধার্মিক ক্রিয়ার জ্ঞান নেই, তার বুদ্ধি বালকের মতো। সে অন্য ধর্ম পন্থের কথা শুনে বিপথে চলে যায়। যে নিজের ধর্ম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখে, সে ভ্রমিত হয় না।

ধর্মবোধ পৃষ্ঠা নং. ১৮২- এর সারাংশ :-

**কবীর, জো কছু ধন কা লাভ হো, শুদ্ধ কমাঈ কীন।**
**তা ধন কে দসবেঁ অংশ কো, আপনে গুরু কো দীন॥**
**দশবাঁ অংশ গুরূ কো দীজৈ । আপনা জন্ম সফল কর লীজৈ**

**ভাবার্থ:-** শুদ্ধ, সত্ ইনকামের (লাভের) দশম অংশ নিজের গুরুদেব কে দান করা উচিত।

**কবীর, জে গুরূ নিকট নিবাস করৈ, তো সেবা কর নিত্য।**
**জো কছু দূর বসৈ, পল-পল ধ্যান সে হিত॥**

**ভাবার্থ:-** যদি গুরুর স্থান তোমার বাড়ির নিকটে হয় তাহলে প্রতিদিন সেবা ও দর্শনের জন্য যাবে। আর যদি দূরে হয় তাহলে পল-পল অর্থাৎ সর্বদা শরণ করা উচিত। এতে সাধকের হিত অর্থাৎ লাভ প্রাপ্ত হয়।

**কবীর, ছঠে মাস গুরূ দর্শ করন তে, কবহু না চুকো হংস।**
**গুরূ দর্শ অরূ সত্সঙ্গ, বিচার সো উধরৈ জাত হৈ বংশ॥**
**কবীর, ছঠে মাস না করি সকে, বর্ষ মেঁ করো ধায়।**
**বর্ষ মেঁ দর্শ নাহিঁ করে, সো ভক্ত সাকিট ঠহরায়॥**
**কবীর, জৈ গুরূ পরলোক গমন করে, সীখ মানিয়ো শীশ।**
**হরদম গুরূ কো সাথে জানি, সুমরো নিত জগদীশ॥**
**কবীর, গুরূ মরা মত জানিয়ো, বস্ত্র ত্যাগা স্থুল।**
**সূক্ষ্ম দেহী গমন করি, খিলা অমর বহ ফুল।**
**কবীর, সতলোক মেঁ বৈঠী কর, গুরূ নিরখৈ তোহে।**
**গুরু তজ না ঔর মানিয়ো, অধ্যাত্ম হানি হোয়।**
**কবীর, গুরূ কে শিষ্য কী, জগদীশ করৈ সহায়।**
**নাম জপৈ অরূ দান ধর্ম মেঁ কবহূ ন অলসায়॥**
**কবীর, জৈসে রবি আকাশ সে, সবকে সাথ রহায়।**
**উষ্ণতা অরূ প্রকাশ কো দূরহী তে পহুঁচায়॥**
**কবীর, এসে গুরূ জহাঁ বসে সব পর করে রজা।**
**গুরু সমীপ জানকর সকল বিকার করত লজা॥**

**ভাবার্থ:-** ছয় মাস অন্তর গুরুজীর দর্শন অবশ্যই করো। সত্সঙ্গ আর গুরু দর্শনে বংশ মুক্ত হয়ে যায়। যদি ৬ মাসে দর্শন সম্ভব না হয় তাহলে বছরে একবার অবশ্যই অতি উৎসাহের সাথে দর্শন করতে যাবে। যে ভক্ত বছরে একবারও গুরু দর্শন করে না তাকে ভক্তি হীন মানা হয়। গুরুদেবের সতলোক চলে যাওয়ার পর গুরুর শিক্ষাকে আধার করে ধর্ম-কর্ম করতে থাকো। গুরুদেব সর্বদা নিজের সাথেই রয়েছে বলে মনে করবে। আর পরমাত্মার ভজন সুমিরণ করবে। গুরুজীর দেওয়া দীক্ষামন্ত্র জপ করতে থাকো।

গুরুজী মারা গিয়েছেন তা মনে করবে না। তিনি স্থূল শরীর ত্যাগ করেছেন। যেভাবে বস্ত্র ত্যাগ করা হয় এবং আসল শরীর সুরক্ষিত থাকে। এই প্রকার স্থূল শরীর রূপী বস্ত্র ত্যাগ করেছেন। গুরুজী নূরী শরীরে সতলোক চলে গিয়েছেন। ওখানে অমরত্ব প্রাপ্ত করেছেন আর তোমার অপেক্ষা করছেন। তোমাকেও তো সতলোক যেতে হবে। মৃত্যু ছাড়া সলোকে যাওয়া যায় না। স্থূল শরীর শিষ্যকেও ত্যাগ করতে হবে। তাই গুরুজীর শরীর ত্যাগের শোক না করে গুরুজীর দ্বারা বলা সাধনা করে নিজের জীবন সফল বানাও।

গুরুদেব সতলোকে বসে তোমাকে দেখছেন। গুরুজী সংসার ছেড়ে যাওয়ার পরে অন্য কাউকে গুরু রূপে দেখবে না, তাহলে ভক্তির হানি হয়ে যাবে। সতগুরুর উপদেশি শিষ্য কে পরমাত্মা সহায়তা করেন। গুরুজীর দেওয়া মন্ত্রজপ ও দান-ধর্মের কর্মে আলস্য করবে না।

সূর্য যেমন দূর আকাশে থেকেও সবাইকে প্রকাশ ও উষ্ণতা দেয়, সবাই নিজের কাছে দেখতে পায়। সেইরূপ গুরুজী যেখানেই থাকেন, ওখান থেকে শিষ্যের প্রতি কৃপা করেন। গুরুজীকে নিকটে তথা দ্রষ্ট মনে করে বিষয়-বিকারে লজ্জা করে পরিহার করো।

ধর্ম বোধ পৃষ্ঠা ১৮৩ এর সারাংশ:-

**কবীর, কেতে জনকাদিক গৃহী জো নিজ ধর্ম প্রবীন।**
**পায়ো শুভগতি আপ হী ঔরনহূ মতি দীন॥**

**ভাবার্থ:-** রাজা জনকের মতো গৃহস্থীও নিজের ধর্মের বিদ্বান ছিলেন অর্থাৎ মানব সমাজের জ্ঞানী ছিলেন। তাই তিনি নিজেও শুভগতি অর্থাৎ স্বর্গ প্রাপ্তি করেন এবং অন্যকেও স্বর্গ প্রাপ্তির মার্গ দেখান।

**কবীর, হরি কে হেত ন দেত, ধন দেত কুমার্গ মাহীঁ।**
**এস্য অন্যায়ী অধম, বান্ধে যমপুর জাহিঁ॥**

**ভাবার্থ:-** যে ব্যক্তি ধর্ম করে না আর পয়সা খারাপ জায়গায় প্রয়োগ করে, মদ খায়, মাছ, মাংস খায়, তামাক সেবন করে অথবা ব্যর্থ লোক দেখানোর জন্য পয়সা খরচা করে, এই ধরনের মানুষ নীচ প্রকৃতির হয় এদের যমদূতরা বেঁধে নরকে নিয়ে যায়।

## "ভক্তের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত?"

**নিজ ধন কে ভাগী জেতে সগে বন্ধু পরিবার।**
**জৈসা জাকো ভাগ হৈ দীজৈ ধর্ম সম্ভার॥**

**ভাবার্থ:-** পরমেশ্বর কবীরজী বলেছেন যে, সম্পত্তি যার যতটা প্রাপ্য অর্থাৎ যার যতটা আইনি অধিকার আছে তাকে ততটা দেওয়া উচিত। নিজের ধর্ম-কর্মকে ঠিক রেখে ভক্তের উচিত অন্যের প্রাপ্য অংশ পুরোপুরি দিয়ে দেওয়া।

ধর্ম বোধ পৃষ্ঠা ১৮৪ এর সারাংশ :-

**কবীর, খাট পড়ে তব ঝখঈ নয়নন আবৈ নীর।**
**যতন তব কছু বনৈ নহীঁ, তনু ব্যাপ মৃত্যু পীর॥**

**ভাবার্থ:-** বৃদ্ধ হয়ে বা রুগী হয়ে মানুষ যখন বিছানায় পড়ে, তখন চোখ দিয়ে জল বের হতে থাকে, কিন্তু তখন আর কোন উপায় থাকে না। যারা ভক্তি করে না মৃত্যুর সময় তাদের ভয়ংকর কষ্ট হয়। কারণ তাদের প্রাণ ভালো ভাবে বের হয় না। ভক্তি হীনদের মৃত্যুর সময়, এতো যন্ত্রণা হয় যেন এক লাখ বিছা এক সঙ্গে হুল ফুটাচ্ছে। ঐ সময় যমদূতরা ঐ ব্যক্তির গলা বন্ধ করে দেয়। তাই সে কিছুই বলতে পারে না এমনকি ঠিক মত নিঃশ্বাসও নিতে পারে না। শুধু চোখ দিয়ে জল বের হতে থাকে। তাই মানবকে উপরোক্ত বলা ভক্তি অবশ্যই করা উচিত।

**কবীর, দেখে জব যম দূতন কো, ইত উত জীব লুকায়।**
**মহা ভয়ংকর ভেষ লখী, ভয়ভীত হো জায়॥**

**ভাবার্থ:-** যমদূতের রূপ ভয়ংকর হয়। মৃত্যুর সময় ঐ ভক্তি হীন প্রাণীরা যম দূতদের ভয়ংকর চেহারা দেখতে পায়। যম দূতদের দেখে জীব ভয়ে, শরীরের ভিতর এদিক ওদিক লুকানোর চেষ্টা করে।

**কবীর, ভক্তি দান কিয়া নহীঁ, আব রহ কাস কী ওট।**
**মারপীট প্রাণ নিকালহীঁ, জম তোড়েঙ্গে হোঠ॥**

**ভাবার্থ:-** না গুরু ধারণ করেছে, না ভক্তি করেছে আর না দান ধর্ম করেছে, এখন কার ভরসায় বাঁচবে? যম দূতরা মার-ধর করে, প্রান বের করবে এবং বিনা বিচারে চোট মারবে অর্থাৎ নির্দয় ভাবে মেরে মেরে ঠোঁট ফাটিয়ে দেবে। ঠোঁট ফাটানো, নির্মম ভাবে পিটানো অর্থ হলো নির্দয়ের মত মারবে।

ধর্ম বোধ পৃষ্ঠা ১৮৫-১৮৬ এ সংক্ষিপ্ত জ্ঞান রয়েছে।

ধর্ম বোধ পৃষ্ঠা ১৮৭ এর সারাংশ:-

**কবীর, মান অপমান সম কর জানৈ, তজৈ জগত কী আশ।**
**চাহ রহিত সংশয় রহিত, হর্ষ শোক নহীঁ তাস॥**

**ভাবার্থ:-** যদি ভক্তকে কেউ অপমান করে, তাহলে তার দিকে ধ্যান দেওয়া

উচিত নয়। ঐ ব্যক্তির বুদ্ধির উপর করুনা করবে। আর যদি কেউ সম্মান করে তাহলেও তার দিকেও ধ্যান দেবে না অর্থাৎ সম্মানীয় হয়ে নিজের ধর্ম খারাপ করবে না। লাভ লোকশান মান-অপমান পরমাত্মার দান মনে করে সন্তুষ্ট থাকবে।

**কবীর, মার্গ চলৈ অধো গতি, চার হাত মাহীঁ দেখ।**
**পর তরিয়া পর ধন না চাহে সমঝ ধর্ম কে লেখ॥**

**ভাবার্থ:-** রাস্তা চলার সময় ভক্তরা দৃষ্টি নিচের দিকে করে চলবে। পথ চলার সময় ভক্তের দৃষ্টি চার হাত অর্থাৎ ৬ ফুট সামনে রাখা উচিত। ধর্ম-কর্মের জ্ঞান বিচার করে পরের স্ত্রী বা পরের ধনের প্রতি কু-দৃষ্টিতে দেখবে না।

**কবীর, পাত্র কু-পাত্র বিচার কর, ভিক্ষা দান জো লেত।**
**নীচ অকর্মী সূম কা, দান মহা দুঃখ দেত॥**

**ভাবার্থ:-** সন্ত অর্থাৎ গুরুকে নিজের শিষ্যদের ছাড়া অন্য কারো দেওয়া দান গ্রহণ করা উচিত নয়। কুকর্মী তথা অধর্মীর ধন দুঃখ দায়ী হয়।

পৃষ্ঠা ১৮৮ তে সংক্ষিপ্ত জ্ঞান রয়েছে।

ধর্ম বোধ পৃষ্ঠা ১৮৯ এর সারাংশ:-

**কবীর, তত্ত্ব প্রকৃতি সে, আত্ম জান পার।**
**জাপ এক পল নহীঁ ছুটৈ, টূট ন পাবৈ তার॥**

**ভক্তি ভাবার্থ:-** আত্মাকে পাঁচ তত্ত্ব থেকে পৃথক জানো। এই শরীর আত্মা নয়। তাই ভাবে। নিরন্তর সত নাম জপ করো।

**কবীর, জব জপ করি কে থক গয়ে, হরি যশ গাবে সন্ত।**
**কৈ নিজ ধর্ম পুরাণ পঢ়ে, এসো ধর্ম সিদ্ধান্ত॥**

**ভাবার্থ:-** যদি ভক্ত নাম জপ করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে যায় তাহলে পরমাত্মার মহিমার বাণী পড়বে, যদি মনে থাকে তো সুর দিয়ে পড়বে অথবা নিজের ধার্মিক পুস্তকগুলি পড়বে, এটাই আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত।

ধর্ম বোধ পৃষ্ঠা ১৯০-এর সারাংশ:-

**কবীর, জ্ঞানী রোগী অর্থার্থী জিজ্ঞাসূ যে চার।**
**সো সব হী হরি ধ্যাবতে জ্ঞানী উতরে পার॥**

**ভাবার্থ:-** পরমাত্মার ভক্তি চার প্রকারের ব্যক্তিরা করে :-

**১. জ্ঞানী :-** তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিদের আত্মবিশ্বাস হয়ে যায় যে, মানব জীবন কেবল পরমাত্মার ভক্তি করে জীবের কল্যাণ করানোর জন্যই প্রাপ্ত হয়। তারা এটাও জানে এক মাত্র পূর্ণ পরমাত্মার ভক্তিতে মোক্ষ হবে। অন্য দেবী দেবতাদের ভক্তি সাধনায় জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ কাটবে না। পূর্ণ গুরু থেকে দীক্ষা নিয়ে সাধনা করলে কল্যাণ সম্ভব। এইজন্য জ্ঞানী ব্যক্তি (ভক্ত) পার হয়ে যায়।

**২. অর্থার্থী:-** এরা ধন লাভের জন্য ভক্তি করে।

৩. আর্ত অর্থাৎ সঙ্কট গ্রস্ত ব্যক্তি:- এরা শুধু সংকট মোচনের জন্যই ভক্তি করে।

**৪. জিজ্ঞাসু:-** জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা পরমাত্মার জ্ঞান সম্পুর্ণ না বুঝে স্বয়ং বক্তা হয়ে, নিজের মহিমার জন্য জীবন নাশ করে দেয়। প্রমাণের জন্য দেখুন গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৬ ও ১৭ তেও আছে। ধর্ম বোধ পৃষ্ঠা ১৯১ এর সারাংশ:-

**কবীর, ক্ষমা সমান ন তপ, সুখ নহীঁ সন্তোষ সমান।**
**তৃষ্ণা সমান নহীঁ ব্যাধী কোঈ, ধর্ম ন দায়া সমান।**

**ভাবার্থ:-** পরমেশ্বর কবীরজী বলেছেন, ক্ষমা করা অনেক বড় তপ। এর সমান তপ নেই। আর সন্তোষ -এর তুল্য সুখ নেই। কোন বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছা বড় ব্যাধির

সমান। আর দয়ার সমান ধর্ম হয় না।

**কবীর, যোগ (ভক্তি) কে অঙ্গ পাঁচ হৈঁ, সংযম মনন একান্ত।**
**বিষয় ত্যাগ নাম রটন, হোয়ে মোক্ষ নিশ্চিন্ত ॥**

**ভাবার্থ:-** ভক্তির জন্য পাঁচটি প্রয়োজনীয় নিয়ম। সংযম অর্থাৎ প্রত্যেক কাজ ধৈর্যের সহিত করা উচিত। ধন সংগ্রহে, কথা বলার সময়, খাওয়া-দাওয়া তে, বিষয় ভোগে সংযম রাখতে হবে। অর্থাৎ ভক্তের কম কথা বলা উচিত, বিকার বিষয় ত্যাগ করা উচিত। একান্তে থেকে এবং পরমাত্মার ভজন তথা পরমাত্মার বাণী প্রবচনের মনন করা অনিবার্য। এই রূপ সাধনা তথা মর্যাদা পালন করলে অবশ্যই মুক্তি প্রাপ্তি হবে।

**“পূর্ণ পরমাত্মা ভক্তের আয়ুও বাড়িয়ে দেন”**

ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সুক্ত ১৬১ মন্ত্র ২-এ বলা হয়েছে পূর্ণ প্রভু নিজের ভক্তের রোগ সমাপ্ত করে দেয়। যদি রুগী ব্যক্তির আয়ু সমাপ্ত হয়ে যায় বা মৃত্যু দেবতার কাছে চলে যাওয়ার সময় হয়ে যায় তাহলেও পরমাত্মা ঐ ব্যক্তিকে সুস্থ করে শত বর্ষ আয়ু বাড়িয়ে দেন। এর প্রমাণ কবীর সাগরের অধ্যায় গরুড় বোধ পুরাণে আছে।

## অধ্যায় “গরুড় বোধ” এর সারাংশ

কবীর সাগরের অধ্যায় ১১ “গরুড় বোধ” পৃষ্ঠা ৬৫ (৬২৫)-তে আছে :-

পরমেশ্বর কবীর জী ধর্মদাস জীকে বলেছেন, “আমি শ্রীবিষ্ণুর বাহন পক্ষীরাজ গরুড়কে উপদেশ দিয়ে সৃষ্টি রচনা শোনাই। অমর লোকের কথা ও সতপুরুষের মহিমা শুনে গরুড় আশ্চর্য হয়ে যায়। নিজের কানে বিশ্বাস করতে পারছিল না। মনে মনে ভাবছিল, আমি কোনো স্বপ্ন দেখছি না তো?

আমি অন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডে তো চলে আসিনি? যে লোক আর যে পরমাত্মার কথা আমি শুনেছি তা আমার সামনে চলচিত্রের মত চলছে।” গরুড় দেব যখন এই খেয়ালে (ভাবনায়) ডুবে ছিল, তখন আমি বললাম, “হে পক্ষীরাজ! আমার কথা মিথ্যা মনে হচ্ছে? একদম শান্ত হয়ে গিয়েছো। প্রশ্ন কর! যদি কোনো সন্দেহ থাকে তার সমাধান করাও। আর আমার কোনো বাণীতে যদি দুঃখ পাও তাহলে মাফ করো।” আমার এই কথা শুনে খগেশের চোখে জল চলে এলো, আর বললো, হে দেব! আপনি কে? আপনার উদ্দেশ্য কি? এমন তিক্ত সত্য বলেছেন যা আমি হজম করতে পারছি না। আপনি সতলোকের যে অমর পরমেশ্বরের কথা বলছেন তা যদি সত্য হয়, তাহলে আমাকে বিভ্রান্ত করে (মিথ্যা বলে ফাঁকি দেওয়া) রাখা হয়েছে। যদি এই কথা মিথ্যা হয় তা হলে আপনি নিন্দার পাত্র এবং অপরাধী। যদি সত্য হয় তাহলে এই গরুড় আপনার অনুগত চাকর হবে (দাস)।

পরমেশ্বর কবীরজী ধর্মদাস জীকে বললেন, আমি বললাম- হে গরুড় দেব! তোমার সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার ধৈর্য্যই তোমার মহত্ত্ব। আমি যে অমর পুরুষ তথা সতলোকের বিষয়ে তোমাকে বলছি তা পরম সত্য। আমার নাম কবীর। আমি ঐ অমর লোকের নিবাসী। কালব্রহ্ম তোমাকে ভ্রমিত করে রেখেছে। এই জ্ঞান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবেরও নেই। তুমি নিজে বিচার করো গরুড় জী! জীব জন্ম নেয়, আনন্দে থাকতে লাগে, পরিবার বিস্তার হয়। তার পালন-পোষণে সাংসারিক পরম্পরা নির্বাহ করতে করতে বৃদ্ধ হয়ে যায়। যেই পরিবারকে দেখাশোনা করে নিজেকে ধন্য মনে করে, ঐ পরিবার ত্যাগ করে সংসার ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। অন্তিম নিশ্বাসের সময় নিজেও কাঁদবে আর পরিবারের লোকও দুঃখী হবে। এ কেমন নিয়ম? এসব হওয়া কি

উচিত? গরুড় বলে, হে কবীর দেব! এতো সংসারের বিধান। যার জন্ম হবে তার মৃত্যু নিশ্চিত। পরমেশ্বর বললেন, কেউ কি মরতে চায়? কেউ কি বৃদ্ধ অবস্থাকে পছন্দ করে? গরুড়দেব উত্তর দেয়- 'না'। পরমেশ্বর কবীরজী বললেন যদি এমন হয়, বৃদ্ধ অবস্থা হবে না আর মৃত্যুও হবে, তাহলে কেমন হয়? গরুড়দেব জী বললেন, এ তো সর্বত্তম। এই রকম হলে আনন্দই আনন্দ, কিন্তু এ তো স্বপ্নের মত। হে ধর্মদাস! তখন আমি বললাম, আপনি কি বেদ এবং পুরানকে মানেন? সত্য না অসত্য? গরুড়দেব বললেন, ও তো পরম সত্য।

দেবী পুরানের তৃতীয় স্কন্দে স্বয়ং বিষ্ণু বলছেন, হে মাতা! তুমি শুদ্ধ স্বরূপা। এই সংসার তোমার কৃপায় উদ্ভাষিত হচ্ছে। আমি, ব্রহ্মা ও শংকর তোমার কৃপায় বিদ্যমান আছি। আমাদের আবির্ভাব (জন্ম) আর তিরোভাব (মৃত্যু) হতে থাকে।

পরমেশ্বর কবীর জীর মুখ কমলে উক্ত পাকা প্রমাণ শুনে গরুড় কবীর জীর চরনে পড়ে গেলেন এবং বললেন হে প্রভু! আজ পর্যন্ত এই অমূল্য জ্ঞান আমি কখনো শুনিনি। গরুড় নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, যে দেব সৃষ্টি রচনা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ তথা দুর্গা দেবী নিরঞ্জন পর্যন্ত উৎপত্তি জানেন তিনিই রচনহার পরমেশ্বর। আজ পর্যন্ত এই রকম জ্ঞান কেউ বলেননি। যদি কোনও জীব এই জ্ঞান জানতো, তাতে তিনি স্বয়ং মহর্ষি হলেও অবশ্যই প্রবচন করতেন। আমি বড়-বড় মন্ডলেশ্বর এর প্রবচন শুনেছি। কারও কাছে এই জ্ঞান নেই। আপনি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন। আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। কৃপা করে আমাকে শরণে নিয়ে নিন, পরমেশ্বর!

কবীরজী গরুড়কে বললেন, আপনি আপনার স্বামী বিষ্ণুজীর কাছ থেকে নিজের কল্যাণ করানোর জন্য আজ্ঞা নিয়ে আসুন। গরুড় শ্রীবিষ্ণু কে বললেন, "এক মহান সন্ত পাওয়া গিয়েছে, আমি ওনার জ্ঞান শুনেছি। যদি আপনার আজ্ঞা হয় তো আমার কল্যাণ করিয়ে নেব! আমি আপনার দাস, আপনি মালিক। আমাদের সবসময় একত্রিত থাকতে হবে। আমি যদি লুকিয়ে দীক্ষা নিই, তাহলে আপনার দুঃখ হবে।" গরুড় জীর নিকট সর্ব বৃতান্ত শুনে শ্রীবিষ্ণু জী বললেন, "আমি আপনাকে মানা করছি না। আপনি স্বাধীন। আপনি ভালো করেছেন, সত্য কথা বলে দিয়েছেন। আমার কোনও আপত্তি নেই।"

কবীর পরমেশ্বর বললেন, হে ধর্মদাস! তখন আমি গরুড়কে পাঁচ নামের প্রথম মন্ত্র (শরীরের কমল খোলার জন্য প্রত্যেক দেবতার সাধনার নাম) দীক্ষা দিলাম। তখন গরুড় জী বললে, হে গুরুদেব! এই মন্ত্র তো এই দেবতাদের নাম জপ। এ তো অমর পুরুষের মন্ত্র নয়! পরমেশ্বর কবীর জী বললেন, এ এনাদের পূজার মন্ত্র নয়, এই মন্ত্র দেবতাদেরকে নিজের অনুকূল করে এনাদের জাল থেকে মুক্ত হওয়ার চাবি। এনাদের বশীকরণ মন্ত্র, যেমন- মহিষকে আকর্ষণ করার জন্য যদি তাকে মহিষ-মহিষ করে ডাকা হয় তো সে আওয়াজ কারীর দিকে তাকিয়ে দেখেও না। যখন তার বশীকরণ নাম 'হুরর্' 'হুরর্' বলে ডাকা হয়, তখন সে তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠে অর্থাৎ সাড়া দেয় এবং আওয়াজ কারীর দিকে দৌড়ে চলে আসে। আওয়াজ কারী ব্যক্তি তার দ্বারা নিজের মহিষীকে গর্ভধারণ করায়। এই প্রকার আপনি যদি শ্রী বিষ্ণুর অন্য কোন নাম জপ করতে থাকেন তাহলে তিনি দৃষ্টিপাত করেন না। যখন আপনি এই মন্ত্রের জপ করবেন তখন বিষ্ণুদেব জী তৎক্ষণাৎ প্রভাবিত হয়ে সাধককে সহায়তা করবেন। এই দেবতারা তিন লোকের (পৃথিবী, স্বর্গ, পাতাল) প্রধান দেবতা, এনারা শুধু কর্মের লেখা দিতে পারেন। এই মন্ত্র জপে অধিক পুণ্য সংগ্রহিত হয়ে যায়। আর সেই পুণ্যের প্রতিফলে দেবতাগণ সাধক কে সাহায্য করেন। তাই সাধনা আর পূজার অন্তর বুঝতে হবে। মনে করো তোমাকে আম খেতে হবে, প্রথমে পরিশ্রম করে পয়সা উপার্জন

করে আম কিনতে হবে তখন তুমি আম খেতে পারবে। ঐ সময় তোমার পূজ্য আম। পূজ্যকে প্রাপ্তির জন্য মেহনত, মজদুরী, চাকরী বা পরিশ্রম করে অর্থ সংগ্রহ করলে আম প্রাপ্ত হবে। অর্থ উপার্জন পূজা নয়, লক্ষ্য বস্তুকে প্রাপ্ত করার সাধনা বা চেষ্টা মাত্র।

সেইরূপ আমাদের পূজ্য পরমেশ্বর কবীর জী তথা অমর লোক। যা প্রাপ্তির জন্য আমাদের শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীশিব, শ্রীগণেশ ও শ্রীদূর্গার নামের মজদুরী করতে হবে অর্থাৎ সাধনা করতে হবে, কিন্তু পূজা পরমেশ্বরেরই করতে হবে। তখন গরুড়জী খুব প্রসন্ন হলেন আর এই অমৃত জ্ঞানের চর্চার জন্য শ্রী ব্রহ্মার সাথে সাক্ষাত করলেন। ব্রহ্মাকে বললেন, আমি এক মহর্ষির কাছ থেকে অদ্ভুত জ্ঞান শুনেছি। আমার মনে হল তাঁর জ্ঞান সত্য। গরুড়জী বললেন, আপনারা (ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও শিব) তিন জনই নাশবান, পূর্ণ করতার নন। আপনারা শুধু ভাগ্যের লেখা ফল দিতে পারেন। কারো আয়ু বৃদ্ধি করতে পারেন না। ভাগ্য ছাড়া অধিক কোন কিছু আপনারা দিতে পারেন না। পূর্ণ পরমাত্মা তো অন্য, তিনি অমর লোকে থাকেন। সর্ব পাপ কর্ম নষ্ট করে দেন। এমনকি মৃত্যুও কাটিয়ে দেন। আয়ুও বাড়িয়ে দিতে পারেন। তার প্রমাণ বেদে আছে। ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সুক্ত ১৬১ মন্ত্র ২-এ বলা হয়েছে যে, রুগীর রোগ বৃদ্ধি পেয়েছে অথবা মৃত্যুকে প্রাপ্ত করেছে তাহলেও আমি কবীরদেব, ঐ মৃত ভক্তকে মৃত্যুর দেবতার (যম) থেকে ছাড়িয়ে এনে নতুন জীবন দিয়ে পূর্ণ আয়ু প্রদান করি।

ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সুক্ত ১৬১ মন্ত্র ৫-এ বলা হয়েছে যে, হে পূর্ব জন্ম প্রাপ্ত প্রাণী! তুই আমার ভক্তি অনন্য মনে কর। যদি তোর চোখ সমাপ্ত (নষ্ট) হয়ে যায়, আমি তোর চোখ ভালো করে দেব এবং আমি তোকে দর্শনও দেব অর্থাৎ তুই আমাকে প্রাপ্ত করবি।

ব্রহ্মার বেদ মন্ত্র কণ্ঠস্থ ছিল। তৎক্ষনাৎ বুঝতে পারলেন কিন্তু সংসারে লোকবেদের আধারে ব্রহ্মা নিজেকে প্রজাপতি অর্থাৎ সকলের উৎপত্তি কর্তা মনে করেন। বেদ মুখস্থ করা আর বেদ মন্ত্রকে সঠিক ভাবে বোঝা সম্পূর্ণ আলাদা। বেদমন্ত্র বুঝতে হলে তত্ত্ব জ্ঞানের প্রয়োজন। মান বড়াইয়ের বশবর্তী হয়ে ব্রহ্মা বললেন, এই ব্রহ্মাণ্ডে বেদের জ্ঞান এক মাত্র আমার কাছে আছে, অন্য কেউ জানে না। এই মন্ত্রের অর্থ ভুল করেছেন।কবীর পরমেশ্বর এই ধরনের ব্যক্তিদের বিষয় বলেছেন:-

**কবীর, জান বূঝ সাচ্চী তজেঁ, করৈ ঝূঠ সে নেহ।**
**তাকি সংগত হে প্রভু, স্বপন মেঁ ভী না দেয়॥**

**শব্দার্থ:-** কবীর পরমেশ্বর জী বলেছেন, নিজের চোখে দেখার পরে যে মিথ্যাকে আধার মেনে চলে, হে পরমাত্মা! ঐ ব্যক্তির সঙ্গে স্বপ্নেও যেন দেখা না হয়। ঐ দুষ্ট ব্যক্তির সাথে জ্ঞান চর্চা করাও ব্যর্থ।

ব্রহ্মা গরুড়ের বচন শুনে অতি ক্রোধিত হয়ে বললেন, তোর বুদ্ধি পাখীর মত। তোকে কেউ কিছু বললে তার কথায় তুই বিশ্বাস করে নিস। তোর তো নিজের কোন বুদ্ধি নেই। ব্রহ্মা তখনই বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র তথা সব দেবতা ও ঋষিগণকে সভায় ডাকলেন। সভা বসালেন। ব্রহ্মা জী, দেবী দেবতাদের ডাকার কারণ অর্থাৎ সভায় (মিটিং) বসার কারণ জানালেন, গরুড় আজ নতুন কথা বলছে যে, তিন দেব (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) নাশবান, পূর্ণ পরমাত্মা অন্য কেউ! তিনি অমর লোকে থাকেন। তিন দেব এই জগতের কর্তা নয়। এই কথা শুনে শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীশিব প্রচন্ড ক্রোধিত হলেন। ব্রহ্মার কথায় গরুড়জীর দোষ বের করে নিন্দা করলেন। পরে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন যে মাতা (দূর্গা) কাছ থেকে সত্য মিথ্যার নির্ণয় করা হোক। সবাই মিলে মাতাজীর কাছে গেলেন এবং প্রশ্ন করলেন, হে মা! আমাদের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) ছাড়া অন্য কোন প্রভু আছে কী? আমরা কি সত্যিই নাশবান?

মাতা উত্তর দিলেন, এই ভ্রম তোমাদের কি করে হল যে, তোমরা অবিনাশী? আর জগতের কর্তা। যদি তাই হয় তা হলে তোমরা আমারও কর্তা (পিতা) কিন্তু তোমরা তো আমার গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছো। আসল পরমেশ্বর অন্য। তিনি অবিনাশী, সকলের পিতা। এই কথা শুনে সভা ভঙ্গ করে সবাই চলে গেলেন কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের গলায় এই সত্য আটকে যায়। তাই গরুড়কে ডাকলেন। আদেশ পেয়ে গরুড়জী প্রণাম করে বসে পড়লেন। তিন দেবতা বললেন, হে পক্ষীরাজ! তুমি কি করে বিশ্বাস করলে আমরা জগতের কর্তা নই? তুমি আমাদের পরীক্ষা করো।

গরুড়জী উঠে আমার (কবীরজী) কাছে আসলেন আর সকল বৃত্তান্ত বললেন। তখন আমি বললাম, বঙ্গদেশে (বর্তমান বাংলাদেশ) এক ব্রাহ্মনের ১২ বছরের ছেলের মৃত্যু হবে। আমি ঐ বালককে আমার শরণে নেওয়ার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের স্থিতি তাকে বলেছি যা তোমাকে বললাম। ঐ বালক খুব তর্ক করে আর আমার জ্ঞান মানলো না। তখন আমি বললাম, “তোর আয়ু মাত্র তিন দিন বাকী আছে। যদি তোর ভগবান (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) সমর্থ্য হয় তাহলে নিজের প্রাণ রক্ষা করিয়ে নে।”এই বলে আমি অন্তর্ধ্যান হয়ে যাই। এখন ঐ বালকের অচৈতন্যের মত অবস্থা। ঐ বালককে নিয়ে দেবতাদের কাছে যাও। ওরা কিছুই করতে পারবে না। পরে তুমি ধ্যানের মাধ্যমে আমার সঙ্গে কথা বলবে। তখন গরুড় জী ঐ বালককে নিয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের কাছে যায়। অন্য কেউ জানে না। গরুড় ঐ বালককে বোঝায় যে, তুমি দেবতাদের বলবে, আমি আপনাদের ভক্ত। আমার পিতামহ, প্রোপিতামহ, পিতা আর আমি সর্বদা আপনাদের পূজা করেছি। আমার জীবন আর মাত্র দু’-তিন দিন আছে। আমি এখনও বালক। কৃপা করে আমার আয়ু বৃদ্ধি করে দিন।

এই কথা বলে বালক বিনম্র ভাবে প্রার্থণা করল। তিনদেব চেষ্টা করলেন কিন্তু ব্যর্থ হলেন। তখন তারা বিচার-বিবেচনা করে ধর্মরাজের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সকলের হিসাব ধর্মরাজের কাছে থাকে। তাই ধর্মরাজকে দিয়ে এই বালকের আয়ু বৃদ্ধির জন্য ভাবলেন। এই রকম চিন্তা ভাবনা করে, সকলে মিলে ধর্মরাজের নিকটে গেলেন। তিনদেব ধর্মরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন- প্রথমে এটা বলুন, এই ব্রাহ্মণ পুত্রের আয়ু আর কতদিন আছে? ধর্মরাজ ডায়েরী (রেজিস্ট্রার) দেখে বললেন, কাল এই বালকের মৃত্যু হবে। তিন দেবতা বললেন, আপনি এই বালকের আয়ু বাড়িয়ে দিন। ধর্মরাজ বললেন, এটা অসম্ভব। তিনদেব বললেন, আমরা আপনার কাছে বার বার আসি না। আজ আমাদের মান সম্মানের প্রশ্ন। আমরা এখানে এসেছি, তার সম্মান তো রাখুন। ধর্মরাজ বললেন, আমি এই বালকের এক মূহুর্ত আয়ূ না বাড়াতে পারবো, না কমাতে পারবো। আপনারা যদি নিজের আয়ু এই বালকের নামে সংকল্প করে দেন, তাহলে আমি এই বালকের আয়ু বৃদ্ধি করে দিতে পারি।

এই কথা শোনা মাত্র ত্রিদেবের হাওয়া বের হয়ে গেল। তারা বলতে লাগলেন, এটা একমাত্র পরমাত্মাই করতে পারেন। ওখান থেকে তিনদেব গরুড় জীর কাছে এসে বললেন, যদি অন্য কোনও সমর্থ্য শক্তি থাকে, তাহলে তুমি এই বালকের আয়ু বাড়িয়ে দেখাও। গরুড় ধ্যানের দ্বারা কবীর জীর সঙ্গে সম্পর্ক করলেন। পরমেশ্বর কবীর জী ধ্যানের মাধ্যমে বললেন, তুমি এই বালকের জন্য মান সরোবর থেকে জল নিয়ে এসো। ওখানে শ্রবণ নামের এক ভক্তেব সঙ্গে দেখা হবে। আমি ওকে সব বলে রেখেছি। তুমি অমৃত জল নিয়ে এসো।

যেরকম আজ্ঞা হলো, গরুড়জী সেই রকমই করলেন। অমৃত জল এনে ঐ বালককে পান করালেন। ঐ বালকের নিকটে আমি গিয়েছিলাম। গরুড়জী ঐ

বালককে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, অমৃতজল তো একটা বাহানা। কবীরজী স্বয়ং পূর্ণ পরমাত্মা। তিনি জল মন্ত্রপুত করে দিয়েছিলেন। তুমি নামদীক্ষা নিয়ে নাও। এই মন্ত্রপুত অমৃত জল দ্বারা তুমি ১০ দিন পর্যন্ত জীবিত থাকবে। তখন আমি (কবীর জী) ঐ বালকের কাছে গেলাম। বালক আমার কাছে থেকে দীক্ষা নিল। ১৫ দিন পরে গরুড়জী ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবজীর কাছে গিয়ে বললেন,“ঐ বালক এখনো জীবিত আছে। ঐ বালক আমার গুরুজীর থেকে নাম দীক্ষা নিয়েছে। তিনি পূর্ণ আয়ু জীবিত থাকার আশীর্বাদ দিয়েছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ তিনদেব ধর্ম রাজের কাছে পুনরায় গেলেন। তখন সঙ্গে গরুড়দেবও ছিলেন। তিন দেব ধর্মরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ বালক এখনো কি করে বেঁচে আছে? ওর তো মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল! ধর্মরাজ খাতা খুলে দেখলেন যে ঐ বাচ্চার অনেক দীর্ঘ আয়ু লেখা আছে। ধর্মরাজ বললেন, এ সব তো উপর থেকেই হয়। এই ধরনের ঘটনা কখনো কখনো হয়। ঐ পরমেশ্বরের লীলা কে জানে?

তিন দেবতা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কিন্তু মান বড়াইয়ের কারণে প্রত্যক্ষ সত্য দেখেও মানলেন না। নিজের অহংকার ভাব ত্যাগ করলেন না । এদিকে গরুড়ের অটল বিশ্বাস হয়ে গেল।

**কবীর, রাজ তজনা সহজ হৈ, সহজ ত্রিয়া কা নেহ।**
**মান বড়াঈ ঈর্ষা, দুলর্ভ তজনা য়েহ॥**

**শব্দার্থ** - আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অভাবের কারণে মানুষকে কিছু কঠিন কু-অভ্যাস ঘিরে ধরে যেমন মান-বড়াঈ, ইর্ষা, অহংকার । মানবড়াই এর অর্থ পদ বা অর্থের কারণ সম্মানিত ব্যক্তি। (মান সম্মানের কারণে অহংকার ও ঈর্ষা সৃষ্টি হয়) এটা এমন খারাপ জিনিস। এর অভিমানে মানুষ অন্ধ হয়ে এইগুলো ছাড়তে পারে না। রাজ ছাড়তে পারে, নিজের স্ত্রী-কে ত্যাগ করতে পারে কিন্তু ঈর্ষা এবং মানবড়াঈ ত্যাগ করা কঠিন।

এই ‘গরুড় বোধ’-এর শেষে বাসুকী নাগ কন্যার প্রকরন ভুলভাবে লেখা হয়েছে । এতে গরুড়জীকে গুরুপদ-এ চিত্রার্থ করে রেখেছে। কিন্তু এটা অসত্য। যা কিছু করেছেন তা পরমেশ্বর কবীরজীই করেছেন।

**“এবার পড়ুন গরুড় বোধের কিছু অমৃতবাণী”**

ধর্মদাস বচন

**ধর্মদাস বীনতী কৰৈ, সুনহু জগত আধার।**
**গরূড় বোধ ভেদ সব, অব কহো তত্ত্ব বিচার॥**

**শব্দার্থ:**- ধর্মদাস পরমেশ্বর কবীর জীর কাছ থেকে গরুড় দেব জী সম্পর্কে জ্ঞান জানার জন্য প্রার্থনা করলেন।বললেন, “হে সংসারের ধারক পরমাত্মা! গরুড় পাখীর বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান বলার কৃপা করুন। সত্গুরু বচন (কবীর বচন):-

**প্রথম গরূড় সোঁ ভেঁট জব ভয়উ। সত্ সাহেব মৈঁ বোল সুনাউ।**
**ধর্মদাস সুনো কহু বুঝাঈ। জেহী বিধি গরুড় কো সমঝাঈ॥**

**শব্দার্থ** :- কবীর পরমেশ্বর জী ধর্মদাস জীকে বললেন, “আমি যখন প্রথম বার গরুড়জীর সাথে দেখা করি তখন “সত সাহেব” বলেছিলাম। হে ধর্মদাস আমি যে ভাবে গরুড়কে বুঝিয়েছিলাম,সেই বিধি বলছি।

গরুড় বচন :-

**সুনা বচন সত সাহেব জবহী। গরুড় প্রণাম কিয়া তবহী॥**
**শীশ নীবায় তিন পূছা চাহয়ে। হো তুম কৌন কহাঁ সে আয়ে॥**

**শব্দার্থ:**- যখন গরুড় সত্ সাহেব বচন শুনল, ঐ সময় আমাকে প্রণাম করে মাথা নত করে জিজ্ঞাসা করল, “আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন?"জ্ঞানী (কবীর) বচন

**কহা কবীর হৈ নাম হমারা। তত্ত্বজ্ঞান দেনে আয়ে সংসারা॥**
**সত্যপুরুষ হৈ  কুল কা দাতা। হাম বাকা সব ভেদ বতাতা॥**
**সত্যলোক সে হম চলি আএ। জীব ছুড়াবন জগ মেঁ প্রকটাএ॥**

**শব্দার্থ:-** কবীর বললেন,"আমি গরুড়কে বলেছি- আমার নাম কবীর, আমি সম্পূর্ণ বিশ্বকে তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিতে এসেছি। আমি সত্ লোক (পরম ধাম) থেকে এসেছি। আমি কাল জাল থেকে জীবকে মুক্ত করার জগতে প্রকট হয়েছি। সত্য পুরুষ সর্ব কুলের মালিক। সকলের পালন পোষনকারী এবং সকলের দাতা। আমি তার সম্পূর্ণ ভেদ বলছি।" গরুড় বচন

**সুনত বচন অচম্ভো মানা। সত্য পুরুষ হৈ কৌন ভগবান॥**
**প্রত্যক্ষদেব শ্রী বিষ্ণু কহাবৈ। দশ ঔতার ধরি ধরি জাবৈ॥**

**শব্দার্থ:-** কবীর জী বলেছেন যে, আমার মুখে সত্য সাহেব  শুনে গরুড় আশ্চার্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এ কোন পরমাত্মা? আধ্যাত্মিক জ্ঞানে স্পষ্ট হয় যে, বিষ্ণুজীকে পরমাত্মা মানা হয়। তিনি ১০ অবতার ধারন করে পৃথিবীতে আসেন।

জ্ঞানী (কবীর) বচন:-

**তব হম কহয়া সুনো গরুড় সুজানা।**
**পরম পুরুষ হৈ পুরুষ পুরাণা॥ (আদি থেকে)**
**বহ কবহু না মরতা ভাঈ। বহ গর্ভ সে দেহ ধরতা নাহীঁ॥**
**কৌটি মরে বিষ্ণু ভগবান। ক্যা গরুড় তুম নহীঁ জানা॥**
**জাকা জ্ঞান বেদ বতলাবৈঁ। বেদ জ্ঞান কোই সমঝ ন পাবৈঁ॥**
**জিসনে কীন্হা সকল বিস্তারা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব কা সিরজনহারা॥**
**জুনী সংকট বহ নহীঁ আবৈ। বহ তো সাহেব অক্ষয় কহাবৈ॥**

**শব্দার্থ:-** কবীরজী বলেছেন, হে গরুড়! শোনো, এই  সত্য পুরুষ আদি পরমাত্মা অর্থাৎ সব সময়ের ভগবান। তিনি  কখনো না মরেন  তথা না গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহন করেন। হে গরুড়! তুমি কি জানো না, কোটি কোটি বিষ্ণুর মৃত্যু হয়ে গিয়েছে। যে পরম অক্ষর পুরুষের জ্ঞান বেদে লেখা আছে, সেই বেদের জ্ঞান কেউ ঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। যিনি সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করেছেন, যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে উৎপত্তি করেছেন, সেই পরমাত্মা ৮৪ লাখ যোনীতে ভ্রমন করে না। তাকে তো অবিনশ্বর পরমাত্মা বলা হয়।

গরুড় বচন:-

**রাম রূপ ধরি বিষ্ণু আয়া। জিন লংকা কা মারা রায়া॥**
**পূর্ণ ব্রহ্ম হৈ  বিষ্ণু অবিনাশী। হৈ বন্দী ছোড় সব সুখ রাশী।**
**তেতীস কোটি দেবতন কী বন্দ ছুড়াঈ। পূর্ণ প্রভু  হৈঁ  রাম রাঈ॥**

**শব্দার্থ:-** গরুড় বলেছেন, বিষ্ণুজী শ্রী রামের অবতার ধারন করে শ্রীলঙ্কার রাজা রাবন কে মেরেছিলেন। শ্রীবিষ্ণুজী অবিনাশী পূর্ণ ব্রহ্ম। তেত্রিশ কোটি দেবতাকে রাজা রাবনের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। তিনি সর্ব সুখের খনী বন্দীছোড়।  শ্রী রাজা রাম পূর্ণ পরমাত্মা।

জ্ঞানী (কবীর) বচন

**তুম গরূড় কৈসে কহো অবিনাশী। সত্য পুরূষ বিন কটৈ না কাল কী ফাঁসী॥**
**যা দিন লংক মেঁ করী চঢ়াঈ। নাগ ফাঁস মেঁ বন্ধে রঘুরাঈ॥**
**সেনা সহিত রাম বঁধাঈ। তব তুম নাগ জা মারে ভাঈ॥**
**তব তেরে বিষ্ণু বন্দন সে ছুটে। যাকু পূজে ভাগ জাকে ফূটে॥**

**কবীর ঐসী মায়া অটপটী। সব ঘট আন অড়ী।**
**কিস-কিস কূঁ সমঝাউঁ, কূঔ ভাঙ্গ পড়ী।**

**শব্দার্থ:-** কবীর জী বললেন, হে গরুড় দেব! আপনি কি ভাবে বিষ্ণুজীকে অবিনাশী বলছেন? সত্ পুরুষ ছাড়া কালের ফাঁস অর্থাৎ কর্ম বন্ধন সমাপ্ত হতে পারে না। হে গরুড় তুমি স্মরণ করো, যখন শ্রীরামচন্দ্র শ্রীলঙ্কা আক্রমন করেছিলেন। যুদ্ধের মাঝে শ্রীরাম এবং তার সর্ব সেনা নাগ ফাঁসে বাঁধা পড়েছিলেন। তুমি নিজে শ্রীরাম তথা সর্ব সেনাকে নাগফাঁস কেটে বন্ধন মুক্ত করেছিলে। তারপর তোমার বিষ্ণুজীও নাগের হাত থেকে মুক্ত হয়েছিল। তবে তুমিই তো ওদের বন্দীছোড়। শ্রীরাম এবং সেনার জন্য তো তুমিই বন্দীছোড়। যে শ্রীবিষ্ণুকে ইষ্টরূপে পূজা করে, তার ভাগ্য খারাপ। কবীরজী দুঃখী মনে বললেন, কাল ব্রহ্ম নিজের মায়া জালে সকলের ঘট অর্থাৎ হৃদয়ে অজ্ঞানতা ভরে দিয়েছেন, কাকে কাকে বোঝাবো। এ তো এমন সমস্যা, যেমন কেউ কুঁয়ার জলে এক কুইন্টাল ভাঙ গুলে রেখেছে। সেই কুঁয়ার জল যে পান করবে তারই ভাঙের নেশা হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ঐ কূঁয়ার জল খাবে,তার ভাঙের নেশা লেগে যাবে।যত লোক ভাঙের জল খেয়ে নেশার মধ্যে থাকে তাদের কথা বলার ধরন বা অ্যাকটিং একই রকমের হয়। কাল ব্রহ্মের দ্বারা ভ্রমিত ব্যক্তিদেরও একই দশা। তারা সবাই বলে শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীশিব অবিনাশী প্রভু। এনারাই সকলের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার কর্তা। এই তিন জন অতিরিক্ত অন্য কোনও পরমাত্মা নেই।

গরুড় বচন:-

**জ্ঞানী গরূড় হৈ দাস তুম্হারা। তুম বিন নহীঁ জীব নিস্তারা॥**
**ইতনা কহ গরুড় চরণ লিপটায়া। শরণ লেবোঁ অবিগত রায়॥**
**কবহু না ছোড়ূঁ তুম্হারা শরণ। তুম সাহব হো তারণ তরণা ॥**
**পত্থর বুদ্ধি পড়ে হৈ জ্ঞানী। হো তুম পূর্ণ ব্রহ্ম লিয়া হম জানী॥**

**শব্দার্থ:-** গরুড়জী কবীরজীকে বললেন, হে বিদ্বান কবীরজী! আমি গরুড় আপনার চাকর। আপনি ছাড়া জীবের কল্যান সম্ভব নয়। কবীর জী ধর্মদাস জীকে বলেছেন যে, এতটুকু কথা বলেই গরুড় আমার চরণ জড়িয়ে ধরলো আর বললো, হে পরমেশ্বর! আমাকে আপনার শরনে নিন। আমি কখনো আপনার শরন ছাড়বো না। আপনি সত্যই তরন- তারন, পূর্ণ মোক্ষ দাতা। হে জ্ঞানী কবীরজী! আমার বুদ্ধিতে পাথর পড়ে আছে। আমি এখন বুঝতে পেরেছি আপনিই পূর্ণ ব্রহ্ম।

জ্ঞানী (কবীর) বচন:-

**তব হম গরুড় কূঁ পাঁচ নাম সুনায়া। তব বাকুঁ সংশয় আয়া॥**
**য়হ তো পূজা দেবতন কী দাতা। য়া সে কৈসে মোক্ষ বিধাতা॥**
**তুমতো কহো দূসরা অবিনাশী। বা সে কটে কাল কী ফাঁসী॥**
**নায়ব সে কৈসে সাহেব ডরহী। কৈসে মৈঁ ভবসাগর তিরহী॥**

**শব্দার্থ:-** কবীর পরমেশ্বরজী ধর্মদাস জীকে বলেছেন যে, গরুড়ের প্রার্থনায় আমি পাঁচ নামের দীক্ষা মন্ত্র তাকে দিয়েছি, যা শরীরের কমল চক্রে স্থিত দেবী-দেবতাদের ও দেবী দূর্গার সাধনা মন্ত্র। তখন গরুড় সন্দেহযুক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, হে প্রভু! আপনি তো এই মন্ত্র দেবী দেবতার পূজার জন্যে দিয়েছেন। আপনি তো বলেছিলেন যে এদের থেকে আলাদা অন্য অবিনাশী সত্ পুরুষ আছেন। তিনি কালের বন্ধন কেটে দেন। এই দেবতাদের পূজার দ্বারা কি ভাবে পূর্ণ মোক্ষ হতে পারে? এ তো নায়েব অর্থাৎ ছোট দেবতা। এদের সাহেব অর্থাৎ মালিক কাল প্রভু। নায়েব অর্থাৎ ছোট দেবতাকে সাহেব অর্থাৎ মালিক কি ভাবে ভয় করবে? অর্থাৎ এই সকল দেবতাদের ভক্তির দ্বারা

কালের জাল থেকে কি ভাবে মুক্ত হবে?

জ্ঞানী (কবীর) বচনঃ-

**সাধনা কো পূজা মত জানো। সাধনা কূঁ মজদুরী মানো॥**
**জো কোউ আম্র ফল খানো চাহৈ। পহলে বহুত মেহনত করাবৈ॥**
**ধন হোবৈ ফল আম্র খাবৈ। আম্র ফল ইষ্ট কহাবৈ॥**
**পূজা ইষ্ট পূজ্য কী কহিএ। ঐসে মেহনত সাধনা লহিএ॥**
**য়হ সুন গরুড় ভয়ো আনন্দা। সংশয় সূল কিয়ো নিকন্দা॥**

ভাবার্থঃ- পরমেশ্বর কবীরজীকে গরুড়দেব জিজ্ঞাসা করল, "হে পরমেশ্বর! আপনি তো এই দেবতাদের নাম মন্ত্র দিয়েছেন। এতো দেবতাদের পূজা। আপনি বলেছেন, এনারা তো কেবল ১৬ কলা যুক্ত প্রভু। কাল এক হাজার কলা যুক্ত প্রভু। পূর্ণ ব্রহ্ম অসংখ্য কলার পরমেশ্বর। সৃষ্টি রচনাতে আপনি এও বলেছেন যে কাল তোমাকে আটকে রেখেছেন। তিন দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কাল ব্রহ্মের অধীনে! হে পরমেশ্বর! নায়েব (উপ অর্থাৎ ছোট) কে সাহব (স্বামী-মালিক) কি করে ভয় করবে? অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব জী তো কালব্রহ্মের নায়েব। যেমন নায়েব তহশিলদার হল ছোট তহশিলদার। ছোটকে, বড় কিভাবে ভয় করবে? এই নায়েবরা তাদের সাহেব (কাল ব্রহ্ম) থেকে আমাকে কি করে মুক্ত করবে? তখন কবীর পরমেশ্বর জী পূজা এবং সাধনার মধ্যে পার্থক্য বললেন। যেমন, যদি কেউ আমফল খেতে চায়, তাহলে আমফল তার পূজ্য। ঐ পূজ্য বস্তুকে পাওয়ার কৃত প্রচেষ্টাকে সাধনা বলা হয়। টাকা উপার্জনের জন্য মেহনত-মজদুরী করতে হয়। তার পর ঐ টাকা দিয়ে আম কিনে এনে খেতে হয়। সেই রকম পূর্ণ পরমাত্মা আমাদের ইষ্টদেব অর্থাৎ পূজ্যদেব। এই দেবতাদের মন্ত্র-জপ মজদুরী মনে করো। এই নাম জপের কামাই রূপী যে ভক্তিধন পাওয়া যাবে, সেই ভক্তি ধন কাল ব্রহ্মকে দিয়ে ঋণ মুক্ত হয়ে নিজের ইষ্টদেব অর্থাৎ পূজ্য কবীর দেবকে প্রাপ্ত করব। এই কথা শুনে গরুড়জী অতি প্রসন্ন হলেন তথা পূর্ণ গুরুর প্রমাণ পেলেন যে, পূর্ণ গুরুই সন্দেহের সমাধান সঠিক ভাবে করতে পারেন। এই বিচার করে গরুড়জী দীক্ষা গ্রহণ করলেন। গরুড় জীকে পরমাত্মা ত্রেতাযুগে নিজের শরণে নিয়েছিলেন। শ্রী বিষ্ণুর বাহন হওয়ার কারণে এবং বার-বার বিষ্ণুর মহিমা শোনার কারনে ও বিষ্ণুজীর দ্বারা বিভিন্ন চমৎকার দেখে, গুরুজীর প্রতি গরুড় দেবের আস্থা কম হয়ে গিয়েছিল কিন্তু গুরুদ্রোহী হোন নি। তাই পরবর্তীতে কোনো জন্মে মানব শরীর প্রাপ্ত করবেন। তখন পরমেশ্বর কবীরজী পুনরায় গরুড়জীর আত্মাকে শরণে এনে মুক্ত করাবেন। দীক্ষার পরে গরুড়জী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবজীর সাথে জ্ঞানচর্চা করার সিদ্ধান্ত নেয়। গরুড় জী ব্রহ্মা জীর নিকটে গিয়ে জ্ঞানচর্চা করলেন।

গরুড় বচন ব্রহ্মার প্রতি -

**ব্রহ্মা কহা তুম কৈসে আয়ে। কহো গরুড় মোহে অর্থায়॥**
**তব হম কহা সুনোঁ নিরঞ্জন পূতা। আয়া তুম্হেঁ জগাবন সূতা॥**
**জন্ম- মরণ এক ঝঞ্ঝাট ভারী। পূর্ণ মোক্ষ করাও ত্রিপুরারী॥**

**শব্দার্থঃ**- পরমেশ্বর কবীর জীর নিকট নাম দীক্ষা নেওয়ার পরে তথা সংসারের উৎপত্তির কথা শুনে গরুড়জীর পূর্ণ বিশ্বাস হল- যে জ্ঞান বেদ বা পুরাণে আছে তা যদি কবীরজীর জ্ঞানের সহিত মেলে তাহলে অন্য যে জ্ঞান আছে, তা ভুল হতে পারে না। কারণ সৃষ্টি রচনার জ্ঞান উৎপত্তি কর্তা পরমেশ্বর ছাড়া অন্য কেউ বলতে পারে না। ইনি কোনো সামান্য ঋষি নয়, স্বয়ং পরমাত্মা। এই কথা চিন্তা করে গরুড়জী ব্রহ্মার লোকে গেলেন। কারণ ব্রহ্মা জীকে বেদ জ্ঞানী মানা হত। ব্রহ্মা গরুড়জীকে আসার

কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, “হে গরুড়জী! কি জন্য এসেছেন? গরুড়জী কারণ বলার সময় বললেন, “হে জ্যোতি নিরাঞ্জনের পুত্র অর্থাৎ ব্রহ্মা! শুনুন আমার আসার কারণ, আমি আপনাদের অজ্ঞান অন্ধকার থেকে জাগানো অর্থাৎ সতর্ক করার জন্য তত্ত্বজ্ঞান রূপী আলো নিয়ে এসেছি। জন্ম-মৃত্যু এক কঠিন রোগ। আপনি আপনার মুক্তি করান।

**“ব্রহ্মা বচন”**

**হমরা কোঈ নহীঁ জন্ম দাতা। কেবল এক হমারী মাতা॥**
**পিতা হমারা নিরাকর জানী। হম হৈঁ পূর্ণ সারঙ্গপাণী॥**
**হমরা মরণ কবহু নহীঁ হোবৈ। কৌন অজ্ঞান মেঁ পক্ষি সোবৈ॥**
**তবহী ব্রহ্মা বিমান মংগাবা। বিষ্ণু, শিবকো তুরন্ত বুলাবা॥**
**গএ বিমান দোনোঁ পাসা। পল মেঁ আন বিরাজে পাসা॥**
**ইন্দ্র কুবের বরুণ বুলাএ। তেতিস করোড় দেবতা আএ॥**
**আএ ঋষি মুনী ঔর নাথা। সিদ্ধ সাধক সব আ জাতা॥**
**ব্রহ্মা কহা গরুড় নীন্দ মৈঁ বোলৈ। কোরী ঝূঠ কুফর বহু তোলৈ॥**
**কহ কোঈ ঔর হৈ সিরজনহারা। জন্ম-মরণ বতাবৈ হমারা॥**
**তাতে মৈঁ য়হ মজলিস জোড়ী। গরুড় কে মন ক্যা বাতাঁ দৌড়ী॥**
**ঋষি মুনী অনুভব বতাতা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব বিধাতা।**
**নির্গুন সরগুণ য়েহী বন জাবৈ। কবহু নহী মরণ মেঁ আবে॥**

**শব্দার্থ:**- ব্রহ্মা বললেন, হে গরুড়! আমার জন্ম মৃত্যু হয় না। আমার কোন পিতা নেই। আমার শুধু এক মাতা আছে। আমার পিতা নিরাকার। আমি পূর্ণ পরমাত্মা। (সারংগ মানে ধনুষ, পাণী মানে হাত, কাল লোকের প্রাণীরা হাতে ধনুষ ধারনকারীকে পরমাত্মা বলে।) হে পক্ষী গরুড়! তুই অজ্ঞান নিদ্রাতে শুয়ে আছিস। শোন! আমার জন্ম-মৃত্যু কখনো হয় না। ঐ সময় ব্রহ্মা নিজের বিমান বিষ্ণু ও শিবকে আনার জন্য পাঠান। কিছুক্ষনের মধ্যে বিমান দু জনকে নিয়ে এল। বিষ্ণু ও শিবের সঙ্গে তেত্রিশ কোটি দেবতা তথা দেবতাদের রাজা ইন্দ্র, ধনের দেবতা কুবের, জলের দেবতা বরুণ, ৮০ হাজার ঋষি, নয় নাথ, ৮৪ সিদ্ধ সবাই কে ডাকা হল। সম্পূর্ণ সভা বসল। ব্রহ্মা বললেন, গরুড় এমন কথা বলছে যেমন কেউ ঘুমের ঘোরে বলে। এমন মিথ্যা কথা বলছে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্ম-মৃত্যু হয়। তোমাদের থেকে অন্য কেউ সৃষ্টি কর্তা পরমাত্মা আছেন। আমি সবাইকে এই জন্য ডেকেছি যে, গরুড়ের মনে এই চিন্তা কি করে এলো?

ব্রহ্মা বলছিলেন, সব ঋষি মুনি তাদের অনুভব বলে থাকেন যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব জগতের উৎপত্তি কর্তা পরমাত্মা। এরাই সর্গুন-নির্গুন হয়ে লীলা করেন। এদের কখনো জন্ম-মৃত্যু হয় না।

“বিষ্ণু বচন”

**পক্ষীরাজ য়হ ক্যা মন মেঁ আঈ। পাপ লগৈ বনা অলোচক ভাই॥**
**হমসে ঔর কৌন বড়েরা দাতা। হমহৈ কর্তা ঔর চৌথী মাতা॥**
**তুমরী মতী অজ্ঞান হরলীনি। হম হৈঁ পূর্ণ করতার তীনী॥**

**শব্দার্থ:**-বিষ্ণু বললেন, “হে পক্ষীরাজ গরুড়! তোমার মনে এই ভুল ধারনা কি করে উৎপন্ন হয়েছে যে, আমাদের জন্ম-মৃত্যু হয়। তুমি তো নিন্দার পাত্র হয়ে গেলে। আমাদের থেকে বড় পরমাত্মা কে? আমরা তিনজন এবং মাতা দূর্গা এই সংসারের কর্তা। তোমার বুদ্ধিকে অজ্ঞান সমাপ্ত করে দিয়েছে। আমরা তিনজন পূর্ণ পরমাত্মা।

সৃষ্টির উৎপত্তি কর্তা।

“মহাদেব বচন”

**কহ মহাদেব, পক্ষী হৈ ভোলা। হৃদয় জ্ঞান ইন নহীঁ তোলা॥**
**ব্রহ্মা বনাবৈ, বিষ্ণু পালৈ। হম সবকা কা করতে কালৈ॥**
**ঔর বতা গরুড় অজ্ঞানী। ঋষি বতাবৈ তুম নহীঁ মানী॥**
**চলো মাতা সে পূছৈ বাতা। নির্ণয় করো কৌন হৈ বিধাতা॥**
**সবনে কহা সহী হৈ বাণী। নির্ণয় করেগী মাতা রাণী॥**
**সব উঠ গএ মাতা পাসা। আপন সমস্যা করী প্রকাশা॥**

**শব্দার্থ:-** মহাদেব অর্থাৎ শিব জী বললেন, গরুড় এক সাধারণ বুদ্ধির পাখী। সে নিজের জ্ঞানকে পরীক্ষা না করেই এই কথা বলেছে। ব্রহ্মা জীবের উৎপত্তি করেন, বিষ্ণু পালন করেন, আর আমি সংহার করি। হে অজ্ঞানী গরুড়! এখন তুমিই বলো, অন্য কোন সমর্থ পরমাত্মা আছে? চলো আজ মাতাকে জিজ্ঞাসা করি পূর্ণ পরমাত্মা কে? সকলে সহমত ব্যক্ত করে বললেন, যে ঠিক আছে। আজ মাতা নির্ণয় করবেন পূর্ণ পরমাত্মা কে? সভাতে উপস্থিত সকলে উঠে মাতার নিকটে গেলেন এবং তাদের সমস্যার কথা বললেন।

অধ্যায় “গরুড় বোধ” এর সারাংশ

**“মাতা বচন”**

**কহা মাতা গরূড় বতাও। ঔর কর্তা হৈ কৌন সমঝাও॥**

**শব্দার্থ:-** দেবী মাতা গরুড়কে প্রশ্ন করলেন যে, তুমিই বলো এই সংসারের বিধাতা অর্থাৎ উৎপত্তি কর্তা অন্য কে?

“গরুড় বচন"

**মাত তুম জানত হো সারী। সচ্চ বতা কহে ন্যাকারী॥**
**সভা মেঁ ঝূঠী বাত বনাবৈ। বাকা বংশ সমূলা জাবৈ॥**
**মৈঁ সুনা ঔর আঁখোঁ দেখা। করতা অবিগত অলগ বিশেষা॥**
**জহাঁ সে জন্ম হুয়া তুমহারা। বহ হৈ সবকা সরজন হারা॥**
**বেদ জাকা নিত গুণ গাবৈঁ। কেবল বহী এক অমর বতাবৈ॥**
**মরহেঁ ব্রহ্মা বিষ্ণু নরেশা । মর হৈঁ সব শংকর শেষা॥**
**অমরপুরুষ সত পুর রহতা। অপনে মুখ সত্য জ্ঞান বহ কহতা॥**
**বেদ কহে বহ পৃথ্বী পর আবৈ। ভূলে জীবন কো জ্ঞান বতলাবৈ॥**
**ক্যা য়ে ঝূঠে শাস্ত্র সারে। তুম ব্যর্থ বন বৈঠে সিরজনহারে॥**
**মান বড়াঈ ছোড়ো ভাঈ। তাকি ভক্তি করে অমরাপুর জাঈ॥**
**মাতা কহনা সাচী বাতা। বতাও দেবী হৈ কৌন বিধাতা॥**

**শব্দার্থ:-** গরুড় বললেন, হে মাতা! আপনি সবই জানেন। বিচারকের উচিৎ সত্য কথা বলা। যে বিচারক সভাতে মিথ্য কথা বলে, পরমাত্মার বিধান অনুসারে তার বংশ নষ্ট হয়ে যায়। পরে আবারও গরুড় বললেন, হে মাতা! যে পরমেশ্বর আপনারও উৎপত্তি করেছেন, তিনি সকলের উৎপত্তি কর্তা। আমি নিজের চোখে দেখেছি এবং তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে শুনেছি। ঐ কর্তা দিব্য অবিগত বিশেষ। তিনি ভিন্ন। (অবিগত এর অর্থ যার ভেদ গুপ্ত) বেদে তাঁর অধিক গুণগান আছে। বেদে বলা হয়েছে যে কেবল তিনিই এক অবিনাশী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু তথা শিবের মৃত্যু হবে। অবিনাশী পরমাত্মা তো সত্ লোকে (ঋত ধামে) থাকেন। তিনি পৃথিবী লোকে প্রকট হয়ে নিজের মুখ কমলে বলা বাণীতে যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করেন। অজ্ঞানের কারনে সত্য

ভক্তির মার্গ থেকে ভ্রমিত ভাল সাধককে সত্য মার্গের জ্ঞান করান। এর প্রমান বেদে আছে। এই সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থ কি মিথ্যা? হে ত্রিদেব! আপনারা মিথ্যা সৃজনহার হয়ে বসে আছেন। আরে ভাই (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) মান বড়াই ত্যাগ করে নিজের জীবের কল্যান করাও। ঐ পূর্ণ পরমাত্মার ভক্তি করুন। গরুড় দেবী মাতার দিকে মুখ করে প্রার্থনা করলেন, হে মাতা! আপনি সত্য বলুন, এই সংসারের উৎপত্তি কর্তা কে?

মাতা (দুর্গা) বচন

**মাতা কহ সুনো রে পূতা। তুম জোগী তীনোঁ অবধূতা॥**
**ভক্তি করী না মালিক পাএ। অপনে কো তুম অমর বতাএ॥**
**বহ কর্তা হৈ সবসে ন্যারা। হম তুম সবকা সিরজনহারা॥**
**গরুড় কহত হৈ সচ্চী বাণী। ঐসে বচন কহা মাতা রানী॥**
**সব উঠ গএ অপনে অস্থানা। সাচ বচন কাহু নহীঁ মানা॥**

**শব্দার্থ:-** মাতা দেবী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব কে বললেন, "হে পুত্র! শোনো! তোমরা তিন জনই স্বয়ং সাধক। সত্য ভক্তি করোনি। নিজেকে অমর বলছো কারন তোমরা পরমাত্মাকে পাওনি। তিনি সৃষ্টির উৎপত্তি কর্তা এবং সবার থেকে আলাদা। তিনিই আমাদের সকল জীবের আত্মাকে উৎপত্তি করেছেন। মাতা যখন এই কথা বললেন তখন সভার সকল সদস্য এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ উঠে নিজের-নিজের স্থানে চলে গেলেন। কিন্তু মাতার কথাও সত্য বলে মানেন নি।

"গরুড় বচন"

**ব্রহ্মা বিষ্ণু মোহে বুলায়া। মহা দেব ভী বহাঁ বৈঠ পায়া॥**
**তীনোঁ কহে কোঈ দো প্রমাণা। তব হম তোহে সাচা জানা॥**
**মৈঁ কহা গুঙ্গা গুড় খাবৈ। দুজে কো স্বাদ ক্যা বতলাবৈ॥**
**মৈঁ জাত হুঁ সতগুরু পাসা। লা প্রমাণ করু ভ্রম বিনাশা॥**
**ত্রিদেব কহেঁ লো পরীক্ষা হমারী। পূর্ণ করে তেরী আশা সারী॥**
**হমহী মারেঁ হমহী বচাবৈঁ। হম রহত সদা নিদাবৈঁ॥**
**গরুড় কহা হম করেঁ পরীক্ষা। তুম পূর্ণ তো লূঁ তুম্হারী দীক্ষা॥**
**উড়া বহাঁ সে গুরু পাসে আয়া। সব বৃত্তান্ত কহ সুনায়া॥**

শব্দার্থ:- গরুড়জীকে শ্রীব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিব নিজের লোকে ডেকে নিয়ে বললেন, হে গরুড়! তুমি কোনও প্রমাণ দাও যে, আমাদের থেকেও কোন বড় সমর্থ শক্তি আছে, কোনও অভিজ্ঞতা বলো। তাহলে আমরা তোমার কথা সত্য বলে মেনে নেব। গরুড় জী উত্তর দিলেন, যেমন কোন বোবা (গুঙ্গা) ব্যক্তি গুড় খেয়ে অন্য কে তার স্বাদ বলে বোঝাতে পারে না। সে তার আনন্দ নিজে অনুভব করতে পারে। প্রসন্নচিত্ত দেখা দেয়। সেই রকম আমিও আমার অনুভব আপনাদের বোঝাতে পারব না। আমি সদগুরুর কাছে সত্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান শুনেছি এবং নিজের চোখে পূর্ণ পরমাত্মাকে দেখেছি। আপনাদেরকে সতগুরুই পরমাত্মার দর্শন করাতে পারেন। আমি আমার সদগুরুজীর নিকটে যাচ্ছি। আপনাকে বিশ্বাস করানোর জন্যে কোনো প্রমান নিয়ে আসি, যার দ্বারা আপনাদের সন্দেহের সমাধান হয়। ত্রিদেব বললেন, হে গরুড়! তুমি আমাদের পরীক্ষা করে দেখো, আমরা তোমার সকল মন-কামনা পূর্ণ করে দেব। আমরাই সৃষ্টি, পালন আর সংহার করি। মৃত্যু থেকে আমরাই বাঁচাতে পারি। আমরা পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থাৎ যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। গরুড় জী বললেন, আমি আপনাদের পরীক্ষা নেব। যদি প্রমাণিত হয় আপনি পূর্ণ পরমাত্মা, তাহলে আমি আপনার শিষ্য হব। গরুড় ওখান থেকে উড়ে সতগুরু কবীরজীর নিকটে এলেন। কবীরজী ঐ সময় জোগজীত

নামে প্রকট ছিলেন। তাই জোগজীত জী কে সর্ব বৃতান্ত বললেন।

সতগুরু (কবীর) বচন

**"গরুড় সুনো বঙ্গদেশ কো জাও। বালক মরেগা কহো উসে বচাও॥**
**দিন তীন কী আয়ু শেষা। করো জীবিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশা॥**
**ফির হম পাস আনা ভাঈ। হম বালক কো দেবেঁ জিবাঈ॥**
**বঙ্গদেশ মে গরুড় গয়ো, বালক লিয়া সাথ।**
**ত্রিদেবা সে অর্জ করী, জীবন দে বালক করো সুনাথ॥**

শব্দার্থ:- জোগজীত রূপে কবীরজী বললেন, হে গরুড়! বঙ্গ দেশে (বর্তমান বাংলাদেশ) যাও। ওখানে একটি বালক আছে, তার আয়ু মাত্র তিন দিন বাকি আছে। তিন দিন পরে ঐ বালকের মৃত্যু হবে। ঐ বালককে নিয়ে ত্রিদেবের (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ ) কাছে যাও আর বলো, এই বালককে জীবিত করো। ত্রিদেবের দ্বারা ঐ বালক জীবিত হবে না। তখন ঐ বালককে নিয়ে তুমি আমার কাছে আসবে। আমি ওকে জীবিত করে আয়ু বাড়িয়ে দেব। সদ গুরুর আদেশ অনুসারে গরুড়জী বঙ্গদেশ থেকে ঐ বালক কে নিয়ে তিন দেবের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করল, যদি এই বালকের আয়ু বাড়িয়ে জীবন দান করতে পারেন তাহলে আমি আপনাদের সমর্থ পরমাত্মা মেনে নেব।

"ত্রিদেব বচন"

**ধর্মরাজ পর হৈ লেখা সারা। বাসে জানে সব বিচারা॥**
**গরুড় ঔর বালক সারে। গএ ধর্মরাজ দরবারে॥**
**ধর্মরাজ সে আয়ু জানী। দিন তীন শেষ বখানী॥**
**য়াকী আয়ু বঢ়ে নাহী। মৃত্যু অতি নিয়ড়ে আয়ী॥**
**ত্রিদেব কহঁ আএ রাখো লাজা। হম ক্যা মুখ দিখাবেঁ ধর্মরাজা॥**
**ধর্ম কহ আপনা আয়ু দে ভাঈ। তো বালক কী আয়ু বঢ় জাঈ॥**
**চলে তীনোঁ নহীঁ পার বসাঈ। বনে বৈঠে থে সমর্থ রাঈ॥**
**সুন গরুড় য়হ সত্য হৈ ভাঈ। আঈ মৃত্যু ন টালী যাঈ।**

**শব্দার্থ:-** তিন দেবতা বললেন, ধর্ম রাজের কাছে সমস্ত জীবের জন্ম-মৃত্যু লেখা আছে। তাঁর সঙ্গে কথা বলি। ত্রিদেব ঐ বালক ও গরুড়কে নিয়ে ধর্মরাজের (কাল ব্রহ্মের ন্যায়ধীশ) কার্যালয়ে গেলেন এবং বালকের আয়ুর খোঁজ করে জানতে পারলেন যে, তিন দিন পরে ঐ বালকের মৃত্যু হবে। ধর্ম রাজ বললেন, এর মৃত্যু অতি নিকটে। আয়ু বাড়ানো সম্ভব নয়। তখন ত্রিদেব বললেন, হে ধর্ম রাজ! আমরা আপনার দরবারে এসেছি, আমাদের সম্মান রাখার জন্য এই বালকের আয়ু বৃদ্ধি করে দেন। তা-না হলে এই সংসারে আমাদের সম্মান থাকবে না। ধর্মরাজ বললেন, যদি আপনাদের মধ্যে কেউ নিজের আয়ু এই বালককে দান করেন তাহলে এই বালক বাঁচতে পারে। অন্যথায় মৃত্যু নিশ্চিত। এই কথা শুনে ত্রিদেব ওখান থেকে চলে যান যারা নিজেকে স্বয়ম্ভু সমর্থ ভেবে বসেছিলেন। তাঁরা গরুড়কে বললেন, এটা সত্য কথা যে, যার মৃত্যু চলে আসে তাকে কেউ রোধ করতে পারে না।

"গরুড় বচন"

**সমর্থ মেঁ গুণ ঐসা বতায়া। আয়ু বঢ়াবৈ ঔর অমর করাবায়া॥**
**অব মৈঁ জাউঁ সমর্থ পাসা। বালক বচনে কী পুরী আশা।**
**গয়া গরুড় কবীর কী শরণা। দয়া করো হো সাহব জরণা (বিশ্বাস)॥**

**শব্দার্থ:-** গরুড় বললেন, পরমাত্মার মধ্যে এমন শক্তি আছে যে তিনি তাঁর সাধকের আয়ু বৃদ্ধি করতে পারেন এবং জন্ম-মৃত্যুর রোগ চিরকালের জন্য সমাপ্ত

করে অমর করে দিতে পারেন। এখন আমি ঐ সমর্থ পরমেশ্বরের নিকটে যাচ্ছি, এই বালকের জীবন বাঁচানোর পূর্ণ আশা আছে। গরুড়জী পরমাত্মার কাছে এসে প্রার্থনা করলেন, হে পরমাত্মা! এই বালককে জীবিত করার কৃপা করুন যাতে আপনার সামর্থ্যের উপর জনতার বিশ্বাস হয়।

"কবীর সাহেব বচন"

**সুনো গরুড় এক অমর বাণী। য়হ অমৃত লে বালক পিলানী॥**
**জীবৈ বালক উমর বাঢ় জাবৈ। জগ বিচরে বালক নির্দাবৈ॥**
**বালক লানা মেরে পাসা। নাম দান কর কাল বিনাশা॥**
**জৈসা কহা গরুড় নে কীন্হা। বালক কূঁ জা অমৃত দীনা॥**
**লে বালক তুরন্ত হী আএ। সতগুরু সে দীক্ষা পাএ॥**
**আশীর্বাদ দিয়া সতগুরু স্বামী। দয়া করি প্রভু অন্তর্যামী॥**
**বদলা ধর্মরাজ কা লেখা। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আঁখোঁ দেখা॥**
**গএ ফির ধর্মরাজ দরবারা। লেখা ফির দিখাউ তুমহারা॥**
**ধর্মরাজ জব খাতা খোলা। অচর্জ দেখ মুখ সে বোলা॥**
**পরমেশ্বর কা য়হ খেল নিরালা। উসকা ক্যা করত হৈ কালা॥**
**বো সমর্থ রাখনহারা। বানে লেখ বদল দিয়া সারা॥**
**সৌ বর্ষ য়হ বালক জীবৈ। ভক্তি জ্ঞান সুধা রস পীবৈ॥**
**য়হ ভী লেখ ইসী কে মাহীঁ। আঁখো দেখো ঝূঠী নাহীঁ॥**
**দেখা লেখা তিনোঁ দেবা। অচর্জ হুয়া কহূঁ ক্যা ভেবা॥**
**বোলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশা। পরম পুরুষ হৈ কোঈ বিশেষা॥**
**জো চাহে বহ মালিক করসী। বাকী শরণ ফির কৈসে মরসী॥**
**পক্ষীরাজ তুম সাচে পায়ে। নাহক হম মগজ পচাএ॥**
**করো তুম জো মান মন তেরা। তুমহারা গরুড় ভাগ বড়েরা॥**
**পূর্ণ ব্রহ্ম অবিনাশী দাতা। সচ্চ মেঁ হৈ কোঈ ঔর বিধাতা॥**
**ইতনা কহ গএ অপনে ধামা। গরুড় ঔর বালক করি প্রণামা॥**
**ভক্তি করী বালক চিত লাঈ। গরুড় অরু বালক ভয়ে গুরু ভাঈ॥**
**ধর্মদাস য়হ গরুড় কো বোধা। এক-এক বচন কহা মৈঁ সোধা॥**

**শব্দার্থ:-** কবীর পরমেশ্বর নিজের করমণ্ডল থেকে গরুড়কে কিছু জল দিলেন এবং বললেন, এটা অমৃত জল। ঐ বালক কে পান করাও। এই জল পান করার পর তার দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা জাগবে এবং তখন কালের প্রভাব থাকবে না, পরে ঐ ছেলেকে আমার কাছে এনে দীক্ষা দেওয়াবে। তাহলে তার আসন্ন মৃত্যু সমাপ্ত হয়ে যাবে। সত্ গুরুর আদেশ অনুসারে বালককে অমৃত জল পান করিয়ে সদগুরুর কাছে এনে ঐ বালককে নাম দীক্ষা দেওয়ালেন। পরমাত্মা বালককে আর্শীবাদ দিয়ে কৃতার্থ করেন, তখন ধর্ম রাজের লেখা বদলে গেল। তিন দেব ধর্মরাজের কাছে গিয়ে বালকের আয়ুর বিষয়ে জানতে চাইলে ধর্মরাজ নিজে পড়ে শোনায় যে, এই মানব শরীরধারী জীব ১০০ বছর পর্যন্ত জীবিত থেকে সতভক্তি করবে। পূর্ণ পরমাত্মার পক্ষ থেকে এই আয়ু বৃদ্ধি করা হয়েছে। ধর্মরাজ পড়লেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নিজের চোখে দেখলেন। এটা দেখে অবাক হলেন। তখন ধর্মরাজও আশ্চর্য হয়ে বললেন, এটা পরমেশ্বরের অদ্ভুত লীলা। কাল ব্রহ্ম কিছুই করতে পারবে না। কাল ব্রহ্মের দ্বারা নির্ধারিত মৃত্যু পরমাত্মার আদেশে সমাপ্ত হয়ে যায়। তিনিই জীবের অন্য

সর্মথ রক্ষক। তিনি আমার খাতার পুরানো লেখা পরিবর্তন করেছেন। এই বালক এখন ১০০ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকবে এবং ভক্তিও করবে। এটাও এখানে লেখা আছে। আমি মিথ্যা বলছি না, আপনি নিজে দেখুন। স্বচক্ষে দেখে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব বললেন, এটা আশ্চর্যের কথা এবং স্বীকার করলেন যে, বাস্তবে পরমাত্মা অন্য কেউ। তিনি যা চান তাই করতে পারেন। যে তাঁর শরণে চলে গিয়েছে, সে কিভাবে মরতে পারে। হে পক্ষী রাজ গরুড়! তোমার কথা সত্য, আমরা বৃথা তোমার সঙ্গে বাদ - বিবাদ করেছি। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর,তোমার ভাগ্য ভাল। এই কথা বলে ত্রি-দেব নিজের- নিজের লোকে চলে গেলেন। গরুড় ও বালক ধর্মরাজকে প্রণাম করলেন। কবীরজী ধর্মদাসজীকে বললেন যে, এই ভাবে গরুড়ও ঐ বালক গুরু ভাই হল। হে ধর্মদাস! এইভাবে গরুড় শরণে এসেছিল, এটাই গরুড় বোধ।

শ্রী হনুমানের গুরু কে ছিলেন? পড়ুন "কবীর সাগর" অধ্যায়ের "হনুমান বোধ" এর সারাংশ।

## অধ্যায় "হনুমান বোধের" সারাংশ

কবীর সাগরের পৃষ্ঠা ১১৩-তে, ১২-তম অধ্যায়ে "হনুমান বোধ" আছে।

কবীর সাগরের এই অধ্যায়ে পবনপুত্র হনুমানকে শরণে আনার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্মদাসজী প্রশ্ন করলেন,"হে পরমেশ্বর কবীর বন্দীছোড়! আপনি ভক্ত আত্মা পবন পুত্র হনুমানজীর সাথে কি দেখা করেছিলেন?

**উত্তর** (পরমেশ্বর কবীরজীর) = হ্যাঁ।

**প্রশ্ন**(ধর্মদাসজীর):- হে প্রভু! হনুমানজী আপনার জ্ঞান স্বীকার করেছিল কি? হনুমানজী তো আমার মত শ্রীরাম তথা বিষ্ণুজীর প্রতি অটুট শ্রদ্ধা রাখতেন। হনুমানজীকে শরণে আনা আর সূর্য পশ্চিম দিকে উদয় হওয়ার সমান।

**উত্তর** (পরমেশ্বর কবীরজীর):- পরমেশ্বর কবীরজী, হনুমানজীকে শরণে আনার বৃত্তান্ত বললেন। আপনারা এখন পড়ুন শ্রী রামপালজী মহারাজ দ্বারা কবীর সাগরের 'হনুমান বোধের' সরলার্থের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:-

রামায়ণ গ্রন্থে বালী নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ভাই-এর নাম ছিল সুগ্রীব। কোনও কারনে বালী নিজের ভাই সুগ্রীবকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। ভায়ের স্ত্রীকে নিজের দখলে করে স্ত্রী বানিয়ে রেখেছিলেন। দুঃখী সুগ্রীব দূর দেশে হতাশ হয়ে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন এবং হনুমানজীকে এক পাহাড়ে বসে রাম-রাম জপ করতে দেখলেন। সুগ্রীব ও হনুমানের মধ্যে মিত্রতা হল। সুগ্রীব নিজের দুঃখের কাহিনী হনুমানজীকে শোনালেন। শরণাগত সুগ্রীবকে হনুমানজী সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সুগ্রীব হনুমানজীকে বললেন যে বালীর নিকট এমন সিদ্ধি আছে, কেউ বালীর সাথে যুদ্ধ করলে তার অর্ধেক শক্তি বালীর ভিতরে প্রবেশ করে। এই কথা শুনে হনুমানজী শান্ত হয়ে গেলেন এবং যুদ্ধ করার পরিকল্পনা ত্যাগ করলেন। ঐ সময় রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র বনবাসে ছিলেন। পত্নী সীতা ও ভাই লক্ষ্মনও সাথে ছিলেন। শ্রী লঙ্কার রাজা রাবণের বোন লক্ষ্মণকে দেখে বিবাহ করতে চাইলেন। লক্ষ্মন বললেন, আমার বিবাহ হয়ে গিয়েছে। (লক্ষ্মনের স্ত্রীর নাম ছিল উর্মিলা) শূর্পণখা বিয়ের জন্য বার বার জেদ করছিলেন। লক্ষ্মনের কোনও কথা মানতে রাজী হচ্ছিলেন না। সে যে কোনও মূল্যে লক্ষ্মণকে বিবাহ করবে। শেষ নাগের অবতার লক্ষ্মণ ক্রোধিত হয়ে শূর্পণখার নাক কেটে দেন। নিজের দুর্দশার কথা ভাই রাবণকে জানায়। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতাকে অপহরণ করার পরিকল্পনা করেন।

সাধু বেশ ধরে মামা মারীচির সহযোগে সীতাজীকে অপহরণ করেন।

সীতাজীর খোঁজে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ বনে বনে ঘুরতে থাকে। ঐ সময় শ্রী হনুমানজী ও শ্রী সুগ্রীবের সাথে শ্রীরামচন্দ্রের দেখা হয়। সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রকে নিজের দুঃখের কথা বলেন। তখন শ্রী রামচন্দ্র শর্ত রাখেন, আমি তোমাকে তোমার রাজ্য বালীর কাছ থেকে উদ্ধার করে দেব, কিন্তু সীতাজীকে খোঁজ করার জন্য আমাকে সাহায্য করতে হবে। সুগ্রীব শর্ত মেনে নেন। শ্রীরামচন্দ্র বৃক্ষের আড়াল থেকে যুদ্ধ করে বালীকে বধ করে সুগ্রীবকে রাজতিলক করে দেন। সুগ্রীব ও নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করেন। সীতার খোঁজ করার জন্য চারিদিকে সেনা পাঠান। জটায়ু পাখী শ্রীরামকে বলেন, সীতা মাতাকে লঙ্কেশ্বর রাবণ অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছেন। আমি মাতাজীকে ছাড়ানোর জন্য চেষ্টা করি কিন্তু আমার ডানা কেটে দেন। রাবণের সঙ্গে কথা বলে সীতাজীকে উদ্ধার করে আনার জন্য হনুমানকে রাজদূত নিয়োগ করেন। হনুমানের উপর সীতার বিশ্বাস জন্মানোর জন্য শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে একটি আংটি দেন।

ঐ আংটির উপর শ্রী রাম লেখা ছিল। আংটিতে রাম নাম লেখা ছিল। যাতে এই আংটি দেখে সীতা হনুমানকে চিনতে পারেন বা বিশ্বাস করতে পারেন যে শ্রীরামচন্দ্রই হনুমান কে পাঠিয়েছেন। শ্রী হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের মুদ্রী (আংটি) নিয়ে আকাশ মার্গে উড়ে শ্রীলঙ্কায় গেলেন। রাবণ সীতাজীকে নৌলখা বাগানে বন্দী করে রেখেছিলেন। হনুমান মাতা সীতাকে আংটি দিয়ে নিজের প্রমাণ দিলেন যে শ্রীরাম তাকে পাঠিয়েছেন। সীতা রাবণের অত্যাচারের কথা হনুমানকে বললেন আর নিজের হাতের কঙ্কন (বিবাহের চিহ্ন) বের করে দিলেন। আর বললেন, ভাই! এই কঙ্কন শ্রীরামচন্দ্রকে দেখালে শ্রীরামচন্দ্র তখন বিশ্বাস করবে যে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করেছ। হনুমানজীর সাথে যাওয়ার জন্য সীতা মানা করে দেন। হনুমানজী ফল খাওয়ার ইচ্ছা ব্যাক্ত করলেন। তখন সীতাজী বললেন, "ভাই! গাছ থেকে ফল পেড়ে খাওয়ার আদেশ আমারও নেই, যদি কোথাও ফল পড়ে থাকে তাহলে খেতে পারো। এই কথা শুনে হনুমানজী ক্রোধিত হয়ে নৌলখা বাগানের গাছ ভেঙে তছনছ করে দিলেন। আর নিজের ইচ্ছামত ফল খেয়ে বাগানের গাছ সমুদ্রে ফেলে দিলেন। লঙ্কার রাজা রাবণের আদেশে রাক্ষসরা হনুমানের লেজে কাপড় আর তুলা বেঁধে আগুন লাগিয়ে দিল। হনুমান নিজের লেজের আগুন দিয়ে লঙ্কা জ্বালিয়ে দিল।

এরপরে হনুমানজী আকাশ মার্গে উড়ে সমুদ্র পার করে এক পাহাড়ের উপর নামলেন। তখন ভোরের সময় ছিল। পাহাড়ের জলাশয় স্বচ্ছ পবিত্র জলে ভরা ছিল। নিকটে একটি ফলের বাগান ও ছিল। বাগানের গাছে প্রচুর ফল ছিল। হনুমানজীর ক্ষুধা পেয়েছিল। তাই স্নান করে ভোজনের চিন্তা করে কঙ্কনটিকে একটি পাথরের উপর রাখলেন। স্নান করার সময়ও হনুমানজীর চোখ কঙ্কনের দিকে ছিল। হঠাৎ এক লঙ্গুর বানর এসে কঙ্কন নিয়ে যায়। হনুমানজী চিন্তা করলেন যে বানর কঙ্গন সমুদ্রে ফেলে না দেয়। তাহলে তার সর্ব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যবে। এখন লঙ্কায় যাওয়ারও পরিস্থিতি নেই। তাই হনুমানজী বানরের পিছনে পিছনে দৌড়াতে লাগল। দেখতে দেখতে বানর এক ঋষির কুটীরের বাইরে রাখা একটি ঘড়ার (কলশির মত) মধ্যে কঙ্কন ঢুকিয়ে দিয়ে দৌড়ে পালাল। হনুমানজী নিশ্চিন্ত হয়ে দীর্ঘ শ্বাস নিলেন। কঙ্কন বের করার জন্য কলশির ভিতর ঝুঁকে দেখলেন যে একই রকম অনেকগুলি কঙ্কন রয়েছে। হনুমানজীর সামনে আবার সমস্যা দেখা দিল। কঙ্গন বের করে দেখেন সব একই রকমের কোন পার্থক্য নাই। নিজের কঙ্কন কোনটা হনুমানজী চিনতে পারলেন না। অন্য কঙ্কন নিয়ে গেলে শ্রীরামচন্দ্র যদি বলেন, এটা সীতাজীর কঙ্গন

নয়, তাহলে সর্ব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। সামনে এক ঋষি হনুমানজীর দুঃখ দেখে মৃদু মৃদু হাসছিল। মুনিজী কুটিরের বাইরে এসে বললেন, এসো পবণপুত্র! বল কি সমস্যা হয়েছে, কেন দুঃখী হয়ে আছো? হনুমানজী বললেন, ঋষিজী! শ্রী রামচন্দ্রজীর পত্নীকে লঙ্কার রাজা অপহরণ করেছে। আমি খোজ করে এসেছি। ঋষিজী বললেন, কত নম্বর রামের কথা বলছো? হনুমান আশ্চার্য হয়ে ভাবলেন, ঋষি ভাঙ্গের নেশায় বলছে না তো। হনুমানজী জিজ্ঞাসা করলেন, হে ঋষিজী! রাম কত জন আছে? ঋষিজী বললেন, অনেক রাম আগে চলে গিয়েছে, পরেও আসবে। ঋষিজীর কথা হনুমানজীর ভালো লাগল না। কিন্তু ঋষির সহিত বাদ বিবাদ করাও ঠিক না। ঋষিজী হনুমানজীকে বললেন, তুমি খুব ক্লান্ত কিছু খেয়ে বিশ্রাম কর। আমি ভোজন তৈরি করছি। হনুমানজী বললেন, ঋষিজী আমি খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছি। সীতা মাতা আমাকে কঙ্গন দিয়েছিলেন। ঐ কঙ্কন ছাড়া শ্রীরামচন্দ্র আমাকে বিশ্বাস করবেন না যে আমি সীতা মায়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছি। ঐ কঙ্কনকে পাথরের উপর রেখে আমি স্নান করছিলাম। এক বাঁদর সেই কঙ্গন এনে এই কলসির মধ্যে ফেলেছে। কিন্তু এই কলসিতে অনেক কঙ্কন। আমি চিনতে পারছি না কোনটা সীতা মায়ের কঙ্কন। সব কঙ্কনদেখতে একই রকম।

ঋষি রূপে বসে থাকা কবীর পরমেশ্বর বললেন, হে পবন নন্দন! তুমি যেকোনো একটি কঙ্কন নিয়ে যাও, কোনো পার্থক্য নেই। আর বললেন, এখানে যত কঙ্গন পড়ে আছে ততবার দশরথ পুত্র রাম বনবাসে আসে আর রাবণ সীতাকে হরণ করে এবং হনুমান খোঁজ করে এখানে আসে। আর বানর এই কলসিতে কঙ্গন ফেলে চলে যায়, পরে হনুমান নিয়ে যায়। হনুমানজী বললেন, ঋষিজী! আপনার কথা ঠিক। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। প্রত্যেকবার বানর এই কলসিতে কঙ্কন ফেলে চলে যায়। পরে হনুমান এই কলসি থেকে কঙ্কন নিয়ে চলে যায়। তাহলে এই কলসিতে এতো কঙ্কন কি করে থাকে? ঋষি মুণিন্দ্রজী বললেন, আমার আশীর্বাদে এই কলসে, যে বস্তু পড়বে তা একইরকম দুটি হয়ে যাবে। এই কথা বলে ঋষিজী একটি মাটির বাটি কলসিতে ফেললেন আর একই রকম দুটো বাটি হয়ে গেল। ঋষি বললেন, হে হনুমান তুমি যে কোনো একটি কঙ্কন নিয়ে যাও। কোন অসুবিধা হবে না। হনুমানজীর কাছে অন্য কোন বিকল্প ছিল না, তাই ঋষিজীর কথা বিশ্বাস করে ঐ কলসি থেকে একটা কঙ্কন নিয়ে আকাশ পথে চলে গেলেন।

হনুমানজী শ্রীরামচন্দ্রকে সীতার চিহ্ন কঙ্কন দিলেন এবং মাতা সীতা যে যে কথা বলেছিলেন, তা শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন। শ্রীরামচন্দ্র কঙ্কন দেখে ভাবুক হলেন আর হনুমানজীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে হনুমান! আমি তোমার উপকার কিভাবে শোধ করবো? তুমি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমার এই কঠিন কাজ করেছো। এই কঙ্গন সীতারই। এখন সবাইকে ডেকে পরবর্তী পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

সমুদ্রের উপর দিয়ে সেতু নির্মানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। রামচন্দ্র তিন দিন হাঁটু পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের কাছে রাস্তার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু সমুদ্রের কোন পরিবর্তন না দেখে, শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন, আমার অগ্নিবান নিয়ে এসো। সমুদ্রকে শুকিয়ে দেব। লাতোঁ কা ভূত বাতোঁ সে নেহী মানতে। তখন সমুদ্র বিপ্র রূপ ধারন করে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এসে হাত জোড় করে বললেন, হে ভগবান! আমার ভিতর অগনিত সংসার বাস করছে। আপনি পাপের ভাগী কেন হবেন! আপনি এক কাজ করুন যাতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না।

আপনার সেনাতে নল-নীল নামের দুই সৈনিক আছে। গুরুজীর আশীর্বাদে

ওদের হাত দিয়ে ফেলা পাথরও আমার উপর ভাসে। তখন রাজা রামচন্দ্র নল-নীলকে পরীক্ষা করার জন্য ডাকলেন এবং জলে পাথর ফেলে দেখানোর জন্য বললেন। ঐ সময় নল-নীল নিজের অহংকারবশত গুরুজীকে স্মরণ না করে, জলে পাথর ফেলল, তার ফলে পাথর জলে ডুবে গেল। রামচন্দ্র সমুদ্রের দিকে এমন ভাবে তাকালেন যেন তিনি মিথ্যা কথা বলছেন। তখন সমুদ্র নল-নীল কে বললেন, হে মূর্খ! তোমরা তোমাদের গুরুজীকে স্মরণ করো তখন নল-নীল নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সদগুরুদেবের স্মরণ করতে লাগল। সদগুরু মুনিন্দ্রজীকে আসতে দেখে নল-নীল বলল, ঐ যে আমাদের গুরুজী আসছেন।

শ্রীরামচন্দ্র চিন্তা করলেন যখন শিষ্যকে শক্তি দিতে পারেন তখন আমার কাজও করে দিতে পারবেন। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার ছিলেন। শ্রীবিষ্ণু কাল নিরঞ্জনের পুত্র। যে সময় পরমেশ্বর কবীরজী নিজের পুত্র জোগজীতের রূপ ধরে প্রথমবার জ্যোতি নিরঞ্জন কালের লোকে এসেছিলেন তখন কাল প্রথমে তো পরমাত্মার সাথে ঝগড়া করেছিলেন। কিন্তু বিপদের লক্ষণ দেখে পরমাত্মার পা ধরে ক্ষমা প্রার্থণা করলেন। পরমাত্মা রূপী জোগজীতের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থণা করলেন। তার মধ্যে এই প্রার্থণাও ছিল যে, তাঁর অংশ বিষ্ণু ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র নামে রাজা দশরথের পুত্র হয়ে জন্ম নেবে। পরে তার বনবাস হবে। সাথে তার স্ত্রীও থাকবে লঙ্কার রাক্ষস রাজা রামচন্দ্রের পত্নীকে অপহরন করবে। তখন রামচন্দ্র সমুদ্রের উপর সেতু (ব্রিজ) নির্মানের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হবে। দয়া করে তখন আপনি সেতু বানিয়ে দেবেন। দ্বিতীয়ত দ্বাপরযুগে সে শ্রীকৃষ্ণ রূপে জন্ম নেবে। মৃত্যুর পরে পুরী নগরীতে এক জগন্নাথ নামের মন্দির সমুদ্রের তীরে বানাবে। কিন্তু সমুদ্র মন্দিরকে নষ্ট করে দেবে। আপনি সমুদ্রের হাত থেকে ঐ মন্দিরকে রক্ষা করবেন। পরমেশ্বর কবীরজী আশীর্বাদ দেন, ঠিক আছে, আমিই সেই কার্য করবো। ঐ বচন পালনের জন্য ঋষি মুণীন্দ্র রূপে কবীর পরমেশ্বর সেতুবন্দের উপর প্রকট হলেন এবং আসার পথে পর্বতের চারদিকে নিজের ছড়ি দিয়ে রেখা অঙ্কিত করতে করতে আসছিলেন।

নল-নীল দূর থেকে গুরুজীকে দেখে চিনতে পারলো আর বলল, আমাদের গুরুজী চলে এসেছেন। শ্রীরামচন্দ্র নিজের দুঃখের কথা বললেন এবং বিনম্রভাবে কার্য সিদ্ধির আশীর্বাদ প্রার্থণা করলেন। পরমেশ্বর বললেন যে নল-নীল অপরাধ করেছে, তাই তাদের শক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছে। আমি সামনের ঐ পাহাড়ের চারিদিকে রেখা টেনে দিয়েছি। ঐ রেখার ভিতরের সব পাথর কাঠের থেকেও হাল্কা হয়ে গিয়েছে, জলে ডুববে না। হনুমানজী রামের ভক্ত ছিলেন, পাথরের উপর রাম-রাম লিখে উঠিয়ে এনে জলের উপর রাখল তো পাথর ডুবল না। নল-নীল দক্ষ রাজমিস্ত্রী ছিল, সেই কারনে পাথরের সঙ্গে পাথর জোড়া লাগাচ্ছিল। প্রথমে শ্রীরাম দ্বারা জলে পাথর ভাসল না, নল-নীলও অসফল হল। হনুমান দাঁড়িয়ে রাম-রাম করছিল, সকলের ইচ্ছা ছিল পাথর জলে ভাসুক কিন্তু ব্যর্থ হল। মুণীন্দ্র ঋষির (কবীর জী) আশীর্বাদে পাথর হাল্কা হয়ে গেল এবং সমুদ্রের জলে ভাসতে লাগল।

হনুমান জী তো নিজের রাম-রামের পাঠ করার জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে পাথরের উপর রাম-রাম লিখছিলেন। হনুমানজী যেখানেই বসতেন সেখানেই গাছপালা লতাপাতার উপর রাম-রাম বলতেন বা লিখতেন। হনুমানজী দশরথের পুত্র রামকে জানতেনই না। তার আগে থেকেই হনুমান রাম-রাম জপ করতেন। আমরা লোকবেদে শুনেছি (কিংবদন্তি) নল-নীল সাগরে পাথর ভাসিয়েছিল, তবে সমুদ্রে সেতু তৈরী হল। আর কেহ বলে হনুমানজী পাথরে রাম-নাম লিখেছিল, তাই পাথর জলে ভেসেছিল। এও

শোনা যায়, শ্রীরামের জন্য পাথর জলে ভেসেছিল। পাথর ভাসানো নিয়ে যেসব কথা হয়েছিল তার মধ্যে কারণ এটা ছিল যে মুনীন্দ্র ঋষি জী বলেছিলেন, "আমি পর্বতের পাথর হালকা করে দিয়েছি। এই ঘটনা 20-30 জন ব্যক্তির সম্মুখে হয়েছিল। কোটি কোটি ব্যক্তি যুদ্ধের জন্য এসেছিল, তারা তো আদেশ পাওয়া মাত্র পাথর আনতে শুরু করেছিল। যোদ্ধারা দেখল হনুমান পাথরে রাম-রাম লিখছে। অন্য যোদ্ধারা পাথর তুলে নিয়ে আসছে। নল-নীল পাথর জোড়া দিয়ে সেতু তৈরি করছে। শ্রীরামচন্দ্র নল-নীলকে বাহবা দিচ্ছেন।

অন্য উপস্থিত ব্যক্তিরা একে অপরকে বলতে লাগল হনুমানজী পাথরে রাম-রাম লিখেছে তাই পাথর জলে ভাসছে। কিছু ব্যক্তির মনে হল, নল-নীলের কাছে শক্তি আছে তাই পাথর জলে ভাসছে। এইভাবে লোক মুখে ভ্রমিত জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ল। সেতু নির্মান করে যুদ্ধে লেগে পড়ল। সেনা লঙ্কায় প্রবেশ করে যুদ্ধ শুরু করে। বেশির ভাগ সেনা মারা গেল, বাকিরা নিজের নিজের বাড়ি চলে গেল। আর নিজের গ্রাম, শহরে সেতু নির্মানের ভুল তথ্য প্রচার করল, যা আজ পর্যন্ত নির্বিবাদে চলছে। উপরোক্ত কথা সত্য যা এই দাস (রামপাল দাস) বলছে। যখন যুদ্ধ শুরু হল, তখন শ্রীরামের সেনার উপর নাগ ফাঁস অস্ত্র ছোড়া হয়েছিল। যার কারণে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্বুবান সহ সর্ব সেনা সাপ দ্বারা বাঁধা পড়েছিল। সাপ সর্ব যোদ্ধাকে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেছিল, হাত গুলোও শরীরের সঙ্গে বাঁধা পড়েছিল, নাড়াতে পারছিল না। যেমন কৃষক আখ বেঁধে দেয় ঐ রকম নিস্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল। তখন গরুড়কে ডাকা হয়েছিল। গরুড় সমস্ত নাগকে কাটল। তারপর সমস্ত সেনা তথা শ্রীরাম নাগের বন্ধন থেকে মুক্ত হলেন।

লক্ষ্মণ তীর বিদ্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। (কোমা-তে চলে গিয়েছিল) তখন হনুমানজী লঙ্কা থেকে বৈদ্যকে ডেকে এনেছিলেন। বৈদ্য বললেন, দ্রোনাগিরি পর্বতে সঞ্জিবনী জড়িবুটি (ঔষধ) আছে। ঐ গাছ রাত্রে জোনাকির মত জ্বলে। সূর্য উদয়ের পূর্বে কেউ যদি ঐ ঔষধ আনতে পারে তাহলে লক্ষ্মণ বাঁচবে। তা না হলে মৃত্যু নিশ্চিত। শ্রীরাম এই কাজের ভার হনুমানকে দিয়ে বললেন, হনুমান! তুমি ছাড়া এই কাজ অন্য কারো দ্বারা সম্ভব নয়। আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে হনুমান আকাশ মার্গে দ্রোনাগিরি পর্বতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। রাক্ষসরা নিজের মায়া শক্তি দিয়ে অন্য নকল জড়ি বুটির ভিতরে চমক সৃষ্টি করে দিয়েছিল। কবিরাজ বলেছিলেন যে, এই জড়ী সংখ্যায় খুব কম । দিনের বেলায় চেনা যায় না কারন তার চারপাশে একই রকম দেখতে ঔষধির চারাগাছ থাকে। হনুমানজীর বুঝতে দেরি হয়নি। তাই তিনি দ্রোনাগিরী পর্বতকে তুলে আকাশ মার্গে চলতে লাগলেন। শ্রীরাম আর লক্ষ্মণ হনুমানকে তাদের ভাই ভরতের শক্তির বিষয় বলেছিলেন যে, আজ যদি ভাই ভরত থাকতো তাহলে ভরত একলা রাবণ ও রাবণের এক লাখ পুত্র ও সোয়া লাখ নাতিকে যমলোকে পাঠিয়ে দিত। তাই হনুমানজী মনে মনে চিন্তা করলেন যে যাওয়ার সময় ভরতকে পরীক্ষা করে যাবে। ভরত জানতেন রাম ও রাবণের যুদ্ধ চলছে। আকাশ পথে পর্বত সহ হনুমানকে যেতে দেখে ভাবলেন কোনও রাক্ষস যাচ্ছে, এ রামের ক্ষতি করতে পারে। তাই ভরত তীর মারলেন। হনুমান জী তির লাগার বাহনা করে হে রাম হে রাম, করতে করতে মাটিতে পড়ে গেলেন। পর্বতকেও ধরিত্রীর উপর রেখে দিলেন।

রাম-রাম শব্দ শুনে ভরতের বুঝতে দেরি হল না, এ আমাদের পক্ষের যোদ্ধা। ভরত কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? কোথায় যাচ্ছেন? এই পর্বত কেন নিয়ে যাচ্ছেন? আমার নাম ভরত আমি শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের ভাই। তখন হনুমানজী

বললেন, আমার নাম হনুমান। রাম রাবণের যুদ্ধ চলছে। আপনার ভাই লক্ষ্মন শক্তি সেলে অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে। কবিরাজ দ্রোনাগিরি পর্বতে এক জড়িবুটির (ঔষধ) কথা বলেছিলেন, আমি চিনতে না পেরে পাহাড়টাই উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে পৌঁছাতে হবে। অন্যথায় লক্ষ্মণের মৃত্যু হবে। আপনি বিচার না করে তির মেরেছেন। এখন সূর্য উদয়ের আগে কিভাবে পৌঁছাব?

ভরত তির মারার কারণ বললেন, হে অঞ্জনী লাল! চিন্তা করো না। তুমি দ্রোনাগিরি পর্বতকে ওঠাও আর বানের অগ্রভাগে বসো। দুই পা আগে-পিছে করে দাঁড়াও। আমি তির দ্বারা পর্বত সহ তোমাকে সময়ের পূর্বে পৌঁছে দিচ্ছি।

হনুমানজীর নিজের শক্তির উপর অত্যাধিক গর্ব করতেন। ভূমিতে রাখা তীরের উপর হনুমান দুই পা দুই পাশে রেখে দিয়ে দ্রোনাগিরি পর্বত হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভরত পর্বত হাতে হনুমান সহ ঐ তিরকে উঠিয়ে নিজের বুকের সমানে এনে ধনুকে জোড়েন। হনুমান আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে পর্বত সহ তাকে এমনভাবে ওঠালেন যেন শুধু তির ওঠাচ্ছেন। তখন হনুমান বললেন, হে দশরথ পুত্র! আমি আপনাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। আমি সুস্থ আছি। আমি নিজে উড়ে গিয়ে সময়ের পূর্বে পৌঁছে যেতে পারবো। আপনার প্রশংসা আপনার ভাইরা করেন। যদি আজ ভরত থাকতো তাহলে একাই রাবণ ও তার সেনা সমেত সকলকে যমলোকে পাঠিয়ে দিত। ঐ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। আজ নিজের চোখে তোমার শক্তি দেখলাম আপনি সত্যিই মহা বলবান ও বীর যোদ্ধা। আপনি আমার অভিমান সমাপ্ত করে দিয়েছেন। এই বলে, হনুমান তীরের উপর থেকে লাফ দিয়ে আকাশে উড়ে গেলেন। কিন্তু তির স্থির ছিল।

এটা ভাবার বিষয়। যদি কেউ ভারী বস্তু ওঠায়, তো দুই হাত বা এক হাত দিয়ে ধরে উঠায়। কিন্তু ঐ ভারী জিনিসকে লাঠি বা ডাণ্ডা দিয়ে ওঠানো অসম্ভব। সামান্য ওজনকে ডান্ডা দিয়ে উঠানো সম্ভব । ভরতজী মহাবলী হনুমান ও দ্রোনাগিরী পর্বতকে ৫০ ফুট উপরে উঠিয়ে ধনুকে জুড়ে ছিলেন। ত্রেতা যুগে মানুষ ৭০/৮০ ফুট লম্বা হতো। এটা কোন সামান্য কথা নয়। কেউ কোন ব্যক্তিকে ডান্ডা দিয়ে উঠিয়ে দেখুক, কেমন অনুভূতি হবে? কবিরাজ সঞ্জীবনী ওষুধ দিয়ে লক্ষ্মণকে সুস্থ করলেন। যুদ্ধ হল আর রাবণ মারা গেল। রাবণ প্রভু শিবের ভক্তি করেছিলেন। দশবার নিজের মাথা কেটে শিবজীকে দান করেছিলেন। শিবজী দশবারই মাথা ফিরিয়ে দেন আর আশীর্বাদ দেন,দশবার গর্দন (গলা) কাটার পরে রাবণের মৃত্যু হবে। দশবার রাবণের গলা কাটার পরে, নাভীতে তির লেগে নাভীর অমৃত নষ্ট হওয়ার কারণে রাবণের মৃত্যু হয়েছিল। দশবার রাবণের মাথা কাটা গেল কিন্তু প্রতিবার মাথা পুনরায় জোড়া লেগে যেত। তখন বিভীষণ বললেন, রাবণের নাভীতে অমৃত আছে। রামচন্দ্র রাবণের নাভীতে তির মারার অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু রাবণের লক্ষ্যও নাভীর দিকে ছিল যাতে নাভীতে তির না লাগে। তখন রামচন্দ্রজী পরমেশ্বরকে স্মরণ করলেন, হে প্রভু! এই রাক্ষস কে মারুন, আমাকে সাহায্য করুন। হে মহাদেব! হে দেবাদিদেব! হে মহাপ্রভু! আমাকে সহায়তা করুন। আপনার পুত্রী (সীতা) মহাকষ্টে আছে। আপনার সন্তান তেত্রিশ কোটি দেবতাকেও এই রাক্ষস জেলে বন্দী করে রেখেছে। তখন পরমেশ্বর কবীর জী গুপ্ত রূপ ধারণ করে রামের হাতের উপর নিজের সূক্ষ্ম হাত রাখলেন এবং রাবণের নাভীতে তির মেরে রাবণকে বধ করেন। {পরমেশ্বর কবীরজীকে প্রাপ্ত করার পর সন্ত গরীবদাসজী (গ্রাম ছুড়ানী, জেলা ঝজ্জর, হরিয়াণা) পরমেশ্বরের মহিমায় বলেছেন :-

**কবীর, কহ মেরে হংস কো, দুঃখ না দীজে কোয়।**

**সন্ত দুঃখাএ মৈঁ দুঃখী, মেরা আপা ভী দুঃখী হোয়॥**
**পহুঁচুঙ্গা ছন এক মৈঁ, জন আপনে কে হেত।**
**তেতীশ কোটি কী বন্ধ ছুটাঙ্গী, রাবণ মারা খেত।**
**জো মেরে সন্ত কো দুঃখী করেঁ, বাকা খোউঁ বংশ।**
**হিরণাকুশ উদর বিদারিয়া, মৈঁ হী মারা কংস॥**
**রাম-কৃষ্ণ কবীর কে শহজাদে, ভক্তি হেত ভয়ে প্যাদে॥}**

**শব্দার্থ:-** সন্ত গরীবদাসজী বলেছেন, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা তাদের পূর্ব জন্মের শুভ কর্মের ফল স্বরূপ পরমাত্মা কবীরজী করেছিলেন। কারণ শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ঐ অনাদি সম্রাট কবীরজীর রাজকুমার ছিলেন। সকল প্রাণীই পরমাত্মা কবীর জীর সন্তান এবং রাম-কৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রী বিষ্ণু তো খুব ভালো আত্মা। ওনাদেরও রক্ষা পরমাত্মা কবীরজীই করেন। তাই পরমাত্মা সকলকে সাবধান করে বলছেন, আমার ভক্তদেরকে কেউ কষ্ট দিও না। আমার ভক্তকে কষ্ট দিলে আমি দুঃখী হই, তাই তার রক্ষা করার জন্য ক্ষনিকের মধ্যে পৌঁছে যাবো। এই কারণেই যখন শ্রীরামচন্দ্র রাবনকে মারতে পারছিল না তখন আমি সুক্ষ্ম রূপ ধারণ করে রামের হাত ধরে রাবনের নাভিতে তির মারি এবং রাবণের মৃত্যু হয়। এইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণকে সহায়তা করে আমি কংসকে বধ করেছিলাম। যে আমার ভক্তকে দুঃখী করবে আমি তার বংশ সমাপ্ত করে দেব। লংকার রাজ্য রাবণের ছোট ভাই শ্রী বিভীষণকে দিই। শ্রী রামচন্দ্র সীতার অগ্নি পরীক্ষা নেয়। কারণ যদি রাবণের মিলন সীতার সঙ্গে হয়ে থাকে তাহলে সীতা ভষ্ম হয়ে যাবে। আর যদি সীতা পবিত্র হয় তাহলে আগুনে জ্বলবে না। সীতাকে আগুন স্পর্শ করে নি। উপস্থিত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিরা সীতা মাতার জয় জয়কার করে। সীতা মাতা সতীর পদবী পান। রাবণ বধ আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের দশমীতে হয়েছিল।

রাবণ বধের ২০-দিন পরে ১৪ বছর বনবাস সমাপ্ত করে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও মাতা সীতা পুষ্পক বিমানে বসে অযোদ্ধা নগরীতে আসেন। ঐ দিন কার্তিক মাসের অমাবস্যার দিন ছিল। ঐ অন্ধকার অমাবস্যার দিনে অযোধ্যাবাসীরা নিজের বাড়ীতে শুদ্ধ দেশী ঘি দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষণ ও সীতামাতার আগমনের খুশি পালন করে। ভরত নিজের বড় ভাইকে রাজ্য ফিরিয়ে দেন। একদিন মাতা সীতা শ্রীরামচন্দ্রকে বলেন, যুদ্ধ করা যোদ্ধাদের আমি কিছু উপহার দিতে চাই। সীতামাতা নিজের গলার আসল মুক্তোর মালা হনুমানকে উপহার দেন আর বলেন, হে হনুমান! এই অমূল্য উপহার আমি তোমাকে দিচ্ছি, খুব সাবধানে রাখবে। হনুমান মুক্তোর মালার একটি দানা ভাঙলেন তারপর একের পর এক টুকরো টুকরো করে ভেঙে সব মুক্তো গুলি মাটিতে ফেলে দিলেন। হনুমানের এই ব্যবহার মাতা সীতার ভালো লাগেনি।

সীতামাতা রেগে গিয়ে বলেন, হে মুর্খ! এ কি করলি? এতো অমূল্য মালার সর্বনাশ করে দিয়েছিস। তুই বানর বানরই রয়ে গেলি, চলে যা আমার চোখের সামনে থেকে। ঐ সময় শ্রীরামচন্দ্র সীতামাতার পাশেই সিংহাসনে বসে ছিলেন। উনিও হনুমানের এই ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ছিলেন তাই কিছু না বলে চুপ করে বসে রইলেন। হনুমান বলে, হে মাতা! যে জিনিসে রাম নাম অঙ্কিত নেই,তা আমার কোন কাজের নয়। তাই আমি মুক্তো ভেঙে দেখছি, এতে রাম নাম লেখা নেই। তখন মাতা সীতা বলেন, তোর শরীরে কি রাম নাম লেখা আছে? কিসের জন্য রেখেছিস ঐ শরীর? চিরে ফেলে দে। ঐ সময় হনুমান নিজের বুক চিরে দেখায়। তাতে রাম নাম লেখা ছিল। হনুমানজী ঐ সময় দুঃখে অযোধ্যা ত্যাগ করে বহু দূরে চলে যান।

শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যা নগরীর জনতাদের দুঃখ-কষ্ট জানার জন্য ছদ্মবেশে রাত্রে

ঘুরে বেড়াতেন। কয়েক বছর পরে একদিন রাজা রামচন্দ্র এক গলির ভিতর বিচরণ করছিলেন। তখন একটি ঘরের ভিতর থেকে চিৎকারের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। রাজা রামচন্দ্র কাছে গিয়ে দেখেন এক ধোবী তার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করছে। ধোবীর স্ত্রী ঝগড়া করে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল। দুই দিন সে নিজের বোনের বাড়িতে থেকে বাড়ি ফিরে এসেছে। তাই ধোবী স্ত্রীকে মারধোর করে বলছিল, তুই আমার বাড়ি থেকে চলে যা। দুই রাত বাইরে কাটিয়ে এসেছিস, তুই কলঙ্কিত হয়ে গিয়েছিস। তোকে আমি বাড়িতে রাখবো না। ধোবীর স্ত্রী বলছিল, ভগবানের নামে, রাজা রামচন্দ্রের নামে শপথ করে বলছি, আমি পবিত্র। আপনি মেরেছিলেন তাই রাগে বোনের বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। আমি নির্দোষ। ধোবী বলে, আমি দশরথের পুত্র রামচন্দ্র না, যে কলঙ্কিত স্ত্রীকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে যে কয়েক বছর রাবণের সাথে ছিল। অযোধ্যা নগরীর সবাই সেই চর্চা করছে। যার স্ত্রী অপবিত্র হয়ে গেছে তার বেঁচে থেকে লাভ কি? রাজা রামচন্দ্র ধোবীর মুখে এই কথা শুনে হতভম্ব হয়ে যান, মনে হচ্ছিল কেউ যেন গরম তেল কানে ঢেলে দিয়েছে।

পরের দিন শ্রীরামচন্দ্র সভা ডাকলেন এবং অযোধ্যা নগরীতে চলতে থাকা চর্চার বিষয়ে বললেন। আর বললেন, এই চর্চা তখনই বন্ধ হবে যখন আমি সীতাকে ঘর থেকে বের করে দেব! তখনই  মাতা সীতাকে সভাতে ডেকে আদেশ শোনান রাজবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার, কারণও জানিয়েদিলেন। সীতা মাতা বিনম্র ভাবে বললেন, হে স্বামী! আপনি আমার অগ্নি পরীক্ষা নিয়েছেন। আমি আমার আত্মা থেকে বলছি, রাবণ আমাকে স্পর্শও করে নি। কারন রাবণকে এক ঋষি অভিশাপ দিয়েছিল যদি তুই পরস্ত্রীর সঙ্গে জোর করে সহবাস করিস তাহলে ঐ সময় তোর মৃত্যু হবে কিন্তু যদি পরস্ত্রীর সহমতে তার সাথে মিলন করিস তবে তোর মৃত্যু হবে না। তাই রাবণ আমাকে কু-ভাবনায় স্পর্শও করেনি । হে প্রভু! আমি গর্ভবতী। এই স্থিতিতে আমি কোথায় যাব? সংসারে রাবণের মত লোকের অভাব নেই। রামচন্দ্র আদেশ দিয়েই সভা ছেড়ে চলে যান। আর বলে গেলেন আমি নিন্দার পাত্র হতে চাই না। আমার কুলের (বংশের) বদনাম হবে। মাতা সীতার পায়ের তলার মাটি যেন সরে যেতে লাগে। চারিদিকে অন্ধকার দেখতে পায়। মনে হয় যেন জীবন শেষ হয়ে গেল।

সীতা অযোধ্যা ছেড়ে যাওয়ার সময় রামচন্দ্র আর মহলকে বার বার পিছন ফিরে দেখতে থাকে। অনেক দূরে জঙ্গলে গিয়ে  বাল্মীকি ঋষির কুটিরের কাছে হাঁপিয়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। ঋষি বাল্মীকি স্নানের উদ্দেশ্যে আশ্রম থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় এক গর্ভবতী যুবতীকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে আশ্রম থেকে জল ও ওষুধ এনে মাতা সীতার মুখে দেন। গরমের দিন ছিল। চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ছিটে দিলে সীতার জ্ঞান ফিরে আসে। ঋষিজী নাম আর গ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করলে বলেন, নীচে পৃথিবী, আর উপরে আকাশ এর থেকে বেশি কিছু বলতে পারব না। ঋষিরা দয়াবান হয়। বলেন, এই সংসার স্বার্থের! পুত্রী! ধন্যবাদ কর পরমাত্মাকে, তুই আমার আশ্রমে এসেছিস। পুত্রী! আমাকে পিতা মনে করে আমার আশ্রমে থাক।

মাতাসীতা ঋষি বাল্মিকীর আশ্রমে থাকতে লাগেন। ঋষিজীও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করেননি। পরমেশ্বর কবীরজী ত্রেতাযুগে মুণিন্দ্র ঋষি রূপে লীলা করছিলেন। হনুমানজীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সত্‌সাহেব বলেন। হনুমানজীও রাম রাম বলেন, এবং দাঁড়িয়ে ঋষি জীর আদর সম্মান করেন। একটি পাথরের উপর স্বয়ং বসেন এবং অন্য একটি পাথরের উপর ঋষিজীকে বসার জন্য প্রার্থণা করে। হনুমানজী ঋষি মুণিন্দ্রজীকে মনে মনে চেনার চেষ্টা করতে লাগলেন। মুনিন্দ্র জী বললেন, কি চিন্তা

করছো হনুমান? আমি সেই ঋষি, যে ঋষির আশ্রমে বানর সীতার কঙ্কন এনে কলসির মধ্যে ফেলেছিল। তার মধ্যে অন্য কঙ্কনগুলিও একই রকম ছিল। হে হনুমান! ঐ কঙ্কন কেমন ছিল? হনুমানজীর চিনতে দেরি হলো না, আর ঋষিজীকে প্রণাম করলেন। হনুমানজী বললেন, হে ঋষিজী! আজ কি মনে করে এসেছেন? কবীর পরমেশ্বর (মুণিন্দ্র ঋষি রূপে) বললেন, হে পবন পুত্র! আমি আপনাকে ভক্তিজ্ঞান দিতে এসেছি। আপনি যে দশরথ পুত্র রামচন্দ্রকে পূর্ণ পরমাত্মা মনে করে পূজা করছেন। আপনি ভ্রমিত হয়ে আছেন। যে মায়ের পেটে জন্ম নেয় আর যার মৃত্যু হয় সে পূর্ণ পরমাত্মা হতে পারে না। পূর্ণ পরমাত্মা তো অবিনাশী। হনুমানজী বললেন, হে ঋষিবর! আপনার বচনে আমি খুব দুঃখ পাই। আমার ভাবনায় আঘাত লাগে। আপনি অন্য কোনো বিষয়ে চর্চা করুন। পরমেশ্বরজী বললেন, যদি কেউ ভুল রাস্তায় যায়, আর ঐ ভুল রাস্তাকে সঠিক মনে করে চলে, যে রাস্তা জঙ্গলে ডাকাতদের আড্ডার দিকে যাবে। যদি কোন সজ্জন (ভাল লোক) ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে বলে, আপনি যে রাস্তায় যাচ্ছেন সে রাস্তা ঠিক নয়। ঐ রাস্তায় গেলে আপনার ও আপনার জিনিস পত্রের ক্ষতি হবে। সামনেই ডাকাতের আড্ডা প্রথমে তারা মারধোর করে তারপর লুটপাট করে। উত্তরে ঐ নির্বোধ ব্যক্তি যদি বলে, আপনি আমার ভাবনাকে কেন আঘাত করছেন। তা কতটা ঠিক? হনুমানজী চুপ থাকে। আর মৃদু মৃদু হাসতে থাকে, যেন মনে মনে বলছিল-হ্যাঁ আপনি সত্যি বলছেন। হনুমানের চেহারায় শান্তি দেখে, পরমেশ্বর বললেন, শ্রীরামচন্দ্র শ্রীবিষ্ণুর অবতার। শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীশিবের পিতা কাল ব্রহ্ম। এই কাল ব্রহ্মকে জ্যোতি নিরঞ্জন বলা হয়। অভিশাপের কারণে কাল মানব শরীর ধারী এক লাখ প্রাণীকে প্রতিদিন খায় আর সোয়া লাখ উৎপন্ন করে। সেই জন্য নিজের তিন পুত্রকে এক এক বিভাগের স্বামী (প্রভু) বানিয়ে রেখেছে। ব্রহ্মা রজোগুণযুক্ত যার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে প্রাণী সন্তান উৎপত্তি করে। আর যে কারণে জীব ভুল বশত ব্রহ্মাকে উৎপত্তিকর্তা মনে করে। বাস্তবে উৎপত্তি কর্তা তো পূর্ণ পরমাত্মা।

কাল ব্রহ্ম তার দ্বিতীয় পুত্র বিষ্ণুকে কর্মানুসারে পালন-পোষণ করার বিভাগ দিয়েছেন, শ্রীবিষ্ণু সত্ত্বগুণ। তৃতীয় পুত্র তমোগুণ শিবকে এক লাখ মানব শরীর ধারী জীবকে মেরে তার (কালের) কাছে পাঠানোর বিভাগ দেয়। কাল নিজে অব্যক্ত (গুপ্ত) থাকে। আপনি (হনুমান) দেখছেন এখানে কোন জীব অমর নয়। দেবতারাও মারা যায়। ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিবেরও জন্ম- মৃত্যু হয়। তারা নির্ধারিত আয়ু পর্যন্ত বাঁচেন, বৃদ্ধ অবস্থাও আসে। কিন্তু এমন একটি লোক আছে যেখানে বৃদ্ধাবস্থা ও মৃত্যু হয় না। ওখানে কোন রাবণ কারো স্ত্রীকে অপহরণ করে না। আপনার চোখের সামনে লঙ্কায় রাম-রাবণের যুদ্ধে কত যোদ্ধা এবং অন্য প্রাণী মারা গেল। একমাত্র সীতা মাতা কে মুক্ত করানোর জন্য। আপনি নিজের প্রাণের বাজি লাগিয়ে লঙ্কা জ্বালিয়ে ছিলেন। রাবণের ভাই মহিরাবণ (বা অহিরাবণ) যে পাতালের রাজা ছিল। বলি দেওয়ার জন্য রাম-লক্ষ্মণকে চুরি করে পাতালে নিয়ে যায়। আপনি ওখানে গিয়ে তাদের মুক্ত করে নিয়ে আসেন। আপনিই বলুন, উনি পরমাত্মা? যে সময় "নাগ ফাঁস অস্ত্র" ছেড়ে সর্প দ্বারা শ্রীরাম, লক্ষণ, আপনি এবং সর্বসেনাকে বাঁধা হয়েছিল। সাপে আপনাদের সকলকে চারদিক থেকে বেঁধে রেখেছিল। তখন আপনারা অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই রাবণের সেনারা আপনাদের সকলকে খুব সহজেই কেটে ফেলত। ঐ সময় গরুড়কে ডাকা হয়। গরুড় সবাইকে নাগ-পাশের বন্ধন থেকে মুক্ত করে। পরমাত্মা কি এতটাই অসহায়? যে পরমাত্মা নিজে নিজের বন্ধন মুক্ত করতে পারে না, সে ভক্তকে কিভাবে মুক্ত করবে? এখন তুমিই বিচার করো।

**কাটে বন্ধন বিপত মেঁ, কঠিন কিয়ো সংগ্রাম।**
**চিন্হো রে নর প্রাণিয়ো, গরূড় বড়ো কে রাম॥**

**শব্দার্থ:** এই বানীর শব্দার্থ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

হনুমানজী বললেন, ঋষিজী! সমুদ্রে সেতু তৈরি করা কি সাধারণ মানুষের দ্বারা সম্ভব? পরমাত্মা ছাড়া ঐ কার্য সম্ভব নয়।

**সমন্দর পাঁটি লঙ্কা গয়ো, সীতা কো ভরতার।**
**অগস্ত ঋষি সাতোঁ পীয়ে, ইনমেঁ কৌন করতার॥**

**শব্দার্থ:** যদি সমুদ্রের উপর সেতু বানানোর জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে পরমাত্মা মনে করো। তাহলে অগস্ত ঋষি সাত সমুদ্রের জল পান করেছিলেন। এদের মধ্যে কে পরমাত্মা?

মুণিন্দ্র ঋষি বললেন, আপনি কি ভুলে গেছেন। এক ঋষি এসে একটি ছড়ি দিয়ে একটি পর্বতের চারিদিকে রেখা অঙ্কিত করে পাথরকে হাল্কা করে দিয়েছিল। সেই পাথর জলে ভেসেছিল। আর সেই পাথর দিয়ে সেতু তৈরি হয়েছিল। রামচন্দ্র তিনদিন ধরে সমুদ্রের কাছে রাস্তার জন্য প্রার্থনা করেছিল। সমুদ্র এসে নল- নীলের কথা বলে। হনুমানজী বললেন, উনি তো বিশ্বকর্মা ছিলেন যিনি সাধুর রূপ ধরে এসেছিলেন রামচন্দ্রের আহ্বানে। পরমেশ্বর কবীরজী বললেন, বিশ্বকর্মা পুল তৈরি করতে পারে কিন্তু পাথরকে জলে ভাসাতে পারে না। নল-নীলের হাতে শক্তি ছিল। তাদের হাতে যে কোন বস্তু জলে ফেললেই তা ভাসতো। ঐ দিন অভিমানের কারণে ওদের শক্তি সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ঐ আশীর্বাদ আমিই দিয়েছিলাম। তখন হনুমানজী বললেন, আপনি কি সেই মুণিন্দ্র ঋষি? পরমেশ্বর কবীরজী বলেন, হ্যাঁ। আপনি নিজের জীবনের চিন্তা না করে শ্রীরামের জন্য কি না করেছেন? মাতা সীতা যখন আপনাকে কটুকথা বলে সেখান থেকে চলে যেতে বলেন, তখন রামচন্দ্রও সিংহাসনে বিরাজমান ছিলেন। একটি কথাও বলেননি। রামচন্দ্র চুপ না থেকে বলতে পারতেন সীতা এধরনের কথা বলা শোভা পায় না। পবন পুত্র হনুমান মনে মনে স্বীকার করলেন, কিন্তু মুখে বললেন, ঋষিজী অন্যের আলোচনা করা উচিত না। মুনিন্দ্রজী বলেলেন, সত্য বলা আলোচনা নয়। যদি রামচন্দ্র ও সীতামাতার মধ্যে ভালো মানুষের গুণ থাকতো তাহলে আপনার (হনুমানের) উপকারের কথা চিন্তা করে নিজের চরণে রাখত। আপনি তো রাম ছাড়া বেঁচে থাকাও উচিত মনে করেন না। আরো শুনুন! আপনার সাথে যে ব্যবহার করেছে তার ফলও রামচন্দ্র ও সীতা পেয়েছে। কিছু বর্ষ পরে শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন। তখন উনি গর্ভবতী ছিলেন। এই কথা শুনে হনুমানের চোখে জল চলে আসে। আর মুনিন্দ্র ঋষির শ্রীচরণে পড়ে যান। অযোধ্যাবাসীরা দুই বছর দীপাবলী আর দশাহরা পালন করেছিল। তারপর বন্ধ করে দেয়। কারণ যে দেবীর জন্য রাবণ কে মারা হয়েছিল সেই দেবী না জানি কত রাবণের থেকে কষ্ট পাবে। দীপমালা খুশীর প্রতীক। যখন রাজা আর রানী পৃথক হয়ে গিয়েছে তখন দীপাবলির খুশি না রাজার ভালো লাগে, না প্রজার। এইজন্য ঐ দিন থেকে দীপাবলী উৎসব বন্ধ হয়ে যায়। যেই দুই বছর পালন করা হয়েছিল সেই আধারে সাদাসীধে জনতা দীপাবলীর উৎসব আজও পালন করতে থাকে।

এইভাবে দীপাবলী ও দশহরার পরম্পরা চলে আসছে। যদি পরিবারের কোন যুবকের মৃত্যু হয় তাহলে ঐ পরিবার বা আত্মীয়-স্বজন কোন উৎসব পালন করে না।

হনুমানজী বললেন, হে প্রভু! পরমেশ্বরের চর্চা করো। কবীর পরমেশ্বর জী সৃষ্টি রচনা শোনালেন । সৃষ্টি রচনার সত্য কথা শুনে হনুমান গদ-গদ হয়ে যায়। সতলোক

দেখার প্রার্থণা করেন। পরমেশ্বর আকাশে উড়ে যান। হনুমানজী দেখতে লাগেন। কিছুক্ষণ পরে অন্তর্ধ্যান হয়ে যান। হনুমানজি চিন্তা করতে লাগেন এখন ঋষিজীকে কোথায় পাবো? ইতিমধ্যে আকাশে বিশেষ প্রকাশ দেখতে পায়। পরমাত্মা হনুমানকে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে সতলোক দেখালেন। ঋষি মুনিন্দ্রজী সিংহাসনে বিরাজমান আছেন। তখন ওনার শরীরে অত্যাধিক প্রকাশ ছিল। মাথায় মুকুট আর মহারাজার মত ছত্র ছিল। কিছুক্ষণ ঐ দৃশ্য দেখিয়ে হনুমানের দিব্য দৃষ্টি সমাপ্ত করে দেন। মুনিন্দ্রজী নিচে এলেন। হনুমানজীর বিশ্বাস হল যে, উনিই পরমেশ্বর আর সতলোকই আসলে সুখের স্থান। তখন হনুমানজী মুনিন্দ্র রূপে পরমেশ্বর কবীরজীর কাছ থেকে নাম দীক্ষা নিলেন। নিজের জীবনের কল্যাণ করান আর মুক্তির অধিকারী হন। এইভাবে পরমার্থী স্বভাবের পবিত্র আত্মা হনুমানজীকে পরমেশ্বর কবীরজী নিজের শরণে আনেন। পরমার্থী আত্মাকে সংসার ও কাল লোকের স্বামী ফল না দিলেও পরমাত্মা ঐ আত্মাকে যে কোন প্রকারে নিজের শরণে নেয়। কেননা এ রকমই আত্মা পরম ভক্ত হয়ে ভক্তি করে এবং মোক্ষ প্রাপ্ত করে। সাংসারিক মানুষ যারা পরমার্থীদের সরলতার সুযোগ নিয়ে ফাঁকি দেয় তারা আজীবন কষ্টময় জীবন ব্যতীত করে।

অবশেষে শ্রীরামচন্দ্রকে নিজের পুত্র লব-কুশের হাতে পরাজিত হতে হয়। মাতা সীতা ওনার দর্শন করাও উচিত মনে করেননি। দেখতে দেখতে পৃথিবীতে প্রবেশ করে গেলেন। এই দুঃখে শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যার কাছে সরযু নদীতে জল সমাধি নিয়ে নিজের জীবন লীলা সমাপ্ত করে। পরমার্থী হনুমান নিঃস্বার্থে দুঃখীর সহায়তা করার ফল পায়। পরমাত্মা স্বয়ং এসে মোক্ষ মার্গ দেখান এবং হনুমানের জীবের কল্যাণ হয়। হনুমানজী পুনরায় মানব জীবন প্রাপ্ত করবে। তখন পরমেশ্বর কবীরজী ওনাকে শরণে নিয়ে মুক্ত করাবেন। ঐ আত্মার মধ্যে সত্য ভক্তির বীজ ফেলে দিয়েছেন।

## আমরা কালের জালে কিভাবে ফেঁসেছি?

এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য কৃপা করে পড়ুন 'সৃষ্টি রচনা' অধ্যায়টি যা এই পুস্তকের "জীবনের পথ" পৃষ্ঠা নম্বর 219 থেকে 266 তে আছে।

## "কবীর পরমেশ্বরের কালের সঙ্গে বার্তা"

বর্তমানে আমরা যে সকল প্রাণী কাল লোকে বসবাস করছি। কাল সেই সকল আত্মার উপর পাঁচ তত্ত্বের স্থূল শরীরের আবরণ চড়িয়ে জীব সৃষ্টি করে দিয়েছে। আত্মার জনক পূর্ণ পরমাত্মাকে ভুলিয়ে সর্ব জীবকে ভ্রমিত করে রেখেছে এবং নিজেকে পরমাত্মা বলে সিদ্ধ করে রেখেছে। কাল পরমাত্মার অংশ জীব আত্মাকে দুঃখী করে, যাতে পরমাত্মা ও দুঃখী হয়। কাল মন রূপে প্রত্যেক আত্মার সাথে থেকে খারাপ কাজ করিয়ে জীবকে দণ্ড ভোগ করায়। যেমন নেশা করা, চুরি করা, পরস্ত্রীর দিকে কু-দৃষ্টিতে তাকানো এ সবই মনরূপে কাল করায়। যদি আপনারা আমার (লেখক রামপালজী মহারাজ) থেকে দীক্ষা নেন তাহলে জীব আত্মা সোজা ভক্তির পথে চলবে। কারণ জীব আত্মার সাথে পরমাত্মার শক্তি থাকে। তত্ত্বজ্ঞানে আত্মা জাগ্রত হয়ে যায়। পরমাত্মার শক্তির কারণে আত্মা দৃঢ় হয়ে যায় তখন কালের প্রভাব ধীরে ধীরে সমাপ্ত হতে থাকে। কাল ব্রহ্মা একমাত্র কবীর পরমেশ্বরকে ভয় পায়। সন্ত গরীব দাসজী বলেছেন:-

**কাল ডরৈ করতার সে, জয়-জয়-জয় জগদীশ।**
**জৌরা জোড়ী ঝাড়তা, পগ রজ ডারে শীশ॥**
**গরীব, কাল জো পীসে পীসনা, জৌরা হৈ পনিহার।**

**যে দো অসল মজদূর হৈঁ, সতগুরূ কবীর কে দরবার॥**

ভাবার্থ একেবারে স্পষ্ট। পরমেশ্বর কবীর জী আমাদের আত্মাকে কাল জাল থেকে বের করার জন্য প্রচেষ্টা করছেন। আর কাল ব্রহ্ম ফাঁসিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। পরের প্রকরণে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।

পরমেশ্বর যখন সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করে নিজ লোকে বিশ্রাম করতে লাগেন। আমরা সকল আত্মারা তখন কালের ব্রহ্মাণ্ডে থেকে নিজের কর্মদণ্ড ভোগ করে খুব দুঃখী রইতে লাগলাম। সুখ ও শান্তির খোঁজে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকি। আর নিজ ঘর সতলোকের কথা মনে করতে থাকি এবং সেখানে যাওয়ার জন্য ভক্তি আরম্ভ করি। কেউ চারবেদ কণ্ঠস্থ করে, কেউ তপ করে জীবন কাটিয়ে দেয় আবার কেউ হবন (যজ্ঞ) করে, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি ক্রিয়া প্রারম্ভ করে দেয়। কিন্তু নিজের ঘর সতলোকে যেতে পারে না। কারণ, উক্ত ক্রিয়াগুলি করার ফলে পরের জন্মে সুখ সমৃদ্ধির জীবন প্রাপ্ত করে (যেমন রাজা, মহারাজা, বড় ব্যবসায়ী, অফিসার, আধিকারিক, দেব-মহাদেব, স্বর্গ-মহাস্বর্গ ইত্যাদি), পুনরায় চুরাশি লক্ষ যোনী ভুগতে থাকে এবং খুব দুঃখী হয়ে পরম পিতা পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থণা করতে থাকি যে, হে দয়ালু! আমাদের নিজের বাড়ির রাস্তা দেখান। আমরা হৃদয় দিয়ে আপনার ভক্তি করছি। আপনি আমাদের দর্শন দিচ্ছেন না কেনো?

কবীর সাহেব, ধর্মদাস জীকে এই সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে বলছেন, ধর্মদাস! জীবদের এই আর্তনাদ শুনে আমি সতলোক থেকে জোগজীতের রূপ ধরে কালের লোকে আসি। তখন একুশ ব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ কালের নিজ লোকে তপ্ত শিলার উপরে জীবকে ভেজে তার সুক্ষ্ম শরীর থেকে গন্ধ বের করছিল। তখন আমি সেখানে পৌঁছতেই জীবের জ্বালার কষ্ট সমাপ্ত হয়ে যায়। তারা আমাকে দেখে বললো, হে পরমপুরুষ! আপনি কে? আপনার দর্শন মাত্র আমাদের বড়ই শান্তির আভাস হচ্ছে। তখন আমি বলি, আমি পারব্রহ্ম পরমেশ্বর কবীর। তোমরা সকল জীবেরা আমার লোক থেকে এসে এই কাল ব্রহ্মের লোকে ফেঁসে গিয়েছো। এই কাল (ব্রহ্ম) প্রত্যেকদিন এক লক্ষ মানবের সুক্ষ্ম শরীর থেকে গন্ধ বের করে খায় তারপর নানা-প্রকার যোনীতে কর্মদণ্ড ভোগ করার জন্য ছেড়ে দেয়। তখন জীবাত্মা বলতে থাকে যে, হে দয়ালু পরমেশ্বর! আমাদের এই কালের কারাগার থেকে বের করুন। আমি বললাম, এই ব্রহ্মাণ্ড কাল তিনবার ভক্তি করে আমার কাছ থেকে প্রাপ্ত করেছে। যে সকল বস্তু তোমরা এখানে ব্যবহার করছো, তা সবই কালের। তোমরা সবাই স্বেচ্ছায় ঘোরার জন্য এখানে এসেছিলে। এই জন্য তোমাদের উপর কাল ব্রহ্মার প্রচুর ঋন জমে গিয়েছে, এই ঋণ আমার আসল নাম ছাড়া সমাপ্ত হবে না।

যতদিন পর্যন্ত তোমরা ঋণমুক্ত হবে না, ততদিন কাল ব্রহ্মের কারাগার থেকে বাইরে আসতে পারবে না। এর জন্য তোমাদেরকে আমার কাছ থেকে নাম উপদেশ নিয়ে ভক্তি করতে হবে। তারপর আমি তোমাদেরকে কালের লোক থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাব। আমরা এই সকল বার্তালাপ করছিলাম, ইতিমধ্যে কাল ব্রহ্ম প্রকট হয় এবং ক্রোধিত হয়ে আমার উপর আক্রমণ করে। আমি নিজ শব্দশক্তি দ্বারা তাকে মুর্ছিত করে দিই। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলে, আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে লাগে আর বলে, আপনি আমার বড় ভাই, আর আমি ছোটো, আমাকে দয়া করুন। বলুন, আপনি আমার লোকে কেন এসেছেন? তখন আমি কাল পুরুষকে বলি, কিছু জীবাত্মারা ভক্তি করে নিজ ঘর সতলোকে যেতে চায়। কিন্তু তারা সতভক্তি মার্গ পাচ্ছে না। তাই ভক্তি করার পরেও তারা এই লোকেই থেকে যায়। আমি জীবাত্মাদের সতভক্তি মার্গ বলে

দিতে এবং তোর আসল পরিচয় দেওয়ার জন্য এসেছি যে, তুই কাল। তুই প্রত্যেকদিন এক লক্ষ জীবের আহার করিস ও সোয়া লক্ষ উৎপন্ন করিস এবং স্বয়ং ভগবান হয়ে বসে আছিস। আমি আত্মাদের বলবো যে, তোমরা যার ভক্তি করো সে ভগবান নয়, সে কাল। তখন কাল বলে, যদি আপনি সর্ব আত্মাদের সতলোকে নিয়ে যান তাহলে আমার খাবারের কি হবে? আমি না খেতে পেয়ে মারা যাব। আপনার কাছে আমার প্রার্থনা যে, তিন যুগে কম সংখ্যক জীব নিয়ে যাবেন এবং কাউকে আমার পরিচয় দেবেন না যে, আমি কাল, আমি সকলকে খেতে এসেছি। তারপর যখন কলিযুগ আসবে তখন যত খুশি জীবেদের নিয়ে যাবেন। এই বচন কাল আমার কাছ থেকে প্রাপ্ত করে নেয়।

কবীর সাহেব ধর্মদাস জীকে বলছেন, আমি সত্য যুগে, ত্রেতা যুগে ও দ্বাপরযুগেও এসেছিলাম এবং বহু জীবকে সতলোক নিয়ে গিয়েছি। কিন্তু কাউকে কালের ভেদ (পরিচয়) বলিনি। এখন আমি কলিযুগে এসেছি এবং কালের সাথে আমার বার্তা হয়েছে, কাল ব্রহ্ম আমাকে বলেছিল যে আপনি যথাসম্ভব চেষ্টা করে নিন কিন্তু আপনার কথা কেউ শুনবে না। প্রথমত, আমি জীবকে ভক্তি করার যোগ্যই রাখিনি, তাদেরকে বিড়ি, সিগারেট, মদ, মাংস ইত্যাদির প্রতি আসক্তির অভ্যাস করিয়ে, তাদের প্রবৃত্তি নষ্ট করে দিয়েছি। জীবাত্মাদের বিভিন্ন প্রকার পাখন্ড পূজায় লিপ্ত করে রেখেছি। দ্বিতীয়ত, আপনি যখন নিজের জ্ঞান সকলকে দিয়ে নিজের লোকে ফিরে যাবেন, তখন আমি (কাল) আমার দূত পাঠিয়ে আপনার পন্থের অনুরূপ ১২ টি পন্থ চালিয়ে দিয়ে সবাইকে ভ্রমিত করে দেব। মহিমা বলবে সতলোকের, আপনার জ্ঞান বলবে অথচ নাম জপ করবে আমার। পরিণাম স্বরূপ আমারই ভোজন হবে। এই কথা শুনে কবীর সাহেব বলেন, তুই তোর চেষ্টা কর। আমি সতমার্গ বলেই ফিরবো । আর আমার জ্ঞান যে শুনবে সে তোর চালাকিতে কখনো ফাঁসবে না।

সদগুরু কবীর সাহেব বলেন, হে নিরঞ্জন! যদি আমি চাই তাহলে তোর সব খেল সেকেন্ডের মধ্যে সমাপ্ত করে দিতে পারি। কিন্তু এমন করলে আমার বচনভঙ্গ হবে। এই চিন্তা করে আমার প্রিয় হংস আত্মাকে যথার্থ জ্ঞান দিয়ে, শব্দের বল প্রদান করে সতলোক নিয়ে যাব আরও বললেন যে :-

**কহে কবীর সুনো ধর্মরায়া, হম শঙ্খোঁ হংসা পদ পরসায়া।**
**জিন লীন্হা হমরা প্রবানা, সো হংসা হম কিয়ে অমানা॥**

(পবিত্র ‘কবীর সাগর’ -এ জীবেদের গোলকধাঁধায় ফেলার জন্য এবং নিজের ক্ষুধা নিবারণের জন্য নানান পদ্ধতির বর্ণনা)

**দ্বাদশ পন্থ করূঁ মৈঁ সাজা, নাম তুম্হারা লে করূঁ অবাজা।**
**দ্বাদশ যম সংসার পাঠহো, নাম তুম্হারে পন্থ চলৈহো॥**
**প্রথম দূত মম প্রকটে জাঈ, পীছে অংশ তুম্হারা আই॥**
**যহী বিধি জীবনকো ভ্রমাউঁ, পুরুষ নাম জীবন সমঝাউঁ॥**
**দ্বাদশ পন্থ নাম জো লৈহে, সো হমরে মুখ আন সমৈ হৈঁ॥**
**কহা তুম্হারা জীব নহীঁ মানে, হামরী ঔর হোয় বাদ বখানৈ॥**
**মৈঁ দৃঢ় ফান্দা রচী বানাই, জামেঁ জীব রহে উরঝাঈ॥**
**দেবল দেব পাষাণ পূজাঈ, তীর্থ ব্রত জপ-তপ মন লাঈ॥**
**যজ্ঞ হোম অরূ নেম অচারা, ঔর অনেক ফন্দ মেঁ ডারা।**
**যো জ্ঞানী জাও সংসারা, জীব ন মানৈ কহা তুম্হারা॥**

(সদগুরু বচন)

**জ্ঞানী কহে সুনো অন্যাঈ, কাটেঁ ফন্দ জীব লে যাঈ॥**

**জেতিক ফন্দ তুম রচে বিচারী, সত্য শব্দ তৈ সবৈ বিন্ডারী॥**
**জৌন জীব হম শব্দ দৃঢ়াবৈ, ফন্দ তুম্হারা সকল মুকাবৈ॥**
**চৌকা কর প্রবানা পাঈ, পুরুষ নাম তিহি দেউঁ চিন্হাঈ॥**
**তাকে নিকট কাল নহীঁ আবৈ, সন্ধি দেখী তাকহুঁ সির নাবৈ।**

উপরোক্ত বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয়, কাল ভগবানের বহু পন্থ চলেছে। তাদের কাছে কবীর সাহেবের দ্বারা বলা সত ভক্তি মার্গ নেই। এরা সব কাল প্রেরিত। তাই বুদ্ধিমান লোকের উচিত ভেবে চিন্তে বিচার করে ভক্তি মার্গ গ্রহণ করা। কারণ মনুষ্য জন্ম বারবার মেলে না।

কবীর সাহেব বলেছেন:-

**কবীর মানুষ জন্ম দুর্লভ হৈঁ, মিলে ন বারম্বার।**
**তরুবর সে পত্তা টূট গিরে, বহুর ন লগতা ডার॥**

## "কাল নিরঞ্জন কবীর সাহেবের থেকে তিন যুগে কম জীব নিয়ে যাওয়ার বচন প্রাপ্ত করে"

(বিস্তারিত বর্ণনা)

**প্রশ্ন**:- কবীর জীর নামে চলা ১২ পন্থের বাস্তবিক মুখিয়া (প্রধান) কে আর ১৩ তম পন্থ কে চালাবে?

**উত্তর**:- কবীর সাগরের সংশোধন কর্তা স্বামী যুগলানন্দ (বিহারী) দুঃখ ব্যক্ত করে বলেছে, কবীরজীর গ্রন্থে মাঝে মাঝে গরমিল (ছেড়- ছাড়) করে খুব খারাপ স্থিতি করে রেখেছে।

**উদাহরণ**:- পরমেশ্বর কবীরজী যখন জোগজীত রূপে কাল লোকে আসেন তখন কাল ব্রহ্ম বিবাদ করেছিল। এটা "স্বসমবেদ বোধ" পৃষ্ঠা ১১৭ থেকে ১২২ পর্যন্ত, "অনুরাগ সাগর" ৬০ থেকে ৬৭ পর্যন্ত আছে।

পরমেশ্বর কবীরজী নিজের পুত্র জোগজীতের রূপ ধারণ করে কালের ২১ ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হন। যেখানে তপ্ত শিলায় জীবকে কষ্ট দিচ্ছিল। কাল ব্রহ্ম প্রথমে জগজীতের সঙ্গে ঝগড়া করে। পরে অসহায় হয়ে পা-ধরে ক্ষমা চায় এবং বচন বদ্ধ করে কিছু সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রার্থণা করে।

১. তিন যুগে সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপর যুগে কম জীবকে মুক্ত করে নিয়ে যাবেন।

২. নিজের ইচ্ছায় জোর করে আমার লোক থেকে কোন জীবকে নিয়ে যাবেন না।

৩. আপনি আপনার জ্ঞান বুঝিয়ে জীবকে নিয়ে যাবেন। যে আপনার জ্ঞান বুঝে যাবে, সে আপনার। আর যে আমার জ্ঞান মানবে সে জীব আমার, তার সহিত জোর করবেন না।

৪. কলি যুগে প্রথমে আমার দূত প্রকট হবে। পরে আপনার দূত পৃথিবীতে যাবে।

৫. ত্রেতা যুগে সমুদ্রের উপর সেতু বানিয়ে দেবেন। ঐ সময় আমার পুত্র বিষ্ণু, রামচন্দ্র রূপে লঙ্কার রাজা রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। তখন সমুদ্র পথ দেবে না।

৬. দ্বাপর যুগে বৌদ্ধ জাগ্রত শরীর ত্যাগ করে যাবে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আমার নামে (জগন্নাথ নামে), আমার আদেশে সমুদ্র তীরে জগন্নাথ নামে একটি মন্দির তৈরী করবে। কিন্তু সমুদ্র বাধা দেবে, মন্দির বানাতে দেবে না। আপনি ঐ মন্দিরের সুরক্ষা প্রদান করবেন। পরমেশ্বর জ্যোতি নিরঞ্জনের সর্ব প্রার্থণা স্বীকার করে নেয়। তখন কাল ব্রহ্ম আনন্দিত হয়ে হেসে বলে, হে জোগজীত! আপনি এখন সংসারে যেতে পারেন। কলিযুগে আমি ১২ জন দূত (নকল সদগুরু) সংসারে পাঠাব। কলিযুগের

৫৫০৫ বছরের মধ্যে আমার দূতরা আপনার নামে ১২ কবীর পন্থ চালাবে। জোগজীত রূপে পরমেশ্বর কালকে বলেছিল, কলি যুগে আমার নাম কবীর হবে। আর আমি কবীর নামে পন্থ চালাব। তাই কার্ল ব্রহ্ম বলে, আপনি কবীর নামে এক পন্থ চালাবেন আর আমি ১২ পন্থ চালিয়ে দেব। সর্ব মানবকে ভ্রমিত করে আমার জালে ফাঁসিয়ে রাখব। এছাড়া আরো অনেক পন্থ চালাব তারা সতলোক সচ্চখণ্ডের সত্য সাধনার কথা বলবে কিন্তু সত্য সাধনা ওদের কাছে থাকবে না। জীব সতলোকের আশা করে আমার নাম জপ করে আমার জালে আটকে থাকবে।

কাল ব্রহ্ম জোগজীতকে জিজ্ঞাসা করেছিল আপনি কলিযুগের কোন সময় সৎ কবীর পন্থ চালাবেন? জোগজীত রূপে পরমেশ্বর কবীরজী বলেন, যখন কলিযুগের ৫৫০৫ বছর হয়ে যাবে তখন আমি যথার্থ তেরোতম কবীর পন্থ চালাব। তখন কাল বলে তার পূর্বে আমি সমস্ত পৃথিবীতে শাস্ত্রবিধি রহিত জ্ঞান প্রচার করে, শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা ভক্তি করিয়ে, সমস্ত জীবকে ভ্রমিত করে দেব। যখন আপনার তেরোতম অংশ এসে সত কবীর পন্থ চালাবে তখন জীব তার কথা বিশ্বাস করবে না, উল্টে আমার সমর্থনে জীব তোমার অংশ অবতারের সাথে ঝগড়া করবে। পরমেশ্বর কবীরজী জানতেন যখন কলিযুগের ৫৫০৫ বছর হবে (সন ১৯৯৭) তখন সর্ব সমাজে শিক্ষার ক্রান্তি আসবে, সর্ব মানব সমাজ শিক্ষিত হবে। তখন

আমার দাস সর্ব ধার্মিক গ্রন্থকে সর্ব মানব সমাজের সামনে তুলে ধরবে। শিক্ষিত মানব সমাজ নিজের চোখে জ্ঞানের প্রমাণ দেখে আমার তেরোতম পন্থের থেকে দীক্ষা গ্রহণ করবে। তখন সমস্ত পৃথিবী আমার জ্ঞান বা ভক্তি বিধির তত্ত্বজ্ঞানকে হৃদয় থেকে স্বীকার করে ভক্তি করবে। ঐ সময় সত্য যুগের মত পরিবেশ তৈরি হবে। জীবের মধ্যে রাগ দ্বেষ, চুরি, ডাকাতি হিংসা ইত্যাদি খারাপ গুণ থাকবে না। ধন সংগ্রহের পিছনে জীবন নাশ না করে ভক্তি করবে। যেমন বর্তমান সময় ধনী ব্যক্তি ও বড় ব্যবসায়ীদের সম্মানীয় মানা হয় কিন্তু ১৩-তম পন্থ আরম্ভ হওয়ার পর ঐ ব্যক্তিদের মূর্খ মানা হবে। আর যে ভক্তি করে সাধারণ জীবন যাপন করবে তাকে সম্মানীয় গণ্য করা হবে।

## “প্রমাণের জন্য পবিত্র কবীর সাগরের ভিন্ন-ভিন্ন অধ্যায়ের অমৃত বাণী”

### “পরমেশ্বর কবীরজী ও জ্যোতি নিরঞ্জনের বার্তালাপ”

অনুরাগ সাগরের পৃষ্ঠা ৬২ :-

“ধর্মরায় (জ্যোতি নিরঞ্জন) বচন”

**ধর্মরায় অস বিনতী ঠানী। মৈঁ সেবক দ্বিতীয়া ন জানী॥১॥**
**জ্ঞানী বিনতী এক হমারা। সো ন করহু জিহ সে হো মোর বিগারা॥ ২॥**
**পুরূষ দীন্হ জস মোকহং রাজু। তুম ভী দেহহু তো হোবে মম কাজু॥ ৩॥**
**অব মৈঁ বচন তুম্হারো মানী। লীজো হংসা হম সো জ্ঞানী॥৪॥**

পৃষ্ঠা ৬৩ থেকে অনুরাগ সাগরের বাণী :-

**দয়াবন্ত তুম সাহেব দাতা। এতিক কৃপা করো হো তাতা। ৫॥**
**পুরূষ শাঁপ মোকহং দীন্হা। লখ জীব নিত গ্রাসন কীন্হা॥ ৬॥**

পৃষ্ঠা ৬৪ থেকে অনুরাগ সাগরের বানী :-

**জো জীব সকল লোক তব আবৈ। কৈসে ক্ষুধা মোর মিটাবৈ॥ ৭॥**
**জৈসে পুরূষ কৃপা মোপে কীন্হা। ভৌসাগর কা রাজ মোহে দীন্হা॥ ৮॥**
**তুম ভী কৃপা মোপর করহু। জো মাঙ্গে সো মোহে দেহো বরহু॥ ৯॥**
**সতযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর মাঁহী। তিনোঁ যুগ জীব থোড়ে জাহী॥ ১০॥**
**চৌথা যুগ যব কলিযুগ আবৈ। তব তব শণ জীব বহু জাবৈ॥ ১১॥**

পৃষ্ঠা ৬৫ থেকে অনুরাগ সাগরের বাণী, উপরের বাণীর পংক্তি নং, ৩ থেকে :-

**প্রথম দূত মম প্রকটে জাঈ। পীছে অংশ তুম্হারা আঈ। ॥ ১২॥**

পৃষ্ঠা ৬৪ থেকে অনুরাগ সাগরের বাণী,উপরের বাণীর পংক্তি নং. ৬ :-

**এসা বচন হরি মোহে দীজে। তব সংসার গবণ তব কিঁজে ॥ ১৩॥**

"জোগজীত বচন = জ্ঞানী বচন"

অনুরাগ সাগরের বাণী, পৃষ্ঠা নং. ৬৪, উপরের বাণীর পংক্তি নং. ৭ :-

**অরে কাল তুম পরপঞ্চ পসারা। তিনোঁ যুগ জীবন দুঃখ ডারা॥ ১৪॥**
**বিনতী তোরী লীন্হ মৈঁ জানি। মোকহং ঠগা কাল অভিমানী॥ ১৫॥**
**জস বীনতী তূ মোসন কীন্হী। সো অব বখ্স তোহে দীন্হী॥ ১৬॥**
**চৌথা যুগ জব কলযুগ আবৈ। তব হয় অপনা অংশ পঠাবৈঁ॥১৭॥**

"ধর্মরায় (কাল) এর বচন"

পৃষ্ঠা ৬৪ অনুরাগ সাগরের বাণী, উপর থেকে বানীর পংক্তি নং. ১৭ :-

**হে সাহিব তুম পন্থ চালাউ। জীব উবার লোক লৈ যাউ ॥১৮॥**

পৃষ্ঠা ৬৬ অনুরাগ সাগরের বানী, উপর থেকে বানীর পংক্তি নং. ৮, ৯, ও ১৬ থেকে ২১ :-

**সন্ধি ছাপ (সার শব্দ) মোহে দিজে জ্ঞানী। জৈসে দেবোঙ্গে হংস সহদানি ॥ ১৯॥**
**জো জন মোঁকু সন্ধি (সার শব্দ) বতাবৈ। তাকে নিকট কাল নহীঁ আবৈ॥ ২০॥**
**কহৈ ধর্মরায় জাও সংসারা। আনহু জীব নাম আধারা॥ ২১॥**
**জো হংসা তুম্হারে গুণ গাবৈ। তাহি নিকট হম নহীঁ জাবৈঁ॥ ২২॥**
**জো কোঈ লেহৈ শরণ তুম্হারী। মম সির পগ দৈ হোবৈ পারী॥ ২৩॥**
**হম তো তুম সংগ কীন্হা ঢ়িঠাই। তাত জান কিন্হী লড়কাই॥ ২৪॥**
**কোটিন অবগুণ বালক করহী। পিতা এক চিত নহীঁ ধরহী॥ ২৫॥**
**জো পিতা বালক কূঁ দেহৈ নিকারী। তব কো রক্ষা করৈ হমারী॥ ২৬॥**
**সারনাম দেখো জেহি সাথা। তাহি হংস মৈঁ নীবাউঁ মাথা॥ ২৭॥**

জ্ঞানী (কবীর) বচন

অনুরাগ সাগর পৃষ্ঠা ৬৬ :-

**জো তোহি দেহুঁ সন্ধি বতাঈ। তো তুঁ জীবন কো হইহো দুখদাঈ॥ ২৮॥**
**তুম পরপঞ্চ জান হম পাবা। কাল চলৈ নহীঁ তুম্হরা দাবা॥ ২৯॥**
**ধর্মরায় তোহি প্রকট ভাখা। গুপ্ত অঙ্ক বীরা হম রাখা॥ ৩০॥**
**জো কোঈ লেঈ নাম হমারা। তাহি ছোড় তুম হো জানা নিয়ারা॥ ৩১॥**
**জো তুম মোর হংস কো রোকা ভাঈ। তো তুম কাল রহন নহীঁ পাঈ॥ ৩২॥**

ধর্মরায় (কাল নিরঞ্জন) বচন

অনুরাগ সাগরের বাণী পৃষ্ঠা ৬২ ও ৬৩ থেকে :-

**বেসক জাও জ্ঞানী সংসারা। জীব না মানৈ কহা তুম্হারা॥৩৩॥**
**কহা তুম্হারা জীব না মানৈ । হমরী ঔর হোয় বাদ বখানৈ॥৩৪॥**
**দৃঢ় ফন্দা মৈঁ রচা বনাঈ। জমেঁ সকল জীব উড়ঝাঈ॥৩৫॥**
**বেদ-শাস্ত্র সমর্তি গুণগানা। পুত্র মেরে তীন প্রধানা॥৩৬॥**
**তিনহূ বহু বাজী রচি রাখা। হমরী মহিমা জ্ঞান মুখ ভাখা॥৩৭॥**
**দেবল দেব পাষাণ পূজাঈ। তীর্থ ব্রত জপ তপ মন লাঈ॥৩৮॥**
**পূজা বিশ্ব দেব অরাধী। যহ মতি জীবোঁ কো রাখা বন্ধিঁ॥৩৯॥**
**জগ (যজ্ঞ) হোম ঔর নেম আচারা। ঔর অনেক ফন্দ মৈঁ ডারা॥৪০॥**

"জ্ঞানী (কবীর) বচন"

**হমনে কহা সুনো অন্যাঈ। কাটোঁ ফন্দ জীব লে জাঁঈ॥ ৪১॥**
**জেতে ফন্দ তুম রচে বিচারী। সত্য শব্দ তে সবৈ বিডারী॥ ৪২॥**
**জৌন জীব হম শব্দ দৃঢ়াবৈঁ। ফন্দ তুম্হারা সকল মুক্তাবৈঁ॥ ৪৩॥**
**জবহী জীব চিন্হী জ্ঞান হমারা। তজহী ভ্রম সব তোর পসারা॥ ৪৪॥**
**সত্যনাম জীবন সমঝাবৈঁ। হংস উভার লোক লৈ জাবৈ॥ ৪৫॥**
**পুরূষ সুমিরন সার বীরা, নাম অবিচল জনাবহুঁ॥৪৬॥**
**শীশ তুম্হারে পাঁব দেকে, হংস লোক পঠাবহুঁ ॥৪৭॥**
**তাকে নিকট কাল নহীং আবৈ। সন্ধি দেখ তাকো সির নাবৈ॥ ৪৮॥**

(সন্ধি = সতনাম + সারনাম)

ধর্মরায় (কাল নিরঞ্জন) বচন

**পন্থ এক তুম আপ চলউ। জীবন কো সতলোক লৈ যাউ॥ ৪৯॥**
**দ্বাদশ পন্থ করূঁ মৈঁ সাজা। নাম তুম্হারা লে করোঁ আবাজা॥ ৫০॥**
**দ্বাদশ যম সংসার পঠাউঁ। নাম কবীর লে পন্থ চালাউঁ॥ ৫১॥**
**প্রথম দূত মেরে প্রগটৈ যাঈ। পীছে অংশ তুম্হারা আঈ॥ ৫২॥**
**যহি বিধি জীবন কো ভ্রমাউঁ। আপন নাম পুরূষ কা বতাউঁ॥ ৫৩॥**
**দ্বাদশ পন্থ নাম জো লৈহি। হমরে মুখ মেঁ আন সমৈহি॥ ৫৪॥**

**শব্দার্থ :- বানী নং. ১ থেকে ৫৪ এর শব্দার্থ উপরে দেওয়া হয়েছে।**

"জ্ঞানী (কবীর) বচন" চৌপাই

**অধ্যায় "স্বসমবেদ বোধ" পৃষ্ঠা ১২১ :-**

**অরে কাল পরপঞ্চ পসারা। তিনোঁ যুগ জীবন দুখ আধারা॥ ৫৫॥**
**বীনতী তোরী লীন মৈঁ মানী। মোকহং ঠগে কাল অভিমানী॥ ৫৬॥**
**চৌথা যুগ জব কলিযুগ আঈ। তব হম আপনা অংশ পঠাঈ॥ ৫৭॥**
**কাল ফন্দ ছুটৈ নর লোঈ। সকল সৃষ্টি পরবানিক (দীক্ষিত) হোঈ॥ ৫৮॥**
**ঘর-ঘর দেখো বোধ (জ্ঞান) বিচারা (চর্চা)।সতনাম সব ঠৌর উচারা॥৫৯॥**
**পাঁচ হাজার পাঁচ সৌ পাঁচা। তব যহ বচন হোয়গা সাচা॥ ৬০॥**
**কলযুগ বীত যায়ে জব এতা। সব জীব পরম পুরূষ পদ চেতা॥ ৬১॥**

**ভাবার্থ:-** বাণী সংখ্যা ৫৫ থেকে ৬১ পর্যন্ত পরমেশ্বর কবীরজী বলেন হে কাল! তুই বিশাল বিভ্রম (পাপঞ্চ) রচনা করে রেখেছিস। তিন যুগে (সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর) তুই জীবকে ভ্রমিত করে কষ্ট দিবি। তোর প্রার্থনা আমি স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু তুই আমার সঙ্গে প্রতারণা করছিস। কিন্তু চতুর্থ যুগ যখন কলিযুগ আসবে; তখন আমার অংশ অর্থাৎ আমার কৃপা পাত্র আত্মাকে পাঠাব। হে কাল! তোর দ্বারা তৈরি সর্ব বন্ধন (ফাঁন্দ) অর্থাৎ শাস্ত্র বিরুদ্ধ অজ্ঞান সাধনা সত্য শব্দ অর্থাৎ সত জ্ঞান দিয়ে সমাপ্ত করে দেবো। ঐ সময় সমস্ত বিশ্ব আমার সন্তের কাছ থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত করবে। ঐ সময় পর্যন্ত অর্থাৎ কলিযুগের পাঁচ হাজার পাঁচশত পাঁচ বছর ব্যতিত না হওয়া পর্যন্ত সতনাম, মূল নাম (সার শব্দ) তথা মূল জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান প্রকট করব না। যতক্ষন কলিযুগের পাঁচ হাজার পাঁচশত পাঁচ বছর ব্যতিত না হবে ততক্ষন পর্যন্ত সতনাম, মূল নাম (সার শব্দ) তথা মূল জ্ঞান প্রকট করব না। যখন কলিযুগের পাঁচ হাজার পাঁচ শত পাঁচ বছর হয়ে যাবে তখন ঘরে ঘুরে আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চা শুরু করবে আর সর্ব উপদেশি কে সত্যনাম ও সার শব্দ দেবে। এই বচন তখন সত্য হবে যখন কলিযুগের ৫৫০৫ বছর পুরো হবে।

তখন মানব প্রাণী পরম পুরুষ অর্থাৎ সতপুরুষের সঙ্গে পরিচিত হবে; অর্থাৎ সতপুরুষ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করবে। যার বিষয় গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪-এ বলেছে, যে তত্ত্বদর্শী সন্ত প্রাপ্ত হওয়ার পর ঐ পরম পদের খোঁজ করা উচিত, যেখানে যাওয়ার পর সাধক পুনরায় এই সংসারে ফিরে আসে না। তাই যে পরমেশ্বর এই সংসার রূপী বৃক্ষের সৃষ্টি করেছে সেই পরমাত্মার ভক্তি কর।

স্বসমবেদ বোধ পৃষ্ঠা ১৭০ :-

**অথ স্বসম বেদের স্ফুটবার্তা-চৌপাই**

**এক লাখ ঔর অসি হজারা। পীর পৈগম্বর ঔর অবতারা॥ ৬২॥**
**সো সব আহী নিরঞ্জন বংশা। তন ধরী-ধরী করেঁ নিজ পিতা প্রশাংসা॥ ৬৩॥**
**দশ অবতার নিরঞ্জন কে রে। রাম কৃষ্ণ সব মাঁহী বড়েরে॥ ৬৪॥**
**ইনসে বড়া জ্যোতি নিরঞ্জন সোই। যামে ফের বদল নহীঁ কোঈ॥ ৬৫॥**

**ভাবার্থ:-** পরমেশ্বর কবীরজী বলেছেন বাবা আদম থেকে হজরত মুহম্মদ পর্যন্ত মোট এক লাখ আশি হাজার পৈগম্বর এবং হিন্দুদের দশ অবতার এরা সব কালের পাঠানো দূত। এই দশ অবতারের মধ্যে রাম ও কৃষ্ণ প্রধান অবতার। এই অবতার গণ কালের মহিমা করে সমস্ত জীবকে ভ্রমিত করে কাল সাধনায় দৃঢ় করেছে। এই সব অবতার গণের প্রধান চালক কাল ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন)।

স্বসমবেদ বোধ পৃষ্ঠা ১৭১ (১৫১৫):-

সত কবীর বচন

**দোঁহা:- পাঁচ হাজার অরূ পাঁচ সৌ পাঁচ জব কলযুগ বীত জায়।**
**মহাপুরুষ ফরমান তব, জগ তারন কূঁ আয়॥৬৬॥**
**হিন্দু তুর্ক আদি সবৈ, জেতে জীব জহান।**
**সত্য নাম কী সাখ গহী, পাবৈঁ পদ নির্বান॥৬৭॥**
**যথা সরিতগণ আপ হী, মিলৈঁ সিন্ধু মৈঁ ধায়।**
**সত্য সুকৃত কে মধ্য তিমি, সব হী পন্থ সমায়॥৬৮॥**
**জব লগ পূর্ণ হোয় নহীঁ, ঠিক কা তিথি বার।**
**কপট-চাতুরী তবহি লোঁ, স্বসম বেদ নিরধার॥৬৯॥**
**সবহী নারী-নর শুদ্ধ তব, জব ঠিক কা দিন আবন্ত।**
**কপট চাতুরী ছোড়ি কে, শরণ কবীর গহন্ত॥৭০॥**
**এক অনেক হ্বৈ গয়ে, পুনঃ অনেক হোঁ এক।**
**হংস চলে সতলোক সব, সত্যনাম কী টেক॥৭১॥**
**ঘর-ঘর বোধ বিচার হো, দুর্মতি দূর বহায়।**
**কলযুগ মেঁ সব এক হোঈ, বরতে সহজ সুভায়॥ ৭২॥**
**কহাঁ উগ্র কহাঁ শুদ্র হো, হরৈ সবকী ভব পীর (পীড়)॥ ৭৩॥**
**সো সমান সমদৃষ্টি হৈ, সমর্থ সত্য কবীর॥ ৭৪॥**

**ভাবার্থ:-** পরমেশ্বর কবীর জী বলছেন হে ধর্মদাস! আমি জ্যোতি নিরঞ্জন অর্থাৎ কাল ব্রহ্মাকেও বলেছিলাম। আর এখন তোমাকেও বলছি।

**স্বসমবেদ বোধের বাণী সংখ্যা-৬৬-৭৪ এর সরলার্থ:-** যখন কলিযুগের পাঁচ হাজার পাঁচ শত পাঁচ বছর হয়ে যাবে, তখন এক মহাপুরুষ এই পৃথিবীর জীবকে পার করতে আসবে। হিন্দু মুসলমান খ্রিষ্টান যত পন্থের মানব এই সংসারে আছে সবাই ঐ মহাপুরুষের থেকে সত্যনাম গ্রহণ করে সত্য নামের শক্তিতে মুক্তি প্রাপ্ত করবে। ঐ মহাপুরুষ যে সত কবীর পন্থ চালাবে সেই তেরো পন্থে স্বতস্ফূর্ত হয়ে তীব্র গতীতে সর্ব

পন্থ মিলে যাবে। যেমন বিভিন্ন নদী সর্ব বাধা অতিক্রম করে সমুদ্রে গিয়ে মিশে যায়। তাকে কেউ বেঁধে রাখতে পারে না। সেইরূপ আমার তেরো তম পন্থে সর্ব পন্থ মিশে যাবে। কিন্তু যতদিন কলিযুগের পাঁচ হাজার পাঁচ শত পাঁচ বছর পূর্ণ না হয় ততদিন আমার এই কথা নিরাধার অর্থাৎ ভিত্তিহীন মনে হবে।

যখন নির্ধারিত সময় আসবে। তখন স্ত্রী পুরুষ ছল-কপট, চালাকি ত্যাগ করো উঁচু বিচার, শুদ্ধ আচারণের হয়ে আমার (কবীর পরমেশ্বরের) শরণ গ্রহণ করবে। পরমাত্মার কাছ থেকে লাভ পাওয়ার জন্য মানব ধর্ম থেকে অনের পন্থ (ধার্মিক সমুদায়) তৈরী হয়েছে, তা পুনরায় সমস্ত জাতি এক হয়ে যাবে। সমস্ত হংস আত্মা নির্বিকার হয়ে ভক্তি করে সতলোকে চলে যাবে। আমার আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান ঘরে ঘরে চর্চা হবে। যার কারণে দুর্মতি সমাপ্ত হয়ে যাবে। আর জীব সত্য যুগের মত শান্তি পূর্বক জীবন যাপন করবে। চোর ডাকাত খুনি কসাই শুদ্র অর্থাৎ ঘোর পাপী হলেও যদি পরমাত্মার শরণে আসে আর সতভক্তি করে তাহলে তার সাংসারিক (ভবপীর) কষ্টও পরমাত্মা দূর করে দেবে। সত্য সাধনায় সকলের ভবপীর অর্থাৎ সাংসারিক কষ্ট দূরিভূত হয়। তেরোতম পন্থের ঐ মহাপুরুষ সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখবে। উঁচু-নীচু ভেদভাব করবে না; সে সমর্থ সত্য কবীর হবে। (মম্ সন্ত মুঝে জান মেরা হী স্বরূপম্)

**প্রশ্ন** :- তেরোতম পন্থ কোন পন্থ? তাঁর প্রবর্তক কে?

**উত্তর**:- তেরোতম পন্থ যথার্থ সত কবীর পন্থ। এই পন্থের প্রবর্তক স্বয়ং কবীর পরমেশ্বরজী। পন্থের সঞ্চালক কবীর সাহেবের গুলাম (দাস) রামপাল দাস। পুত্র স্বামী রামদেবানন্দজী মহারাজ। (আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে গুরুজীকে পিতা মানা হয়। যে আত্মার পালন পোষণ করায়।)

**প্রমাণ**:- ধর্মদাসজীর বংশ পরম্পরার মহন্ত শ্রদ্ধালুরা অজ্ঞানতার কারণে ধর্মদাসের পরিবার (বিন্দ) থেকে চলা সংস্থার পরিচালককে তেরোতম পন্থ প্রমান করার কুচেষ্টা করে। কিন্তু হাতীর বস্ত্র মহিষের গায়ে লাগিয়ে যদি বলে দেখ এ মহিষের বস্ত্র (কাপড়) বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের বুঝতে দেরি হবে না। এই বস্ত্র মহিষের নয়, মহিষ থেকেও অন্য কোন বড় জীবের হবে, হাতির কথা যদি তারা নাও বলতে পারে। **উদাহরণ**:- পবিত্র কবীর সাগর এর অধ্যায় “কবীর চরিত্র বোধ”এর পৃষ্ঠা ১৮৩৪-১৮৩৫ এ লেখা আছে।

## “তেরো গাড়ি কাগজে লিখেছিলেন”

এক দিন দিল্লীর বাদশা বললেন, কবীরজী যদি ১৩ গাড়ি কাগজ আড়াইদিন অর্থাৎ ৬০ ঘন্টায় লিখে দেয় তাহলে আমি কবীর জীকে পরমাত্মা মেনে নেব। পরমেশ্বর কবীরজী নিজের লাঠি ঐ তেরো গাড়ি কাগজের উপর ঘোরায়, ঐ সময় সাথে সাথে সব কাগজে অমৃতবাণী ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা লেখা হয়ে যায়। রাজার বিশ্বাস হয়ে যায় কিন্তু নিজের ধর্মের ব্যক্তিদের (মুসলমানদের) চাপে পড়ে সর্ব গ্রন্থ দিল্লীতে মাটির নীচে পুঁতে দেয়। কবীর সাগরের অধ্যায় কবীর চরিত্র বোধে পৃষ্ঠা ১৮৩৪-১৮৩৫ এ ভুল লিখে দিয়েছে, যে যখন মুক্তা মনি সাহেবের সময় আসবে তখন দিল্লীতে নিজের পতাকা (ঝাণ্ডা) গড়বে এবং সমস্ত পুস্তক মাটির নীচ থেকে বের করবে। মুক্তামণি অবতার ধর্মদাসের তেরোতম বংশ হবে।

**বিবেচনা**:- উপরোক্ত লেখায় নিজেদের মত মেলানোর পরিস্কার প্রমাণ, যে বর্তমানে ধর্মদাসজীর বংশের গদ্দী দামাখেড়া, জেলা-রায়পুর, ছত্তিসগড়ে আছে। বর্তমানে ঐ গদ্দীতে ১৪তম বংশ গুরু প্রকাশমুনি নাম সাহেব বিরাজমান। তেরোতম

বংশ গুরু গৃন্ধ মুনি সাহেব ছিল, তিনি ২০১৩ থেকে ১৫ বছর পূর্বে ১৯৯৮ এ শরীর ত্যাগ করেছিলেন। যদি তেরোতম বংশ গুরুর বিষয়ে লেখা থাকতো তাহলে সে দিল্লীতে নিজের পতাকা উড়িয়ে সমস্ত পুস্তক মাটির নীচ থেকে বের করে দিতো, কিন্তু এই রকম হয়নি। তাই তেরোতম পন্থ ধর্মদাসজীর বংশ পরম্পরার নয়।

আবার "কবীর চরিত্র বোধের" পৃষ্ঠা ১৮৭০-এ কবীর সাগরে ১২-পন্থের নাম লেখা আছে যে, কাল (জ্যোতি নিরঞ্জন) কবীর জীর নামে নকল পন্থ চালাবে। বাস্তবে ১২-তম পন্থ গরীবদাসের লেখা। ওখানে কালের পন্থের সর্বপ্রথম নাম নারায়ণ দাস লেখা আছে। আসলে নারায়ণ দাসের জায়গায় প্রথম চূড়ামণিজী হবে। জেনে শুনে নকল পন্থীরা এই গরমিল করেছে। দ্বাদশপন্থ গরীব দাসজীর লেখা আছে যা সত্য। ওদের মনে থাকবে পরমেশ্বর কবীর সাহেব নারায়ণ দাসকে শিষ্য করেনি। নারায়ণ দাস শ্রীকৃষ্ণের পুজারী ছিল এবং ছোট ভাই, চূড়ামণির ঘোর বিরোধী ছিল। যার কারণে শ্রী চূড়ামণিজী কুদুর্মাল (মামাবাড়ি) চলে যায়, পরে বাঁধবগড় নগর নষ্ট হয়ে যায়। "কবীর চরিত্র বোধে" পৃষ্ঠা ১৮৭০-এ ১২ পন্থের প্রবর্তকের নাম লেখা আছে। ওখানে প্রথম নাম ভুল লিখেছে বাকী সব ঠিক আছে। লেখা আছে:-

১. নারায়ণ দাসজীর পন্থ ২. যাগৌদাস (জাগু দাস) পন্থ ৩. সূরত গোপাল পন্থ ৪. মূল নিরঞ্জন পন্থ ৫. টকসারী পন্থ ৬. ভগবান দীসজীর পন্থ ৭. সতনামী পন্থ ৮. কমালীয়ে (কমালজীর) পন্থ ৯. রাম কবীর পন্থ ১০. প্রেম ধাম (পরম ধাম) কি বানী পন্থ ১১. জীবাদাস পন্থ ১২. গরীবদাস পন্থ।

আবার 'কবীর সাগরের' কবীর বাণী অধ্যায়ের ১৩৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে

-: বংশ প্রকাশ

প্রথম বংশ উত্তম **(এটা চূড়ামণিজীর বিষয়ে বলেছে)**
দ্বিতীয় বংশ অহংকারি **(যাগৌ অর্থাৎ জাগু দাসের বিষয়ে বলেছে)**
তৃতীয় বংশ প্রচণ্ড **(সুরত গোপাল জীর পন্থ)**
চতুর্থ বংশ বীরহে **(মুল নিরজ্ঞনের পন্থ)**
পঞ্চম বংশ নিদ্রা **(টকসারী পন্থ)**
ষষ্ঠ বংশ উদাস **(ভগবান দাসজীর পন্থ)**
সপ্তম বংশ জ্ঞান চুরাই **(সত্ নামী পন্থ)**
অষ্টম বংশ দ্বাদশ পন্থ বিরোধ **(কমালী পন্থ)**
নবম বংশ পন্থ পূজা **(রাম কবীর পন্থ)**
দসবে বংশ প্রকাশ **(পরধামের বাণী পন্থ)**
এগারো তম বংশ প্রকট পসারা **(জীবাপন্থ)**

বারহবেঁ (১২-তম) বংশ প্রকট হয় উজিয়ারা (আলোর প্রকাশ) এই পন্থ সন্ত গরীব দাসজীর (গ্রাম ছুড়ানী, জেলা ঝজ্জর, হরিয়াণা, ভারত) পন্থ। পরমেশ্বর কবীর জীর দর্শনের পরে গরীবদাসজী পরমেশ্বরের যথার্থ জ্ঞান বলে তাতে পরমেশ্বরের মহিমার কিছু অংশ প্রকাশিত হয়।

তেরহবেঁ (১৩-তম) বংশ মিটে সকল অন্ধিয়ারা (অন্ধকার) **{ এটি যথার্থ কবীর পন্থ, ১৯৯৪ থেকে প্রারম্ভ হয়েছে। যা বর্তমানে এই দাস (রামপাল দাস) দ্বারা সঞ্চালিত হচ্ছে।}**

যারা দামাখেড়ার ধর্ম দাসজীর বংশের আসনরত, তারা বাস্তবিক ভেদ (তথা) লুকানোর কুচেষ্টা করে। কিন্তু সত্যকে মেটাতে পারেনি।

কবীর সাগরের অধ্যায় "কবীর বাণীর" পৃষ্ঠা ১৩৬ :-

দ্বাদশ পন্থ চলো সো ভেদ

**দ্বাদশ পন্থ্ কাল ফুরমানা। ভূলে জীব ন জায় ঠিঁকানা॥**
**তাতেঁ আগম কহ হম রাখা। বংশ হমারা চুড়ামণি শাখা॥**
**প্রথম জগ মেঁ জাগু ভ্রমাবৈ। বিনা ভেদ বহ গ্রন্থ্ চুরাবৈ॥**
**দূসর সুরতি গোপাল হোঈ। অক্ষর জো জোগ দৃঢ়বৈ সোঈ॥**

**বিবেচনা:-** ওখানে প্রথম জাগু দাস বলা হয়েছিল; কিন্তু বাণীতে স্পষ্ট করে দিয়েছে প্রথম বংশ চূড়ামণির্জী, দ্বিতীয় জাগুদাস। এই প্রমাণ কবীর চরিত্র বোধ পৃষ্ঠা ১৮৭০-এ আছে। অধ্যায় "স্বসমবেদ বোধ" -এর পৃষ্ঠা ১৫৫ তে ও দ্বিতীয় জাগু দাস লেখা আছে। এখানে প্রথম লিখে দিয়েছে। এখানে প্রথম চূড়ামনি লেখা উচিত ছিল।)

**তিসরা মূল নিরঞ্জন বাণী। লোক বেদ কী নির্ণয় ঠানী॥**
(এখানে চতুর্থ লেখা উচিত)
**চৌথ পন্থ্ টকসার (টকসারী) ভেদ লৌ আবৈ। নীর পবন কো সন্ধি বতাবৈ॥**
(এখানে পঞ্চম লেখা উচিত)
**পাঁচবা পন্থ্ বীজ কো লেখা। লোক প্রলোক কহৈ হম মেঁ দেখা॥**
(এই পন্থ ভগবান দাসের এখানে ষষ্ঠ পন্থ্ লেখা উচিত ছিল)
**ছটা পন্থ্ সত্যনামী প্রকাশা। ঘট কে মাহীঁ মার্গ নিবাসা॥**
(এখানে সপ্তম পন্থ্ লেখা ছিল)
**সাতবাঁ জীব পন্থ্ লে বোলৈ বাণী। ভয়ো প্রতীত মর্ম নহীঁ জানী॥**
(এই পন্থ্ কামালের, অষ্টম পন্থ্)
**আঠবাঁ রাম কবীর কহাবৈ। সতগুরূ ভ্রম লৈ জীব দৃঢ়াবৈ॥**
(আসলে এই পন্থ্ নবম পন্থ্ হবে)
**নৌমেঁ জ্ঞান কী কলা দিখাবৈ। ভঈ প্রতীত জীব) সুখ পাবৈ॥**
(আসলে এই পন্থ্ এগারো তম পন্থ্ এখানে নবম লিখেছে)
**দশবেঁ ভেদ পরম ধাম কী বাণী। সাখ হমারী নির্ণয় ঠানী॥**

(এখানে ঠিক লেখা আছে, কিন্তু এখানে এগারোতম পন্থের উল্লেখ নেই যদি প্রথম পন্থ্ চূড়ামণির মানা হয় তাহলে যথাক্রমে ঠিক হত। আসলে প্রথম চূড়ামণির হবে। তার পরে দ্বাদশ পন্থ্ গরীবদাসজীর পন্থের বর্ণনা আরম্ভ হয়। ইহা সংঙ্কেত মাত্র। সন্ত গরীব দাসজীর জন্ম বিক্রম সংবত ১৭৭৪ (সতেরোশো চুয়াত্তর) সালে হয়েছিল। এখানে ভুল করে ১৭৭৫ (সতেরো শো পঁচাত্তর) লেখা হয়েছে। এটি প্রিন্টের ভুল।)

**সংবত্‌সতরহসৌপচহত্তর(১৭৭৫)হোঈ।তাদিনপ্রেমপ্রকটেঁজগসৌঈ॥**
**আজ্ঞা রহৈ ব্রহ্ম বোধ লাবৈ। কোলী চমার সবকে ঘর খাবৈ॥**
**সাখি হামারী লে জীব সমঝাবৈ।অসংখ্য জন্ম ঠৌর নহীঁ পাবৈ॥**
**বারহবেঁ (বারবৈ) পন্থ্ প্রগট হোবৈ বাণী। শব্দ হমারৈ কী নির্ণয় ঠানী॥**
**অস্থিরঘরকামর্মনহীঁপাবে।যেবার(বারহ)পন্থ্হামী(কবীরজী)কোধ্যাবৈঁ।**
**বারহেঁপন্থ্হমহি(কবীরজী)চলিআবৈঁ।সবপন্থ্মিটাএকহীপন্থ্চলাবৈঁ॥**
**প্রথম চরণ কলযুগ নিরয়ানা (নির্বাণ)। তব মগহর মাণ্ডো মৈদানা।**

**ভাবার্থ:-** এখানে বারোতম পন্থ্ সন্ত গরীবদাসজীর পন্থ্। কারণ পরমাত্মা কবীরজী গরীবদাসজীকে দর্শন দিয়েছিলেন এবং সতলোক দেখিয়ে জ্ঞান যোগ খুলে দিয়েছিলেন। তখন গরীবদাসজী পরমেশ্বরের মহিমার বাণী লিপিবদ্ধ করান। বর্তমানে ঐ লিপি প্রিন্ট করানো হয়েছে। বিচার করুন। সন্ত গরীব দাসজীর পন্থ্ পর্যন্ত ১২তম পন্থ্ হয়ে গিয়েছিল। উল্লেখ আছে, সন্ত গরীবদাসজী আমার মহিমার বানী (সাখী), শব্দ, চৌপাই (চতুস্পদী শ্লোক) লিখবে কিন্তু ঐ বারো পন্থের অনুগামীরা নিজের বুদ্ধিমত

বাণীর অর্থ করবে। তাই বাণী না বোঝার কারণ গরীবদাস জীর পন্থের লোক অসংখ্য জন্ম পর্যন্ত সতলোক বা অমর লোকের ঠিকানা প্রাপ্ত করতে পারবে না। এই দ্বাদশ পন্থ আমার (কবীরজীর) নামে চালাবে আর আমার মহিমা প্রচার করবে। কিন্তু এই অনুগামীরা স্থায়ী ঘর (সতলোক) প্রাপ্ত করতে পারবে না। আর বলেছে, এই ১২তম পন্থে (সন্ত গরীবদাসজীর) আমি নিজে (স্বয়ং কবীরজী) চলে আসব। তখন সর্বপন্থ সমাপ্ত করে এক পন্থ চালাবো। কলিযুগের প্রথম চরণে আমি (কবীরজী) সন ১৫৭৫ (ইংরেজী ১৫১৮)-তে মগহর নগরে (উত্তর প্রদেশ) নির্বান প্রাপ্ত হবো অর্থাৎ লীলা করে সতলোকে চলে যাব।

পরমেশ্বর কবীরজী কলি যুগকে তিনটি চরনে (ভাগ) ভাগ করেছে। প্রথম চরনে পরমেশ্বর লীলা করে চলে গিয়েছে। মধ্যচরন (মধ্যপীঢ়ী) কলিযুগের পাঁচ হাজার পাঁচশত পাঁচ বছর ব্যতীত হওয়ার পর। তখন সর্ব সমাজ ভক্তি করবে। অন্তিম চরনে সব কৃতঘ্নী (দুরাচারী) হয়ে যাবে। কেউ ভক্তি করবে না।

আমি (সন্ত রামপাল জী মহারাজ) সন্ত গরীব দাসজীর ১২-তম (বারোতম) পন্থে এসেছি। এখন তেরো তম পন্থ চলছে। এই পন্থ পরমেশ্বর কবীরজী চালিয়েছেন। গুরু মহারাজ স্বামী রামদেবানন্দের আশীর্বাদ সফল হবে আর সমস্ত বিশ্ব পরমেশ্বরের ভক্তি করবে। সদগুরু রূপে পরমেশ্বর কবীরজী গরীবদাস জীর সাথে দেখা করেছিলেন। পরমাত্মা নিজের জ্ঞান দেওয়ার জন্য স্বয়ং পৃথিবী বা অন্য লোকে প্রকট হন। গরীবদাস জী "অসুর নিকন্দন রমৈনী"-তে বলেছেন, "সতগুরু দিল্লী মণ্ডল আয়সী। সূতী ধরতী সূম জগায়সী। দিল্লী কে তখ্ত ছত্র ফের ভী ফিরায় সী। চৌঁসঠ যোগনি মঙ্গল গায়সী"। সন্ত গরীবদাসজীর সতগুরু "পরমেশ্বর বন্দীছোড় জী" ছিলেন।

পরমেশ্বর কবীরজী, কবীর সাগরের 'কবীর বাণী' অধ্যায়ের পৃষ্ঠা ১৩৬ ও ১৩৭ এ বলেছেন, দ্বাদশ পন্থ গরীবদাস দ্বারা চালিত হবে।

**সংবত্ সতরহ সৌ পচহত্তর (১৭৭৫) হোঈ। জা দিন প্রেম প্রকটে জগ সোঈ॥**
**সাখি হমারী লে জীব সমঝাবৈ। অসংখ্যোঁ জন্ম ঠৌর নহীঁ পাবৈ॥**
**বারহবেঁ পন্থ প্রগট হো বাণী। শব্দ হমারে কী নির্ণয় ঠানী॥**
**অস্থির ঘর কা মর্ম না পাবৈঁ। য়ে বারা (বারহ) পন্থ হমহী কো ধ্যাবৈঁ॥**
**বারহবেঁ পন্থ হম হী চলি আবৈঁ। সব পন্থ মিটা এক পন্থ চলাবৈঁ॥**

**ভাবার্থ:-** পরমেশ্বর কবীরজী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ১২ পন্থের অনুগামীরা আমার মহিমার বাণী যা আমি নিজের মুখে বলেছি, যেমন কবীর সাগর, কবীর বীজক, কবীর শব্দাবলি, ইত্যাদি গ্রন্থের বানী এবং আমার কৃপায় গরীব দাসের লেখা অমৃত বাণীর গূঢ় রহস্য কে সঠিক ভাবে না বুঝে নিজের শিষ্যদের ভুল বোঝাবেন। তাই সত্যের সাথে পরিচিত না হওয়ায় অসংখ্য জন্ম পর্যন্ত স্থায়ী ঘর অর্থাৎ পরম ধাম প্রাপ্ত করতে পারবে না। পাঁচ হাজার পাঁচশত পাঁচ বছর চলে যাওয়ার পরে আমি ঐ গরীব দাসের পন্থে এসে সৎ কবীর পন্থ চালাব; তখন ঘরে ঘরে আমার ভক্তির চর্চা চলবে। তত্ত্বজ্ঞানকে বুঝে সর্ব সংসারের মানুষ আমার ভক্তি করবে এবং খারাপ আচরন ত্যাগ করে শান্তি পূর্বক বসবাস করবে। এতে প্রমাণিত হয় ১৩-তম পন্থই যথার্থ কবীর পন্থ। পরমেশ্বরের কৃপায় এই যথার্থ কবীর পন্থ এখন আমার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। পরমেশ্বর কবীরজী তোতাদ্রি নামক স্থানে মহিষকে দিয়ে বেদ শ্লোক না বলিয়ে নিজে বলে ব্রাহ্মণ দের শিক্ষা দিতে পারতেন। একেই বলে সমর্থের-সমর্থতা অর্থাৎ পরমাত্মা যাকে খুশি তাকে দিয়ে নিজের মহিমার প্রচার করতে পারেন। তাই মনে হয় এই দাসের দ্বারা পরমাত্মা ১৩-তম পন্থ চালানোর কৃপা করেছেন।

## বর্তমানে কলিযুগের কতদিন হয়েছে?

হিন্দু ধর্মে আদি শংকরাচার্যের বিশেষ স্থান আছে। দ্বিতীয়ত আদি শঙ্করাচার্যকে হিন্দু ধর্মের সংরক্ষক তথা সঞ্জীবনী দাতাও বলা হয়। পরবর্তীতে প্রচার প্রসার ওনার শিষ্যরা করে। তার পরিণামস্বরূপ হিন্দু দেবী দেবতার পূজা করার বিপ্লব শুরু হয়। শঙ্করাচার্যের ইষ্টদেব ভগবান শঙ্কর ছিল এবং পূজ্য দেবী শ্রী পার্বতী ছিল। তার সাথে শ্রীবিষ্ণু ও অন্য দেবতাদেরও পূজা করতে লাগেন। বিশেষত পঞ্চদেবের পূজার এক বিধান তৈরি করেন:- ১. শ্রী ব্রহ্মা ২. শ্রী বিষ্ণু ৩. শ্রী শঙ্কর ৪. শ্রী পরাসর ঋষি ৫. শ্রী কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন অর্থাৎ বেদব্যাসজী পূজা।

পুস্তক "জীবনী আদি শঙ্কারাচার্য" তে লেখা আছে ঈশা মসির ৫০৮ বছর পূর্বে আদি শঙ্কারাচার্যের জন্ম হয়েছিল।

আবার পুস্তক "হিমালয় তীর্থ"-তে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল যে, আদি শঙ্করাচার্যের জন্ম কলিযুগের তিন হাজার বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে হবে।

তাই গণিতের রীতি তে বিশ্লেষণ করে দেখি ২০১২ সাল পর্যন্ত কলিযুগের কত দিন হয়েছে?

আদি শঙ্কারাচার্যের জন্ম ঈশাজীর জন্মের ৫০৮ বছর পূর্বে হয়।

ইশাজীর জন্ম হয়ে গেছে = ২০১২ বছর পূর্বে, তাহলে আদি শঙ্করাচার্যের জন্ম কত বছর হয়েছে ২০১২+৫০৮ = ২৫২০ বছর।

উপর থেকে হিসাব করলে শঙ্করাচার্যজীর জন্ম হয়েছে কলিযুগ ৩০০০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে।

এখন দেখি ২০১২তে কলিযুগের কত দিন হয়েছে, ৩০০০ + ২৫২০ = ৫৫২০ বছর।

এখন দেখি কলিযুগের ৫৫০৫ কোন সালে পূর্ণ হবে=৫৫২০-৫৫০৫=১৫ বছর ২০১২ সালের আগে।

২০১২-১৫ = ১৯৯৭ সালে কলিযুগের ৫৫০৫ বছর পূর্ণ হয়ে যায়। সংবত্-এর হিসাবে অর্থাৎ দেশী বছরের হিসাবে ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে পূর্ণ হয়।

যে সন্তগণ বলেন শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৫১৫১ বছর পূর্ব বলা হয়েছে। এটা তাদের ভুল ধারনা।

## "গুরু ছাড়া মুক্তি হয় না"

**প্রশ্ন:**- গুরু ছাড়া কি ভক্তি সম্ভব?

**উত্তর:**- ভক্তি করতে পারো, কিন্তু কোন ফল পাবে না। ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

**প্রশ্ন:**- কেন,কারণ বলুন?

**উত্তর:**- এটাই পরমাত্মার বিধান। সুক্ষ্ম বেদ-এ বলেছে:--

**কবীর, গুরু বিন মালা ফেরতে, গুরু বিন দেতে দান।**
**গুরু বিন দোঁনো নিষ্ফল হৈ, পূছো বেদ পুরাণ॥**
**কবীর, রাম, কৃষ্ণ সে কৌন বড়া, উন্হোঁ ভী গুরু কীন্হ।**
**তীন লোক কে বে ধনী, গুরু আগে আধীন॥**
**কবীর, রাম কৃষ্ণ বড়ে তিন্হূঁ পুর রাজা। তিন গুরু বন্ধ কীন্হ নিজ কাজা॥**

**ভাবার্থ:**- গুরু ধারন না করে যদি নাম জপের মালা করেন বা দান করেন, তা ব্যর্থ যাবে। যদি আপনাদের সন্দেহ হয়, তাহলে বেদ, গীতা, ও পুরানের প্রমাণ দেখুন।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা হচ্ছে চার বেদের সারাংশ। গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ৭-এ অর্জুন বলেছে, হে কৃষ্ণ! আমি আপনার শিষ্য,আমি আপনার শরণে আছি। গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩-এ শ্রী কৃষ্ণের শরীরে কাল প্রবেশ করে বলেছে, তুই আমার ভক্ত। পুরাণে প্রমাণ আছে শ্রী রামচন্দ্র বশিষ্ঠ ঋষির কাছ থেকে নাম দীক্ষা নিয়েছিলেন। সকল রাজকার্য গুরু বশিষ্ঠের আজ্ঞা নিয়ে করতেন। শ্রীকৃষ্ণ সন্দীপনী ঋষির কাছ থেকে অক্ষর জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান গুরু দুর্বাসা ঋষির কাছ থেকে প্রাপ্ত করেন।

কবীর পরমেশ্বরজী আমাদের বোঝাতে চাইছেন যে, আপনারা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম চন্দ্র থেকে অন্য কাউকে বড় অর্থাৎ সমর্থ মানেন না। ওনারা তিন লোকের মালিক হয়েও গুরু ধারন করে, ভক্তি করে, মানব জীবন সফল করেছিলেন। এই থেকে বোঝা যায় অন্য ব্যক্তি যদি গুরু ছাড়া ভক্তি করে তাহলে কতটা ঠিক? অর্থাৎ ব্যর্থ।

গুরু ছাড়া দেখাদেখি বা শোনা কথার উপর ভিত্তি করে ভক্তি করাকে লোকবেদের আধারে ভক্তি করা বলে। লোকবেদের অর্থ হয়, কোন এলাকার প্রচলিত ভক্তি জ্ঞান, যা শাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞানের বিপরীত। এক সময় আমি (সন্ত রামপালদাস) লোক বেদের আধারে শ্রীহনুমান, বাবা শ্যামজীর, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশিবের ও অন্য দেবী দেবতাদের ভক্তি করতাম। মঙ্গলবারে হনুমানজীর ব্রত রেখে বুন্দিয়া প্রসাদ বিতরণ করতাম স্বয়ং দেশী ঘী-এর তৈরি গিচ চুরমা খেতাম। হনুমানজীকে বনস্পতি ঘী-র তৈরি বুন্দিয়ার ভোগ লাগাতাম! হরে রাম, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে মন্ত্রের জপ করতাম। একদিন এক ব্যক্তি বলেন:-

**ওম্ নাম সবসে বড়া, ইসসে বড়া ন কোয়।**
**ওঁ নাম কা জাপ করে, তো শুদ্ধ আত্মা হোয়॥**

তাই ওঁ নামের জপ শুরু করি। ওম্ নমো শিবায়ঃ,শিবের এই মন্ত্রও জপ করতাম। ওম্ ভগবতে বাসুদেবায়ঃ নমঃ, শ্রীবিষ্ণুর এই মন্ত্রও জপ করতাম। তীর্থে যাওয়া, দান করা, তীর্থে স্নান করা ইত্যাদি লোক বেদের আধারে করতাম।

বাড়িতে যদি কোন সুখ হতো অর্থাৎ খুশি বা আনন্দ হতো তাহলে মনে করতাম, এই সব আমার উপরোক্ত ভক্তি দ্বারা হয়েছে। যেমন, পরীক্ষায় পাশ করা, বিবাহ হওয়া, পুত্র পুত্রীর জন্ম হওয়া,চাকরী পাওয়া, এই সমস্ত সুখ উপরোক্ত সাধনার ফল মনে করতাম। কবীর সাহেব সুক্ষ্ম বেদে বলেছেন:-

**কবীর পীছে লাগ্যা জাউঁ থা, মেঁ লোক বেদ কে সাথ।**
**রাস্তে মেঁ সতগুরু মিলে, দীপক দীন্হা হাথ॥**

ভাবার্থ এই যে, সাধক লোকবেদ অর্থাৎ দন্ত কথার আধারে ভক্তি করছিল এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ ভক্তি সাধনার মার্গে চলছিল। রাস্তায় অর্থাৎ ভক্তি মার্গে একদিন তত্ত্বদর্শী সন্তের দেখা পাই। তিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে সাধনা রূপী দীপক দেন, যাতে মানব জীবন সফল হয়ে গেল। তখন সতগুরু দ্বারা দেওয়া তত্ত্বজ্ঞানের আলোতে জানতে পারি যে আমি ভুল সাধনা করছিলাম। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩, ২৪-এ বলেছে,শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে যে সাধক ইচ্ছামত আচারণ করে, তার না সুখ হয়,না সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আর না গতি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না অর্থাৎ ব্যর্থ। আবার গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৪ এ বলেছে, হে অর্জুন! তোর জন্য কর্তব্য আর অকর্তব্যের ব্যবস্থায় শাস্ত্রই প্রমাণ।

উপরোক্ত যে সাধনা আমি (সন্ত রামপাল দাস) করতাম এবং সর্ব হিন্দু সমাজ করছে। এই সব সাধনা বেদ ও গীতায় বর্ণিত না হওয়ার কারণে শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা অর্থাৎ সম্পূর্ন ব্যর্থ।

**কবীর, গুরু বিন কাহু ন পায়া জ্ঞানা, জ্যোঁ থোথা ভুস ছড়ে মূঢ় কিসানা।**
**কবীর, গুরু বিন বেদ পড়ৈ জো প্রাণী, সমঝৈ ন সার রহে অজ্ঞানী॥**

তাই গুরুজীর কাছে শাস্ত্রের জ্ঞান পড়া উচিত। যাতে শাস্ত্র অনুকূল সৎভক্তি (সত্য সাধনা) করে মানব জীবন ধন্য হয়।

## "পূর্ণ গুরুর বচন শক্তিতে ভক্তি হয়"

সদগুরু থেকে দীক্ষা নিয়ে ভক্তি করলে তা লাভ দায়ক হয়। গুরু ছাড়া ভক্তিতে কোন লাভ হয় না।

**উদাহরণ:-**

এক রাজার রানী খুব ধার্মিক প্রবৃত্তির ছিল। রানী পরমেশ্বর কবীরজীর থেকে নাম উপদেশ নিয়েছিলেন। রানী প্রতিদিন গুরু দর্শনের জন্য যেতেন। কিন্তু রাজার তা ভাল লাগত না। কিন্তু তিনি নিজের পত্নীর গুরুর কাছে যাওয়া বন্ধ করতে পারছিলেন না। কারণ তিনি একজন শক্তিশালী রাজার কন্যা ছিলেন। দ্বিতীয়ত রাজা স্ত্রীকে খুশি দেখতে চাইতেন।

একদিন রাজা নিজের পত্নীকে বললেন, যদি তুমি রাগ না করো তাহলে একটি কথা বলি? রানী বললেন, বলুন। রাজা বললেন, তুমি তোমার গুরুর কাছে যাও। গুরু ছাড়াও তো ভক্তি করা যায়। রানী বলেন, গুরু ছাড়া ভক্তি করা ব্যর্থ। তখন রাজা বললেন, কাল আমি তোমার সঙ্গে গুরুজীর কাছে যাব এবং এই কথার সমাধান করব।

পরের দিন রাজা সন্তজীকে প্রশ্ন করলেন, আপনি জনতাকে কেন মূর্খ বানাচ্ছেন, গুরু বিনা ভক্তি হয় না, কেন গুরু বিনা ভক্তি সফল হবে না? নাম মন্ত্রই তো জপ করতে হবে। কারো কাছ থেকে মন্ত্র জেনে জপ করলেই তো ভক্তি করা হয়। সন্তজী বললেন, রাজন! আপনার কথা যথেষ্ট যুক্তি পূর্ণ। আমি আপনার দরবারে গিয়ে এই কথার উত্তর দেব। নির্দিষ্ট দিনে সন্তজী রাজদরবারে যান। রাজা সিংহাসনের উপর বিরাজমান ছিলেন। সিপাহীরা আশেপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সন্তজীর বসার জন্য পৃথক চেয়ার রাখা ছিল। সন্তজী আসামাত্র পাশে দাঁড়ানো সিপাহীদের আদেশ দেন, রাজাকে বন্দী করো। সন্তের কথায় সিপাহীরা কোন গুরুত্ব দেয় না। সন্তজী লাগাতার তিনবার সিপাহীদের আদেশ দেন ওকে গ্রেপ্তার করো। কিন্তু সিপাহীরা রাজাকে গ্রেপ্তার করে না। তখন রাজা ক্রোধিত হয়ে ভাবলেন,অভাগা! এই জন্য আমার পত্নীকে ভ্রমিত করছিল যাতে আমার রাজ্য হরপ করতে পারে। তিনি একবার মাত্র সন্তজীর দিকে ইশারা করে বললেন, ওকে গ্রেপ্তার করো। এই কথা বলার সাথে সাথে সিপাহীরা সন্তকে বন্দী করে নিল ।

সন্ত বললেন, হে রাজন! আপনি ঘরে ডেকে সন্তের অনাদর করছেন। এটা ভালো কথা নয়। রাজা বললেন, আপনি কেন অভদ্র আচরণ করছিলেন? কেন আমাকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দিচ্ছিলেন? সন্তজী বললেন, আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম যে গুরুজীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে ভক্তি করলে কেন লাভ দায়ক হয়? আমাকে ছাড়তে বলো, তাহলে আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। রাজা সিপাহীদের বললেন, ছেড়ে দাও। সিপাহীরা সন্তজীকে ছেড়ে দিলেন। সন্তজী বললেন, হে রাজন! আমি এই বাক্য তিনবার বলেছিলাম, "ওকে গ্রেপ্তার করো"। সিপাহীরা কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। আপনি ঐ কথাই মাত্র একবার বলাতে সিপাহীরা আমাকে গ্রেপ্তার করে।আপনার বচনে রাজশক্তি আছে। আর আমার বচনে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। আপনি যদি ঐ নাম মন্ত্রের জপ অন্য কাউকে বলেন, তা কাজ করবে না। কিন্তু

আমি ঐ নাম মন্ত্র দেওয়ার সাথে সাথে ক্রিয়াবান হবে। এইজন্য পূর্ণ সন্ত থেকে দীক্ষা নিলে সাধকের তৎক্ষণাৎ আধ্যাত্মিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়। সাধকের আত্মায় ভক্তির অঙ্কুর প্রস্ফুটিত হয়। সুক্ষ্মবেদে বলেছে :-

**সতগুরু পশু মানুষ করি ডারৈ, সিদ্ধি দেয় কর ব্রহ্ম বিচারৈঁ।**

**ভাবার্থ:-** সদগুরু প্রথমে মানুষকে সৎসঙ্গ শুনিয়ে শুনিয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ বানায়, সর্ব বিকার অর্থাৎ, দুষ্কর্ম, মন্দ চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত করে। তারপর নিজের ভক্তির সিদ্ধি অর্থাৎ শক্তি শিষ্যের অন্তঃকরণে শব্দ রূপে প্রবেশ করিয়ে পরমব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মার সাধনা করার ইচ্ছা প্রবল করেন। তখন সাধকের রুচি ভক্তিতে দিন প্রতিদিন বাড়তে থাকে এবং দেবতুল্য হয়ে যায়। কবীর জী বলেছেন :-

**কবীর, বলিহারী গুরু আপনা, ঘড়ী-ঘড়ী সৌ-সৌ বার।**
**মানুষ সে দেবতা কিয়া, করত না লাঈ বার॥**

তাই বলেছেন যে :-

**কবীর, গুরু বিন মালা ফেরতে, গুরু বিন দেতে দান।**
**গুরু বিন দোনোঁ নিষ্ফল হৈঁ, চাহে পুছো বেদ পুরাণ॥**
**যোগ, যজ্ঞ তপ দান করাবৈ, গুরু বিমুখ ফল কভী নহী পাবৈ॥**

**ভাবার্থ:-** গুরু ছাড়া মালা জপা বা দান দেওয়া দুই-ই নিষ্ফল হয়। বেদ ও পুরাণে এর প্রমাণ আছে। অন্তিম চতুষ্পদ শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, যদি দীক্ষা নিয়ে সদগুরুকে ছেড়ে শুধু মন্ত্র জপ করো বা দান ধর্ম, যজ্ঞ, হবন ইত্যাদি করো তাও নিষ্ফল যাবে। ঐ দানে কোন লাভ হয় না।

**কবীর, তাঁতে সতগুরু শরণা লীজৈ, কপট ভাব সব দুর করিজৈ।**

অন্য প্রমাণ:-

**কবীর, গর্ভ যোগেশ্বর গুরু বিনা, করতে হরি কি সেব।**
**কহৈঁ কবীর বৈকুন্ঠ সে, ফের দিয়া সুখদেব॥**
**রাজা জনক গুরু কিয়া, ফির কিন্হী হর কী সেব।**
**কহেঁ কবীর বৈকুণ্ঠ মেঁ, চলে গয়ে সুখদেব॥**

**ভাবার্থ:-** ঋষি বেদ ব্যাসের পুত্র শুকদেব ঋষি পূর্বজন্মের ভক্তির শক্তিতে উড়ে স্বর্গে চলে গিয়েছিলেন। একদিন তিনি শ্রীবিষ্ণুর লোকে বানানো স্বর্গে প্রবেশ করতে যান। ওখানে দ্বার রক্ষীরা স্বর্গদ্বারে শুকদেব ঋষিকে নিজের পূজ্য গুরুদেবের নাম বলতে বলেন। শুকদেব ঋষি বলেন, গুরুর কি প্রয়োজন? আমার মধ্যে এতোটা শক্তি আছে যে আমি গুরু ছাড়া এখানে চলে এসেছি। দ্বারপাল বলে, ঋষিজী এ আপনার পূর্ব জন্মের সংগ্রহ করা ভক্তি শক্তি। যদি পুনরায় গুরু ধারন না করে ভক্তি না করেন তাহলে পূর্বের ভক্তিধন কিছুদিন পরে সমাপ্ত হয়ে যাবে। আর আপনার মানব জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।

**উদাহরণ:-** বর্তমানে ইনভার্টার কে চার্জে লাগিয়ে চার্জ করে রাখা হয়েছে। চার্জার সরিয়ে দেওয়ার পরও ইনভার্টার নিজের কাজ করতে থাকবে। কারণ ঐ ব্যাটারিতে উর্জা (শক্তি) সঞ্চিত আছে। কিছু সময় পরে ঐ ইনভার্টার কাজ করা বন্ধ করে দেবে। পাখা, বাল্ব, টিভি, কিছুই চলবে না। কারণ ঐ ব্যাটারির উর্জা (শক্তি) শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই পুনরায় চার্জ করার প্রয়োজন। চার্জ করতে হলে চার্জারের প্রয়োজন, গুরুজীকে চার্জার মনে করো আর পরমেশ্বরকে বিদ্যুৎ।

ঋষি শুকদেবের নিজের সিদ্ধির অভিমান ছিল। তিনি মানলেন না। এই কথা শ্রীবিষ্ণু পর্যন্ত পৌঁছায়। শ্রীবিষ্ণুও ঐ একই কথাই বলেন, হে ঋষিজী। প্রথমে গুরু

ধারণ করো, তারপর এখানে আসবে। শুকদেব বলে, হে ভগবান! পৃথিবীতে আমার সমতুল্য কেউ নেই আর আমার যোগ্য গুরুও কেউ নেই। কৃপা করে আপনি বলে দেন আমি কার কাছ থেকে গুরু দীক্ষা নেব? তখন শ্রী বিষ্ণু বললেন, ঋষিজী! তুমি রাজা জনককে গুরু বানাও। এই বলে বিষ্ণুজী নিজের মহলে চলে গেলেন। শুকদেব ঋষি পৃথিবীতে ফিরে এসে রাজা জনকের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে গুরু দ্বারা বলা মন্ত্র জপ করেন। তখন শুকদেব ঋষিকে স্বর্গে থাকতে দেওয়া হয়। এইজন্য গুরু ধারন করে ভক্তি করলেই সফলতা প্রাপ্ত হয়। গুরু বিনা ভক্তি দান প্রভৃতি ব্যর্থ হয়।

**"পূর্ণ গুরু হতে হবে, নকল গুরুতে কোন লাভ হবে না।"**

**প্রশ্ন**:- পূর্ণ গুরুর পরিচয় কি? আমরা যে গুরুর জ্ঞানই শুনি তাকেই পূর্ণ গুরু মনে হয়।

**উত্তর** :- সুক্ষ্মবেদে গুরুর লক্ষণ বলেছে:-

**গরীব, সতগুরু কে লক্ষণ কহুঁ, মধুরে বৈন বিনোদ।**
**চার বেদ ছঃ শাস্ত্র, কহ অঠারহ বোধ॥**

সন্ত গরীব দাসজীর (গ্রাম ছুড়ানী, জেলা ঝজ্জর, হরিয়াণা) সঙ্গে পরমেশ্বর দেখা করেছিলেন। ওনার আত্মাকে উপরে নিজের সতলোকে (সনাতন পরম ধাম) নিয়ে যান। উপরের সর্বলোক দেখিয়ে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। ওনাকে সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম জ্ঞান বলেন এবং পরমেশ্বর কবীর জী ওনার জ্ঞান যোগ খুলে দেন। তার আধারে সন্ত গরীব দাসজী পূর্ণ গুরুর পরিচয় বলেছেন। সত্য গুরু অর্থাৎ সদগুরু এমন জ্ঞান বলেন যা শুনে ভক্তের আত্মা আনন্দিত হয়ে যায়, খুবই মধুর লাগে কেননা তা সত্য জ্ঞানের উপর আধারিত হয়। সদগুরু চারবেদ এবং সর্ব শাস্ত্রের জ্ঞান বিস্তার পূর্বক বলেন। এই প্রমাণ পরমেশ্বর কবীরজী সুক্ষ্মবেদে, কবীর সাগরের অধ্যায় "জীব ধর্ম বোধ" এর ১৯৬০ পৃষ্ঠায় দিয়েছে:--

**গুরুকে লক্ষণ চার বখানা, প্রথম বেদ শাস্ত্র কো জ্ঞানা॥**
**দুজে হরি ভক্তি মন কর্ম বানি, তীজে সমদৃষ্টি করি জানী॥**
**চৌথে বেদ বিধি সব কর্মা, য়ে চার গুরু গুণ জানোঁ মর্মা॥**

**সরলার্থ**:- কবীর পরমেশ্বর জী বলেছেন, যিনি সতগুরু হবেন তার মধ্যে চার লক্ষণ থাকবে:-

১. সমস্ত বেদ ও শাস্ত্রকে তিনি ভালো ভাবে জানেন।

২. তিনি স্বয়ং মন-কর্ম-বচন দিয়ে ভক্তি করেন এবং করান অর্থাৎ ওনার কথা আর কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

৩. তৃতীয় লক্ষণ হল এই যে, সর্ব অনুগামীদের তিনি সমদৃষ্টিতে দেখেন। কোন ভেদ-ভাব করেন না।

৪. চতুর্থ লক্ষণ, সতগুরু সর্ব ভক্তি কর্ম বেদ (চার বেদের কথা তো সকলে জানে ১. ঋগ্বেদ, ২. যর্জুবেদ, ৩. সামবেদ, ৪. অর্থববেদ আর এক বেদ আছে পঞ্চম বেদ একে সুক্ষ্মম বেদ বলে) অনুসার করেন ও করান।

বেদে (চার বেদে ঋগ্বেদ, যর্জুবেদ, সামবেদ, ও অথর্ববেদ) একমাত্র ওম্=ওঁ নামের জপ করার বিধান আছে।

প্রমাণ = যর্জুবেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ১৫ ও ১৭ তে।

মন্ত্র ১৫ তে বলেছে যে, ওম্ (ওঁ) নামের স্মরণ কর্ম করতে করতে করো, বিশেষ ব্যাকুলতার সাথে করো। মানুষ জীবনের পরম কর্তব্য মেনে করো।ওঁ নামের জপ মৃত্যু

পর্যন্ত করলে ততটা অমরত্ব পাওয়া যায়, যতটা ঔ সাধনায় হয় (যজুর্বেদ ৪০/১৫)।

যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ১৭-তে বেদ জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম বলছেন যে, পূর্ণ পরমেশ্বর তো আছেন কিন্তু তিনি পরোক্ষ ভাবে (লুকানো বা অব্যক্ত) থাকেন। সকলের দৃষ্টিতে আসেন না (তাঁর বিষয়ে যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ১০ এ বলা হয়েছে। তার যথার্থ জ্ঞান তত্ত্বদর্শী সন্তই জানেন তাঁর কাছে শোনো)। আবার যর্জুবেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র ১৭ তে বলেছে (অহম্ খম্ ব্রহ্ম) আমিই ব্রহ্মা। আমার এক ওম-ওঁ নাম। আমি উপরে দিব্য আকাশরূপী ব্রহ্মালোকে থাকি। (যজুবেদ ৪০/১৭)।

এই প্রমাণ শ্রী দেবী মহাপুরানেও আছে (গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত সচিত্র মোটা টাইপ কেবল হিন্দিত) সপ্তম স্কন্দ পৃষ্ঠা ৫৬২-৫৬৩-র শ্রী দেবীজী রাজা হিমালয়কে বলছেন, হে রাজন! তুমি যদি আত্ম-কল্যাণ করাতে চাও, তাহলে আমার ভক্তি সহিত সমস্ত সাধনা ত্যাগ করে কেবল এক ওঁ নামের জপ করো আর ব্রহ্ম প্রাপ্তির উদ্দেশ্য রাখো। তাহলে তুমি ব্রহ্মকে প্রাপ্তি করবে। তিনি ব্রহ্মালোক রূপী দিব্য আকাশে থাকেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, বেদে শুধু ওম্ নাম জপের বিধান আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতেও তার প্রমান আছে। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৩ তে বলেছে:-

**ওম্ ইতি একাক্ষরম ব্রহ্ম ব্যাহরণ মাম্ অনুস্মরন্।**
**য়ঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহম্ সঃ যাতি পরমাম্ গতিম্॥**

**অনুবাদ:-** গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম বলছেন যে, আমার শুধু ওম =ওঁ এই এক অক্ষর। তার উচ্চারণ করতে করতে যে সাধক শরীর ত্যাগ করে সে মৃত্যুর পরে ওম্ নামের স্মরণ থেকে হওয়া পরমগতি অর্থাৎ ব্রহ্মালোক প্রাপ্তি করে।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা এবং বেদে এই মন্ত্র ছাড়া অর্থাৎ ঔম = ওঁ অতিরিক্ত ব্রহ্ম আর কোন নাম ব্রহ্ম সাধনার নেই।

প্রমাণিত হল যে, ওঁ = ওম্ নামের জপ শাস্ত্র প্রমাণিত।

গীতা জ্ঞানদাতা স্পষ্ট বলেছেন যে, হে অর্জুন! তোর আর আমার অনেক জন্ম হয়ে গেছে, পরেও হবে। আমার উৎপত্তিকে ঋষি এবং দেবতাগণ জানে না। (গীতা অধ্যায় ২/ শ্লোক ১২, অধ্যায় ৪ শ্লোক/৫ অধ্যায় ১০ শ্লোক ২.

এতে প্রমাণিত হয় গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম নাশবান এবং তার জন্ম ও মৃত্যু হয়। এনার পূজারীরাও জন্ম- মৃত্যু চক্রে থাকে। এইজন্য গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৬ তে বলেছে, ব্রহ্মালোকে যাওয়া সাধকও পুনরায় জন্ম মৃত্যুতে ফিরে আসে। এইজন্য গীতা জ্ঞানদাতা গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ তে বলেছে, হে ভারত! তুই সর্বভাবে ঐ পরমেশ্বরের শরণে যা। ঐ পরমেশ্বরের কৃপায় তুই পরম শান্তি তথা সনাতন পরমধাম অর্থাৎ সতলোক প্রাপ্ত করবি।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত করার পরে তাঁর মতানুসারে সাধনা করে পরমেশ্বরের ঐ পরম পদের খোঁজ করা দরকার। যেখানে যাওয়ার পরে সাধক পুনরায় এই সংসারে ফিরে আসে না। তাই একমাত্র ঐ পরমেশ্বরের পূজা করো।

গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৯-তে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছে:-

**জরা মরণ মোক্ষায় মাম্ আশ্রিত্য যতন্তি য়ে।**
**তে তত্ ব্রহ্ম বিদুঃ কৃতসম্ অধ্যাত্মম্ কর্ম চ অখিলম॥**

**ভাবার্থ:-** গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন,যে আমার বলা জ্ঞানে আশ্রিত হয়ে অর্থাৎ আমার মত অনুসারে যে তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে থেকে তত্ত্বজ্ঞান জেনে নেয়, সে জরা অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা ও মৃত্যুর কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। সে (তত্ ব্রহ্ম

বিদুঃ) ঐ ব্রহ্মকে অর্থাৎ সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান আর কর্মকে জানে।

অর্জুন গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১-এ জিজ্ঞাসা করেছে "তত ব্রহ্ম" কি? এই প্রশ্নের উত্তর গীতা জ্ঞানদাতা গীতা অধ্যায় ৮-এর শ্লোক ৩ এ দিয়েছেন। বলেছেন যে, সেই 'পরম অক্ষর ব্রহ্ম'।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৫ এবং ৭ এ গীতা জ্ঞানদাতা নিজের ভক্তি করতে বলেছেন। আর ভরসা দিয়েছেন যে, আমার ভক্তিতে তুই আমাকেই প্রাপ্ত করবি। আমার ভক্তিতে জন্ম -মৃত্যু, কর্ম চক্র চলতে থাকবে এবং যুদ্ধও করতে হবে, পরম শান্তি হবে না।

আবার গীতা জ্ঞানদাতা, গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৮, ৯, ১০ এ বলেছেন যে, "তত ব্রহ্ম" অর্থাৎ "পরম অক্ষর ব্রহ্ম" এর ভক্তি করা ব্যক্তি সেই সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম অর্থাৎ আমার থেকে অন্য দিব্য পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত করবে।

এই প্রকার পরম অক্ষর ব্রহ্মের মহিমা গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭-তে বলেছে। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ তে দুই পুরুষের কথা বলা হয়েছে। এক ক্ষর পুরুষ। উনি স্বয়ং গীতা জ্ঞানদাতা এবং ২১-ব্রহ্মাণ্ডের মালিক।

দ্বিতীয় অক্ষর পুরুষ, যিনি ৭ শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। এই দুই প্রভুই নাশবান। এনাদের লোকের সর্ব জীবও নাশবান।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে বলেছে:-

**উত্তম পুরুষঃ তু অন্যঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃত**
**যঃ লোক ত্রয়ম্ আবিশ্যা বিভর্তি অব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ**

**অনুবাদ:-** উত্তম পুরুষ = পুরুষোত্তম অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্ম উপরে বর্ণিত ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ থেকে অন্য যাকে পরমাত্মা বলা হয়। {ক্ষর পুরুষের ২১ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্র, দ্বিতীয় অক্ষর ব্রহ্মের ৭ সংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্র (সীমানা), তৃতীয় উপরের চার লোক (সত্যলোক, অলখলোক, অগম লোক ও অনামী লোক) এই তিন লোকে} প্রবেশ করে যিনি সকলের ধারণ পোষণ করেন, তিনিই বাস্তবে অবিনাশী পরমেশ্বর।

গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ এ পরম অক্ষর ব্রহ্ম-এর প্রাপ্তির মন্ত্র বলেছে:-

**ওঁ তত্ সত্ ঈতি নির্দেশঃ ব্রহ্মনঃ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।**
**ব্রাহ্মণাঃ তেন বেদাঃ যজ্ঞাঃ চ বিহিতা পুরা॥**

ব্রহ্মাণঃ = সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্ম-এর ভক্তি সাধনা অর্থাৎ পরমেশ্বরের ঐ পরম পদের প্রাপ্তি করার মন্ত্র বলেছে। যেখানে যাওয়ার পর সাধক পুনরায় এই সংসারে আর কখনো ফিরে আসে না। যেখানে পরম শান্তি প্রাপ্ত হয় যা সনাতন পরমধাম।

ওঁ= 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ 'ক্ষর পুরুষের' মন্ত্র জপ যা প্রত্যক্ষ আছে।

তত্ = এই মন্ত্র অক্ষর পুরুষের জপ মন্ত্র। এই মন্ত্র এখানে সাংকেতিক বাস্তবিক মন্ত্র সূক্ষ্মবেদে বলা হয়েছে। এই মন্ত্র দীক্ষার সময় একমাত্র দীক্ষার্থীদের বলা হয়। অন্যদের বলা হয় না।

সত্= ইহা 'পরম অক্ষর পুরুষ'-এর সাধনার মন্ত্র। এই মন্ত্রও এখানে সংকেত রূপে আছে। এক মাত্র দীক্ষার্থীকে বলা হয়। যথার্থ মন্ত্র সুক্ষ্মবেদে লেখা আছে। এর প্রমাণ সামবেদ- এর মন্ত্র সংখ্যা ৮২২ তে আছে, এই তিন নামের জপে পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

সংখ্যা নং ৮২২ সামবেদ উতার্চিক অধ্যায় ৩ খণ্ড নং ৫ শ্লোক নং ৮ (সন্ত রামপাল

দাস দ্বারা ভাষা-ভাষ্য অর্থাৎ অনুবাদিত)

**মনীষিভিঃ পবতে পর্ব্যত কবির্নৃভির্যতঃ পরি কোশাং অসিব্যদত**
**ত্রিতস্য নামঁ জনযন্মধু ক্ষরগ্নিন্দ্রস্য বায়ু সখ্যায় বর্ধয়ন॥ ৮॥**

মনীষিভিঃ -পবতে -পূর্ব্যয়ঃ- কবির্- নৃভিঃ -যতঃ পরি- কোশান্ অসিব্যদত্- ত্রি- তস্য-নাম- জনয়ন্- মধু- ক্ষরনঃ-ন-ইন্দ্রস্য- বায়ুম্ -সখ্যায় -বর্ধয়ন।

**শব্দার্থ:**- (পূর্ব্যঃ) সনাতন অর্থাৎ সর্ব প্রথম প্রকট (কবির নৃভিঃ) কবীর পরমেশ্বর মানব রূপ ধারন করে, অর্থাৎ গুরু রূপে প্রকট হয়ে (মনীষিভিঃ) বুদ্ধিমান ভক্তকে (ত্রি) তিন (নাম) মন্ত্র অর্থাৎ নাম উপদেশ দিয়ে (পবতে) পাপরহিত অর্থাৎ পবিত্র করে (জনয়ন) জন্ম (ক্ষরনঃ) মৃত্যু থেকে (ন) রহিত- মুক্ত করে এবং (তস্য) তার (বায়ুম) প্রাণ অর্থাৎ জীবন- শ্বাসকে যে সংস্কারবশ গুনে দেওয়াছিল তাও (কোশান) নিজের ভাণ্ডার থেকে (সখ্যায়) মিত্রতার আধারে (পরি) পূর্ণ রূপে (বর্ধয়ন) বাড়িয়ে দেন। (যতঃ) যে কারণে (ইন্দ্রস্য) পরমেশ্বরের (মধু) বাস্তবিক আনন্দ কে (অসিব্যদত্) নিজের আশীর্বাদ প্রসাদে প্রাপ্ত করান।

**ভাবার্থ:**- এই মন্ত্রে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পূর্ণ পরমাত্মা কবির অর্থাৎ কবীর মানব শরীরে গুরু রূপে প্রকট হয়ে প্রভু প্রেমী আত্মাদের তিন নামের জপ দিয়ে সত্য ভক্তি করান। ঐমিত্র ভক্তকে পবিত্র করে নিজের আশীর্বাদ দিয়ে পূর্ণ পরমাত্মা অর্থাৎ নিজের প্রাপ্তির মার্গ বলে পূর্ণ মোক্ষপ্রাপ্ত করান। সাধকের আয়ুও বাড়িয়ে দেন। এর প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ এ আছে যে ওম-তত- সত্ ইতি নির্দেশঃ ব্রহ্মানঃ ত্রিবিধ স্মৃতঃ। ভাবার্থ এই যে পূর্ণ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার (১) ওঁ (২) তত (৩) সত এই তিন মন্ত্র জপ করে স্মরণ করার নির্দেশ আছে। এই নামকে তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছ থেকে প্রাপ্ত করো। তত্ত্বদর্শী সন্তের বিষয়ে গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪ এ বলেছে এবং গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ ও ৪ এ তত্ত্বদর্শী সন্তের পরিচয় বলেছে এবং এও বলেছে তত্ত্বদর্শী সন্ত থেকে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত করার পরে ঐ পরমপদ পরমেশ্বরের খোঁজ করা উচিত। যেখানে যাওয়ার পরে সাধক আর এই সংসার সমুদ্রে ফিরে আসে না অর্থাৎ পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিজের লোকে অর্থাৎ সনাতন ধামে চলে যায়। ঐ পূর্ণ পরমাত্মার দ্বারা এই সর্ব সংসারের সৃষ্টি হয়েছে।

**বিশেষ:**- উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট হয় যে, পবিত্র চার বেদ সাক্ষী দিচ্ছে, একমাত্র পূর্ণ পরমাত্মাই পূজার যোগ্য। তার বাস্তবিক নাম কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) এবং তিন মন্ত্র নামের জপের বিধিতে পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

এই তিন মন্ত্রের জপ চার বেদের সারাংশ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে প্রমাণ আছে যে ইহাতে ঐ স্থান প্রাপ্ত হয় যেখানে যাওয়ার পর সাধককে আর এই সংসারে ফিরে আসে না, যা সনাতন পরমধাম যেখানে যাওয়ার পরে পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়।

বেদ ও গীতায় এই অমূল্য তিন নামের মন্ত্র অস্পষ্ট অর্থাৎ সাংকেতিক ভাবে আছে। তাই চারবেদ ও গীতা অনুসারে সাধনা করলে ঐ সনাতন স্থান অর্থাৎ পরম ধাম প্রাপ্ত হবে না। তাই গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২ এবং ৩৪ এ গীতা জ্ঞানদাতা স্পষ্ট করেছে যে যজ্ঞ অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানের যথার্থ জ্ঞান (ব্রহ্মানঃ মুখে) সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্ম নিজের মুখ কমলের বাণীতে বলেন। ঐ বাণীকে সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্মের বাণী বলা হয়। ঐ বাণীকে তত্ত্বজ্ঞান বা সূক্ষ্মবেদ বলা হয়। এই জ্ঞান জানার পর সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এতে সম্পূর্ণ ভক্তি বিধির (মন্ত্র বলা হয়েছে। (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২)

গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪- এ বলেছে ঐ তত্ত্বজ্ঞানকে তুই তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে

গিয়ে জান। ছল কপট ত্যাগ করে, নম্রতা পূর্বক দণ্ডবত প্রণাম করে, প্রশ্ন করলে পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান জানা ঐ জ্ঞানী আত্মা তোকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেবে। (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪)।

গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪ = ঐ তত্ত্বজ্ঞানকে তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে গিয়ে জ্ঞান বোঝ এবং দণ্ডবৎ প্রণাম করে নম্রতা পূর্বর প্রশ্ন করলে ঐ পরমাত্মতত্ত্বকে ভালোভাবে জানা জ্ঞানী মহত্মা তোমাকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেবে। (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪)

মহাশয়! ঐ তত্ত্বদর্শী সন্ত বর্তমানে একমাত্র এই দাসই (সন্ত রামপাল দাস) আছে। ঐ তত্ত্বজ্ঞান আমার কাছে আছে। আমি ছাড়া ঐ তত্ত্বজ্ঞান বর্তমান পৃথিবীতে অন্য কারো কাছে নেই। বর্তমান পৃথিবীতে এখন জনসংখ্যা মোটামুটি ৭ আরব। এই আরব মানুষের মধ্যে একমাত্র এই দাসের কাছে তত্ত্বজ্ঞান আছে।

গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২ থেকে ১৫ পর্যন্ত গীতা জ্ঞানদাতা তিন গুণের ভক্তি (রজোগুণ ব্রহ্মা, সতগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ শিব) করা মানুষকে বলেছে (১) রাক্ষস স্বভাব ধারন করা (২) মানুষের মধ্যে নীচ (৩) দূষিত অর্থাৎ খারাপ কর্ম করা ৪) মূর্খ আমার ভক্তিও করে না।

(আবার গীতা জ্ঞানদাতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৬ থেকে ১৮ পর্যন্ত নিজের সাধনা করা ভক্তের স্থিতি বলেছে- আমার ভক্তি চার প্রকারের (১. আর্ত ২. অথার্থী ৩. জিজ্ঞাসু, ৪. জ্ঞানী) ভক্ত করে। এদের মধ্যে কেবল জ্ঞানী সাধকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে কিন্তু ঐ তারও তত্ত্বজ্ঞান না হওয়ার কারণে আমার অর্থাৎ ব্রহ্ম-এর অনুত্তম্ অর্থাৎ খারাপ গতিতে স্থিত থেকে যায়।

গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৯ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছে যে, বহু বহু জন্মের পরে কোন এক জন্মে কোন জ্ঞানী আত্মা আমার পূজা ঠিক ভাবে করে। অন্যথায় অন্য উপাসনায় লেগে থাকে। এই জ্ঞান বলা মহাত্মা অতি দুলর্ভ যিনি শুধু বলেন বাসুদেব অর্থাৎ সর্বত্তম ব্রহ্মই সবকিছু। ওনার ভক্তিতেই পরম শান্তি ও সনাতন পরমধাম বা পরমপদ প্রাপ্ত হয়। যেখানে যাওয়ার পরে সাধক আর পুনরায় এই সংসারে ফিরে আসেনা। ঐ পরম অক্ষর ব্রহ্ম সর্ব উৎপত্তির কর্তা। তিনি সংসার রূপী বৃক্ষের মূল এবং সর্ব লোকে প্রবেশ করে সকলের ধারণ-পোষন করেন। ঐ পরমাত্মা পাপ নাশক, পূর্ণ মোক্ষ দায়ক। ওনার ভক্তি করা দরকার।

প্রিয় পাঠক! ঐ তত্ত্বদর্শী সন্ত বর্তমানে এই পৃথিবীতে এই দাস (সন্ত রামপাল দাস) আছে। আমার কাছে সর্ব বেদ-শাস্ত্রের প্রমাণিত জ্ঞান আছে। বাসুদেব ভগবানের ভক্তির পূর্ণ মন্ত্র আছে।

এইবার বাসুদেবের পরিভাষা বলছি:-

## "বাসুদেবের পরিভাষা"

গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৪-১৫ তে বলেছে যে, সম্পূর্ণ প্রাণী অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়। অধিক জানার জন্য 208-209 নং পৃষ্ঠাতে দেখুন, সেখানে কেবল এই বিষয়ে লেখা আছে।

আবার বলেছে ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্ষর পুরুষের উৎপত্তি অবিনাশী পরমাত্মা থেকে হয়েছে। এই বিষয়ে গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭তে বলেছে। এতে প্রমাণিত হয়, "সর্বগতম্ ব্রহ্ম"= সর্বব্যাপী পরম অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ বাসুদেব সর্বদা যজ্ঞতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

**বিশ্লেষন করি:-** সর্বগতম্ ব্রহ্ম-এর অর্থ হল সর্ব ব্যাপী পরম অক্ষর পরমাত্মা (গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৫)

১. শ্রী ব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীশিব এই তিন দেবতা এক ব্রহ্মাণ্ডের তিনলোকের (স্বর্গ, মর্ত, ও পাতাল) শুধুমাত্র এক-এক বিভাগের (গুণের) প্রধান। এনারা সর্বগতম্ ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্বব্যাপি পরমাত্মা নয় অর্থাৎ বাসুদেব নয়।

**২. ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ:-** ইনি কেবল ২১ ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, এই পুরুষও সর্বগতম্ ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্বব্যাপি পরমাত্মা নয়।

**৩. অক্ষর পুরুষ:-** ইনি কেবল সাত (৭) শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী (প্রভু) এই পুরুষও সর্ব ব্যাপী পরমাত্মা না অর্থাৎ বাসুদেব নয়।

**৪. পরম অক্ষর ব্রহ্ম:-** ইনি সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, সকলকে ধারণ পোষন করা সর্ব ব্যাপী বাসুদেব।

**বিশেষ:-** অধিক জানার জন্য পড়ুন এই পুস্তকের 'সৃষ্টি রচনা' অধ্যায়ে।

যেমন আপনাদের পূর্বে বলা হয়েছে, পরম অক্ষর ব্রহ্ম স্বয়ং পৃথিবীতে প্রকট হয়ে পুন্যাত্মাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাদের তত্ত্বজ্ঞান বোঝান। এই বিধানানুসার ঐ পরমাত্মা সন্ত গরীব দাস (গ্রাম ছুড়ানী, জেলা ঝজ্জর, হরিয়াণা) জীকে ১৭২৭ সালে, দর্শন দেন এবং জিন্দা মহাত্মা রূপে (কালো ওভারকোট পরা মুসলমান ফকির রূপে) গরীব দাসজীর আত্মাকে ঐ সনাতন পরম ধামে নিয়ে যান এবং উপরের সর্ব ব্রহ্মাণ্ড ও সর্ব প্রভুর স্থিতির সাথে পরিচিত করান এবং তত্ত্বজ্ঞান বুঝিয়ে পুনরায় পৃথিবীতে ছেড়ে যান। ঐ সময় সন্ত গরীব দাসজীর বয়স ১০ বছর ছিল। ঐদিন সন্ত গরীব দাসজীকে মৃত মনে করে চিতার উপরে তুলে অন্তিম সংস্কারের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। ঐ সময় সন্ত গরীব দাসজীর আত্মাকে শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেন। গরীব দাসজীকে জীবিত দেখে বংশের এবং অন্য সকলে আনন্দে আত্ম হারা হয়ে যায়। এরপরে গরীবদাসজী এক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ গোপাল দাস নামক এক দাদু পন্থী সাধু লেখেন। গরীবদাস জী নিজের চোখে দেখা এবং পরমাত্মার দ্বারা বলা জ্ঞান নিজের মুখকমলে বলেন আর গোপালদাস জী তা লিপিবদ্ধ করেন। যা বর্তমানে প্রিন্ট করে রাখা হয়েছে।

পাঞ্জাব প্রান্তে লুধিয়ানা শহরের কাছে বাসীয়র নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে একজন প্রভুপ্রেমী ব্যক্তি রামরায় ওর্ফে ঝূমকরা বসবাস করত। তিনি সন্ত গরীব দাসজীর মহিমার কথা শুনে দর্শনের জন্য ছুড়ানী গ্রামে চলে আসেন। সন্ত গরীবদাসজী ঐভক্ত আত্মাকে তত্ত্বজ্ঞান শোনান। সেই জ্ঞান আমি (সন্ত রামপাল দাস) সন্ত গরীব দাসজীর থেকে প্রাপ্ত করে আপনাদের জন্য এই পুস্তকে এবং অন্যান্য পুস্তকেও বর্ণনা করেছি।

রামরায় (ঝূমকরা) প্রশ্ন করেন, হে মহত্মাজী! এই জ্ঞান আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি। সন্ত গরীব দাসজী নিজের বাণীতে বলেছেন:-

**কোটয়োঁ মধ্যে কোঈ নহীঁ রাঈ ঝূমকরা, অরবোঁ মেঁ কোঈ গরক সুনো রাঈ ঝূমকরা॥**

**ভাবার্থ:-** সন্ত গরীবদাসজী বলছেন, এই জ্ঞান কোটি কোটি মানুষের মধ্যে পাবে না। আরবো লোকের মধ্যে কোন এক জনের কাছে পাওয়া যাবে। ঐ সন্ত সর্ব জ্ঞান সম্পূর্ণ সাধনার মন্ত্রে গরক, অর্থাৎ পরিপূর্ণ। প্রিয় পাঠক ঐ সন্ত বর্তমানে বরবালা, জেলা হিসার এ বিদ্যমান। জ্ঞান বুঝে দীক্ষা নিয়ে লাভ উঠান।

**প্রশ্ন:-** প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা ভক্তি সাধনাকে আপনি কি করে ভুল বলছেন? যেমন সমস্ত ঋষিগণ তপ করত। আমরা সর্ব হিন্দু সমাজের মানুষ হরে, কৃষ্ণ, হরে রাম, রাধে, রাধে শ্যাম মিলা দে, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ জয় সিয়ারাম, রাধে শ্যাম, ওঁ তৎ সত্, এর মধ্যে কোন এক মন্ত্র জপ করি, এখনও করছি। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণকে আমরা পূর্ণ পরমাত্মা মনে করি। তাই তাদের নাম জপ করি।

আপনি এই নাম জপ করা ব্যর্থ বলছেন কেন? এর ব্যাখ্যা দিন।

**প্রশ্ন:-** প্রাচীনকালে থেকে চলে আসা সাধনাকে আপনি ভুল কিভাবে বলতে পারেন? যেমন সর্ব ঋষিগণ তপ করতেন, আমরা সর্ব হিন্দু সমাজে দেখে থাকি, সকলে হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাধে রাধে শ্যাম মিলাদে, ওম্ নমঃ শিবায়, ওম্ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ, জয় সিয়ারাম, রাধে শ্যাম, ওম্ তৎ সৎ এই মন্ত্রের মধ্যে কোন একটি মন্ত্র জপ করেন। বর্তমানেও করে চলেছে। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ কে আমরা পূর্ণ পরমাত্মা মানি, এই জন্য এনাদের নাম জপ করি। আপনি এই নাম জপ করার মন্ত্রকে ব্যর্থ জপ বলেন। প্রমাণ করুন।

**উত্তর:-** প্রাচীনকালে যদি এই সাধনা থাকতো তাহলে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ১-২-এ গীতা জ্ঞানদাতা এই কথা বলতেন না যে, যে যোগ অর্থাৎ ভক্তি বিধি আমি গীতা জ্ঞানে বলছি, তা এখন প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই জ্ঞান তথা ভক্তি আমি পূর্বে সূর্যদেবকে বলেছিলাম। পরে সূর্যদেব মনুকে, মনু নিজের পুত্র ইক্ষবাকুকে বলে। পরে কিছু রাজ ঋষিগণ জেনেছিল। এখন অনেক সময় থেকে অর্থাৎ দ্বাপর যুগের অনেক পূর্ব থেকেই এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। মনু, ইক্ষবাকু বা অন্যরা সত্যযুগের প্রথম চরণে এসেছিল। যদি আপনারা রাজা দশরথের পুত্র শ্রী রামচন্দ্র এবং শ্রীবাসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ পরমাত্মা মনে করেন এবং হরে রাম হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি মন্ত্র জপ করেন আর একেই মুক্তি মানেন তাহলে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় বর্ণিত যথার্থ প্রাচীন যোগ অর্থাৎ ভক্তি বিধির বিপরীত হওয়ায় সর্ব সাধনা ব্যর্থ। যে কারণে উপরোক্ত প্রশ্নতে লেখা অন্য মন্ত্রও শাস্ত্র প্রমাণিত নয় তাই ব্যর্থ। গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩-২৪ এ বলেছে, যে পুরুষ শাস্ত্র বিধিকে ত্যাগ করে মনমানী আচরণ করে। তার না সুখপ্রাপ্ত হয় না সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। না তার কোন গতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সর্ব সাধনা ব্যর্থ। (গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩)

গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৪ এ বলেছে, হে অর্জুন! তোর জন্য কর্তব্য আর অকর্তব্যের ব্যবস্থা শাস্ত্রে প্রমাণিত আছে। ভাবার্থ হয়, যে ভক্তি বিধির প্রমাণ শাস্ত্রে (চার বেদ = ঋগ্বেদ, যর্জুবেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ এবং এই চার বেদের সারাংশ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ও সূক্ষ্মবেদ = যা পরমেশ্বর স্বয়ং নিজ মুখ কমলে বলেছিলেন, এইগুলো ভক্তির জ্ঞান ও সমাধান প্রমাণিত শাস্ত্র)। যা শাস্ত্রে বর্ণিত নেই তা শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা। তাই কোন ভক্তি কর্ম করা উচিত আর কোন কর্ম করা উচিত নয় তা শাস্ত্রের আধারে করো বা শাস্ত্রকে আধার মানো। তাই শাস্ত্রে বর্ণিত বিধিকে গ্রহণ করো, বাকী সব ত্যাগ করে দাও।

শ্রীরাম চন্দ্রের জন্ম ত্রেতা যুগের অন্তিম চরণে হয়েছিল। আর শ্রী কৃষ্ণের জন্ম দ্বাপর যুগের অন্তিম চরণে হয়েছিল। সত্যযুগ থেকেই মানব ভক্তি করে আসছে। তখন কোন রাম ছিল? শ্রীবিষ্ণু সত্য যুগের আগে ছিলেন। আর শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ তো স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুই ছিলেন! সত্য যুগেও প্রমাণ আছে মহর্ষি বাল্মীকি রাম-রাম জপ করতেন, বিষ্ণু-বিষ্ণু জপ করতেন না। এটা থেকে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ থেকেও অন্য কোন রাম আছেন অর্থাৎ প্রভু আছেন। ঐ রামের নাম জপ করা উচিত। যা গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৯ এ বর্ণিত আছে। তার বিষয়ে বলেছে "তত ব্রহ্ম" কে জানা সাধক জরা অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা আর মৃত্যু থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভক্তি করে। অর্জুন গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১ এ প্রশ্ন করেছে, ঐ 'তত ব্রহ্ম' কি?

গীতা জ্ঞানদাতা, গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩-এ উত্তর দিয়েছেন যে, তিনি 'পরম অক্ষর ব্রহ্ম'। গীতা অধ্যায় ৮-এর শ্লোক ৫/৭ এ গীতা জ্ঞান দাতা নিজের ভক্তি করতে

বলেছে যার জপমন্ত্র গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৩-তে আছে। (ওম্ ইতি একাক্ষরম্ (ব্রহ্ম ব্যাহরণ মাম্ অনুস্মরণ----)

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৮, ৯, ১০-এ গীতা জ্ঞান দাতা নিজের থেকে অন্য তত্ ব্রহ্ম অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্ম-এর ভক্তি করতে বলেছে। তাঁর ভক্তির জপ মন্ত্র গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ এ বলেছে:-

**ওঁ তত্ সত্ ইতি নির্দেশঃ ব্রহ্মানঃ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।**
**ব্রহ্মাণাঃ তেন বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ চ বিহিতাঃ পুরা॥**

**সরলার্থ:-** ব্রহ্মণঃ- সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মের ভক্তির ওঁ-তত-সত মন্ত্র স্মরণ করার (নির্দেশ) আদেশ দিয়েছে। যা (ত্রিবিধঃ) তিন প্রকারের (স্মতঃ) স্মরণ করার জন্য বলেছে (ব্রাহ্মনাঃ) বিদ্বান অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী সন্ত (তেন) ঐ (বেদাঃ) জ্ঞানের আধরে ভক্তি করান (চ) আর (যজ্ঞাঃ) ধার্মিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান (চ) অন্য (যজ্ঞাঃ) ভক্তি কর্ম (পুরা) সৃষ্টির আদি অর্থাৎ সৃষ্টির শুরুতে এ (বিহিতা) করা হত।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় প্রমাণিত হয়, গীতা জ্ঞান দাতা থেকে অন্য কোন পূর্ণ পরমাত্মা আছেন। যিনি শ্রী বিষ্ণু, শ্রী ব্রহ্মা শ্রী শিব থেকে ভিন্ন (আলাদা), যার বিষয় গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১, ৪, ১৭ এবং গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ আর অনেক স্থানে বলেছে তিনিই পূর্ণ পরমাত্মা। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ তে দুই পুরুষের কথা বলেছে। দুজনকেই নাশবান বলেছে। এদের অন্তর্গত যত প্রাণী আছে তারাও নাশবান। (১) ক্ষরপুরুষ, একুশ ব্রহ্মাণ্ডের মালিক (২) অক্ষর পুরুষ ৭ শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী। এই (দুইজন পূর্ণ পরমাত্মা নয়। (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬)

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭, গীতা জ্ঞানদাতা বলেছে, উত্তমঃ পুরুষঃ তুঃ অন্যঃ অর্থাৎ পুরুষোত্তম তো উপরে বর্ণিত দুই পুরুষ (ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ ) থেকে অন্য কেউ তাকে (পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ) পরমাত্মা বলা হয়েছে। (য়ঃ লোকত্রয়ম্) যে তিন লোকে (আবিশ্য বিভর্তি) প্রবেশ করে, সকলের ধারন পোষণ করেন তিনি (অব্যযঃ ইশ্বরঃ) অবিনাশী পরমেশ্বর (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭)

পূর্ণ পরমাত্মাই পরম অক্ষর ব্রহ্ম প্রমাণিত হল। তাঁর ভক্তিমন্ত্র ওঁ-তত্-সত্ এটাও প্রমাণিত হল। ওঁ-তত্-সত্ এই তিন মন্ত্র যা উপরোক্ত তিন প্রভুর (ওঁ-ক্ষর পুরুয় অর্থাৎ ক্ষর ব্রহ্ম গীতা জ্ঞানদাতার। তত্- সাংকেতিক, যা এই পুস্তকে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তত্ মন্ত্র অক্ষর পুরুষের) সত্ও সাংকেতিক, ইহা পরম অক্ষর ব্রহ্মের মন্ত্র)। ইহা শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতার পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্তির সাংকেতিক মন্ত্র। আজ পর্যন্ত (২০১২ সাল) কেউ পরিস্কার ভাবে বলে নি। আপনারা যে “হরি ওম্ তত্ সত্” জপ করেন, এটাও ব্যর্থ। কারণ তত্ ও সত্ এর বাস্তবিক মন্ত্রের জ্ঞান আপনাদের জানা নেই।

**উদাহরণ:-** এক ধনী ব্যক্তি নিজের ধনকে বাড়ির এক জায়গায় গর্ত করে মাটির নীচে লুকিয়ে রাখেন। ঐ স্থানের ব্যাপারে কেবল ঐ ধনী ব্যক্তি জানতেন। একটি ডায়েরিতে সংকেতিক ভাষায় ঐ স্থানের বর্ণনা লিখে রাখেন। এক দিন হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। পুত্ররা ক্রিয়া কর্ম করার পরে ঐ ডায়েরি খুলে দেখে যে, পিতাজী কোথায় ধন লুকিয়ে রেখেছে তা ঐ ডায়েরিতে লেখা আছে। যা পিতাজী কাউকে দেখায়নি।

ধনী ব্যক্তির বাড়ির সামনে উঠানের এক কোণায় একটি মন্দির ছিল। ডায়েরিতে লেখা ছিল, চাঁদনী চতুর্দশী রাত্রি ২-টোর সময় সমস্ত ধন মন্দিরের গুম্বুজে পুঁতে রেখেছি। পুত্ররা রাত ২-টোর সময় মন্দিরের গুম্বজ ভেঙে দেখে। কিন্তু কিছুই পায় না। তারা খুব দুঃখী হয়ে যায়। একদিন পিতার এক মিত্র অন্য গ্রাম থেকে শোক ব্যক্ত করার জন্য বাড়িতে আসেন। পুত্ররা নির্ধারিত স্থানে ধন না পাওয়ার কথা জানায়। ধনী ব্যক্তির মিত্র

ডায়েরি আনতে বলেন, ঐ ব্যক্তি সাংকেতিক শব্দ পড়ে বলেন পুনরায় মন্দিরের গুম্বজ তৈরি করো। যেমন ছিল ঠিক তেমনই তৈরি করো। আমি অন্য একদিন এসে ধন রাখা জায়গাটি চিহ্নিত করে দেব। ঐ ব্যক্তি চাঁদনী চতুর্দশীতে আসেন। রাত্রি দুইটার সময় যে স্থানে চাঁদের আলোতে মন্দিরের গুম্বজের ছায়া পড়ে ছিল, ঐ স্থানে খনন করালেন। ডাইরিতে যা লেখা ছিল সেই সমস্ত ধন ওখানে পায়, তখন ছেলেরা খুব খুশি হয়।

আপনারা যে হরি ওঁ তত্ সত্ জপ করছেন। অর্থাৎ মন্দিরের গুম্বজ ভাঙ্গছেন, কিছুই হাতে পাবেন না। আসল বাস্তবিক মন্ত্র আমার (সন্ত রামপাল দাস) কাছে আছে। তা গ্রহণ করে সুখী ও ভক্তির ধনী হও।

**প্রশ্ন:-** শ্রীরাধা বৃন্দাবনের কাছে বরসানা (উত্তর প্রদেশ) গ্রামে বাস করতেন। ওখানের মানুষ এখন 'রাধে, রাধে' নাম জপ করে। সকাল-সকাল বা অন্য কোন সময়ে যদি কারো সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে "রাম রাম" বলে না। এর স্থানে তারা 'রাধে, রাধে' বলে। তাঁরা কি মূর্খ?

**উত্তর:-** তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে লোকবেদকে সত্য মনে করে এরা সবাই শাস্ত্রবিরুদ্ধ মন্ত্রের জপ করে চলছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩/২৪ তে বলেছে যে, শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে যে মনমানা আচরণ করে অর্থাৎ যে নাম শাস্ত্রে জপ করতে বলেনি, বা যে নাম জপ শাস্ত্রে লেখা নেই, তা জপ করলে না সুখ প্রাপ্ত হবে, না সিদ্ধি। তার কোন গতি হয় না অর্থাৎ ব্যর্থ। এইজন্য অর্জুন তোর জন্য কর্তব্য আর অকর্তব্যের ব্যবস্থা শাস্ত্রে প্রমাণ আছে। এই বিষয়ে পূর্বে বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো এই যে, কাকা- ভাইপোর দেখা হলে 'রাধে- রাধে' কেন বলে? তারা কি জানে শ্রীরাধা কে ছিল? শ্রীরাধা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমিকা ছিলেন। ঐ সময় বরসানা গ্রামের লোকেরা শ্রীরাধাকে কুলটা, বদচলন, নির্লজ্জ ইত্যাদি বিশেষণে সম্বোধিত করতো। সকলে বলতো শ্রীরাধা অন্য গ্রামের নন্দবাবার ছেলের সাথে লুকিয়ে দেখা করতে যায়। তাই ওনাকে বাড়িতে কেউ আসতেও দিতো না। কারন মেয়েদের উপর কু-প্রভাব পড়বে। মহাশয়! আর এখন ঐ গ্রামের ব্যক্তিরা রাধা জীকে স্বয়ং বলে (স্ত্রী পুরুষ সকলে) "রাধে রাধে শ্যাম মিলা দে।" যেমন পূর্বে আপনার প্রশ্ন ছিল, আমরা এই নামও জপ করি। এখন না শ্রীরাধা আছে, আর না কৃষ্ণজী। এখন জ্বরের রোগীদের মত ভুল বকে (রাধে রাধে শ্যাম মিলাদে) লাভ কি? এরকম স্থিতি অন্য মন্ত্রের। এগুলিকে আগে জানো। এগুলো শাস্ত্রে প্রমাণিত না হওয়ার কারণে ব্যর্থ।

এখন আপনাদের এই প্রশ্নের উত্তর বলছি,কেন কাকাও বলে 'রাধে রাধে' তার উত্তরে ভাগ্নেও বলে, রাধে রাধে। আপনারা সকলে জানেন যে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমীকা ছিলেন। আপনারা এটাও জানেন, যখন রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করার উদ্দেশ্য নিয়ে পালিয়ে যান তখন রথে চড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন রুক্মিণীর ভাই নিজের বোনকে কৃষ্ণের কাছ থেকে উদ্ধার করার জন্য ঘোড়ার পিঠে চড়ে রথের পিছনে ধাওয়া করেন। শ্রী কৃষ্ণ রুক্মিণীর ভাইকে পূর্বেও এক বার মেরেছিল। এইবার রথের পিছনে বেঁধে টানতে লাগেন। রুক্মিণীও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমিকা ছিল। এই প্রেমের মাঝখানে আসায় রুক্মিণীর ভাইয়ের এই দুর্দশা হয়। শ্রীকৃষ্ণ কে রুক্মিণী প্রার্থনা করায় তার ভাইয়ের প্রাণ বাঁচে। আজ যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা বেঁচে থাকতেন আর বরসানা গ্রামের কাকা- ভাইপোরা নিজেদের মধ্যে এই শব্দ বলতো "রাধে রাধে" তাহলে কি শ্রীকৃষ্ণ পছন্দ করতেন? কখনোই না ? কাকা, ভাইপো দুই জনকেই রথের চাকায় বেঁধে টানতো। যদি আপনি কারো প্রেমিকার নাম নিয়ে বিড়-বিড় করেন তাহলে ঐ প্রেমিকের উপর কেমন প্রভাব পড়বে? যদি শক্তিশালী হয় তাহলে মুখ ভেঙ্গে দেবে।

দুর্বল হলে কাঁদবে। নিজেকে দোষারোপ করবে। সে কি প্রসন্ন হবে? না। তাই এই নাম যা শাস্ত্র প্রমাণিত নয়, তার জপ করা ব্যর্থ। শাস্ত্রে প্রমাণিত নাম আমার কাছে আছে। আসুন আর নিজের কল্যাণ করান।

**প্রশ্ন:-** আপনার প্রশ্নের (পূর্ণগুরুর পরিচয় কি?) উত্তরে এক স্থানে লিখেছেন, প্রমানিত হয় যে ওঁ (ওম্) নামের জপ শাস্ত্র প্রমাণিত। (কাল ব্রহ্ম-এর পূজা করা উচিত কি না?) তার উত্তরে অনেক ঋষিদের শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে মনমুখী আচরণের কথা বলেছেন, যারা ওম্ নামের জপ করতেন।

**উত্তর:-** ঐ ঋষিগণ ওম্ (ওঁ) নামের জপ অর্থাৎ হঠযোগও করে ঘোর তপস্যা করতেন । যে কারণে তাদের সাধনাকে শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলা হয়েছে। ওম্ নামের জপ শাস্ত্রে প্রমাণিত আছে, কিন্তু মোক্ষদায়ক নয়, যাতে অনুত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। বেদ ও গীতায় পূর্ণ পরমাত্মার ভক্তি করতে বলেছে। ওনার (পূর্ণ পরমাত্মার) ভক্তি না করে, মনমুখী পূজা শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

**প্রশ্ন:-** মহর্ষি বাল্মিকী তো সত্যযুগে এসেছিলেন। তিনিও রাম-রাম জপ করতেন? এই মন্ত্র কি শাস্ত্র প্রমাণিত নয়?

**উত্তর:-** পূর্বে বলা হয়েছে যে, গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ১-২ এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, এই জ্ঞান আমি সূর্যকে বলেছিলাম। উনি নিজের পুত্র মনুজীকে বলেন। পরে কিছু রাজঋষিগণ প্রাপ্ত করেন। সত্য যুগের প্রারম্ভে সূর্য, মনু ও রাজ ঋষিরা পৃথিবীতে এসেছিল। তার পরে এই জ্ঞান ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়। মহর্ষি বাল্মিকির সঙ্গে সপ্ত ঋষি দেখা করেছিল। উনি তপস্যা করে সিদ্ধি প্রাপ্ত করেছিলেন। হঠযোগ বা তপ বিধি মহর্ষি বাল্মীকি জীকে সপ্ত ঋষি বলেছিলেন। ঐ হঠযোগের তপকে মহর্ষি বাল্মিকী তন-মন দিয়ে করেছিলেন। কিছু সময় পরে শরীরের উপরের ভাগ (মাথা) থেকে শব্দ শুনতে পেলেন। ঐ শব্দ ছিল ‘রাম-রাম’। তখন ঐ শব্দ উচ্চারণ করে বাল্মিকী তপস্যা করতে লাগেন। কিন্তু অন্যরা মনে করত মরা মরা বলছে। বাস্তবে রাম রাম উচ্চারণ করত। ওনার তপস্যার পরিনাম পেলেন। উনি সিদ্ধি প্রাপ্ত করলেন এবং দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। যে কারণে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের হাজার হাজার বছর পূর্বে রামায়ণ অর্থাৎ রামচন্দ্রের জীবনী ও সর্ব ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সেই গ্রন্থের নাম ‘বাল্মিকী রামায়ণ’ যা সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল। রাম-রাম জপ করলে কোন আধ্যাত্মিক লাভ হয় না। কিন্তু পরমাত্মা বোধক শব্দ হওয়ার কারণে পরমাত্মার কথা সর্বদা মনে থাকে অর্থাৎ ভুলে যায় না। তাই হিন্দু ধর্মে প্রাচীনকাল থেকেই রাম-রাম উচ্চারণের প্রচলন আছে। যেমন স্বামী রামানন্দ রাম-রাম শব্দে সম্বোধিত করতেন। তাঁর শিষ্যরাও একে অন্যকে রাম-রাম শব্দে সম্বোধিত করত। কিন্তু সবাই ওঁ মন্ত্র জপ করত। সেইরূপ আমরা কবীর পন্থীরা ‘সত্ সাহেব’ বলি। আমাদের জপ মন্ত্রও অন্য। এই ভক্তিতে পরমাত্মা পর্যন্ত যাওয়া যায়। সুক্ষ্ম বেদে বলেছে:-

**সুক্ষ্ম বেদে বলেছে:-**

**সদগুরু মিলে তো ইচ্ছা মেটৈ, পদ মিল পদৈ সমানা।**
**চল হংসা উস লোক পাঠাউঁ, জো অজর অমর অস্থানা॥**
**চার মুক্তি জহাঁ চম্পী করতী, মায়া হো রহী দাসী।**
**দাস গরীব অভয় পদ পরসৈ, মিলৈ রাম অবিনাশী॥**

## গীতা অনুসারে "কোন প্রভুর ভক্তি করা উচিত"

**সূক্ষ্মবেদে বলেছে:-**

**"ভজন করো উস রব কা, জো দাতা হৈ কুল সব কা"**

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪ ও ১৬, ১৭-তে বলেছে যে, এই সংসার অশ্বথ বৃক্ষের মত। যে সন্ত এই সংসার রূপী অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল (মূল শিকড়) থেকে তিন গুণ রূপী শাখা (ডাল) পর্যন্ত পৃথক-পৃথক ভাবে বলতে পারেন, (সঃ বেদবিত) তিনি বেদের তাৎপর্যকে ভালো ভাবে জনেন। অর্থাৎ তিনি তত্ত্বদর্শী সন্ত।

নিজের দ্বারা রচনা করা সৃষ্টির জ্ঞান এবং বাস্তবিক অধ্যাত্ম জ্ঞান পরমাত্মা স্বয়ং পৃথিবীর উপর প্রকট হয়ে নিজের মুখ কমল দ্বারা বলেন। প্রমাণের জন্য পড়ুন নিম্নের বেদমন্ত্র। কৃপা করে এই মন্ত্রের ফটোকপি দেখুন "গীতা তোমার জ্ঞান অমৃত" পুস্তকে, যার অনুবাদ আর্য সমাজের প্রবর্তক মহর্ষি দয়ানন্দ ও তার অনুগামীরা করেছেন। ঐ অনুবাদে যে ত্রুটি ছিল তা আমি (সন্ত রামপাল দাস) শুদ্ধ করে দিয়েছি।

ঋগ্বেদ মণ্ডল নং ৯ সুক্ত ৮৬ মন্ত্র ২৬-২৭, ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৮২ মন্ত্র ১-২, ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৬ - ২০, ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৯৪ মন্ত্র ১, ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৯৫ মন্ত্র ২, ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৫৪ মন্ত্র ৩, ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ২০ মন্ত্র ১ -তে প্রমাণ আছে, সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা এবং সমস্ত জীবের পালন হার পরমেশ্বর। তিনি সর্ব ভূবনের উপরের লোকে বসে আছেন। (ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৫৪ মন্ত্র ৩) ঐ পরমাত্মা ওখান থেকে গতি করে, অর্থাৎ সশরীরে পৃথিবীতে চলে আসেন। তিনি ভক্তদের সংঙ্কট নাশ করেন। তার নাম কবির্দেব অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বর। পৃথিবীতে পবিত্র আত্মাদের সাথে দেখা করে নিজ মুখ কমল দিয়ে তত্ত্বজ্ঞান বলে বোঝান। ঐ পরমাত্মা উপরের লোকে বিরাজমান আছেন। (ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৮৬ মন্ত্র ২৬-২৭ মণ্ডল ৮২ মন্ত্র ১-২ ও মণ্ডল ৯ সুক্ত ২০ মন্ত্র ১)

পরমাত্মা পৃথিবীতে কবিদের মত আচরণ করে বিচরণ (ঘোরাফেরা) করেন (ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৯৪ মন্ত্র ১)

পরমাত্মা নিজের মুখে বাণী বলে সাধককে ভক্তি করার প্রেরণা দেন। পরমাত্মা ভক্তির গুপ্ত মন্ত্র ও আবিষ্কার করেন। (ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৯৫ মন্ত্র ২)

পরমাত্মা তত্ত্বজ্ঞানকে কবির বাণী (কবীর বাণী) দ্বারা প্রবাদবাক্য, দোঁহা বা চতুষ্পদ শ্লোক দ্বারা বলে শোনায়। এই কবির্দের (কবীর পরমেশ্বর) সন্ত রূপে প্রকট হন। ঐ পরমেশ্বরের দ্বারা তার প্রেরিত সন্তের দ্বারা রচিত অসংখ্য বাণীই তত্ত্বজ্ঞান। এই বাণীই পরমাত্মার ভক্তদের জন্য অমৃত তুল্য আনন্দ দায়ক হয়।

ঐ পরমাত্মা প্রসিদ্ধ কবিদের মত কবি পদবী প্রাপ্ত করেন। তাই তাকে কবিও বলা হয়। কিন্তু তিনি আসলে পরমাত্মা ঐ পরমাত্মা তৃতীয় মুক্তি ধামে (সতলোক) বিরাজমান আছেন। মানুষ যেমন নানা রকম বস্ত্র ধারন করেন। ঠিক তেমন পরমাত্মাও ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারন করে পৃথিবীতে আসেন। উপরোক্ত ঋগ্বেদের মন্ত্রে স্পষ্ট বলেছে, পরমাত্মা নিজের অমর ধাম থেকে গতি করে (চলে এসে) পৃথিবীতে প্রকট হন এবং পবিত্র আত্মাদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তত্ত্বদর্শী সন্তের ভূমিকা (অভিনয়) পালন করে তত্ত্বজ্ঞানের বাণী দোঁহা, চতুস্পদ ও শ্লোকের দ্বারা বলেন। ঐ পরমেশ্বর ১৩৯৮ সাল থেকে ১৫১৮ সাল পর্যন্ত, ১২০ বছর পৃথিবীর উপর ভারতবর্ষের পবিত্র ধরিত্রীর উপর কাশী শহরে তাঁতি (ধানক জুলাহা) রূপে থেকে তত্বজ্ঞান দিয়েছিলেন।

**কবীর, অক্ষর পুরুষ এক পেড় হৈ, ক্ষর পুরুষ বাকী ডার।**

**তীনোঁ দেবা শাখা হৈঁ, পাত রূপ সংসার॥**

**বিশেষ:-** কবীর বাণী পুস্তকে আরো এক বাণী লেখা আছে:-

**কবীর, অক্ষর পুরুষ বৃক্ষ কা তনা হৈ, ক্ষর পুরুষ হৈ ডার।**
**ত্রয়দেব শাখা ভয়ে, পাত জানোঁ সংসার॥**

**সরলার্থ:-** বৃক্ষের যে অংশ মাটির উপর দেখা যায় তার বিষয়ে বলেছে বৃক্ষের যে কাণ্ড (তনা) তাকে অক্ষর পুরুষ জানো। কাণ্ডের উপর যে মোটা ডাল বের হয় তার মধ্যে একটি মোটা ডালকে "ক্ষরপুরুষ" জান। এই মোটা ডাল থেকে যে শাখা বের হয়েছে তা তিন দেব (ব্রহ্মা রজোগুণ, বিষ্ণু সত্ত্বগুণ ও শিব তমোগুণ) জানো। আর ঐ শাখায় লাগা পাতা জীবজন্তু জানো।

কবীর পরমেশ্বর তত্ত্বজ্ঞানে সমস্ত জ্ঞান বলেছেন। গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২-এ বলেছেন যজ্ঞ অর্থাৎ ধার্মীক অনুষ্ঠানের বিষয়ে (ব্রহ্মনঃ মুখে) সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্ম নিজের মুখ কমলের বাণীতে বিস্তারিত ভাবে যে জ্ঞান বলেছেন। সেটাই তত্ত্ব জ্ঞান।

গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪ এ বলেছে যে, তত্ত্বজ্ঞান পরমাত্মা স্বয়ং বলেন, সেই জ্ঞান তাঁর কৃপা পাত্র সন্তই ঠিক মত বুঝতে পারে। ঐ তত্ত্ব জ্ঞানকে তুই তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে গিয়ে জান। তাকে দণ্ডবত প্রণাম করে (মাটিতে শুয়ে লম্বা হয়ে প্রণাম) বিনম্র ভাবে প্রশ্ন করলে তিনি তোকে (তত্ত্বদর্শী সন্ত) তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেবেন।

পরমেশ্বর এই জ্ঞান স্বয়ং পৃথিবীতে প্রকট হয়ে বলেছে। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ এ তত্ত্বদর্শী সন্তের পরিচয়ে বলেছে, যে সন্ত সংসার রূপী বৃক্ষের মূল (শিকড়) সহ সর্ব অংশের বিষয়ে জানে, তিনিই তত্ত্বদর্শী সন্ত।

❖ এখন সংসার রূপী বৃক্ষের সর্ব অংশের বিষয়ে বলছি:-

**১. মূল (শিকড়):-** ইহা পরম অক্ষর ব্রহ্ম, যে সব কিছুর মালিক। সকলের উৎপত্তি কর্তা। সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছু ধারন পোষণ করেন, তার বিষয়ে গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১ এর প্রশ্নের উত্তর গীতা অধ্যায় ৮ এর শ্লোক ৩, ৮, ১০, ও ২০, ২১, ২২ এ দিয়েছে। তারই বর্ণনা গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে আছে। যেমন গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ তে দুই পুরুষের কথা বলেছে:- এক 'ক্ষর পুরুষ' দ্বিতীয় 'অক্ষর পুরুষ' এই দুই পুরুষ এবং এনাদের অন্তর্গত মতো শরীর ধারী প্রাণী আছে তারা সকলেই নাশবান। কিন্তু জীব আত্মা কারোর মরে না।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে বলেছে যে (উত্তম পুরুষঃ) অর্থাৎ পুরুষোত্তম্ তো অন্য কেউ যাকে (পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ) পরমাত্মা বলা হয়। (যঃ লোক এয়ম) যিনি তিন লোকে (অবিশ্য বিভতী) প্রবেশ করে সকলের ধারন পোষণ করেন (অব্যয়ঃ ঈশ্বর) তিনি অবিনাশী পরমেশ্বর, পরম অক্ষর ব্রহ্ম, সংসার রূপী বৃক্ষের মূল রূপী পরমেশ্বর। এই পরমাত্মার বিষয়ে সন্ত গরীবদাসজী বলেছেন :-

**"ভজন করো উস রব কা, জো দাতা হে কূল সব কা"**

পরমেশ্বর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের মালিক (প্রভু), উনি ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষেরও মালিক এবং উৎপত্তি কর্তা।

**২. অক্ষর পুরুষ:-** এই পুরুষ সংসার রূপী বৃক্ষের কাণ্ড। উনি ব্রহ্ম সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের মালিক (প্রভু) এবং নাশবান।

**৩. ক্ষর পুরুষ:-** এই পুরুষ, গীতা জ্ঞানদাতা, ওনাকে 'ক্ষর ব্রহ্ম' ও বলা হয়। এই ব্রহ্ম ২১ ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, এই ব্রহ্মও নাশবান।

এই সংসার হল, উল্টো বৃক্ষের মত যেমন – উপরে মূল (শিকড়)
নীচে শাখা (ডাল বা পাতা) রূপী বৃক্ষের চিত্র

৪. তিন দেবতা (রজোগুন ব্রহ্মা, সত্ত্বগুন বিষ্ণুও তমোগুন শিব) সংসার রূপী বৃক্ষের তিন শাখা। এই দেবতারা এক ব্রহ্মাণ্ডে রচিত তিন লোকের (পৃথিবী লোক, পাতাল লোক, স্বর্গলোক) এক এক বিভাগের মন্ত্রী বা মালিক।

যেমন = রজোগুন বিভাগের মালিক শ্রী ব্রহ্মা, যার প্রভাবে সমস্ত প্রাণী সন্তান উৎপত্তি করে। শ্রীবিষ্ণু সত্ত্বগুণ বিভাগের মালিক। এই সত্ত্বগুণের দ্বারা জীব একে

অপরের সাথে মায়া মমতার বন্ধনে আটকে থাকে এবং কর্ম অনুসারে ফল দেয়। তমোগুণের মালিক শ্রী শঙ্কর। এই তমোগুণের প্রভাবে সর্ব জীবের মৃত্যু হয়। আর গাছের পাতাকে এই সংসারের প্রাণী জানো। এটাই এই সংসার রূপী বৃক্ষের সর্বাঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা। এই জ্ঞান স্বয়ং পরমেশ্বর কবীরজী নিজের মুখ কমলে বলেছিলেন। এটাই কবীর বাণী, কবীর বীজক, কবীর শব্দাবলী ও কবীর সাগরে। ধর্মদাস জী (বান্ধবগঢ়) দ্বারা লেখা হয়েছিল। ঐ বাণী এই দাস (সন্ত রামপাল দাস) পরমেশ্বরের কৃপায় ঠিক মত বুঝেছে এবং পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান আমার প্রাপ্ত হয়েছে।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ এর অনুসারে তত্ত্বদর্শী সন্তের পরিচয়ে ও প্রমাণিত সন্ত বর্তমানে এই পৃথিবীতে একমাত্র এই দাস (সন্ত রামপাল দাস)ই আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নাম দীক্ষা নিয়ে নিজের জীবনের কল্যাণ করুন।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪ ও ১৬ থেকে ১৭-এর সারাংশ রূপী চিত্র। পুনরায় বাণীতে আসি:-

**“ভজন করো। উস রব কা, জো দাতা হৈ কুল সব কা”**

এখন পর্যন্ত এই কথা বলা হয়েছে যে, ভক্তি করা প্রয়োজন, কিন্তু এখন স্পষ্ট করছি কোন ভগবানের ভক্তি করতে হবে? ১. শ্রীব্রহ্মা রজোগুণের না ২. শ্রীবিষ্ণু সত্ত্বগুণের না ৩. তমোগুণ শ্রী শংকর রূপী গাছের তিন শাখাকে না ৪. ক্ষর পুরুষ গীতা জ্ঞানদাতাকে (মোটা ডাল রূপী) না ৫. (গাছের কাণ্ড) অক্ষর পুরুষ আর না ৬. পরম অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ গাছের মূলের।

**উদাহরণ**:- যখন আমরা নার্সারী কিংবা অন্য কোথাও থেকে কোনো আমগাছের চারা আনি, তখন আমরা তা মাঠে বা উঠানে কিভাবে রোপন করি?

রোপন করতে প্রথমে মাটিতে গর্ত করি। তারপর গাছের মূল শিকড়কে গর্তের ভিতর রেখে মাটি দিয়ে মূলকে ঢেকে দিই। পরে গাছের মূলে মাঝে মাঝে সার ও জলের সেচ দিই অর্থাৎ গাছের মূলের পূজা করি। গাছের মূল থেকে খাদ্য কাণ্ডে পৌঁছায়, কাণ্ড নিজের পূর্তি করে বাকী খাবার ডালে পাঠায়। মোটা ডাল নিজের প্রয়োজনীয় আহার রেখে বাকী অংশ শাখা প্রশাখায় পাঠায়। শাখা প্রশাখা নিজের অংশ রেখে অবশিষ্ট আহার পাতায় পাঠিয়ে দেয়। এই ভাবে গাছ বড় হয়ে ফুল ও ফল দেয়।

পাঠকগণ আপনারা খুব বুদ্ধিমান। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমাদের কোন পরমাত্মার পূজা করা উচিত। সুক্ষ্মবেদে পরমেশ্বর কবীর জী বলেছেন:-

**কবীর, একৈ সাধৈ সব সাধৈ, সব সাধৈ সব জায়।**
**মালী সীচে মূল কুঁ, ফুলৈ, ফলে অঘায়॥**

একমাত্র মূল মালিকের পূজা করলেই সমস্ত দেবতাদের পূজা করা হয়। এটা শাস্ত্র অনুকূল সাধনা। যদি তিন দেবতাদের মধ্যে এক বা দুই (শ্রী বিষ্ণু সত্ত্বগুণ, শ্রী শঙ্কর তমোগুণ) জনের পূজা করি বা তিন প্রভুকে ইষ্ট মেনে পূজা করি তাহলে গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক ১০ এ বর্ণিত অব্যাভিচারিনী ভক্তি না হওয়ায় ইহা ব্যর্থ। যেমন যদি কোনো স্ত্রী নিজের পতি অতিরিক্ত অন্য পুরুষের সাথে শারীরিক সম্বন্ধ না রাখে তাহলে সে

অব্যাভিচারিনী স্ত্রী। যদি কেউ অন্য পুরুষের সাথে সম্পর্ক রাখে তাহলে

গীতা অধ্যায় ১৫
শ্লোক নং ১ থেকে ৪ এবং
শ্লোক নং ১৬ ও ১৭
থেকে উদ্ধৃত
ব্রহ্মা (রজ গুন)
শিব (তমো গুন)
িষ্ণু (সত্ত্ব গুন)
কবীর
অক্ষর পুরুষ এক পেড় হ্যায়,
নিরঞ্জন বাকী ডার।
তিনো দেবা শাখা হ্যায়,
পাত রূপ সংসার ॥
ডাল (ডার)
ডাল = [ কাল বা ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ) ]
কান্ড (পেড়)
কান্ড = [ অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) ]
(মূল শিকড়)
কবীর সাহেব
[ পরম অক্ষর ব্রহ্ম = পূর্ণ ব্রহ্ম ]
শাস্ত্র অনুকূল
সাধনা
অর্থাৎ সোজা করে লাগানো ভক্তিরূপী বৃক্ষ

গীতা অধ্যায় ১৫
শ্লোক নং ১ থেকে ৪ এবং
শ্লোক নং ১৬ ও ১৭
থেকে উদ্ধৃত
পূর্ণব্রহ্ম কবীর সাহেব
কবীর
অক্ষর পুরুষ এক
পেড় হ্যায়,
নিরঞ্জন বাকী ডার।
তিনো দেবা শাখা হ্যায়,
পাত রুপ সংসার।।
(মূল শিকড়)
[পরম অক্ষর ব্রহ্ম = কবীর সাহেব]
কান্ড (পেড়)
অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম)
ডাল (ডার)
কাল বা ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ)
বিষ্ণু (সত্ত্ব গুন)
ব্রহ্মা (রজ গুন)
শিব (তমো গুন)
শাস্ত্র বিরুদ্ধ
সাধনা
অর্থাৎ উল্টো করে লাগানো ভক্তিরূপী বৃক্ষ

সে ব্যভিচারিনী হওয়ায় সমাজের চোখে নিন্দনীয় হয়। ঐ স্ত্রী স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয় বা স্বামী ঐ স্ত্রীকে ঘৃণার চোখে দেখে।

শাস্ত্র অনুকুল সাধনা অর্থাৎ সোজা লাগানো ভক্তিরূপী চারা গাছের চিত্র আর শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা অর্থাৎ উল্টো লাগানো ভক্তি রূপী চারা গাছের চিত্র- পৃষ্ঠা ১৯৮-১৯৯ দেখুন। উপরোক্ত প্রমাণে স্পষ্ট হয় একমাত্র মূল মালিকের ভক্তি করলে সাধকের আত্মা কল্যাণ সম্ভব।

**অন্য প্রমাণ:**- গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১০ থেকে ১৫ পর্যন্ত উপরোক্ত ভক্তির সমর্থন করে।

❖ গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১০-এ প্রজাপতি অর্থাৎ কুলের মালিক সৃষ্টির আদিতে যজ্ঞ সহিত অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানের জ্ঞান সহিত প্রজাদেরকে উৎপন্ন করে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা সর্ব ধার্মিক অনুষ্ঠানের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। এই যজ্ঞ অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠান তোমাদের ইচ্ছিত (ইচ্ছার) ভোগ প্রদান করবে। (গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১০)।

❖ এই শাস্ত্র অনুকূল ধার্মিক অনুষ্ঠান দ্বারা দেবী-দেবতাদের (সংসার রূপী চারা গাছের শাখা সমূহ) উন্নত করো অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মা (মূল)-কে ইষ্ট মেনে সাধনা করলে, শাখাগুলি নিজে থেকেই বিস্তার লাভ (উন্নত) হয়ে যায় যেমন, পূর্বে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তারপর ঐ দেবতাগণ (শাখাগুলি বিস্তারিত হয়ে ফল দেবে) তোমাদেরকে উন্নত করবে অর্থাৎ যখন আমরা শাস্ত্র অনুকূল সাধনা করবো তখন আমাদের ভক্তি কর্ম তৈরী হবে, কর্মের প্রতিফল এই তিন দেবতা (শ্রী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শ্রী শিব রূপী শাখা) দিয়ে থাকে। এই ভাবে একে অন্যের উন্নত করে তোমাদের কল্যাণ হবে এবং এইভাবে অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে লাভ করতে পারবে। (এই জ্ঞান গীতা জ্ঞান দাতা বলছেন, গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১১)

❖ শাস্ত্র অনুকূল করা যজ্ঞ অর্থাৎ অনুষ্ঠান দ্বারা বৃদ্ধি হওয়া দেবতা অর্থাৎ সংসার রূপী চারা গাছের শাখা তোমাদের না চাইতেও ইচ্ছিত ভোগ (প্রয়োজনীয় জিনিস) নিশ্চয়ই দিতে থাকবে। যেমন, চারা গাছের মূলের সেচাই করলে চারাগাছ বড় হয়ে যায় এবং শাখাগুলিতে ফলে ভরে যায়।

পরে ঐ বৃক্ষের শাখায় নিজে থেকেই প্রতি বছর ফল দিতে থাকবে অর্থাৎ আপনাদের দ্বারা করা শাস্ত্রানুকূল ভক্তি কর্মের ফল যা সঞ্চিত হয়ে যায়, তা ঐ দেবী দেবতারা আপনাদের দিতে থাকবে। আপনি না চাইলেও দিতে থাকবে। যদি ঐ দেবতাদের দেওয়া আপনাদের কর্ম সংস্কারের ধন পুনরায় ধর্ম-কর্মে না লাগাও, তাহলে ঐ সাধক ভক্তির চোর। ঐ সাধক ভবিষ্যতে পুণ্যহীন হয়ে কষ্ট ভোগ করে। (গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১২)।

❖ যজ্ঞ করার পরে অবশিষ্ট অন্ন খাওয়া সন্তগণ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ভাবার্থ এই যে, তত্ত্বদর্শী সন্ত সর্ব প্রথম পরম অক্ষর ব্রহ্মকে ভোগ লাগায়, পরে বাকী ভোজনকে সমস্ত ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়, এটা সত্য সাধনার পরিচয়। একারণে ঐ সন্ত সমস্ত ভক্তি মন্ত্র শাস্ত্রানুকূল দেয়। যার জন্য সাধক সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে সতলোকে চলে যায়। আর যে পাপীলোক সে শাস্ত্র বিধি অনুসারে ধার্মিক ক্রিয়া করে না অথবা ধর্ম-কর্ম করে না, শুধু নিজের শরীর পোষণের জন্য অন্ন তৈরি করে, সে পাপ অন্নই খায়। (অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৩)

❖ সম্পূর্ণ প্রাণী অন্ন থেকে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অন্ন খেলে শরীরে সন্তান উৎপত্তির পদার্থ তৈরি হয়, যা থেকে সকল প্রাণীর উৎপত্তি হয়। অন্নের উৎপত্তি বৃষ্টি থেকে হয়। বর্ষা শাস্ত্রবিধি অনুসারে করা যজ্ঞ অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠান থেকে হয়ে থাকে। যজ্ঞ

বা ধার্মিক অনুষ্ঠান শাস্ত্রে বর্ণিত ধার্মিক বিধিতে করা হয়। কর্মকে ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ থেকে উৎপন্ন হয় জানো, কারণ আমরা ব্রহ্ম (কাল)-এর লোকে এসেছি। তাই আমাদের কর্ম করেই সব কিছু প্রাপ্ত করতে হয়। যখন আমরা সতলোকে ছিলাম, তখন কর্ম ছাড়াই সবকিছু প্রাপ্ত হত। এইজন্য বলেছে, কর্ম-কে ব্রহ্ম (কাল) থেকে উৎপত্তি জানো আর ব্রহ্ম (কাল)-এর উৎপত্তি অবিনাশী পরমাত্মা থেকে হয়েছে। (যার বর্ণনা গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে আছে, তাছাড়া সৃষ্টি রচনা অধ্যায়ে পড়ুন)। এই থেকে প্রমাণিত হয় যে, (সর্বগতম্ ব্রহ্ম) সর্বব্যাপী পরম অক্ষর পরমাত্মা অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্ম সদা যজ্ঞতে অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানে (প্রতিষ্ঠিতম্) প্রতিষ্ঠিত আছেন অর্থাৎ সমস্ত ধার্মিক ক্রিয়ার মধ্যে পরম অক্ষর ব্রহ্ম ইষ্ট রূপে পূজ্য। (গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৪-১৫

**পরম অক্ষর ব্রহ্ম গীতা জ্ঞানদাতা থেকে অন্য।**

গীতা জ্ঞানদাতা স্বয়ং গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২-তে বলেছেন যে, হে ভারত! তুই সর্বভাবে ঐ পরমেশ্বরের অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মের শরণে যা, ঐ পরমেশ্বরের কৃপায় তুই পরম শান্তি তথা শাশ্বত স্থান অর্থাৎ সনাতন পরম ধাম প্রাপ্ত করবি।

❖ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪-এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, তত্ত্বদর্শী সন্তকে পাওয়ার পরে তত্ত্বজ্ঞান রূপী অস্ত্র দ্বারা অজ্ঞানকে কেটে (নষ্ট করে) পরমেশ্বরের ঐ পরম পদের খোঁজ করা উচিত, যেখানে যাওয়ার পরে সাধক পুনরায় এই সংসারে ফিরে আসে না অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না। সেই সাধক সনাতন পরম ধাম প্রাপ্ত করে। সেখানে পরম শান্তি আছে, কোন প্রকারের কষ্ট নেই। ওখানে জন্ম মৃত্যু হয় না। বৃদ্ধা অবস্থাও হয় না, কোন জিনিসের অভাব নেই। যে পরমেশ্বর দ্বারা এই সংসার রূপী বৃক্ষের বিস্তার হয়েছে, সেই পরমেশ্বরের ভক্তি করা উচিত।

❖ গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক ১৭-তে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন, ঐ পরমাত্মা অর্থাৎ আমার থেকে অন্য প্রভু অন্য ভাষায় পরম অক্ষর ব্রহ্ম (যার বিষয় গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ৩-এ বলেছে) জ্যোতিরও জ্যোতি অর্থাৎ পরমেশ্বর মায়া থেকে অনেক উপরে। বোধরূপ (জানার যোগ্য) পরমাত্মাকে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পাওয়া সম্ভব এবং সকলের হৃদয়ে বিশেষ রূপে স্থির থাকেন। (গীতা অধ্যায় ১৩ শ্লোক ১৭)

**বিচার করুন:-** যে তত্ত্বজ্ঞানে পরম অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। তাকে সুক্ষ্ম বেদও বলা হয়। ঐ জ্ঞান গীতা জ্ঞানদাতারও নেই। তাই গীতা জ্ঞানদাতা গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২ ও ৩৪-এ বলেছে, যজ্ঞ অর্থাৎ ধার্মীক অনুষ্ঠানের বিস্তার পূর্বক জ্ঞান স্বয়ং (ব্রহ্মণ মুখে) সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম পরমাত্মা অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্ম নিজের মুখ কমলে বলেছেন, তাকে সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম-এর বাণী বলা হয়। একে তত্ত্বজ্ঞানও বলা হয়। ঐ জ্ঞান জেনে সাধক সমস্ত পাপের হাত থেকে মুক্ত হয়ে যায়। (গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২)

❖ পাঠকগণের কাছে নিবেদন যে গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২ এর মূল পাঠে ‘ব্রহ্মণঃ’ শব্দ আছে। গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত গীতা বা অন্য স্থান থেকে প্রকাশিত গীতার অনুবাদকরা ‘ব্রহ্মণঃ’ শব্দের অর্থ বেদ করে ভুল করেছে।

গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩ এর মধ্যেও ‘ব্রহ্মণঃ’ শব্দ আছে। ওখানে অনুবাদকরা ‘সচ্চিদানন্দ ঘনব্রহ্ম’ অর্থ করেছে যা সঠিক। তাই গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩২-এ ‘ব্রহ্মণঃ মুখে’ অর্থ সচিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম-এর মুখ কমল থেকে উচ্চারিত বাণী করা উচিত ছিল।

গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪ এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছে, যে তত্ত্বজ্ঞান পরমেশ্বর নিজের মুখ কমলে বলেন, সেই জ্ঞান তুই তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে গিয়ে ভালো ভাবে বুঝে দণ্ডবত প্রণাম করে বিনম্রতা পূর্বক প্রশ্ন করলে, ঐ পরম তত্ত্বকে ভালো ভাবে জানা তত্ত্বদর্শী মহাত্মা তোকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেবেন।

প্রভু প্রেমী পাঠকগণ! এতে প্রমাণিত হয়, যে তত্ত্বজ্ঞানে পরম অক্ষর পরমাত্মা প্রাপ্ত হয়। গীতা গ্রন্থে সেই জ্ঞান নেই। গীতা চার বেদের (ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ) সংক্ষিপ্ত রূপ বা সারাংশ। এই থেকে প্রমাণ হয় যে, সুক্ষ্ম বেদের তত্ত্বজ্ঞান কোন প্রচলিত সদগ্রন্থে নেই। এই তত্ত্বজ্ঞান বর্তমানে আমার (সন্ত রামপাল দাসের) কাছে আছে, পৃথিবীর অন্য কারো কাছে নেই।

**প্রশ্ন:-** শ্রী ব্রহ্মা রজোগুণ, শ্রী বিষ্ণু সত্ত্বগুণ ও শ্রী শিব তমোগুণ ইষ্ট রূপে কি পূজার যোগ্য নয়? হিন্দু ধর্মে এই সব দেবী দেবতার পূজা করা হয়। হিন্দু ধর্মগুরু শঙ্করাচার্য ও অন্যরা এই দেবতাদের ইষ্ট রূপে পূজা করতে বলেন এবং তারা নিজেরাও করেন। আপনার কথা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। আপনি কি গীতায় এই প্রমাণ দেখাতে পারেন?

**উত্তর:-** হিন্দু ধর্মের ধর্ম গুরুদেরও নিজের সদগ্রন্থের জ্ঞান নেই। যেমন অক্ষর জ্ঞান প্রদানকারী অধ্যাপকের যদি পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত জ্ঞান না থাকে, তাহলে সেই অধ্যাপক বিদ্যার্থীদের জন্য হানিকারক হয়। ঐ শিক্ষক ঠিক নয়, সেইরূপ দশা হিন্দু ধর্মের ধর্মগুরুদের।

**প্রমাণ:-** শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২ থেকে ১৫ পর্যন্ত গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন, তিনগুণ থেকে (রজোগুণ ব্রহ্মা থেকে উৎপত্তি, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু থেকে স্থিতি ও তমোগুণ শঙ্করের থেকে সংহার) যা কিছু হচ্ছে তার নিমিত্ত আমি। কিন্তু আমি ওদের মধ্যে আর ওরা আমার মধ্যে নেই। (গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২) প্রথমে প্রমাণ করছি, রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শংকর :-

১. মার্কণ্ডেয় পুরাণের (গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত হিন্দি সচিত্র মোটা টাইপ) পৃষ্ঠা ১২৩ এ লেখা আছে- ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ ব্রহ্মের প্রধান শক্তি। এই তিন গুণ এবং এই তিন দেবতা।

২. শ্রী দেবী পুরানের (শ্রী খেমচন্দ শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র ভেঙ্কেটেশ্বর প্রেস মুম্বাই থেকে প্রকাশিত) তৃতীয় স্কন্দ অধ্যায় ৫ শ্লোক ৮- এ বলেছে:-

**যদি দয়াদ্রর্মনা সদা অম্বিকে কথম্ অহম্ বিহিতঃ তমোগুণঃ।**
**কমলজঃ রজগুণঃ কথম্ বিহিতঃ চ শ্রী হরিঃ সতগুণঃ॥ (দেবী পুরাণ - 3/5/8**

**অনুবাদ:-** ভগবান শিব নিজের মাতা দুর্গাকে প্রশ্ন করছেন যে, হে মাতা! যদি আপনি আমার উপর দয়াযুক্ত হন তাহলে আমাকে তমোগুণে কেন উৎপত্তি করেছেন? কমলে উৎপন্ন ব্রহ্মাকে রজোগুণ আর শ্রী হরি বিষ্ণুকে সত্ত্বগুণে কেন সৃষ্টি করেছেন?

❖ এতে প্রমাণিত হয় (১) রজোগুণ বলো অথবা ব্রহ্মা, (২) সত্ত্বগুণ বলো অথবা বিষ্ণু (৩) তমোগুণ বলো অথবা শংকর একই কথা।

**গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২-এর ভাবার্থ:-** গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম কাল। প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৩১-৩২ অধ্যায় ১১ শ্লোক ৩১ এ অর্জুন জিজ্ঞাসা করছে:-হে মহানুভাব! আপনি কে? শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের শ্যালক ছিল। শ্রীকৃষ্ণের বোন সুভদ্রার বিবাহ অর্জুনের সঙ্গে হয়েছিল। যদি গীতা জ্ঞানদাতা শ্রীকৃষ্ণ হতো তাহলে অর্জুনের জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হত না যে, আপনি কে? এটা কি হতে পারে যে, ভগ্নীপতী তার শ্যালককে চিনতে পারে না? আসলে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রেতবত্ (যেমন মানুষের শরীরে ভুত প্রবেশ করে) প্রবেশ করে কাল ব্রহ্ম গীতা জ্ঞান বলে ছিল। (অধিক প্রমাণের জন্য পড়ুন "গীতা তোমার জ্ঞান অমৃত", "গহরী নজর গীতা", "জ্ঞানগঙ্গা", আধ্যাত্মিক জ্ঞান গঙ্গা এবং দেখুন সতসঙ্গের D.V.D। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার জ্ঞান কে বলেছেন?)

এই সমস্ত আমার D.V.D.তে বা ইন্টারনেট থেকে জানতে পারেন। এই সব আমাদের ওয়েবসাইট = www.jagatgururampalji.org -তে আপলোড করা

আছে, বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারেন। ইউটিউবেও সার্চ করতে পারেন। (Satsang Barwala Ashram অথবা Sant Rampal Ji) গীতা জ্ঞানদাতা কাল ব্রহ্ম গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৩২ -এ স্বয়ং বলেছেন, আমি বড় কাল। এখন প্রকট হয়েছি। যদি শ্রীকৃষ্ণ গীতা জ্ঞান বলতেন, তাহলে এ কথা বলতেন না যে আমি এখন এসেছি। কারণ শ্রীকৃষ্ণ আগে থেকেই সেখানে বিদ্যমান ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে কখনো বলেননি আমি কাল, আর এটাও বলেননি যে আমি সকলের নাশ করা সব থেকে বড় কাল। শ্রীকৃষ্ণ কৌরবদের সভায় নিজের বিরাট রূপ দেখিয়েছিলেন। প্রত্যেক আত্মার নিজের বিরাট রূপ হয়। সেই বিরাট রূপ তার ভক্তির উপর নির্ভর করে। ভক্তি অনুসারে এই বিরাট রূপ কেউ কেউ প্রকট করতে পারে।

গীতা জ্ঞানদাতা গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৭ এ বলেছে, হে অর্জুন! আমার এই বিরাট রূপ তুই ছাড়া এর পূর্বে কেউ দেখে নি। প্রিয় পাঠকদের কাছে নিবেদন যে, শ্রীকৃষ্ণ, নিজের বিরাট রূপ পূর্বে কৌরবদের সভায় দেখিয়েছিলেন। সভায় উপস্থিত কৌরব সহ হাজারো লোকে শ্রীকৃষ্ণের বিরাট রূপ দেখেছিল। যদি শ্রীকৃষ্ণ গীতা জ্ঞান বলতেন, তাহলে এই কথা বলতেন না যে, আমার এই বিরাট রূপ তুই ছাড়া অন্য কেউ আগে দেখেনি। এতে প্রমাণিত হয় যে, গীতা জ্ঞান দাতা শ্রীকৃষ্ণ নয় ‘কাল ব্রহ্ম'। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ -তে এই ব্রহ্মকে ‘ক্ষর পুরুষ’ বলেছে। গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৩-তে বলেছে:-

**“ওম্ ইতি একাক্ষরম্ ব্রহ্ম ব্যহরন্ মাম্ অনুসম্মরণ।**
**যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহম্ সঃ যাতি পরমাম্ গতিম্”**

**সরলার্থ:-** গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন (মাম্ ব্রহ্ম) আমি ব্রহ্ম-আমার (ওম্ ইতি একাক্ষরম্) এই এক অক্ষর (ব্যবহরণ) উচ্চারণ করে (অনুস্মরণ) স্মরন করে (যঃ প্রয়াতি ত্যাজন্ দেহম্) যে সাধক শরীর ত্যাগ করে যায় (সঃ যাতি পরমাম্ গতিম) সে ওঁ নামে হওয়া পরম গতি প্রাপ্ত করে। একে আরো স্পষ্ট করে বলি।

শ্রীদেবী পুরাণের (সচিত্র মোটা টাইপ হিন্দি গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত) সপ্তম স্কন্দ পৃষ্ঠা ৫৬২-৫৬৩ এ বর্ণনা আছে যে, শ্রীদেবী রাজা হিমালয়কে ব্রহ্ম জ্ঞানের উপদেশ দেওয়ার সময় বলেছেন; হে রাজন! তুমি ওম্ নামের জপ করো তাতে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হবে। এই ‘ওঁ’ নাম ব্রহ্ম-এর জপ মন্ত্র। অন্য সব পূজা ত্যাগ করে ব্রহ্ম প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কেবল এক ‘ওঁ’ নামের জপ করো। তোমার কল্যাণ হবে ইহাতে ব্হ্ম প্রাপ্তি হবে। ঐ ব্রহ্ম দিব্য আকাশ রূপী ব্রহ্মলোকে থাকেন। এই দেবী পুরাণে প্রমাণিত হয় ‘ওঁ’ ব্রহ্ম-এর নামের জপ।

**অন্য প্রমাণ:-** শ্রী শিব মহাপুরানের (গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত সচিত্র মোটা টাইপ) বিদ্বেশ্বর সংহিতার পৃষ্ঠা ২৩ থেকে ২৫ পর্যন্ত এই রূপ বিবরণ আছে:-

এক সময় রজোগুণ শ্রী ব্রহ্মা ও সত্ত্বগুণ শ্রী বিষ্ণুর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। কারণ, ব্রহ্মা শ্রী বিষ্ণুর নিবাস স্থলে গিয়ে বলেন, হে অভিমানী! তুই আমাকে আসতে দেখে উঠে আমার শ্রদ্ধা-সম্মান করলি না! তুই পুত্র হয়ে পিতার সম্মান (অভ্যর্থনা) করছিস না! আমি সর্ব জগতের উৎপত্তি কর্তা সকলের পিতা। ব্রহ্মার এই বচন শুনে শ্রী বিষ্ণু অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত ক্রোধিত হলেন, কিন্তু উপর থেকে মৃদু হেসে বললেন- আয় পুত্র! আমি তোর পিতা। আমার নাভী কমল থেকে তোর উৎপত্তি হয়েছে। এই কথায় ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু নিজের নিজের অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধ শুরু করে। ঠিক সেই সময় ‘কাল ব্রহ্ম’ এই দুই জনের মাঝখানে এক তেজময় স্তম্ভ খাড়া করে

দেয়। যার কারণে দু'জনে যুদ্ধ করা বন্ধ করে দিয়ে তেজময় স্তম্ভকে দেখতে লাগে। তখন কাল ব্রহ্ম দুর্গাকে পাবর্তী রূপে এবং স্বয়ং নিজের পুত্র শিবের রূপ ধারণ করে ওখানে প্রকট হয়। সদাশিব বলে, তোমাদের দুই জনের কি জ্ঞান নেই যে, এখানের ঈশ্বর কে? আমি হলাম ব্রহ্ম, এই সংসার আমার। হে বিষ্ণু, হে ব্রহ্মা! তোমরা দুইজন তপস্যা করে এক-এক কার্যভার প্রাপ্ত করেছো। ব্রহ্মাকে সৃষ্টির উৎপত্তি আর বিষ্ণুকে স্থিতির কার্যভার দেওয়া হয়েছে। পুত্র শোনো! আমি মহেশ ও রুদ্রকেও এক-এক কার্যভার সংহার ও তিরোভাব দিয়েছি। তারপর আরো বললেন যে, আমার নাম জপ করার মন্ত্র- এক অক্ষর ওম্ (ওঁ)। ইহা পাঁচ অব্যয় (অ, উ, য় নাদ তথা বিন্দু) -এর সংগ্রহে এক 'ওঁ' অক্ষর তৈরী হয়েছে। পাঠকগণের কাছে এখন স্পষ্ট হয়েছে যে, একমাত্র এক অক্ষর 'ওঁ' ব্রহ্মের জপের মন্ত্র। এটাও পরিস্কার হয়েছে যে, এই তিন দেব- শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী মহেশ থেকেও কাল ব্রহ্ম অন্য কোন শক্তি এবং এই তিনদেব কাল ব্রহ্মের পুত্র।

**অন্য প্রমাণ:-** শ্রী শিব মহাপুরাণ (গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত সচিত্র মোটা টাইপ)-এর রুদ্র সংহিতা পৃষ্ঠা ১১০-তে লেখে আছে রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব এই তিন দেবতাদের গুণ আছে। আমি এদের থেকে ভিন্ন (পৃথক)।

এই সমস্ত প্রমাণে সিদ্ধ হয় যে, গীতা জ্ঞানদাতা হলেন কাল ব্রহ্ম। ইনি অভিশাপের কারণে প্রতিদিন এক লাখ মানব শরীরধারী প্রাণীকে খায় আর সোয়া লাখ উৎপন্ন করে।

এই জন্য তিন পুত্রকে এক-এক গুণ যুক্ত বানিয়ে রেখেছে। এদের শরীর থেকে বের হওয়া সুক্ষ্ম গুণের প্রভাবে প্রত্যেক প্রাণী কার্য করতে বাধ্য হয়। যেমন রান্না ঘরে লঙ্কার ছোঁক দিলে হাঁচি আসে। ঐ হাঁচিকে কেউ থামাতে পারে না। স্থূল রূপে লঙ্কা রান্না ঘরে আছে। তার থেকে বের হওয়া গুণ অন্য ঘরের লোককে প্রভাবিত করছে।

সেইরূপ তিন দেবতা (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু, শ্রী শিব) নিজের নিজের লোকে থাকেন, কিন্তু তাদের শরীর থেকে বের হওয়া গুণের সুক্ষ্ম প্রভাব তিন লোকে (স্বর্গলোক, পৃথিবীলোক ও পাতাললোক) প্রাণীদেরকে প্রভাবিত করে রাখে। যাতে কাল ব্রহ্মের আহারের জন্য এক লাখ মানব প্রাণী উৎপন্ন হয়। তাই গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২ -তে গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম বলেছেন যে-

❖ তিন গুণ থেকে যা কিছু হচ্ছে, তার নিমিত্ত কারণ হলাম আমিই। যেমন, রজোগুণ ব্রহ্মা থেকে উৎপত্তি, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু থেকে স্থিতি ও তমোগুণ শিব থেকে সংহার হয়। এইসব আমার জন্যই এদের দ্বারা হচ্ছে এমন জানো, কিন্তু তারা আমার মধ্যে আর আমি তাদের মধ্যে নেই। কারণ, কাল ব্রহ্ম এই তিন দেবতা থেকে পৃথক থাকেন (গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২)।

❖ এই সংসার তিন গুণে (শ্রী ব্রহ্মার রজোগুণ, শ্রী বিষ্ণুর সত্ত্বগুণ, শ্রী শিবের তমোগুণ) মোহিত হচ্ছে। এই পর্যন্তই তাদের জ্ঞান আছে। এই তিন দেবতাদের উপর আমাকে এবং (অব্যয়ম্) ঐ অবিনাশী পরমাত্মাকে জানে না। (গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৩)।

❖ কারণ, আমার এই অলৌকিক ত্রিগুণময়ী মায়ার জাল (অর্থাৎ আমার পুত্র দ্বারা বিছানো মায়া জাল) বড়োই কঠিন (মজবুত)। যে সাধক শুধু আমার (কাল ব্রহ্ম)সাধনা করে, সে এই মায়া (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ভক্তিতে হওয়া লাভ থেকে ব্রহ্ম ভক্তিতে অধিক লাভ হয়। তাই বলেছে যে, যারা এই তিন গুণ থেকে পাওয়া লাভকে ত্যাগ করে কাল ব্রহ্মের সাধনা করে, তারা এই গুণকে অতিক্রম করে অর্থাৎ তিন গুণের সাধনা ত্যাগ করে দেয়।)-কে অতিক্রম করে যায়। (গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৪)।

❖ গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৫ -তে বলেছে:- তিন গুণ (রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু,

তমোগুণ শিব) রূপী মায়ার জাল দ্বারা যাদের জ্ঞান হরন করা হয়েছে অর্থাৎ যে সাধক এই তিন দেবতা থেকে ভিন্ন প্রভুকে জানে না। এদের থেকে পাওয়া নাম মাত্র লাভকে মোক্ষ মনে করে এদের উপর আশ্রিত থাকে এবং এদেরই পূজা করতে থাকে, এমন ব্যক্তিরা অসুর স্বভাবকে ধারন করা, মানুষের মধ্যে নীচ, দুষিত কর্ম করা মূর্খ লোকেরা কাল ব্রহ্মকে অর্থাৎ আমাকেও ভজে না। (গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৫)।

❖ গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক ১৯-এ গীতা জ্ঞানদাতা বলেছে যে, সময় দৃষ্টা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান শোনা সাধক আর যে তিন গুণকে (রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ শিব) ইষ্ট রূপে পূজা করা সাধক নিজের পুরানো ধারনাকে বদলায় না অর্থাৎ এই তিন গুণ অতিরিক্ত অন্য কাউকে কর্তা মানে না আর তিন গুণের উপরে পূর্ণ পরমাত্মার জ্ঞান প্রাপ্ত করে নেয়, সে আমার জালে থেকে যায়। (গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক ১৯)

গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক ২০ তে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন, যে শরীর ধারী মানুষ এই তিনগুণের অতিক্রম করে অর্থাৎ এই তিন গুণের পূজা ত্যাগ করে জন্ম মৃত্যু বৃদ্ধাবস্থা ও অন্য সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে পরমানন্দ অর্থাৎ গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ এবং অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ এ বর্ণিত পরম শান্তি তথা সনাতন পরম ধামকে প্রাপ্ত করে।

**সারাংশ:-** যারা তিন দেবতার (রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ শিব) পূজা করে তাদের রাক্ষস স্বভাব ধারন করা মানুষের মধ্যে নীচ দুষিত কর্ম করা মূর্খ বলেছে। ভাবার্থ এই যে, তিন গুণের পূজা করা উচিত নয়।

**কারণ:- ১.** রজোগুণ ব্রহ্মার পূজা হিরণ্যকশ্যপু করেছিল। নিজের পুত্র ভক্ত প্রহ্লাদের শত্রু হয়ে রাক্ষস উপাধি প্রাপ্ত করে আর কুকুরের মত অপমৃত্যু হয়।

২. রাবণ শ্রী শিবের তমোগুণের পূজা করেছিল। জগত জননী সীতাকে হরণ করে পত্নী বানানোর কুচেষ্টা করে। রাবণ রাক্ষস উপাধি পেয়েছিল এবং সবংশে দুঃক্ষদায়ক কুকুরের মতো মৃত্যুকে প্রাপ্ত করে। ভাস্মাসুরও তমোগুণ শিবের পূজা করেছিল, সেও রাক্ষস উপাধি পায় এবং তারও অপমৃত্যু হয়।

৩. শ্রী বিষ্ণুর পূজারীদেরকে বৈষ্ণব বলা হয়। এক সময় হরিদ্বারে কুম্ভমেলার সংযোগ হয়। ঐ কুম্ভ পর্বে স্নানার্থে সর্ব সন্ত (গিরী, পুরী, নাথ, নাগা, বৈষ্ণব) হরিদ্বারে পৌঁছায়। নাগা সাধুরা শ্রী শিবের (তমোগুণের) পূজারী হয়। আর বৈষ্ণবরা শ্রীবিষ্ণুর (সত্ত্বগুণ) পূজারী হয়। সর্ব সন্ত হরিদ্বারের হরকি পৌড়ীতে স্নান করার প্রস্তুতি শুরু করে, তখন ওখানে প্রায় ২০ হাজার তমোগুণের উপাসক উপস্থিত ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রায় সম সংখ্যক বৈষ্ণব সাধু হরকি পৌড়ীতে প্রবেশ করে। বৈষ্ণব সাধুরা নাগাদের বলে আমরা শ্রেষ্ঠ তাই আমরা আগে স্নান করবো। নাগা সাধুরা বলে, আমরা শ্রেষ্ঠ সংসারের কোন ইচ্ছা আমরা রাখি না। আমরা ত্যাগী ও বৈরাগী। এই কথায় নাগা আর বৈষ্ণব সাধুদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। তলোয়ার, কাটারী, ত্রিশুল দিয়ে লড়াই শুরু করে। দুই পক্ষের প্রায় ২৫ হাজার ত্রিগুণের সাধু নিজেদের মধ্যে লড়াই করে কাটা-কাটি করে মৃত্যু প্রাপ্ত করে।

তাই গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২ থেকে ১৫ পর্যন্ত তিন গুণের (রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ শিব) উপাসককে রাক্ষস স্বভাব ধারণ করা মানুষের মধ্যে নীচ দূষিত কর্ম করা মূর্খ বলেছে।

এতে সিদ্ধ হয় শ্রীব্রহ্মা রজোগুণ, শ্রী বিষ্ণু সত্ত্বগুণ ও শ্রী শিব তমোগুণের ভক্তি যারা করে তারা মূর্খ রাক্ষস ও মানুষের মধ্যে সব থেকে নীচ কর্ম করা মূর্খ ব্যক্তি। অর্থাৎ এদের পূজা করা শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে নিষেধ করা হয়েছে। এনাদেরকে ইষ্ট রূপে পূজা করা ব্যর্থ।

## "পূজা ও সাধনার মধ্যে পার্থক্য"

**প্রশ্ন:-** কাল ব্রহ্ম-এর পূজা করা কি উচিত? গীতায় প্রমাণ দেখান। সর্ব প্রথম, পূজা ও সাধনা কি সেই বিষয়ে বলছি।

**উত্তর:-** কাল ব্রহ্ম-এর পূজা করা উচিত নয়। পূর্বে পূজার ভেদ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

**ভক্তি অর্থাৎ পূজা:-** আমরা জানি যে, পৃথিবীর নীচে ঠাণ্ডা মিঠা জল আছে। ঐ জল কিভাবে প্রাপ্ত হবে? তার জন্য অভিজ্ঞ মিস্ত্রি দ্বারা জমিতে সুড়ঙ্গ করে, লোহার পাইপ মাটির নীচে প্রবেশ করাতে হয়। পরে হ্যান্ড পাম্প বা মটর লাগানো হয়। তারপর শীতল মিঠা জল পাওয়া যায়। আমাদের পূজ্য হল শীতল জল। ঐ শীতল জলকে প্রাপ্ত করার জন্য উপরোক্ত (প্রয়োজনীয় জিনিস) যে চেষ্টা করা হয়েছে, তাকেই সাধনা মনে করো। যদি আমরা উপকরণের পূজা করতে লাগি তাহলে মিঠা শীতল জল প্রাপ্ত হবে না। প্রয়োজনীয় বস্তু প্রয়োগ করলে পূজ্য বস্তু প্রাপ্ত হবে।

**অন্য উদাহরণ:-** যেমন পতিব্রতা স্ত্রী, বাড়ির সকল সদস্যকে আদর যত্ন (শ্রদ্ধা) করে। শ্বশুর-শ্বাশুড়িকে মাতা-পিতার মত দেখে, ননদকে বোনের মতো, ভাসুর-দেওরকে বড় ভাই ও ছোট ভাইয়ের মত মনে করে। মোট কথা বাড়ির সকলের সঙ্গে প্রেমের সাথে থাকে। কিন্তু পূজা নিজের স্বামীকেই করে। যে ভাব ভালোবাসা স্বামীর প্রতি থাকে তা অন্যের প্রতি থাকে না। ঐ স্ত্রী যখন সংসার থেকে পৃথক হয় তখন নিজের ভাগের সমস্ত জিনিস নিজের স্বামীর ঘরে নিয়ে যায়।

**অন্য উদাহরণ:-** যদি আম খেতে ইচ্ছা হয় তাহলে আমাদের পূজ্য বস্তু হলো আম ফল। ঐ আম প্রাপ্ত করার জন্য টাকার প্রয়োজন। টাকা উপর্জনের জন্য পরিশ্রম/চাষ-আবাদ/ চাকরি ইত্যাদি করতে হবে। তবেই আম প্রাপ্ত হবে। তাই পূজ্য বস্তু হল আম আর অন্যান্য ক্রিয়া হলো সাধনা। সাধ্য বস্তুকে প্রাপ্ত করার জন্য সাধনার প্রয়োজন। তাই সাধনা ভিন্ন এবং পূজা অর্থাৎ ভক্তি ভিন্ন, যা স্পষ্ট হয়ে গেলো।

প্রশ্ন ছিল যে, ব্রহ্মের পূজা করা কি উচিত। উত্তরে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মের পূজা করা উচিত নয়। এখন শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতার মধ্যে প্রমাণ দেখছি।

প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১২ থেকে ১৫ তে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন, তিন গুণের (রজগুণ শ্রীব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ শ্রীবিষ্ণু, তমোগুণ শ্রীশিব) ভক্তি ব্যার্থ। পরে গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৬-১৭-১৮ তে গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম নিজের ভক্তিতে হওয়া গতি অর্থাৎ মোক্ষকে 'অনুত্তম্' অর্থাৎ খারাপ বলেছে। আরো বলেছে যে, আমার ভক্তি চার প্রকারের ব্যক্তিরা করে।

**১. অর্থার্থী :-** যারা ধন লাভের জন্য বেদ অনুসারে অনুষ্টান করে।

**২. আর্ত:-** যারা সংকট নিবারণের জন্য বেদ অনুসারে অনুষ্ঠান করে।

**৩. জিজ্ঞাসু-** পরমাত্মার বিষয়ে জানার ইচ্ছুক ব্যক্তি (জ্ঞান গ্রহণ করে স্বয়ং বক্তা হয়ে যায়) এই তিন প্রকারে ব্রহ্ম সাধককে ব্যর্থ বলেছেন।

**৪. জ্ঞানী:-** জ্ঞানী ভক্তরা বুঝতে পারে যে, মানব জীবন খুবই দুলর্ভ জীবন। মানব জীবন প্রাপ্ত করে আত্মার কল্যাণ করা উচিত। তাদের এই জ্ঞানও হয়ে যায় যে, অন্য দেবী দেবতাদের পূজা করাও ব্যর্থ মোক্ষ লাভ নয়। একমাত্র পরমাত্মার ভক্তি অনন্য মন দিয়ে করলে মুক্তি সম্ভব। কিন্তু তত্ত্বদর্শী সন্ত না পাওয়ার কারণে বেদ থেকে যে জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে, ঐ জ্ঞানের অধারেই ব্রহ্মাকে সমর্থ্য প্রভু মনে করে। তাই যর্জুবেদ অধ্যায় ৮০ মন্ত্র ১৫ থেকে "ওঁ" নাম নিয়ে ভক্তি করে, কিন্তু তাতে পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না। ওম্ নাম ব্রহ্ম সাধনার। এতে ব্রহ্ম লোক প্রাপ্ত হয়, যা পূর্বেই প্রমাণিত করা হয়েছে।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ১৬ তে বলেছে যে, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সকল লোক পুনরাবর্তীতে আছে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে যাওয়া সাধকও পুনরায় এই সংসারে ফিরে এসে জন্ম মৃত্যুর চক্রে চলে যায়।

কাল ব্রহ্মের সাধনায় মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না, যে বিষয়ে গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪-এ বলেছে যে, "তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে অজ্ঞানকে নষ্ট করে, পরমেশ্বরের ঐ পরম পদের খোঁজ করা উচিত যেখানে যাওয়ার পরে সাধক পুনরায় এই সংসারে ফিরে আসে না।"

❖ গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮ তে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছে, এই জ্ঞানী আত্মা (যাদের চতুর্থ প্রকারের ব্রহ্ম সাধক বলা হয়) তো উদার অর্থাৎ সত কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে আমার অনুত্তম গতিতেই স্থিত থাকে। গীতা জ্ঞানদাতা নিজের সাধনায় হওয়া গতিকেও অনুত্তম অর্থাৎ নিকৃষ্ট বলেছে। তাই ব্রহ্মেরও পূজা করা উচিত নয়।

**কারণ:-** চুনক ঋষি নামের এক জ্ঞানী আত্মা ছিলেন। তিনি ওম্ নামের জপ তথা হাজার বছর হঠযোগ করেন। যার কারণে ঋষির মধ্যে সিদ্ধি চলে আসে। ব্রহ্মের সাধনা করলে জন্ম-মৃত্যু স্বর্গ-নরকের চক্র সদা রয়ে যাবে। কারণ গীতা অধ্যায় ২ শ্লোক ১২, গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৫, গীতা অধ্যায় ১০ শ্লোক ২ এ গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম বলেছে, হে অর্জুন! তোর আর আমার অনেক বার জন্ম হয়েছে, তুই জানিস না, আমি জানি। তুই, আমি ও এই সর্ব রাজারা আগেও জন্মে ছিল আর পরেও জন্ম নিতে থাকবে। তুই এই চিন্তা করিস না যে, আমাদের এখন জন্ম হয়েছে। আমার উৎপত্তিকে মহর্ষি ও দেবতারাও জানে না, কারণ এই সমস্ত দেবতা আমার থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

এতে প্রমাণিত হয় যে, গীতা জ্ঞান দাতা ব্রহ্মের জন্ম-মৃত্যু হয়। তাহলে ব্রহ্মের পূজারীরা কি ভাবে অমর হবে? এর দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা ঐ মোক্ষ সম্ভব নয়, যে বিষয়ে গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ ও অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ এ বলেছে। এই শ্লোকে গীতা জ্ঞানদাতা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, হে ভারত! তুই সর্বভাবে ঐ পরমেশ্বর, পরম অক্ষর ব্রহ্মের শরণে যা। ঐ পরমেশ্বরের কৃপায় তুই পরম শান্তি ও সনাতন পরম ধাম অর্থাৎ সতলোককে প্রাপ্ত করবি। তত্ত্বজ্ঞান বোঝার পরে পরমাত্মার ঐ পরম পদকে খোঁজ করা উচিত। যেখানে যাওয়ার পরে সাধক পুনঃ এই সংসারে ফিরে আসে না। বিচারনীয় বিষয়, গীতা জ্ঞানদাতা স্বয়ং জন্ম-মৃত্যুতে আছে। তাই ব্রহ্ম পূজায় হওয়া গতিকে অনুত্তম্ বলেছে।

**এবার চুনক ঋষির প্রসঙ্গ শোনাই :-** চুনক ঋষি ওম্ (ওঁ) নামের জপ তথা হঠযোগ করেন। বেদে ( ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ) বলা ভক্তি তে পরমাত্মা প্রাপ্তি হয় না। এর প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৭-৪৮ এ আছে। গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম বলছেন, হে অর্জুন! এটি আমার (কাল ব্রহ্ম) বিরাট রূপ। আমার এই রূপের দর্শন তুই ছাড়া আগে অন্য কেউ করেনি আমি কৃপা করে তোকে এই রূপ দেখিয়েছি। আমার এই রূপের দর্শন অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তি, বেদে বর্ণিত বিধিতে অর্থাৎ ওঁ নামের জপে, না কোন তপে, না কোন হবন ইত্যাদি যজ্ঞেতে হবে। অর্থাৎ বেদে বর্ণীত কোন বিধিতে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় না। এই জন্য চুনক ঋষিও ব্রহ্মকে নিরাকার বলতে থাকেন। চুনক ঋষির মধ্যে সিদ্ধি চলে আসে, যে কারণে সংসারে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। হাজার বর্ষ সাধনা করে সাধক নিজের ব্যাটারী চার্জ করে অর্থাৎ সিদ্ধি শক্তি প্রাপ্ত করে, অন্যকে অভিশাপ বা আশীর্বাদ দিয়ে নিজের ভক্তি কামাই নাশ করে দেয়। সিদ্ধি শক্তি দিয়ে কারোর ওপর যন্ত্র-মন্ত্র করে নিজের ভক্তি নাশ করে সংসারে প্রশংসার পাত্র হয়, আর স্বয়ং প্রভু হয়ে বসে।

এক মানধাতা চক্রবর্তী রাজা ছিল। সমস্ত পৃথিবী তার অধীনে ছিল। রাজা অন্বেষণ করতে চেয়েছিল যে, পৃথিবীর অন্যান্য রাজা, যারা আমার অধীনে রয়েছে। তারা কি

কেউ সতন্ত্র হতে চায়? এই কারণে রাজা একটি ঘোড়ার গলায় পত্র লিখে ছেড়ে দেয় যে, যদি কোন রাজা মানধাতা রাজার অধীনতা স্বীকার না করে, তাহলে সে এই ঘোড়াকে বেঁধে আমার সৈনিকের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। মানধাতা চক্রবর্তী রাজার ৭২ কোটি অর্থাৎ ৭২ অক্ষুনী সেনা ছিল। ঐ ঘোড়ার পিছন পিছন শতশত সৈনিক চলেছিল। সমস্ত পৃথিবী ঘুরে চলে আসে। কোন রাজা ঘোড়া বাঁধার দুঃসাহস করেনি। এতে স্পষ্ট হয়, অন্য রাজারা মানধাতা রাজার অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছে। সৈনিকরা খুশিতে ফিরে আসছিল। রাস্তায় চুনক ঋষির কুটির ছিল। চুনক ঋষি সৈনিকদের জিজ্ঞাসা করেন, সৈনিকগণ! তোমরা কোথায় গিয়েছিলে? প্রত্যেক ঘোড়ার পীঠে সৈনিক বসে আছে কিন্তু এই ঘোড়াটা খালি কেন? এই ঘোড়ার সৈনিক কোথায়? সৈনিক ঋষিকে সব কথা জানায়। ঋষিজী বলেন, কেউ কি রাজা মানধাতার যুদ্ধ স্বীকার করেনি? সৈনিক বলে, কার বুকের পাটায় এতোটা দম আছে, কে এমন মায়ের দুধ খেয়েছে যে, আমাদের রাজার সাথে যুদ্ধ করবে। আমাদের রাজার কাছে ৭২ কোটি সেনা আছে। যদি কেউ যুদ্ধ করার দুঃসাহস করে তবে তার বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ঋষি চুনক কাল ব্রহ্মের পূজারী ছিলেন। ঋষি বলেন, হে সৈনিক! তোমার রাজার যুদ্ধ আমি স্বীকার করছি। এই ঘোড়াকে আমার কুটিরের কাছে গাছের সঙ্গে বেঁধে দাও। সৈনিক বলে, হে কাঙ্গাল! তোমার কাছে এক দানাও নেই খাওয়ার জন্য, আর আমাদের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? ভক্তি করো ঋষি, কেন নিজের মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ দিচ্ছ! ঋষিজী বললেন, যা হবে দেখা যাবে। যাও, আর রাজাকে বলো, চুনক ঋষি আপনার যুদ্ধ স্বীকার করে নিয়েছে। রাজা চিন্তা করে, আজ এক ভিখারী ঋষি ঘোড়া বাঁধার সাহস করেছে। আগামী দিনে অন্যরা ও এই সাহস দেখাবে। খারাপ জিনিসকে প্রথমেই সমাপ্ত করে দেওয়া ভালো। রাজা জনতাকে ভয় দেখানোর জন্য ৭২ কোটি সেনাকে ৪ ভাগে ভাগ করে এক ভাগ অর্থাৎ ১৮ কোটি সেনা চুনক ঋষির সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য না পাঠিয়ে দেয়। কাল ব্রহ্ম-এর পূজারী চুনক ঋষি নিজের সিদ্ধি শক্তি দিয়ে চারটি পুতুল না (পুতলিয়া) বানায়। অর্থাৎ চারটি পরমাণু বোমা তৈরি করে। একটি পুতুল ছেড়ে দেয়, তা রাজার ১৮ এক কোটি সেনাকে মেরে ফেলে। রাজা দ্বিতীয় ভাগ সেনা পাঠায়। ঋষি দ্বিতীয় পুতুল ছাড়ে। এই ভাবে রাজা মানধাতার ৭২ অক্ষুনী সেনাকে কাল ব্রহ্মের পূজারী চুনক, নাশ করে দেয়।

**বিচারনীয় বিষয় যে** :- ঋষি, মহর্ষিদের রাজাদের মাঝে অর্থাৎ রাজাদের কাজে দখল দেওয়া উচিত নয়। কারণ ঋষিরা সব কিছু ত্যাগ করে পরমাত্মা প্রাপ্তির এর জন্য হাজার হাজার বছর ওম্ নামের জপ করেন। কিন্তু পরমাত্মা পায় না। কারণ গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৭-৪৮-এ লেখা আছে, বেদে (চারবেদ ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ) বর্ণিত ভক্তি বিধিতে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় না। ঐ সাধনায় ঋষিদের মধ্যে সিদ্ধি প্রকট হয়ে যায়। অজ্ঞানতার কারণে ঐ সিদ্ধিকেই ভক্তির উপলব্ধি বলে মনে করে। যে কারণে ঐ পরম পদকে প্রাপ্ত করতে পারে না, যেখানে যাওয়ার পরে সাধকের পুনরায় জন্ম হয় না। কারণ ঐ ঋষিরা তত্ত্বদর্শী সন্ত পায়নি। সুক্ষ্ম বেদে বলেছেন:-

**কবীর, গুরু বিন কাহূ ন পায়া জ্ঞানা, জ্যোঁ থোথা ভুস ছড়ে মূঢ় কিসানা॥**
**গুরু বিন বেদ পঢ়ে জো প্রাণী, সমঝে ন সার রহে অজ্ঞানী॥**
**গরীব, বহতর ক্ষৌণী খা গয়া, চুণক ঋষিশ্বর এক।**
**দেহ ধারেঁ জৌরা ফিরেঁ, সবহী কালকে ভেষ॥**

**ভাবার্থ**:- তত্ত্বদর্শী সন্ত না পাওয়ার কারণে সাধক যে সাধনা করে তা শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে মনমর্জী আচরন হয়। এতে সাধকের কোন লাভ হয় না। গীতা অধ্যায় ১৬

শ্লোক ২৩-২৪ এ প্রমাণ আছে যে, হে ভারত! যে সাধক শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে ইচ্ছামত (মনমত) আচরণ করে, সে না তো সুখ প্রাপ্ত করে না তার সিদ্ধি হয় আর না তার কোন গতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মোক্ষ হয় না। তাই তোর জন্য শাস্ত্রেই প্রমান যে, কোন সাধনা করা উচিত আর কোন সাধনা করা উচিত নয়।

গুরু বিনা অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী সন্ত বিনা, বেদ পড়তে থাকা বা বেদ গুলিকে কণ্ঠস্থ করে নেওয়া ব্রাহ্মণরা, যেমন পূর্বে ব্রাহ্মণরা বেদ মন্ত্র মুখস্থ করে নিতেন। যারা চার দেব কণ্ঠস্থ করত তাদেরকে চতুর্বেদী, যারা তিন বেদ কণ্ঠস্থ করত তাদের ত্রিবেদী, যারা দুই বেদ কণ্ঠস্থ করত তাদের দ্বিবেদী বলা হত। কিন্তু বেদের গুঢ় রহস্যের জ্ঞান না হওয়ার কারণে ঐ ঋষিগণ বেদ পড়ে-গুলে খেয়ে নিলেও অজ্ঞানীই রয়ে যায়। সুক্ষ্মবেদে বলেছে:-

**পিঠ মনুখা দাখ লদী হৈ, উঁট খাত ববূল।**

**ভাবার্থ :-** আগেকার সময় মরুভূমিতে উটের পীঠে মনুক্কা দাখ (কিসমিস্) বোঝাই করে নিয়ে যেত। উটের পীঠে এত সুস্বাদু কিসমিসে ভরা বস্তা চাপানো থাকে, কিন্তু উট নিজের বাবুলের কাঁটা যুক্ত পাতা খায়। অজ্ঞানতার কারণ ঋষিরা চার বেদ রূপী কিশমিশের বস্তা দাগ নিয়ে ঘুরে বেড়াতো আর বাবুলের কাঁটা রূপী কাল ব্রহ্মের সাধনা করত। যার কারণে সনাতন পরম ধাম প্রাপ্ত হয়, আর না পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়। সূক্ষ্ম বেদে বলেছে যে :-

**বনজারে কে বৈল জ্যোঁ, ফিরা দেশ-বিদেশ।**
**খাণ্ড ছোড় ভুষ খাত হৈ, বিন সতগুরু উপদেশ॥**

**ভাবার্থ :-** আগেকার দিনে যাযাবর প্রজাতির লোকেরা অর্থাৎ ব্যবসাদারেরা (খাণ্ড) মিছরির বস্তা বলদের পিঠে করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেত। বলদের পীঠে সুস্বাদু মিছরির বস্তা চাপানো রয়েছে, কিন্তু বলদ নিজে ভূষি খায়। সেইরূপ গুরু দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়ার কারণে ঋষিগণ বেদ রূপী মিছরি (খাণ্ড) ঠিক মত না বুঝে কণ্ঠস্থ করে নেয়। কিন্তু বেদ না বুঝে বিরুদ্ধ সাধনা করতো।

**উদাহরণের জন্য :-**

শ্রী দেবী পুরাণের (সচিত্র মোটা টাইপ কেবল হিন্দী, গীতা প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত) পঞ্চম স্কন্দ পৃষ্ঠা নং. ৪১৪ তে লেখা আছে:- বেদ ব্যাস বলেছেন, সত্যযুগের ব্রাহ্মণরা বেদের পূর্ণ বিদ্বান ছিলেন। তাঁরা দেবী অর্থাৎ শ্রী দুর্গার পূজা করতেন। প্রত্যেক গ্রামে শ্রী দেবীর মন্দির বানানো তাদের প্রবল ইচ্ছা থাকতো।

**পাঠকগণ বিচার করুন:-**

চারবেদের সারাংশ হল শ্রীমদ্ভাগবত গীতা। গীতায় কোথাও দেবীর পূজা করার নির্দেশ নেই। তাহলে সত্য যুগের ব্রাহ্মণ কেমন বিদ্বান ছিলেন, তা সহজেই বোঝা যায়। এই দেবী পুরানের সপ্তম স্কন্দের পৃষ্ঠা ৫৬২-৫৬৩ তে শ্রী দেবী, রাজা হিমালয়কে জ্ঞান দেওয়ার সময় বলেছিলেন, তুই আমার পূজাও ত্যাগ কর। যদি ব্রহ্ম প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে তাহলে সব কিছু ত্যাগ করে কেবল ওম্ (ওঁ) নামের জপ কর। এটাই ব্রহ্ম-এর মন্ত্র। এর দ্বারাই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হবে। ঐ ব্রহ্ম, ব্রহ্মলোক রূপী দিব্য আকাশে থাকে। পাঠকগণ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, সত্যযুগের ব্রাহ্মণদের এইরূপ জ্ঞান ও সাধনা ছিল, তাহলে বর্তমান ব্রাহ্মণদের কেমন জ্ঞান হতে পারে? এই দেবী পুরানের পঞ্চম স্কন্দে পৃষ্ঠা ৪১৪ তে লেখা আছে, সত্য যুগে যাদের রাক্ষস মনে করা হত কলিযুগে তাদের ব্রাহ্মণ মানা হবে। ব্রাহ্মণ কোন জাতি বিশেষ নয়। যে পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম-এর জন্য প্রয়ত্নশীল, তাকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়, সে যে কোন জাতির হতে পারে। বর্তমানে

পরম্পরাগত ব্রাহ্মণ খুবই নগন্য। সন্ত রূপে ব্রহ্ম জ্ঞান দেওয়ার ব্রাহ্মন অধিক। যারা ব্রাহ্মণ অর্থাৎ মার্গ দর্শক গুরু বলে পরিচিত হন অথচ তারা তত্ত্বজ্ঞানহীন। তাই বলা হয়েছে তত্ত্বদর্শী গুরু ছাড়া কেউ বেদের গুঢ় রহস্যের জ্ঞান লাভ করতে পারে না। যে কারণে ব্রাহ্মণরা বেদ পড়ত, কিন্তু সাধনা করতো বেদ বিরুদ্ধ। বেদ ও গীতায় তিন দেবের (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিব) পূজা করতে নিষেধ করেছে। সর্ব হিন্দু সমাজকে, জ্ঞানহীন সন্তরা এই তিন দেবতার উপর কেন্দ্রিত করে রেখেছে এবং শ্রীদুর্গা, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু, ও শ্রীশিবের ভক্তি করছে ও করাচ্ছে। পূর্ব থেকেই এই লোকবেদ অর্থাৎ দন্ত কথার জ্ঞান চলে আসছে। এই লোক বেদ আজ আমার সামনে এক প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি (তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপালজী মহারাজ) শাস্ত্রক্ত জ্ঞান বলি, প্রজেক্টারের মাধ্যমেও দেখাচ্ছি। কিন্তু পূর্বের থেকে অজ্ঞানকে সত্য মনে করা লোকজন সত্যকে স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করে না। উল্টে বিরোধ করে আমাকে জেলে পাঠিয়ে দেয়।

সুক্ষ্মবেদে বলা হয়েছে যে:-

**গরীব, বেদ পঢ়েঁ পর ভেদ ন জানেঁ, বাঁচেঁ পুরান অঠারহ।**
**পত্থর কী পূজা করেঁ, বিসরে সিরজনহারা॥**

**ভাবার্থ:-** বেদ ও আঠেরো পুরাণ পড়ে আর মূর্তি পূজা করে। বেদে বর্ণিত সৃজনহার পরম অক্ষর ব্রহ্মকে ভুলে গিয়েছে। অন্য প্রভুর পূজা করে ঐ পরম শক্তি তথা সনাতন পরম ধাম অর্থাৎ পরমেশ্বরের ঐ পরম পদ থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়, যার বিষয়ে গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২ এবং অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ এ বলা হয়েছে। সুক্ষ্মবেদে লেখা আছে যে:-

**গূরূবাঁ গাম বিগড়ে সন্তো, গূরূবাঁ গাম বিগাড়ে।**
**ঐসে কর্ম জীব কে লা দিয়ে, ফির ঝড়েঁ নহীঁ ঝাড়ে॥**

ভাবার্থ হলো, বেদ জ্ঞান হীন, তত্ত্বজ্ঞানে অপরিচিত গুরুরা গ্রামের পর গ্রামকে শাস্ত্র বিরুদ্ধ জ্ঞান ও ভক্তির অজ্ঞান শুনিয়ে ভক্ত আত্মাদেরকে এমন ভ্রমিত করে দিয়েছে যে, তারা শাস্ত্র বিরুদ্ধ জ্ঞান ত্যাগ করতে রাজি নয়। গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩ এ বলেছে, শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে মন মত আচারণ করলে কোন লাভ হয় না। না সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, না সুখ অর্থাৎ ব্যার্থ সাধনা।

দ্বিতীয়ত, আপনারা চুনক ঋষির কাহিনীতে পড়েছেন যে, ঋষি সিদ্ধি প্রাপ্ত করেছিলেন। পাঠকদের এটা বুঝতে হবে যে, সিদ্ধি হলো ভক্তির বাই প্রডাক্ট। যেমন গমে ভুষি থাকে, এতে তুস বেশি থাকে। পশুরা এই ভুষি খেলে মুখে ক্ষত হয়ে যায়। সেইরূপ সিদ্ধিতে ও হয়। যেমন ব্রহ্ম ভক্তিতে চুনক ঋষি প্রাপ্ত করেছিল।

শাস্ত্র বিধি অনুসারে ভক্তি করলে যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাকে গমের ভুষি মনে করো। যা পশুদের জন্য উপযোগী ও খেতে সুবিধা হয়। ভাবার্থ হলো, শাস্ত্রবিরুদ্ধ সাধনা করে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তা সাধককে নষ্ট করে দেয়। কারণ অজ্ঞানতার জন্য ঋষিজন ঐ সিদ্ধি প্রয়োগ করে অন্যের হানি করে, আবার কাউকে আশীর্বাদ দিয়ে নিজের ভক্তির শক্তি খালি করতে থাকে। যে শক্তি তারা ওম্ নামের জপ করে উপার্জন করেছিল।

যেমন চুনক ঋষি নিজের সিদ্ধি শক্তি সমাপ্ত করে মানধাতা চক্রবর্তী রাজার ৭২ কোটি সৈন্য নাশ করেছিল। সুক্ষ্ম বেদে বলা হয়েছে :-

**গরীব, বহতর ক্ষৌণী ক্ষয় করী, চুণক ঋষিশ্বর এক।**
**দেহ ধারেঁ জৌরা (মৃত্যু) ফিরেঁ, সব হই কালকে ভেষ॥**

**ভাবার্থ:-** ঋষিদের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ ঋষি চুনক, ৭২ কোটি সৈন্যকে নাশ করে দেয়।

দেখে তো এদের মহাত্মা মনে হয় কিন্তু এদের সম্মুখীন হলেই জানা যায় যে, এনারা হলেন সর্পের মত। সামান্য কথায় বা কারণে ক্রোধিত হয়ে অভিশাপ দিয়ে দেওয়া, অকারণে কারোর সাথে ঝামেলা করা তাঁদের জন্য সাধারণ ব্যাপার ছিল।

## "ঋষি দুর্বাসার কান্ড"

❖ দুর্বাসা নামের এক ঋষি কাল ব্রহ্মের পূজারী ছিলেন (ব্রহ্ম সাধক)। এক দিন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়, সুন্দর মুক্তোর মালা গলায় পড়ে এক অপ্সরাকে (স্বর্গের স্ত্রী) দেখতে পায়। ঋষি অপ্সরা বলে, এই মুক্তোর মালা আমাকে দাও। দেবপরী জানতো যে, এই ঋষিরা সর্পের মত আচারণ যুক্ত হয়। যদি মানা করি তাহলে অভিশাপ দিয়ে দেবে। অপ্সরা তৎক্ষণাৎ গলা থেকে মালাটি খুলে আদরের সহিত দুর্বাসা ঋষিকে দিয়ে দেয়। ঋষি ঐ মালা নিজের মাথার ঝুটিতে বেঁধে নিয়ে চলতে শুরু করে। স্বর্গের রাজা ইন্দ্র নিজের ঐরাবত হাতীর পীঠে বসে ঐ রাস্তা দিয়ে আসছিলেন এবং আগে আগে অপ্সরা ও গন্ধর্বরা নাচ-গান করতে করতে যাচ্ছিল। সাথে বহু সংখ্যায় দেবতারাও সম্মান পূর্বক ইন্দ্রের সঙ্গেই যাচ্ছিল। দুর্বাসা ঋষি মাথার ঝুটি থেকে মালা খুলে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের দিকে ছুঁড়ে দেয়। ইন্দ্র ঐ মালা হাতীর ঘাড়ের উপর রেখে দেয়। হাতী আবার ঐ মালাকে শুঁড় দিয়ে নিচে মাটিতে ফেলে দেয়। স্বর্গের রাজা ইন্দ্রকে যদি কোন ভক্ত বা দেবতা ফুলেরমালা উপহার দিত, ইন্দ্র ঐ ফুলেরমালা হাতির ঘাড়ের উপর রেখে দিত। ইন্দ্র যখন হাতির ওপর চড়ে বসত, হাতী ঐ সব গুলিকে তুলে নীচে ফেলে দিত। হাতী নিজের অভ্যাসের কারণে ঐ মালাটিকেও নীচে ফেলে দেয়।

মালা নীচে ফেলতে দেখে ঋষি দুর্বাসা কুপিত হয়ে যায়, আর বলে হে ইন্দ্র! তোর রাজ্যের অভিমান হয়ে গিয়েছে। আমার দেওয়া মালা তুই অনাদর করে ফেলে দিয়েছিস! আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তোর সর্ব রাজ্য নষ্ট হয়ে যাক। দেবরাজ ইন্দ্র ভয়ে কাঁপতে লাগে, আর বলে হে বিপ্র! আমি আপনার মালা আদরের সহিত গ্রহণ করে হাতির ওপর রেখেছিলাম। হাতী নিজের অভ্যাসের কারণে নীচে ফেলে দিয়েছে। আমাকে ক্ষমা করুন। এই বলে দেবরাজ ইন্দ্র হাতী থেকে নেমে দণ্ডবৎ প্রণাম করে বরং বার ক্ষমা প্রার্থণা করতে থাকে, কিন্তু দুর্বাসা ঋষি কোন কথা মানলেন না। দুর্বাসা বললেন, আমি যা বলে দিয়েছি তা ফিরিয়ে নিতে পারব না। কিছু সময় পরই ইন্দ্রের রাজ্যের সর্বনাশ হয়ে যায়।

❖ একবার ঋষি দুর্বাসা দ্বারকা নগরীর কাছে এক বনে (ছোট বন বা জঙ্গল) কিছু সময়ের জন্য থাকেন। দ্বারকাবাসীরা জানতে পারে দুর্বাসা ঋষি নগরের কাছেই এসেছেন। তিনি ত্রিকালদর্শী মহাত্মা, সিদ্ধিযুক্ত ঋষি। দ্বারকাবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে অধিক শক্তিশালী কাউকে মানত না। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুমন সহ আরও অন্যান্য যাদবেরা পরিকল্পনা করে যে, ত্রিকালদর্শী দুর্বাসা ঋষি নাকি মনের কথা বলে দেন, ওনাকে পরীক্ষা করা যাক। এই বিচার করে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুমনকে গর্ভবতী স্ত্রী এবং অন্য একজন কে স্বামী সং সাজিয়ে ৮/১০ জন দ্বারকাবাসী দুর্বাসা ঋষির কাছে যায়। ওদের মধ্যে একজন দুর্বাসা ঋষিকে বলে, হে ঋষিজী! পরমাত্মার কৃপায় বহুদিন পরে এই স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে, ইনি হলেন তার স্বামী। পতি-পত্নি দুইজন জানতে চায় যে, গর্ভ থেকে ছেলে না মেয়ে সন্তান হবে। আপনি তো অন্তর্যামী, কৃপা করে বলে দিন? তারা প্রদ্যুমনের পেটে একটা ছোট লোহার কড়াই বেঁধে উপর থেকে কাপড় মুড়িয়ে গর্ভ আকৃতি বানায় এবং স্ত্রীর বস্ত্র পরিয়ে দেয়। দুর্বাসা ঋষি তাঁর দিব্য দৃষ্টির সাহায্যে জানতে পারেন যে, এই যাদবরা আমার সঙ্গে ঠাট্টা করতে এসেছে। তাই দুর্বাসা ঋষি

ক্রোধিত হয়ে বলে দেন যে, এই গর্ভ থেকে যাদব কুলের নাশ হবে। ঋষিকে ক্রোধিত দেখে, সমস্ত ব্যক্তি ওখান থেকে চলে আসে।

এই কথা দ্বারকা নগরীতে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে যে, দুর্বাসা ঋষি অভিশাপ দিয়েছেন যে যাদব বংশ ধ্বংস হবে। যাদবেরা বিশ্বাস করতো যে, আমাদের সঙ্গে সর্বশক্তি মান ভগবান অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন। দুর্বাসা ঋষির অভিশাপের প্রভাব আমাদের উপর পড়বে না। তবুও কিছু বুদ্ধিমান যাদব শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলো এবং ঋষি দুর্বাসার সাথে বাচ্চাদের ঠাট্টা করা ও অভিশাপ দেওয়ার সকল বৃত্তান্ত জানালো। সর্ব বৃত্তান্ত শুনে, কিছুক্ষন চিন্তা ভাবনা করে শ্রী কৃষ্ণজী বলেন, তোমরা ঐ বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে দুর্বাসাজীর কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থণা করো। যাদবরা দুর্বাসা ঋষির কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে, কিন্তু দুর্বাসা ঋষি বলেন, আমি যা বলে দিয়েছি তা ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না।

সকল যাদবেরা আবার শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে গিয়ে সব কথা খুলে বলে। দ্বারকায় ভোজন রান্না বন্ধ হয়ে গেলো। সর্ব নগরী চিন্তায় ডুবে গেলো। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তোমাদের চিন্তা কিসের? গর্ভ তৈরিতে যে সব বস্তু ব্যবহার করা হয়েছিল তাতেই আমাদের বিনাশ বলেছেন তো! তবে এক কাজ করো, কাপড়গুলি আগুনে ভস্ম করে দাও আর লোহার কড়াইকে পাথরে ঘষে প্রভাস ক্ষেত্রে (যমুনা নদীতে) ফেলে দাও। ওখানে বসেই কড়াইকে ঘষে ঘষে গুঁড়ো বানাও। কাপড়ের ভস্ম আর কড়াইয়ের গুঁড়ো এক সাথে নদীতে ফেলে দাও। না থাকবে বাঁশ আর না বাজবে বাঁশি। গর্ভের জিনিসগুলই যখন থাকবে না, তখন আমাদের নাশ হবে কিভাবে? এই বিচার শুনে দ্বারকাবাসীরা সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং তারা সবাই নিজেকে সঙ্কট মুক্ত বলে মনে করে। শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসার সমস্ত ক্রিয়া করে। কড়াই ঘষে ঘষে নষ্ট করে ফেলে কিন্তু কড়াই-এর একটি আংটা সম্পূর্ণ না ঘষেই যমুনা নদীতে ফেলে দেয়। একটি মাছ ঐ কড়াইয়ের অংটাকে চকচকে খাদ্য বস্তু মনে করে খেয়ে নেয়। বালীয়া নামক এক ভীল ঐ মাছকে ধরে কাটলে মাছের পেটে রূপার মত ধাতু দেখতে পায়। সে ঐ চকচকে ধাতুকে (লোহা) বিষযুক্ত করে তীরের মাথার ফলা তৈরী করে লাগিয়ে নিয়ে সুরক্ষিত করে রাখে। আর কড়াই ঘষে যে লোহার গুঁড়ো যমুনা নদীতে ফেলেছিল সেই স্থানে কাঁটা যুক্ত লম্বা লম্বা ঘাস রূপে নদীর ধার দিয়ে উৎপন্ন হয়ে যায়।

কিছু সময় পর দ্বারকা নগরীতে উপদ্রব শুরু হয়। যাদবেরা কথায় কথায় একে অপরের সাথে ঝগড়া- মারপিঠ করতে লাগে। নিজেদের মধ্যে শত্রু-বিরোধ ভাব বাড়তে থাকে। নগরবাসীদের এই অবস্থা দেখে, কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে নগরের পরিস্থিতির কথা বলে, এবং এর কারণ ও সমাধানের জানার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ, যাদব ও পাণ্ডবদের আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন। তাই সঙ্কটের নিবারণ গুরুদেবই করে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, দুর্বাসা ঋষির অভিশাপ ফলিভূত হচ্ছে। এর সমাধান হল সমস্ত পুরুষ (নর) যাদব, এমনকি আজ যার জন্ম হয়েছে তাকেও নিয়ে ঐ প্রভাস ক্ষেত্রে, যেখানে কড়াইয়ের চূর্ণ ফেলা হয়েছিল সেখানে গিয়ে যমুনার জলে স্নান করো। তাহলে যাদবকুল অভিশাপ মুক্ত হবে। সর্ব দ্বারকা বাসী শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া আদেশ পালন করে। সদ্যজাত শিশু সহ সর্ব পুরুষ যাদবেরা অভিশাপ মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে স্নানের জন্য প্রভাস ক্ষেত্রে যমুনার তীরে একত্রিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল সকলে এক সঙ্গে স্নান করে অভিশাপ মুক্ত হওয়া, যাতে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লড়াই না হয়। কিন্তু তার বিপরীতটাই হলো। সমস্ত যাদবরা যমুনার পবিত্র জলে শাপ মোচনের জন্য স্নান করে উঠেই নিজেদের মধ্যে

ঝগড়া-লড়াই গালাগালি শুরু করে দেয়। লোহার গুঁড়া থেকে নদীর কুলে উৎপন্ন কাঁটাযুক্ত ঘাস তুলে তুলে একে অপরকে মারতে লাগে। সারকণ্ডে ঘাস তলওয়ারের মত কাজ করতে লাগে। ঐ ঘাস (সারকাণ্ডে) দিয়ে মারা মাত্রই ধর থেকে মাথা আলাদা হয়ে যেতে লাগে। এই ভাবে সর্ব যাদব নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মৃত্যুকে প্রাপ্ত করে। মাত্র দুই-চারশো যাদব শেষ রয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণও তখন সেখানে পৌঁছে যান এবং ঐ ধারালো তরয়ালের মত ঘাসকে (সারকণ্ডা) তুলে, শেষ জীবিত নিজ বংশের ব্যক্তিদের কেও নিজের হাতে হত্যা করেন।

যাদবদের বংশ সমাপ্ত হওয়ার পরে শ্রীকৃষ্ণজী একটি গাছের নীচে বিশ্রাম করতে লাগলেন। এরইমধ্যে দেবযোগে ঐ বালিয়া নামের ভীল, কড়াইয়ের অবশিষ্টাংশ দিয়ে তৈরি বিষাক্ত তির নিয়ে শিকার খুঁজতে খুঁজতে ঐ স্থানে পৌঁছায় যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ডান পায়ের তলায় পদ্ম চিহ্ন ছিল। ঐ পদ্মে লাইটের মত চমক ছিল। গাছের ঝুরি মাটি পর্যন্ত ঝুলছিলো। ঝোপের মধ্য দিয়ে পদ্মের চমক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। বালিয়া ভীল ঐ পদ্মের চমককে হরিণের চোখ মনে করে, হরিণকে মারার উদ্দেশ্যে ঐ কড়ায়ের লোহা দিয়ে তৈরি বিষাক্ত তির নিক্ষেপ করে। তির শ্রীকৃষ্ণের পায়ে গিয়ে লাগে। শ্রীকৃষ্ণ যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে, মরে গেলাম রে! মরে গেলাম! বালিয়া ভীল বুঝতে পারে যে, তির নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তির শরীরে গিয়ে লেগেছে। কাছে গিয়ে দেখে দ্বারকাধীশ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। বালিয়া বলে, হে মহারাজ! আমি ভুল করে তির নিক্ষেপ করে ফেলেছি। আপনার পায়ের দীপ্তিকে হরিণের চোখ মনে করে তির নিক্ষেপ করি। আমার অন্যায় হয়েছে, আমায় ক্ষমা করে দিন মহারাজ। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তুমি কোন অন্যায় করোনি। এ তোমার আর আমার পূর্ব জন্মের লেন-দেন ছিল যা আজ পরিশোধ হল। ত্রেতা যুগে আমি দশরথ পুত্র রামচন্দ্র ছিলাম আর তুমি সুগ্রীবের ভাই বালী ছিলে। আমি বৃক্ষের আড়ালে থেকে প্রতারণা করে তোমাকে হত্যা করেছিলাম। তার বদলা (Tit for tat) আজ পূর্ণ হয়েগেলো।

এই ভাবেই ঋষি দুর্বাসার অভিশাপে সর্ব যাদব কূল নাশ হয়ে যায়। ঐ সময়ে যে সব যাদব মায়েরা গর্ভবতী ছিল তাদের থেকে পুনরায় যাদব বংশ শুরু হয়, তারাই আজ বর্তমানের যাদব।

সূক্ষ্ম বেদে লেখা আছে :-

**গরীব, দুর্বাসা কোপে তহাঁ, সমঝ ন আঈ নীচ।**
**ছপ্পন করোড় যাদব কটে, মচী রুধির কী কীচ॥**

**সরলার্থ:-** ঋষি দুর্বাসা ছোটো বালকদের করা কৌতুক এতটা গম্ভীর ভাবে নিয়ে নেন যে, কুল ধ্বংস হওয়ার অভিশাপ দিয়ে দেন। ঐ নীচ দুর্বাসা ঋষি এতকুটুও চিন্তা করলেন না যে, আমার অভিশাপে কি অনর্থ হয়ে যাবে! বিষয় সেরকম কিছুই ছিলনা, নীচ ঋষির নৃশংসতার কারণে ৫৬ কোটি যাদব নিজেদের মধ্যে কাটা-কাটি করে মারা যায় আর তাদের রক্তে মাটি কিচড় (কাদা) হয়ে যায়।

**এইরূপ চুনক ঋষিও কোনো কারণ ছাড়াই**
**মানধাতা রাজার ৭২ কোটি সেনার নাশ করে॥**

❖ কপিল মুনি নামের এক ঋষি ছিলেন। তাকে ভগবান বিষ্ণুর ২৪ অবতারের মধ্যে একটি অবতার বলে মনে করা হয়। তিনি তপস্যা করছিলেন।

সগর নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর ৬০ হাজার পুত্র ছিল। কোনো এক ঋষি, রাজা সগরকে বলে, যদি একটি পুকুর, একটি কুয়া (ইন্দ্রা) আর একটি বাগিচা (ফলের

বাগান) তৈরি করে দেওয়া যায় তাহলে এক অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। রাজা সগরের ছেলেরা এই কার্য শুরু করে দেয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা রাজাকে বলে, আপনি এইভাবে সব স্থানে পুকুর, কুয়া, বাগান ইত্যাদি তৈরি করতে থাকলে অন্ন উৎপাদনের জন্য পৃথিবীতে আর জমি অবশিষ্ট থাকবে না। কোনো রাজা এসে বিরোধ করলে তার সাথে লড়াই শুরু করে দেয়। রাজা সগরের পুত্ররা একটি ঘোড়ার গলায় পত্র লিখে ঝুলিয়ে দেয় যে, যদি আমাদের এই কাজে কেউ বাধা দেয় তাহলে সে এই ঘোড়াকে বেঁধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাক! ঐ উন্মত্তদের সাথে কে বিরোধ করতে চাইবে? পৃথিবী দেবী গোমাতার রূপ ধারন করে ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বলে, হে ভগবান! পৃথিবীতে এক সগর রাজা আছেন। তাঁর ৬০ হাজার পুত্র। সাগর রাজা আমার উপর খুঁড়ে যেখানে সেখানে পুকুর বানানো শুরু করে দিয়েছে। সেখানে মানুষের খাওয়ার জন্য অন্ন উৎপাদন করাও যাবেনা। করার জায়গা থাকবে না। ভগবান বিষ্ণু বললেন, তুমি যাও, রাজা সাগর এখন আর কিছু করবে না। ভগবান বিষ্ণু, দেবরাজ ইন্দ্রকে ডেকে বলেন, রাজা সগরের ৬০ হাজার পুত্র যজ্ঞ করা শুরু করেছে। যদি এক শত যজ্ঞ পূর্ন হয়ে যায় তবে ইন্দ্রের সিংহাসন তাদেরকে দিয়ে দিতে হবে। সময় থাকতে যদি পারো, কিছু করো। ইন্দ্র নিজের চাকরকে সবকিছু বুঝিয়ে পৃথিবীতে পাঠায়। রাত্রি বেলা রাজা সাগরের পুত্ররা, ঘোড়াটিকে পাশেই একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। দেবরাজ ইন্দ্রের দূতেরা ঘোড়াটিকে সেখান থেকে খুলে কপিল মুনির উরূর (জাং) সাথে বেঁধে দেয়। কপিল মুনি বহু বছর ধরে তপস্যারত ছিলেন।যায় কারণে তাঁর শরীর অস্থি-কঙ্কালের মত হয়ে গিয়েছিল। পদ্মাসন লাগিয়ে বসেছিলে এবং পা দুটি এত সরু হয়ে গিয়েছিল যেমন, কোনো বড় গাছের শেকড়ের মধ্যে দিয়ে বর্ষার জল বয়ে যাওয়ার ফলে শেকড়ের মাঝে ৬-৭ ইঞ্চির ফাঁক (gap) হয়ে যায় এইরূপ ছিল ঋষির পা দুটি। ইন্দ্রের দূতেরা, ঘোড়ার দড়িটিকে ঋষির সরু পায়ের ফাঁক দিয়ে নিয়ে উরূর কাছে বেঁধে দেয়। রাজার পুত্ররা সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পায় ঘোড়া নেই। ঘোড়ার খোঁজে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ৬০ হাজার তাদের সৈন্য দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করতে করতে কপিল মুনির আশ্রমে গিয়ে পৌঁছায়। ঘোড়া বাঁধা দেখে সগর রাজার পুত্ররা ঋষির কাঁখে বর্শা দিয়ে খোঁচা দেয়। ঋষির চোখের পলক এত লম্বা হয়ে গিয়েছিল যে, মাটি পর্যন্ত ছুঁয়ে যায়। পীড়ার করোনে ঋষি ক্রোধিত হয়ে নিজের হাত দিয়ে চোখের পলক সরিয়ে উপরে ওঠায়, তখনই চোখ দিয়ে অগ্নি বান নিক্ষিপ্ত হয় যার ফলে রাজা সগরের ৬০ হাজার পুত্র ও সেনাদের মৃত্যু হয়।

সূক্ষ্ম বেদে বলা হয়েছে:-

**৬০ হজার সগড় কে হোতে, কপিল মুণিশ্বর খায়।**
**জৈ পরমেশ্বর কী করেঁ ভক্তি, তো অজর-অমর হো জাএ॥**
**৭২ ক্ষৌণী খা গয়া, চুণক ঋষিশ্বর এক।**
**দেহ ধারেঁ জৌরা ফিরেঁ, সভী কাল কে ভেষ॥**
**দুবার্সা কোপে তহাঁ, সমঝ ন আঈ নীচ।**
**৫৬ করোড় যাদব কটে, মচী রূধির কী কীচ॥**

**ভাবার্থ:**- কপিল মুণি ও দুর্বাসা মুণি এই সংসারের খুব প্রসিদ্ধ, এই সব ঋষি কাল ব্রহ্মের ভক্তি করা বেশধারী। যেন চলমান-জীবন্ত মনুষ্য রূপী মৃত্যুর দূত। (যেমন তান্ত্রিকরা তন্ত্র মন্ত্রের সাহায্যে মানুষের ক্ষতি করে বা বান মেরে মানুষকে মেরে ফেলে।) সেইরূপ এইসব ঋষিরা। ভুলবশত অজ্ঞানতার কারণে মানুষ এদের মহান

আত্মা মনে করে। এই সব ঋষি, মুনিরা জ্ঞানী আত্মা এবং উদার হৃদয়ের ছিল। পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য তন-মন-ধন সমর্পিত করে দেন কিন্তু তত্ত্বদর্শী সন্ত না পাওয়ার কারণে, কাল ব্রহ্মাকে সমর্থ্য প্রভু মনে করে ভুল করে বসে। এই কাল ব্রহ্মেরই সাধনা ওম্ (ওঁ) নামের জপ এবং অধিক হঠযোগে ও সমাধির দ্বারা করেন। এই সাধনায় পরমাত্মা প্রাপ্তি তো হয় না, এর বিপরীতে ক্ষতি হয়ে যায় কারণ এটি শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা।

গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩-২৪ এ বলেছে যে, শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে যারা মনমর্জী আচরণ করে তাদের সাধনা ব্যর্থ। এই জন্য ঐ উদার আত্মারা কাল ব্রহ্মের অনুত্তম গতিতে স্থিত থাকে।

গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ৫, ৬ এ বলা হয়েছে :-

❖ যে মনুষ্য শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে মনের কল্পনায় ঘোর তপ করে এবং ঘোর দম্ভ অহংকার যুক্ত, কামনা আসক্তি অভিমান যুক্ত হয়। (গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ৫)

❖ শরীরে স্থিত সর্ব কমলে অবস্থিত দেব শক্তি ও পূর্ণ পরমাত্মা এবং আমাকেও দুঃখী করা অর্থাৎ কষ্ট দেওয়া অজ্ঞানীদের তুই অসুর স্বভাবের জান। (গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ৬)

❖ এই প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ১৭ থেকে ২০ পর্যন্ত আছে।

❖ তারা নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা, অহংকারী পুরুষ ধন আর মানের নেশায় মত্ত হয়ে কেবল নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা পাখণ্ড (ভণ্ডামী) করে শাস্ত্রবিধি রহিত পূজা করে। (গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ১৭)

❖ অহংকার, বল, দম্ভ, কামনা, ক্রোধ ইত্যাদির বশীভূত হয়ে এবং অন্যের নিন্দা করা পুরুষ, নিজের ও অন্যের শরীরে স্থিত আমাকে ঘৃণা করে। (গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ১৮)

❖ ঐ দ্বেষ করা পাপী, ক্রুরকর্মী 'যে বচন দ্বারা কোটি কোটি ব্যক্তিকে হত্যা করে' সেই নরাধম অর্থাৎ নীচ মানুষকে আমি সংসারে রাক্ষস অর্থাৎ অসুরী যোনীতে বার বার পাঠাই। (গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ১৯)

সূক্ষ্ম বেদে তাঁকে নীচ বলা হয়েছে :-

**দুবার্সা কোপে তহাঁ, সমঝ ন আঈ নীচ।**
**৫৬ করোড় যাদব কটে, মচী রূধীর কী কীচ ॥**

❖ হে অর্জুন! এই মূর্খরা আমাকে প্রাপ্ত না করেই জন্ম-জন্ম ধরে অসুরী যোনী প্রাপ্ত করে এবং এর থেকে ও নীচ গতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঘোর নরকে যায়। (গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২০)

উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হলো যে, গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮-তে গীতা জ্ঞানদাতা নিজের সাধনায় হওয়া গতিকেও এই কারণে অনুত্তম অর্থাৎ নিকৃষ্ট বলেছে কারণ :-

❖ গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮-তে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছে, যারা আমার চতুর্থ প্রকারের সাধক আছে তারা উদার, কারণ পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য নিজের শরীর নষ্ট হওয়ার চিন্তাও করে না। হাজার হাজার বছর ধরে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট করে সাধনারত থাকে। কিন্তু তত্ত্বদর্শী সন্ত না মেলার কারণ ঐ সব আত্মা আমার অনুত্তম অর্থাৎ ঘাটিয়া গতি অর্থাৎ ব্রহ্ম সাধনায় হওয়া মোক্ষ যা উপরোক্ত ঋষিরা পেয়েছে অর্থাৎ মৃত্যুর চক্রতে রয়ে যায়।

❖ **নিষ্কর্ষঃ-** চুনক ঋষি, দুর্বাসা ঋষি ও কপিল ঋষি যে ওম্ (ওঁ) নামের জপ করেছেন, ঐ ভক্তির ফল স্বরূপ কিছু সময়ের জন্য ব্রহ্ম লোকে যাবে। ওখানে ভক্তি সমাপ্ত করে

পৃথিবীতে এসে রাজা হবে। সুক্ষ্ম বেদে লেখা আছে :-

**তপ সে রাজ, রাজ মধ মানম্, জন্ম তীসরে শুকর স্বনাম্।**

তারপর কুকুর, গরুর যোনীতে যাওয়ার পর নরকে যাবে। যখন কুকুর হবে, তখন তাদের মাথায় পোকা হবে। যে সমস্ত ব্যক্তিরা তাঁদের অভিশাপে মারা গিয়েছে, সেই পাপ ভোগ করতে হবে, তখন পোকা হয়ে এঁদের মাংস কুড়ে-কুড়ে খাবে। এইজন্য গীতায় এমন সাধকদের বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তা আপনারা উপরেই পড়লেন।

### ❖ উপরোক্ত কথার সারাংশ :-

১. ব্রহ্ম সাধনা অনুত্তম (নিকৃষ্ট)।

২. তিন তাপকে শ্রীকৃষ্ণও সমাপ্ত করতে পারেননি। কাউকে অভিশাপ দেওয়া তিন তাপের (দৈবিক) মধ্যেই পড়ে। সর্ব যাদব সহ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দুর্বাসা ঋষির অভিশাপের শিকার হয়।

৩. শাপ মুক্ত হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে স্নান করতে বলে। এতে অভিশাপ খন্ডন হলো না তবে যাদব কুলের নাশ অবশ্যই ঘটে গেলো। **বিচার করুন :-** যে সব সন্ত বা ব্রাহ্মণরা সঙ্কট মোচনের জন্য তীর্থ যাত্রা বা স্নানের উপদেশ দেন, তা কতটা কার্যকরী? স্বয়ং ভগবান ত্রিলোকনাথের বলা সমাধানে অর্থাৎ যমুনায় স্নান করায় উপদেশে কোন লাভ হয়নি। তাহলে অন্য নকল গুরু, ব্রাহ্মণের কথায় স্নান করা ইত্যাদি সমাধান দ্বারা কোনো লাভ হওয়া সম্ভব নয়।

৪. প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ অভিশাপ থেকে মুক্তির সমাধান দেয়, ঐ কড়াইটি ঘষে চূর্ণ করে প্রভাস ক্ষেত্রে যমুনা নদীতে ফেলে দাও। বাঁশও থাকবে না আর বাঁশিও বাজবে না। কিন্তু বাঁশও থেকে যায় আর ৫৬ কোটি যাদবদের বাঁশিও বেজে যায়।

প্রিয় পাঠকগণ! বর্তমানের মানুষ বুদ্ধিমান, শিক্ষিত। আমার (সন্ত রামপাল দাস) দ্বারা বলা জ্ঞান শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, পরে ভক্তি করে দেখুন কেমন চমৎকার হয়।

### ❖ প্রসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাই :-

১. তিন গুনের (রজগুন ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ শিব) ভক্তি করা ব্যর্থ প্রমাণিত হলো।

২. গীতা জ্ঞানদাতা ব্রহ্ম-এর ভক্তিকে স্বয়ং গীতা জ্ঞানদাতা, অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮ তে অনুত্তম বলেছেন। গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২-তে ঐ পরমেশ্বর অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মের শরনে যেতে বলেছেন। এ কথাও বলেছেন যে, ঐ পরমেশ্বরের কৃপায় তুই পরম শান্তি তথা সনাতন পরমধামকে প্রাপ্ত করবি।

৩. গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪ এ সংসার রূপী বৃক্ষের বর্ণনা ও তত্ত্বদর্শী সন্তের পরিচয় বলেছেন। সংসার রূপী বৃক্ষের সব অংশ অর্থাৎ মূল (শিকড়) কোন পরমেশ্বর? কাণ্ড অংশটি কোন প্রভু? শাখা কোন প্রভু? প্রশাখা কোন প্রভু? এবং পাতা রূপী সংসার বলা হয়েছে।

এই অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬ তে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে :-

**১. ক্ষর পুরুষ (ইনি ২১ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী) :-** এই পুরুষকে ব্রহ্ম, কাল ব্রহ্ম, জ্যোতি নিরঞ্জনও বলা হয়। ইনি নাশবান। আমরা এই প্রভুর লোকে থাকি। এই লোক থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের নিজের পরম পিতা পরমাত্মার কাছে সতলোকে যেতে হবে। তাই এনার টোলট্যাক্স দিতে হবে। এই প্রভুর সাথে আমাদের সম্পর্ক এইটুকুই।

**২. অক্ষর পুরুষ :-** এই প্রভু ৭ শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী। এই প্রভু ও নাশবান। এই ৭ শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড হয়ে আমাদের সতলোকে যেতে হবে। তাই অক্ষর পুরুষকেও টোলট্যাক্স

দিতে হবে। এনার সাথেও আমাদের এইটুকুই সম্পর্ক রয়েছে।

❖ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭ তে বলা হয়েছে যে :-

**উত্তমঃ পুরুষঃ তু অন্যঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ।**
**য়ঃ লোক ত্রয়ম্ আবিশ্য বিভর্তি অব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ॥**

**সরলার্থ**:- গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬-তে দুই পুরুষের কথা বলেছে। এক ক্ষর পুরুষ আর দ্বিতীয় অক্ষর পুরুষ। এই দুই জন থেকে অন্য উত্তম পুরুষ অর্থাৎ পুরুষত্তম, তাঁকেই পরমাত্মা বলা হয়। যিনি তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের ধারন-পোষণ করেন। তিনিই বাস্তবে অবিনাশী পরমেশ্বর। (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৭)। গীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৪-১৫ তে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সর্বগতম্ ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্বব্যাপী পরমাত্মা, যিনি হলেন সচিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম, তাঁকেই বাসুদেবও বলা হয়, যাঁর বিষয়ে গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৯ এ বলা হয়েছে। তিনি সর্বদা, যজ্ঞ অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানে প্রতির্ষ্ঠিত অর্থাৎ ইষ্ট রূপে পূজ্য।

পূর্ণ গুরুর থেকে দীক্ষা নিয়ে মর্যাদায় থেকে ভক্তি করুন। এইভাবে জীবনের পথে চলে, সংসারে সুখী জীবন যাপন করুন ও মোক্ষ রূপী গন্তব্যে পৌঁছান।

# সৃষ্টি রচনা

## (সূক্ষ্ম বেদের সারাংশ স্বরূপ সৃষ্টি রচনার বর্ণনা)

প্রভু প্রেমী আত্মাগণ প্রথমবার যখন নিম্নলিখিত সৃষ্টি রচনা পড়বেন তখন এইরকম মনে হবে যে, এটা একটা গল্পকথা/ লোকগাতা/পৌরাণিক গল্প কাহিনী কিন্তু সমস্ত পবিত্র সদগ্রন্থের প্রমাণ পড়বার পরে আপনি গালে হাত দিয়ে বসে যাবেন যে, এই আসল/বাস্তবিক অমৃত জ্ঞান এতদিন কোথায় লুকানো ছিল ? ধৈর্য্যের সঙ্গে পড়তে থাকুন এবং এই অমৃত জ্ঞানকে সুরক্ষিত রাখুন। আপনার ১০১ বংশ পর্যন্ত কাজে আসবে। পবিত্র আত্মাগণ কৃপা করে সত্যনারায়ণ (অবিনাশী প্রভু/সতপুরুষ) দ্বারা রচিত এই সৃষ্টি রচনার বাস্তবিক/আসল জ্ঞান পড়ুন।

**১.পূর্ণব্রহ্ম:-** এই সৃষ্টি রচনায় সতপুরুষ-সতলোকের স্বামী (প্রভু), অলখ পুরুষ-অলখ লোকের স্বামী (প্রভু), অগম পুরুষ, অগম – লোকের স্বামী (প্রভু) এবং অনামী পুরুষ – অনামী লোকের স্বামী (প্রভু) তো ঐ একই পূর্ণ ব্রহ্ম, যিনি বাস্তবে অবিনাশী প্রভু, যিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে নিজের চার লোকে থাকেন। ওনার অন্তর্গত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে।

**২.পরব্রহ্ম:-** তিনি কেবল সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী (প্রভু) ওনাকে অক্ষর পুরুষও বলা হয়। কিন্তু ইনি এবং এনার অন্তর্গত ব্রহ্মাণ্ড গুলি বাস্তবে অবিনাশী নয়।

**৩.ব্রহ্ম:-** ইনি কেবল ২১ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী (প্রভু) এনাকে ক্ষর পুরুষ, জ্যোতি নিরঞ্জন কাল ইত্যাদি নামে জানা যায়। ইনি এবং এনার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ শীল। উপরোক্ত তিন পুরুষদের (প্রভুদের) প্রমাণ পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার অধ্যায় নং এর ১৫ শ্লোক নং ১৬-১৭ তেও আছে।)

**৪. ব্রহ্মা:-** ব্রহ্মা এই ব্রহ্মের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বিষ্ণু মধ্যম পুত্র এবং শিব কনিষ্ঠ/তৃতীয় পুত্র। ব্রহ্মার এই তিন পুত্রগণ কেবল একটি ব্রহ্মাণ্ডের এক এক বিভাগের স্বামী (প্রভু) এবং এনারা নাশবান।

বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য কৃপা করে নিম্নলিখিত সৃষ্টি রচনা পড়ুন:-

{কবীর্দেব (কবীর পরমেশ্বর) সূক্ষ্ম বেদে অর্থাৎ কবীর্বাণীতে নিজের দ্বারা রচিত সৃষ্টির জ্ঞান স্বয়ংই বলেছেন। যা হলো নিম্নরূপ}

সর্বপ্রথম কেবল একটাই স্থান 'অনামী' (অনাময়) লোক ছিল। যাকে অকহ লোকও বলা হয়ে থাকে, পূর্ণ পরমাত্মা, ঐ অনামী লোকে একা থাকতেন। ঐ পরমাত্মার বাস্তবিক নাম কবীর্দেব অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বর। সমস্ত আত্মারা ঐ পূর্ণ ধনীর শরীরে সমাহিত হয়ে ছিল। এই কবীর্দেবের উপমাত্মক (পদাধিকার জনিত) নাম অনামি পুরুষ (পুরুষের অর্থ হলো প্রভু, প্রভু মানুষকে নিজের স্বরূপে বানিয়েছেন, এই জন্য মানবের নামও পুরুষ হয়েছে।) অনামি পুরুষের এক লোমকূপের প্রকাশ শঙ্খ সূর্যের প্রকাশ থেকেও অধিক।

**বিশেষ কথা:-** যেমন কোন দেশের আদরণীয় প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব নাম তো কিছু অন্যই হয় কিন্তু পদজনিত উপমাত্মক নাম প্রধানমন্ত্রী হয়। অনেক সময় প্রধানমন্ত্রী নিজের অধীনেই বিভিন্ন বিভাগ রাখেন। তখন যে বিভাগের কাগজপত্রে হস্তাক্ষর করেন, ঐ সময় ঐ পদ এর নাম লেখেন। যেমন গৃহ মন্ত্রকের কাগজপত্রে হস্তাক্ষর করার সময় নিজেকে গৃহমন্ত্রী হিসেবে লেখেন। ওখানে ঐ ব্যক্তির হস্তাক্ষরের শক্তি কম। এইভাবেই কবীর পরমেশ্বরের (কবীর্দেবের) জ্যোতি বিভিন্ন লোকে আলাদা আলাদা হয়ে যায়।

# পরমেশ্বর কবীর সাহেবের অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের লঘু চিত্র

অনামী লোকঃ- এই লোকে কবীর সাহেব অনামী পুরুষ রূপে আছেন। এখানে একাকি থাকেন।

অগম লোকঃ- এই লোকেও কবীর সাহেব অগম পুরুষ রূপে থাকে।

অলখ লোকঃ- এই লোকেও কবীর সাহেব অলখ পুরুষ রূপে থাকে।
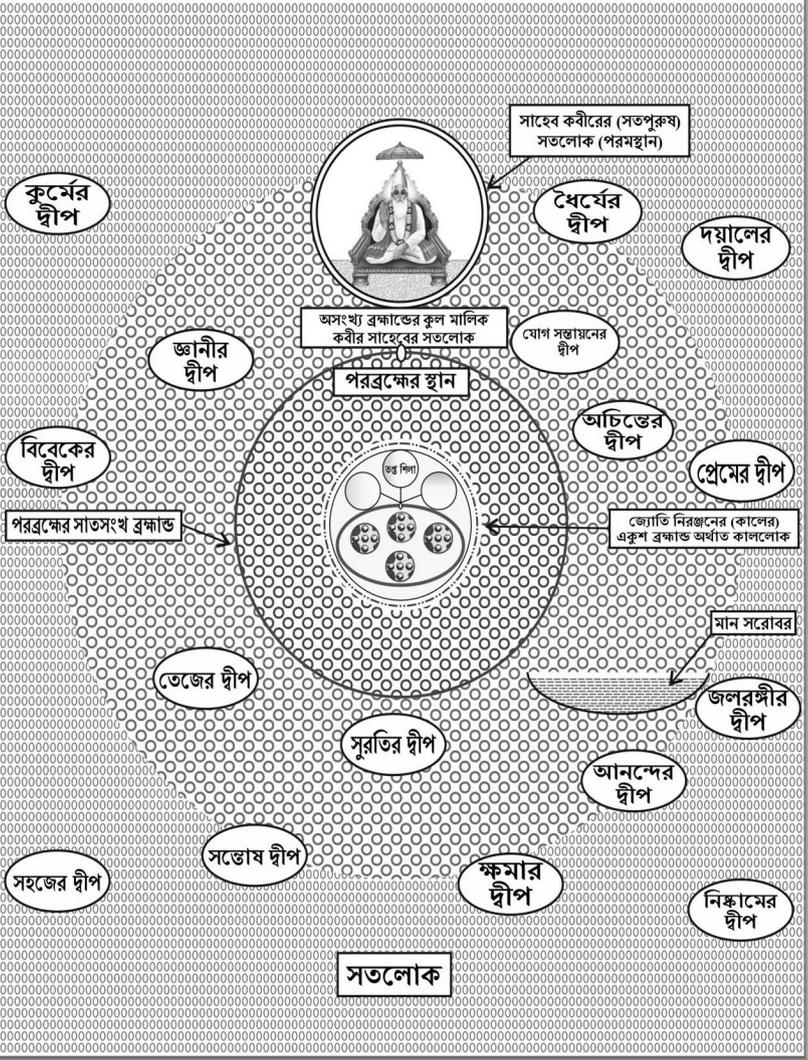
পূর্ণ পরমাত্মা কবীর্দেব (কবীর পরমেশ্বর) এইভাবেই নিচের আরো তিন লোক (অগম লোক, অলখ লোক, সতলোক) শব্দ (বচন) দিয়ে রচনা করেছেন। এই পূর্ণ পরমাত্মা কবীর্দেব-ই (কবীর পরমেশ্বর) অগম লোকে প্রকট হয়েছেন এবং পূর্ণ পরমাত্মা কবীর্দেব (কবীর পরমেশ্বর) অগম লোকেরও স্বামী এবং ওখানে এনার উপমাত্মক (পদ জনিত নাম) নাম অগমপুরুষ অর্থাৎ অগম প্রভু। এই অগম প্রভুর মানব সদৃশ্য শরীর ভীষণ তেজোময়, যাঁর এক লোমকূপের প্রকাশ বর্বুদ সূর্যের রশ্মির থেকেও বেশি।

এই পূর্ণ পরমাত্মা কবীর্দেব (কবীর দেব = কবীর পরমেশ্বর) অলখ লোকেও প্রকট হয়েছেন এবং স্বয়ং এই অলখ লোকেরও স্বামী এবং পদ জনিত উপমাত্মক নাম অলখ পুরুষও এই পরমেশ্বরই আর এই পূর্ণ প্রভুর মানব সদৃশ্য শরীর তেজময় (স্বর্জ্যোতি) ও স্বপ্রকাশিত। ওনার এক লোমকূপের প্রকাশ অর্বুদ সূর্যের প্রকাশের থেকেও অধিক।

এই পূর্ণ প্রভু সতলোকেও প্রকট হয়েছেন, সতলোকেরও অধিপতি তিনি। এই জন্য ওনার পদজনিত উপমাত্মক নাম অবিনাশী প্রভু)। এনারই নাম অকাল মূর্তি – শব্দ স্বরূপী রাম – পূর্ণ ব্রহ্ম – পরম অক্ষর ব্রহ্ম ইত্যাদি। এই সতপুরুষ কবীর্দেব (কবীর প্রভু) এর মানব সদৃশ্য শরীর তেজোময়। যার এক লোম কূপের প্রকাশ কোটি সূর্য কোটি চন্দ্রমার মিলিত প্রকাশের থেকেও অধিক।

এই কবীর দেব (কবীর প্রভু) সতপুরুষ রূপে প্রকট হয়ে, সতলোকে বিরাজমান হয়ে, প্রথমে সতলোকে অন্যান্য রচনা করেন।

একটি শব্দ (বচন) দ্বারা ষোলোটি দ্বীপ রচনা করেন। তারপর ১৬ টি শব্দ দ্বারা ১৬ টি পুত্র উৎপন্ন করেন। একটি মানসরোবর রচনা করেন যা অমৃতে ভরা। ১৬ জন পুত্রের নাম হল:- ১."কূর্ম" ২. "জ্ঞানী" ৩."বিবেক" ৪."তেজ" ৫."সহজ" ৬."সন্তোষ" ৭."সুরতি" ৮."আনন্দ" ৯."ক্ষমা" ১০."নিষ্কাম" ১১."জলরঙ্গী" ১২."অচিন্ত" ১৩."প্রেম" ১৪."দয়াল" ১৫."ধৈর্য" ১৬. "যোগ সন্তায়ন" অর্থাৎ "যোগজীত"।

সতপুরুষ কবীরদেব নিজের পুত্র অচিন্তকে সত্যলোকের অন্যান্য রচনার ভার দিয়েছিলেন এবং শক্তি প্রদান করেছিলেন। অচিন্ত অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) কে শব্দ দ্বারা উৎপন্ন করেন এবং বলেন যে আমাকে সাহায্য করো। অক্ষর পুরুষ স্নান করার জন্য মান সরোবরে গিয়েছিল, ওখানে ভীষণ আনন্দ পায় আর শুয়ে ঘুমিয়ে যায়। অনেক দিন পর্যন্ত বাইরে আসে না। তখন অচিন্তর প্রার্থনা শুনে অক্ষর পুরুষ কে নিদ্রা থেকে জাগানোর জন্য কবীর্দেব (কবীর পরমেশ্বর) ঐ মানসরোবরের কিছু অমৃত জল নিয়ে একটি অণ্ড বানান এবং ঐ অন্ডের মধ্যে একটি আত্মাকে প্রবেশ করিয়ে দেন। আর ঐ অন্ডকে মানসরোবরের অমৃত জলে ছেড়ে দেন। অন্ডের গড়গড় আওয়াজ শুনে অক্ষর পুরুষের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। তিনি ক্রোধে অন্ডটির দিকে তাকান, যার কারণে অন্ডটি দুভাগ হয়ে যায়। তার মধ্যে থেকে জ্যোতি নিরঞ্জন ক্ষর পুরুষ বেরিয়ে আসে, যাকে পরের দিকে 'কাল' বলা হয়েছে। এনার আসল নাম 'কৈল'। তখন সতপুরুষ (কবীর্দেব) আকাশবাণী করলেন যে, তোমরা দুজন বাইরে এসো এবং অচিন্তর দ্বীপে গিয়ে থাকো। আদেশ পেয়ে অক্ষর পুরুষ এবং ক্ষর পুরুষ (কৈল) দুজনে অচিন্তর দ্বীপে থাকতে শুরু করলো। (বাচ্চাদেরকে তাদের নাবালকত্ব দেখালেন যে, পরে যেন তাদের প্রভুত্ব করার ইচ্ছা না জাগে, কেননা সামর্থ্য ছাড়া কোন কাজ সফল হয় না।) তারপর পূর্ণ ধনী কবির্দেব সমস্ত রচনা স্বয়ং করলেন। নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা এক

রাজেশ্বরী (রাষ্ট্রী) শক্তি উৎপন্ন করলেন। যার মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে স্থাপিত করলেন। একেই পরাশক্তি পরা নন্দিনী ও বলা হয়।

পূর্ণ ব্রহ্ম সমস্ত আত্মাদের নিজের মধ্যে থেকে নিজের বচন শক্তি দ্বারা, নিজের মতো মানব সদৃশ্য শরীরে উৎপন্ন করলেন। প্রত্যেক হংস আত্মার শরীর পরমাত্মার মতো করেই রচনা করলেন, যার প্রকাশ ষোল সূর্যের সমান মানব সদৃশ্যই। কিন্তু পরমেশ্বরের শরীরের এক লোমকূপের প্রকাশ কোটি সূর্যের থেকেও অধিক। অতি দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরে ক্ষর পুরুষ (জ্যোতি নিরঞ্জন) ভাবলেন যে, আমরা তিনজন (অচিন্ত – অক্ষর পুরুষ – ক্ষর পুরুষ) একটা দ্বীপে থাকছি। আর অন্যরা এক একটা দ্বীপে থাকছে। আমিও সাধনা করে আলাদা দ্বীপ প্রাপ্ত করবো। এইরকম ভাবনা চিন্তা করে তিনি এক পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সত্তর (৭০) যুগ পর্যন্ত তপস্যা করলেন।

## "আত্মারা কালের জালে কিভাবে ফেঁসে গেল?"

**বিশেষ কথা :-** যখন ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) তপস্যা করছিল, তখন আমরা সব আত্মারা যারা আজ জ্যোতি নিরঞ্জনের ২১ ব্রহ্মাণ্ডে থাকি, তার সাধনার প্রতি আসক্ত হয়ে গিয়েছিলাম এবং হৃদয় থেকে তাকে চাইতে শুরু করেছিলাম। নিজের সুখদায়ী প্রভু সত্য পুরুষের প্রতি বিমুখ হয়ে গেলাম। প্রতিব্রতা পদ থেকে আমরা পতিত হয়ে গেলাম। পূর্ণ প্রভু বার বার সাবধান করা সত্বেও ক্ষর পুরুষের প্রতি আমাদের আসক্তি দূর হলো না।

**{এই প্রভাব আজও কাল সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন তরুণ তরুণীরা ফিল্মস্টারদের (অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের) ছলনাময় চেহারা দেখে আর ওদের রোজগারের উদ্দেশ্যে করা অভিনয়ে অত্যন্ত আসক্ত হয়ে যায়। থামালেও থামে না। যদি কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী নিকটবর্তী কোনো শহরে আসে, তো দেখবেন এই নির্বোধ ছেলেমেয়েরা ভিড় করে কেবল তাদের দর্শনের জন্য, প্রচুর সংখ্যায় জড়ো হয়ে যাবে। কোনো লাভ হয় না, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নিজেদের রোজগার করছে আর তরুণ তরুণীদের পকেট খালি হচ্ছে। মা-বাবা যতই বোঝাক কিন্তু তরুণ তরুণীরা মানে না। কোথাও না কোথাও, কখনো না কখনো লুকিয়ে-চুরিয়ে চলে যাবেই।}**

পূর্ণ ব্রহ্ম কবির্দেব (কবীর প্রভু) ক্ষর পুরুষ কে জিজ্ঞাসা করলেন, বলো তুমি কি চাও? তিনি বললেন যে, পিতাজী এই স্থান আমার জন্য ছোট, আমাকে কৃপা করে আলাদা দ্বীপ প্রদান করুন। হক্কা কবীর (সত্ কবীর) তাকে ২১ টি ব্রহ্মাণ্ড প্রদান করে দিলেন। কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর জ্যোতি নিরঞ্জন ভাবলেন, এর মধ্যে কিছু রচনা করা দরকার। খালি ব্রহ্মাণ্ড (প্লট) কি কাজে লাগবে। এইরকম চিন্তাভাবনা করে সত্তর (৭০) যুগ তপস্যা করে পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেবের (কবীর প্রভু) কাছ থেকে রচনা সামগ্রী চাইলেন। সতপুরুষ তাকে তিনগুণ এবং পাঁচ তত্ত্ব প্রদান করলেন। সেগুলি দিয়ে ব্রহ্ম (জ্যোতি নিরঞ্জন) নিজের ব্রহ্মাণ্ডে কিছু রচনা করলেন। তারপর আবার ভাবলেন যে এর মধ্যে জীব থাকা দরকার, একা একা ভাল লাগে না। এই কথা ভেবে ৬৪ যুগ পর্যন্ত আবার তপস্যা করলেন। পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব জিজ্ঞাসা করায় বললেন যে আমাকে কিছু আত্মা দিয়ে দিন। আমার একা একা ভালো লাগছে না। তখন সতপুরুষ কবিরগ্নি (কবীর পরমেশ্বর) বললেন যে, ব্রহ্ম তোর তপস্যার প্রতিফল স্বরূপ তোকে আরও ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমার আত্মাদেরকে কোনো জপ-তপ-সাধনার ফলস্বরূপ দিতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ স্বেচ্ছায় তোর সাথে যেতে চায় তাহলে সে যেতে পারে। যুবা কবীর (সমর্থ কবীর) এর বচন শুনে

জ্যোতি নিরঞ্জন আমাদের কাছে এলো। আমরা সমস্ত হংস আত্মারা আগে থেকেই তার উপরে আসক্ত ছিলাম। আমরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে দাঁড়িয়ে গেলাম। জ্যোতি নিরঞ্জন বললেন যে, আমি পিতাজীর কাছ থেকে আলাদা ২১ টা ব্রহ্মাণ্ড প্রাপ্ত করেছি, সেখানে নানা প্রকারের রমনীয় স্থান বানিয়েছি। তোমরা কি আমার সাথে যাবে? আমরা সমস্ত হংস আত্মারা যারা আজ এই ২১ ব্রহ্মাণ্ডে দুঃখ কষ্টে হয়রান হয়ে আছি বললাম যে, আমরা তৈরি আছি এখন যদি পিতাজী আজ্ঞা দেন, তখন ক্ষরপুরুষ, পূর্ণ ব্রহ্ম মহান কবির (সমর্থ কবীর প্রভু)-র কাছে গেলেন এবং সমস্ত কথা জানালেন। তারপর কবিরগ্নি (কবীর পরমেশ্বর) বললেন যে, আমার সামনে স্বীকৃতি দেবে যারা তাদের আজ্ঞা দেব। ক্ষরপুরুষ এবং পরম অক্ষর ব্রহ্ম (কবিরমিতৌজা = কবির অমিত ঔজা অর্থাৎ যার শক্তি অসীম, উনিই কবীর) দুজনে আমদের/সমস্ত হংসাত্মাদের কাছে এলেন। সত কবির্দেব বললেন যে, যে হংস আত্মারা ব্রহ্মের সাথে যেতে চাও, তারা হাত তুলে স্বীকৃতি দাও। আপন পিতার সামনে কারোর হিম্মত হলো না, কেউ স্বীকৃতি দিল না। অনেক সময় পর্যন্ত নীরবতা ছেয়ে রইলো।

তারপর একটি হংস আত্মার সাহস হলো আর বললো যে, পিতাজী! আমি যেতে চাই। তখন তার দেখাদেখি (আজ যারা কাল ব্রহ্মের একুশ ব্রহ্মাণ্ডে ফেঁসে আছি) আমরা সমস্ত আত্মারা স্বীকৃতি দিয়ে দিলাম। পরমেশ্বর কবীর জ্যোতি নিরঞ্জন কে বললেন যে তুমি তোমার জায়গায় চলে যাও। যারা তোমার সাথে যাওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছে সেই সমস্ত আত্মাদেরকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো। জ্যোতি নিরঞ্জন নিজের একুশ ব্রহ্মাণ্ডে ফিরে গেল। ঐ সময় পর্যন্ত এই একুশ ব্রহ্মাণ্ড সতলোকেই ছিল।

তারপর পূর্ণব্রহ্ম সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেওয়া হংস কে মেয়ের রূপ দিলেন, কিন্তু স্ত্রী ইন্দ্রিয় রচনা করেননি। এবং সমস্ত আত্মাদেরকে যারা জ্যোতি নিরঞ্জন (ব্রহ্ম) এর সাথে যেতে সহমত প্রকাশ করেছিল তাদের সকলকে ঐ মেয়ের শরীরে প্রবিষ্ট করে দিলেন, এবং তার নাম আষ্ট্রা (আদি মায়া/প্রকৃতি দেবী/দুর্গা) হলো। আর সত্যপুরুষ বললেন যে পুত্রী আমি তোমাকে শব্দ শক্তি প্রদান করে দিয়েছি। যত জীব ব্রহ্ম বলবে, তুমি উৎপন্ন করে দেবে। পূর্ণব্রহ্ম কবির্দেব (কবীর সাহেব) নিজের পুত্র সহজ দাসের দ্বারা প্রকৃতিকে ক্ষর পুরুষের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সহজ দাস, জ্যোতি নিরঞ্জনকে গিয়ে বললেন যে, পিতাজী এই বোনের শরীরের মধ্যে ঐ সমস্ত আত্মাদের প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন, যারা তোমার সাথে যাওয়ার জন্য সহমত প্রকাশ করেছিল। আর এই বোনকে পিতাজী বচন শক্তি প্রদান করেছেন, যতগুলি জীব তুমি চাইবে, প্রকৃতি নিজের শব্দ দ্বারা উৎপন্ন করে দেবে। এই কথা বলে সহজ দাস নিজের দ্বীপে ফিরে গেল।

যুবতী হওয়ার কারণে, মেয়েটির রং-রূপের জৌলুষ ফুটে উঠেছিল, মেয়েটির রূপে মোহিত হয়ে ব্রহ্মের মনে কামনা-বাসনা জেগে ওঠে। আর প্রকৃতি দেবীর সাথে অভদ্র গতিবিধি শুরু করে দেয়। তখন দুর্গা বললেন যে, জ্যোতি নিরঞ্জন! আমার কাছে পিতাজীর প্রদান করা শব্দ শক্তি আছে তুমি যত প্রাণী চাইবে আমি বচন দিয়ে উৎপন্ন করে দেবো। তুমি মৈথুন পরম্পরা শুরু করো না। তুমিও ঐ একই পিতার শব্দ শক্তি দ্বারা অন্ড থেকে উৎপন্ন হয়েছো আর আমিও ঐ পরম পিতার বচন দ্বারা পরে উৎপন্ন হয়েছি। তুমি আমার বড় ভাই হও, ভাই-বোনের মধ্যে এরকম সংযোগ মহাপাপের কারণ হবে।

কিন্তু জ্যোতি নিরঞ্জন প্রকৃতি দেবীর একটা প্রার্থনাও শুনলো না আর নিজের শব্দ শক্তিতে নখ দিয়ে প্রকৃতি দেবীর স্ত্রী-অঙ্গ (ভগ-যোনী) বানিয়ে দিল এবং বলাৎকার করার চেষ্টা করলো। সেই সময় দুর্গা নিজের ইজ্জত রক্ষার করার আর কোন

ব্রহ্ম লোকের লঘু চিত্র
শূন্য স্থান
পরমেশ্বরের রাজদূত ভবন
মহাবিষ্ণু রূপী কাল (ব্রহ্ম)
জটাকুন্ডলীর ঝীল
মহাশীব রূপে কাল
মহাব্রহ্মা রূপে কাল
গুন প্রধান স্থান
তমোগুন প্রধান স্থান
রজগুন প্রধান স্থান
ব্রহ্মলোক
সপ্তপুরী
দূর্গা লোক
নকল অনামি লোক
নকল অগম লোক
নকল অলখ লোক
নকল সতলোক
মহা ইন্দ্রের দ্বীপ
মিষ্টি জলের সমুদ্র
ধর্মরাজের লোক
মান সরোবর
সুমেরু পর্বত
স্বর্গ
নরক
ফলযুক্ত বন
জটাকুণ্ডলী ঝীল
বিষ্ণুলোক
শিবলোক
সূর্য
ব্রহ্মালোক
পৃথিবী
চন্দ্রমা
ইন্দ্রের লোক
মহাতল
বিতল
অতল
সুতল
রসাতল
তলাতল
পাতাল লোক

উপায় না দেখে সুক্ষ্ম রূপ বানালো আর জ্যোতি নিরঞ্জনের খোলা মুখ দিয়ে পেটের মধ্যে প্রবেশ করে, পূর্ণব্রহ্ম কবীর দেব কে নিজের রক্ষার্থে প্রার্থনা করতে লাগলো।

সেই সময় কবির্দেব নিজের পুত্র যোগ সন্তায়ন অর্থাৎ জোগজীতের রূপ বানিয়ে ওখানে প্রকট হলেন এবং কন্যাকে ব্রহ্মের উদর থেকে বাইরে নিয়ে এলেন আর বললেন যে, জ্যোতি নিরঞ্জন আজ থেকে তোর নাম 'কাল' হবে। তোর জন্ম মৃত্যু হতে থাকবে। এই জন্য তোর নাম ক্ষর পুরুষ হবে এবং ১ লক্ষ মানব শরীর ধারী প্রাণীকে প্রতিদিন আহার করবি আর সওয়া লক্ষ উৎপন্ন করবি। তোমাদের দুজনকে একুশ ব্রহ্মাণ্ড সমেত এখান থেকে নিষ্কাশীত করা হলো। এই কথা বলতেই ২১ টি ব্রহ্মাণ্ড বিমানের মত চলতে শুরু করল। সহজ দাসের দ্বীপের পাশ দিয়ে সতলোক থেকে ষোল শঙ্খ ক্রোশ (এক ক্রোশ প্রায় তিন কিমি হয়) দূরে গিয়ে থেমে গেল।

**বিশেষ বিবরণ:**- এখনো পর্যন্ত তিনটি শক্তির বর্ণনা এসেছে।

১.পূর্ণব্রহ্ম, যাকে অন্য উপমাত্মক নামেও জানা যায়। যেমন সতপুরুষ, অকালপুরুষ, শব্দ স্বরূপী রাম, পরম অক্ষম পুরুষ, ইত্যাদি। এই পূর্ণ ব্রহ্ম অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী এবং বাস্তবে/আসলে অবিনাশী।

২.পরব্রহ্ম, যাকে অক্ষর পুরুষও বলা হয়, তিনি বাস্তবে অবিনাশী নন। ইনি সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের মালিক।

৩. ব্রহ্ম, যাকে জ্যোতি নিরঞ্জন, কাল, কৈল ক্ষরপুরুষ এবং ধর্মরায় ইত্যাদি নামে জানা যায়। যিনি কেবল একুশ ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। এরপর এই ব্রহ্মের সৃষ্টির এক ব্রহ্মাণ্ডের পরিচয় দেওয়া হবে যার মধ্যে আরো তিনটি নাম আপনারা পড়তে গিয়ে পাবেন - ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং শিব।

**ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মার মধ্যে পার্থক্য:**- একটি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোপরি স্থানে ব্রহ্ম/ক্ষর-পুরুষ স্বয়ং তিনটি গুপ্ত স্থানের রচনা করে ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং শিব রূপে থাকেন আর নিজের পত্নী প্রকৃতি/দুর্গার সহযোগে তিনটি পুত্র উৎপন্ন করেন। তাদের নামও ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং শিব রাখেন। ব্রহ্মের পুত্র ব্রহ্মা যিনি, তিনি এক ব্রহ্মাণ্ডের কেবল ৩ লোকের (পৃথিবী লোক স্বর্গলোক এবং পাতাল লোকের) একটি রজোগুণ বিভাগের মন্ত্রী/স্বামী/প্রভু। এনাকে ত্রিলোকীয় ব্রহ্মা বলা হয় আর ব্রহ্ম, যিনি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা রূপে থাকেন তাকে মহাব্রহ্মা বা ব্রহ্মলোকীয় ব্রহ্মা বলা হয়। এই ব্রহ্ম (কাল)-কে সদাশিব, মহাশিব, মহাবিষ্ণুও বলা হয়েছে।

**শ্রী বিষ্ণু পুরাণের মধ্যে প্রমাণ:**- চতুর্থ অংশ অধ্যায় নম্বর একের পৃষ্ঠা নম্বর ২৩০-২৩১ এ শ্রী ব্রহ্মা বলছেন, যে অজন্মা, সর্বময় বিধাতা পরমেশ্বর এর আদি মধ্য অন্তর স্বরূপ স্বভাব আর সার আমি জানতে পারি না (শ্লোক ৮৩)।
যিনি আমার রূপ ধারণ করে সংসারের রচনা করেন, স্থিতির সময়, যে পুরুষ রূপে থাকেন এবং যিনি রুদ্র রূপে বিশ্বকে গ্রাস করেন, অনন্ত রূপ দ্বারা সম্পূর্ণ জগতকে ধারণ করেন (শ্লোক ৮৬)।

## "শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু এবং শ্রী শিবের উৎপত্তি কথা"

কাল (ব্রহ্ম) প্রকৃতিকে (দুর্গা) বললেন, এখন আর আমাকে কে কি করতে পারবে? মনের ইচ্ছামতো কাজ করব। প্রকৃতি পুনরায় প্রার্থনা করলেন যে, একটু তো লজ্জা শরম রাখো। প্রথমতঃ তুমি আমার বড় ভাই হও, কেননা তুমিও ঐ একই পিতার শব্দ শক্তি দ্বারা অন্ড থেকে উৎপন্ন হয়েছো, আর আমিও ঐ পরম পিতার বচন দ্বারা পরে উৎপন্ন হয়েছি। দ্বিতীয়তঃ তোমার পেট থেকে বাইরে এসেছি, তাহলে

আমি তোমার মেয়ে হলাম আর তুমি আমার পিতা হলে। এই পবিত্র সম্পর্ককে নষ্ট করা মহাপাপ হবে। আমার কাছে পিতার প্রদান করা শব্দ শক্তি রয়েছে। যতগুলি প্রাণী তুমি বলবে আমি বচন দ্বারা উৎপন্ন করে দেবো। জ্যোতি নিরঞ্জন দুর্গার একটাও অনুনয়-বিনয় শুনল না এবং বলল যে আমার যা সাজা পাওয়ার ছিল, তা পেয়ে গেছি। আমাকে সতলোক থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, এবার যা মন চায় তাই করবো। এই কথা বলে কালপুরুষ ক্ষরপুরুষ প্রকৃতির সাথে জোর জবরদস্তি বিবাহ করলেন এবং তিন পুত্রকে (রজোগুণ যুক্ত – ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ যুক্ত – বিষ্ণু এবং তমোগুণ যুক্ত – শিব শংকর) উৎপন্ন করলেন। যুবক না হওয়া পর্যন্ত তিন পুত্রকে দুর্গার দ্বারা অচেতন করে রেখে দেয়। তারপর যুবাবস্থায় এলে শ্রী ব্রহ্মাকে কমল ফুলের উপরে, শ্রীবিষ্ণুকে শীষনাগের শয্যায়, এবং শ্রী শিবকে কৈলাস পর্বতের উপর সচেতন ক'রে, তারপর সবাইকে একত্রিত করে দেন। এরপর প্রকৃতি দ্বারা তিন গুণের বিবাহ করিয়ে দেন এবং একটি ব্রহ্মাণ্ডের তিনটি লোক (স্বর্গলোক এবং পাতার লোক) এর এক একটি বিভাগের মন্ত্রী/প্রভু/স্বামী নিযুক্ত করে দেন। যেমন শ্রী ব্রহ্মাকে রজোগুণ বিভাগে এবং শ্রীবিষ্ণুকে সত্ত্বোগুণ বিভাগে এবং শ্রী শিব শংকরকে তমোগুণ বিভাগের আর স্বয়ং নিজে গুপ্ত রূপে ( মহাব্রহ্মা, মহাবিষ্ণু ও মহাশিব রূপে) একটা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটা ব্রহ্মালোক রচনা করেছে। তার মধ্যে তিনটে গুপ্তস্থান বানিয়ে রেখেছেন

একটি রজোগুণ প্রধান স্থান আছে যেখানে ব্রহ্ম (কাল) স্বয়ং মহা ব্রহ্মা (মুখ্যমন্ত্রী) রূপে থাকেন এবং নিজের পত্নী দুর্গাকে মহা সাবিত্রী রূপে রাখেন। এই দুজনের সংযোগে যে পুত্র এই স্থানে উৎপন্ন হয় তিনি স্বাভাবিকভাবেই রজোগুণী হয়ে যান।

দ্বিতীয় স্থান সত্ত্বগুণ প্রধান বানিয়েছেন ওখানে এই ক্ষর পুরুষ মহাবিষ্ণু রূপ বানিয়ে থাকেন এবং নিজের পত্নী দুর্গাকে মহালক্ষ্মী রূপে রেখে যে পুত্র উৎপন্ন করেন তার নাম বিষ্ণু রাখেন। এবং তৃতীয়তঃ এই কাল ওখানে একটি তমোগুন প্রধান ক্ষেত্র বানিয়ে রেখেছেন। ওখানে ইনি স্বয়ং সদাশিব রূপ বানিয়ে থাকেন এবং নিজের পত্নী দুর্গাকে মহা পার্বতী রূপে রাখেন। এই দুজনের পতি পত্নী ব্যবহারে যে পুত্র উৎপন্ন হয় তার নাম শিব রেখে দেন এবং তমোগুন যুক্ত করে দেন। (প্রমাণের জন্য দেখুন পবিত্র শিব মহাপুরাণ, বিদ্ধেশ্বর সংহিতা পৃষ্ঠা ২৪-২৬, যেখানে ব্রহ্মা , বিষ্ণু, শিব, রুদ্র এবং মহেশ্বর এর থেকে অন্য কেউ সদাশিব রয়েছেন। রুদ্র সংহিতা অধ্যায় ৬,৭, ৯ এর পৃষ্ঠা নম্বর ১০০ থেকে ১০৫ এবং ১১০ এ, অনুবাদ কারক হনুমান প্রসাদ পোদ্দার গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত এবং পবিত্র শ্রীমদদেবী মহাপুরাণ তৃতীয় স্কন্দ পৃষ্ঠা নম্বর ১১৪ থেকে ১২৩ পর্যন্ত, গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত, যার অনুবাদক হলেন শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার চিমন লাল গোস্বামী।) তারপর এনাদেরকে ধোঁকার মধ্যে রেখে নিজের খাওয়ার জন্য জীবদের উৎপত্তি ব্রহ্মার দ্বারা এবং স্থিতি (একে অপরের প্রতি মায়া-মমতার বন্ধন রেখে কালের জালে ফাঁসিয়ে রাখা) বিষ্ণুর দ্বারা এবং সংহার (কেননা কাল পুরুষ কে অভিশাপবশত: এক লক্ষ মানব শরীর ধারী প্রাণীদের সুক্ষ্ম শরীর থেকে নোংরা বের করে খেতে হয়। তার জন্য ২১তম ব্রহ্মাণ্ডে একটি তপ্ত শিলা রাখা আছে যেটা সততই গরম থাকে, সেখানে উত্তপ্ত করে নোংরা গলিয়ে আহার করেন, জীবাত্মা মরে না কিন্তু অসহ্য কষ্ট পায়। তারপর প্রাণীদেরকে তাদের কর্মের আধারে অন্য শরীর প্রদান করেন) শিবের দ্বারা করান। যেমন কোন ঘরে তিনটি কক্ষ আছে। এক কক্ষে অশ্লীল চিত্র লাগানো আছে। ঐ কক্ষে যেতেই মনে মলিন বিচার চলে আসে। দ্বিতীয় কক্ষে সাধু-সন্ত-ভক্তদের চিত্র লাগানো আছে, ওখানে যেতেই মনে ভালো বিচার এবং প্রভুর প্রতি চিন্তা আসে। তৃতীয় কক্ষে দেশ

ভক্ত শহীদদের চিত্র লাগানো আছে, ওখানে গেলে মনে বিদ্রোহীভাব বা জোশ ভাব উৎপন্ন হয়। সেইরূপ ব্রহ্ম (কাল) নিজের চিন্তা ভাবনা (বিচার-বুদ্ধি) দিয়ে তিন গুণের তিনটি বিশেষ স্থানের রচনা করেন।

## "তিন গুণ কি? প্রমাণ সহিত"

"তিন গুণ - রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, তমোগুণ শিব । এই তিন গুণ ব্রহ্ম (কাল) তথা প্রকৃতি (দূর্গা) থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং তিন জনই নশ্বর"

**প্রমাণ:-** গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত শ্রী শিব মহাপুরাণ যার সম্পাদক শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার পৃষ্ঠা ২৪ থেকে ২৬ বিধ্যেশ্বর সংহিতা পৃষ্ঠা ১১০ অধ্যায় ৯ রুদ্র সংহিতা" ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং শিব এই তিন দেবতাদের মধ্যে গুণ আছে। কিন্তু সদা শিব (ব্রহ্ম-কাল) কে গুণাতীত বলা হয়েছে।

**দ্বিতীয় প্রমাণ** :- গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত শ্রীমদ দেবী ভাগবত্ পুরাণ যার সম্পাদক শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার চিমন লাল গোস্বামী, তৃতীয় স্কন্দ, অধ্যায় ৫ পৃষ্ঠা ১২৩ :- ভগবান বিষ্ণু দূর্গার স্তুতি করে বলছেন - আমি (বিষ্ণু) ব্রহ্মা এবং শঙ্কর তোমার কৃপায় বিদ্যমান আছি। আমাদের আবির্ভাব (জন্ম) ও তিরোভাব (মৃত্যু) হতে থাকে। আমরা নিত্য (অবিনাশী) নই। তুমিই নিত্য (অবিনাশী), জগৎ জননী, প্রকৃতি ও সনাতনী দেবী।

ভগবান শঙ্কর বললেন, যদি ভগবান ব্রহ্মা ও ভগবান বিষ্ণু তোমার থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহলে তার পরে উৎপন্ন হওয়া আমি তমোগুণী লীলা করা শঙ্কর কি তোমার সন্তান নই? অর্থাৎ তুমিই আমাকে উৎপন্ন করেছো। এই সংসারের সৃষ্টি স্থিতি-সংহারে তোমার গুণ সর্বত্র বিদ্যমান। এই তিন গুণে উৎপন্ন আমরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকর সর্বদা নিয়মানুসারে কর্মে তৎপর থাকি।

❖ উপরোক্ত এই বিবরণ একমাত্র হিন্দীতে অনুবাদিত শ্রীদেবী মহাপুরাণে বিদ্যমান আছে। এখানে কিছু তথ্য লুকানো হয়েছে। সেই জন্য আপনারা প্রমাণ দেখুন শ্রীমদদেবী ভাগবত মহাপুরাণ সভাষটিকম্ সমহাত্যম্, খেমরাজ শ্রী কৃষ্ণদাস প্রকাশিত মুম্বাই, এতে সংস্কৃত সহ হিন্দী অনুবাদ আছে। তৃতীয় স্কন্দ অধ্যায় ৪ পৃষ্ঠা ১০ শ্লোক৪২:-

**ব্রহ্মা - অহম্ ঈশ্বরঃ ফিল তে প্রভাবাত্সর্বে বয়ং জনি যুতা ন যদা তু নিত্যাঃ কে অন্যে**
**সুরাঃ শতমখ প্রমুখাঃ চ নিত্যা নিত্যা ত্বমেব জননী প্রকৃতিঃ পুরাণা। (৪২)**

**হিন্দী থেকে বাংলা অনুবাদ:-** হে মাতা! ব্রহ্মা, আমি এবং শিব তোমার প্রভাবে (শক্তিতে বা দয়ায়) জন্ম নিয়েছি। আমরা নিত্য নই অর্থাৎ আমরা অবিনাশী নই। তাহলে অন্য দেবী দেবতা ইন্দ্রাদি কিভাবে নিত্য (অবিনাশী) হতে পারে? তুমিই অবিনাশী প্রকৃতি তথা সনাতনী দেবী।

পৃষ্ঠা ১১ - ১২, অধ্যায় ৫, শ্লোক ৮ :-

**যদি দয়ার্দ্রমনা ন সদাংৎবিকে কথমহং বিহিতঃ চ তমোগুণঃ কমলজশ্চ**
**রজোগুণসম্ভবঃ সুবিহিতঃ কিমু সত্ত্বগুণোঁ হরিঃ। (৮)**

**অনুবাদ:-** ভগবান শঙ্কর বললেন, "হে মাতা! যদি আমার উপর দয়াযুক্ত হন, তাহলে আমাকে তমোগুণ কেন বানিয়েছেন, কমল থেকে (পদ্ম) উৎপন্ন ব্রহ্মাকে রজোগুণ কি জন্য বানিয়েছেন এবং বিষ্ণুকে সত্ত্বগুণ কেন বানিয়েছেন? অর্থাৎ জীবের জন্ম - মৃত্যু রূপী দুষ্কর্মে আমাদের কেন লাগিয়েছেন?

**শ্লোক-১২ :- রময়সে স্বপতিং পুরুষং সদা তব গতিং ন হি বিহ বিদম শিবে (১২)**

**বাংলা :-** নিজের পতি পুরুষ অর্থাৎ কাল ভগবানের সাথে সদা (সর্বদা) ভোগ

বিলাস করতে থাকো। তোমার গতি (ভেদ) কেউ জানে না।

**নিষ্কর্ষ** :- উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হয় যে, রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু এবং তমোগুণ শিব, এই তিন জনই নশ্বর। দূর্গার স্বামী ব্রহ্ম (কাল) দূর্গার সাথে সদাভোগ বিলাস করতে থাকে। এটা প্রমাণিত হল যে, দূর্গা এবং ব্রহ্ম (কাল) ও সাকার।

## "ব্রহ্ম (কাল) এর অব্যক্ত থাকার প্রতিজ্ঞা"

### ( সূক্ষ্ম বেদের অবশিষ্ট সৃষ্টি রচনা-----

তিন পুত্রের উৎপত্তির পর ব্রহ্ম নিজের পত্নী দুর্গা (প্রকৃতি)-কে বলে যে, আমি প্রতিজ্ঞা করছি ভবিষ্যতে কাউকে নিজের বাস্তবিক রূপে দর্শন দেবো না। যেই কারণে আমি অব্যক্ত বলে বিবেচিত হবো। দুর্গাকে বললো যে, তুমি আমার গোপন থাকার কথা কাউকে বলবে না। আমি গুপ্ত থাকবো। দুর্গা জিজ্ঞাসা করলো যে, আপনি কি নিজের পুত্র দেরকেও দর্শন দেবেন না? ব্রহ্ম বললো, আমি আমার পুত্রদের বা অন্যান্যদের কখনো কোনো সাধনার দ্বারাই দর্শন দেবো না, এটি আমার অটল নিয়ম থাকবে। দুর্গা বললো, এতো আপনার উত্তম নিয়ম নয়, যে আপনি নিজের সন্তানদের কাছ থেকেও লুকিয়ে থাকবেন। তখন কাল বলে, দুর্গা, এটি আমার বাধ্যতা। আমি এক লক্ষ মানব শরীর ধারী প্রাণীকে নিত্য আহার করার অভিশাপ পেয়েছি। আমার পুত্রের (ব্রহ্মা,বিষ্ণু,মহেশ) যদি জানতে পারে তবে তারা উৎপত্তি, স্থিতি সংহার কার্য করবে না। এই কারণেই, আমার এই অনুত্তম নিয়ম সদা থাকবে। যখন এই তিনজন কিছুটা বড় হয়ে যাবে তখন এদের অচেত করে দেবে। আমার বিষয়ে কিছু জানাবে না, নইলে তোমাকেও সাজা দেবো। এই ভয়ে দুর্গা বাস্তবিকতা কাউকে বলেন না।

{প্রমাণ:- তাই গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৪ এ বলেছে যে, এই বুদ্ধিহীন জনসম্প্রদায় আমার অনুত্তম নিয়ম দ্বারা অপরিচিত যে, আমি কখনও কারোর সামনে প্রকট হই না, নিজের যোগমায়া দ্বারা লুকিয়ে থাকি। এই কারণে অব্যক্ত আমাকে, মনুষ্য রূপে আগত কৃষ্ণ মনে করে।

**(অবুদ্ধয়ঃ) বুদ্ধিহীন (মম্) আমার (অনুত্তমম্) অনুত্তম অর্থাৎ অশ্রেষ্ঠ (অব্যয়ম্) অবিনাশী (পরম্ ভাবম্) বিশেষ ভাবকে (অজানন্তঃ) না জেনে (মাম্ অব্যক্তম্) অব্যক্ত আমাকে (ব্যক্তিম্) মনুষ্য রূপে (আপন্নম) আসা (মন্যন্তে) মনে করে অর্থাৎ আমি কৃষ্ণ নই। (গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৪)**

গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৭ এবং ৪৮ এর মধ্যে বলেছেন যে, এটি আমার বাস্তবিক কাল রূপ। এই রূপের দর্শন অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তি না বেদে বর্ণিত বিধিতে, না জপ করে, না তপ করে তথা না কোনো প্রকার ক্রিয়া দ্বারা সম্ভব।}

তিন সন্তান যখন যুবক হয়ে যায়, তখন মাতা ভবাণী (প্রকৃতি/অষ্টাঙ্গী) তাদেরকে বললেন, "তোমরা সাগর মন্থন করো।" প্রথম বারে সাগর মন্থন করলে (জ্যোতি নিরঞ্জন নিজের নিশ্বাস দ্বারা চার বেদ উৎপন্ন করলো এবং তাদেরকে সাগরে নিবাস করো বলে গুপ্ত বাণী দ্বারা আজ্ঞা দিল) যে চার বেদ বেরোয়, সেগুলি ব্রহ্মা নিলেন। বেদগুলি নিয়ে তিন সন্তান মায়ের কাছে আসলে, মাতা বললেন, "ব্রহ্মা! বেদ গুলি তুমি নিজের কাছে রাখো এবং পড়ো।"

**বিশেষ** :- বাস্তবে পূর্ণব্রহ্মই, ব্রহ্ম অর্থাৎ কালকে পাঁচটি বেদ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্ম তার মধ্যে কেবল চারটি বেদ প্রকট করে। আর পঞ্চম বেদটি লুকিয়ে রাখে। যা পূর্ণ পরমাত্মা স্বয়ং প্রকট হয়ে "কবির্গির্ভীঃ" অর্থাৎ কবির্বাণী (কবীর বাণী) দ্বারা প্রবাদ বাক্য ও দোঁহার মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় বার সাগর মন্থন করলে তিন কন্যা প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি (দুর্গা) নিজেরই অন্য তিনটি রূপ (সাবিত্রী, লক্ষ্মী ও পার্বতী) ধারণ করে সমুদ্রে লুকিয়ে গেলেন। সমুদ্র মন্থনের সময় বেরিয়ে এলেন। মাতা তিন জনকে ভাগ করে দিলেন। তিনটি রূপের মধ্যে ভগবান ব্রহ্মাকে সাবিত্রী, ভগবান বিষ্ণুকে লক্ষ্মী ও ভগবান শঙ্করকে পার্বতী, পত্নী রূপে দিলেন। তিন জনেরই ভোগ বিলাসের মাধ্যমে সুর ও অসুর দুই'ই জন্ম নিল।

{তৃতীয় বার সাগর মন্থন করলে ব্রহ্মা চৌদ্দটি রত্ন, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতাগণ অমৃত, অসুরগণ মদ (মদিরা) প্রাপ্ত করে এবং পরোপকারী শিব বিষ নিজের কণ্ঠে ধারণ করে নেয়। এটি অনেক পরের ঘটনা।} বেদ পড়ার পর ব্রহ্মা জানতে পারেন যে, সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনাকর্তা কূলের মালিক পুরুষ (প্রভু) কেউ অন্য। তখন শ্রী ব্রহ্মা, শঙ্কর ও বিষ্ণুকে বললেন বেদে বর্ণিত আছে যে, সৃজনহার অন্য কোনো প্রভু রয়েছেন। অথচ বেদ বলছে যে এর খোঁজ আমরাও জানি না। তার জন্য সংকেত আছে যে, কোনো তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে জিজ্ঞেস করো। ব্রহ্মা তখন মাতার কাছে এলেন এবং সব বৃত্তান্ত বলে শোনালেন। মাতা বলে থাকতেন যে, আমি (দুর্গা) ছাড়া আর কেউ নেই। আমিই কর্তা, আমিই সর্ব শক্তিমান। ব্রহ্মা বললেন কিন্তু বেদ ঈশ্বরের সৃষ্টি এটি মিথ্যা হতে পারে না। তখন দুর্গা বললেন, তোমার পিতা তোমাকে দর্শন দেবেন না, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন। ব্রহ্মা তার মাতা কে বললেন, মা আপনার কথায় আমার অবিশ্বাস হয়ে গেছে। আমি ঐ পুরুষকে (প্রভুকে) খুঁজে বের করবই। দুর্গা বললেন, যদি তিনি দর্শন না দেন তবে তুমি কি করবে? আমি আপনাকে নিজের মুখ দেখাবো না, ব্রহ্মা বললেন। অপর দিকে জ্যোতি নিরঞ্জন প্রতিজ্ঞা করেছে আমি অব্যক্ত অবস্থায় থাকবো, কাউকে দর্শন দেবো না অর্থাৎ ২১ ব্রহ্মাণ্ডে কখনও নিজের বাস্তবিক কাল রূপে আকার ধারণ করে আসবো না।

গীতা অধ্যায় নং. ৭ এর শ্লোক নং. ২৪

**অব্যাক্তম্, ব্যক্তিম্, আপন্নম, মন্যন্তে, মাম্, অবুদ্ধয়ঃ।**

**পরম্ ভাবম্, অজানন্তঃ, মম, অব্যয়ম্ অনুত্তমম্॥ ২৪॥**

**অনুবাদ:-** (অবুদ্ধয়ঃ) বুদ্ধিহীন লোকেরা (মম্) আমার (অনুতমম্) অশ্রেষ্ঠ (অব্যয়ম্) অটল (পরম্) পরম্ (ভাবম্) ভাবকে (অজানন্তঃ) না জেনে (অব্যকত্তম্) অসদৃশ্যমান (মাম্) আমি কালকে (ব্যকত্তিম্) আকার রূপে কৃষ্ণ অবতার (আপন্নম্) প্রাপ্ত হয়েছে (মন্যন্তে) মনে করে।

গীতা অধ্যায় নং. ৭ এর শ্লোক নং. ২৫

**ন, অহম্ প্রকাশঃ, সর্বস্য, যোগমায়াসমাবৃতঃ।**

**মূঢ়ঃ, অয়ম্, ন, অভিজানাতি, লোকঃ, মাম্, অজম্, অব্যয়ম্ ॥ ২৫॥**

**অনুবাদ:-** (অহম্) আমি (যোগমায়া সমাবৃতঃ) যোগমায়া দ্বারা লুকিয়ে থাকা (সর্বস্ব) সবার (প্রকাশঃ) প্রত্যক্ষ (ন) হয় না অর্থাৎ অদৃশ্য অর্থাৎ অব্যক্ত থাকি তাই (অজম্) জন্ম না নেওয়া (অব্যয়ম্) অবিনাশী অটল ভাবকে (অয়ম্) এই (মূঢ়ঃ) অজ্ঞানী (লোকঃ) জনসম্প্রদায় সংসার (মাম্) আমাকে (ন) (অভিজানাতি) জানে না অর্থাৎ আমাকে অবতার রূপে আগত মনে করে। কারণ, ব্রহ্ম নিজ শব্দ শক্তি দ্বারা নানান রূপ ধারণ করে নেয়। ব্রহ্ম হলো দুর্গার স্বামী তাই উপরোক্ত মন্ত্রে বলেছেন যে, আমি শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদিদের মতো দুর্গার থেকে জন্ম নিই না।

### "নিজের পিতাকে (কাল/ব্রহ্ম) প্রাপ্তির জন্য ব্রহ্মার প্রচেষ্টা"

শ্রী দুর্গা ব্রহ্মাকে বললেন যে, অলখ নিরঞ্জন তোমার পিতা কিন্তু সে তোমাকে

দর্শন দেবেনা। ব্রহ্মা বললেন, আমি দর্শন করে তবেই ফিরবো। মাতা জিজ্ঞাসা করলেন পিতার দর্শন না হলে তুই কি করবি? ব্রহ্মা বললেন আমি প্রতিজ্ঞা করছি, পিতার দর্শন যদি না হয় তবে আমি আপনার সম্মুখীন হবোনা। এই বলে শ্রী ব্রহ্মা ব্যকুল হয়ে উত্তর দিকে রওনা দিলেন যেদিকে কেবল মাত্র অন্ধকারময় ছিল। সেখানে ব্রহ্মা চার যুগ পর্যন্ত ধ্যানমগ্ন ছিলেন কিন্তু কোনো কিছুই প্রাপ্ত হয়নি। কাল আকাশবাণী করলো যে জীব উৎপত্তি করোনি কেনো? ভবাণী বললেন, আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রহ্মা জেদ করে আপনার খোঁজে গিয়েছে। ব্রহ্মাকে ছাড়া জীব উৎপত্তির সব কার্য অসম্ভব। ব্রহ্ম (কাল) বললো, ওকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। আমি দর্শন দেবো না। তারপর দুর্গা (প্রকৃতি) নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা গায়েত্রী নামে একটি কন্যা উৎপন্ন করলেন এবং তাকে ব্রহ্মাকে ফিরিয়ে আনার জন্য বললেন। গায়েত্রী যখন ব্রহ্মার কাছে গেলেন তখন ব্রহ্মা সমাধি অবস্থায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন যার জন্য তিনি কিছুই টের পেলেন না যে কেউ একজন এসে উপস্থিত হয়েছে। তারপর আদি কুমারী (প্রকৃতি) ধ্যান যোগের মাধ্যমে গায়েত্রীকে বললেন, ব্রহ্মার চরণ স্পর্শ করো। গায়েত্রী তেমনটাই করলেন। ফল স্বরূপ ব্রহ্মার ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেলো এবং ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্রধিত হয়ে বললেন "কোন পাপিনী আমার ধ্যান ভঙ্গ করলি! আমি তোকে অভিশাপ দেবো। এইকথা শুনে গায়েত্রী বলতে লাগলেন, আমার কোনো দোষ নেই, প্রথমে আমার কথা শুনুন তারপর অভিশাপ দেবেন। মাতা আপনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাকে বলেছেন, কারণ আপনাকে ছাড়া জীবের উৎপত্তি সম্ভব নয়। ব্রহ্মা বললেন কিন্তু আমি যাই কিভাবে? পিতার দর্শন তো হলো না, এখন যদি আমি যাই, তাহলে আমার উপহাস করা হবে। তাই, যদি আপনি মাতার কাছে এটা বলে দেন যে, ব্রহ্মা তার পিতার (জ্যোতি নিরঞ্জন) দর্শন পেয়েছে তবে আমি আপনার সাথে যাব। তখন গায়েত্রী ব্রহ্মাকে বললেন যে আপনি যদি আমার সাথে সম্ভোগ (সেক্স) করেন তবেই আমি আপনার মিথ্যা সাক্ষী দেবো। ব্রহ্মা মনে করলেন পিতার দর্শন তো করা হলো না এই অবস্থায় মায়ের সামনে গেলে লজ্জাবোধ হবে তাই কোনো উপায় দেখতে না পেয়ে গায়েত্রীর সাথে রতী ক্রিয়া (সম্ভোগ) করেন।

তারপর গায়েত্রী বললেন যে, আরও একজন সাক্ষী তৈরি করে নিলে কেমন হয়? ব্রহ্মা বললেন, খুবই ভালো হয়। গায়েত্রী তখন নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা একটি কন্যা (পুহপবতী নামে) উৎপন্ন করে এবং দুজনেই তাকে বলে দিলেন যে, তুমি সাক্ষী দিয়ে এই বলবে যে, "ব্রহ্মা পিতার দর্শন করেছেন।" এইকথা শুনে পুহপবতী বললো "আমি কেনো মিথ্যা সাক্ষী দেবো? হ্যাঁ, যদি ব্রহ্মা আমার সাথে রতী ক্রিয়া করে তাহলে আমি মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারি।" গায়েত্রী ব্রহ্মাকে বোঝালেন যে, এছাড়া আর কোন উপায় নেই। তখন ব্রহ্মা পুহপবতীর সাথে সম্ভোগ ক্রিয়া করে এবং তিনজনে আদি মায়া (প্রকৃতির) কাছে ফিরে আসে। এই দুই দেবী উপরোক্ত শর্ত এই কারণেই রেখেছিল, কেননা যদি ব্রহ্মা মাতার সামনে আমাদের মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার কথা বলে দেয়, তাহলে মাতা আমাদেরকে অভিশাপ দেবে। এই জন্য তারা ব্রহ্মাকেও দোষী বানিয়ে নেয়।

**(এখানে মহারাজ গরীবদাস জী বলছেন যে - "দাস গরীব য়হ চূক ধুরোঁ ধুর")**

## "ব্রহ্মাকে মাতার (দুর্গার) অভিশাপ"

ব্রহ্মা বেদে পড়েছে যে, যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ মন্ত্র নং ১ - অগ্নেঃ তনুঃ অসি। যার অর্থ হল পরমেশ্বর তেজোময় শরীর যুক্ত। বিষ্ণবে ত্বা সোমস্য তনুঃ অসি। অর্থ হল - সকলের পালন করার জন্য ঐ অবিনাশী পরমাত্মার শরীর আছে। এজন্য ব্রহ্মা ঐ দুজন স্ত্রী-কে বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিলেন যে, পরমাত্মা মানব সদৃশ্য ও তেজোময় শরীর যুক্ত।

ব্রহ্মাকে দেখে মাতা জিজ্ঞাসা করলেন, " তুই কি তোর পিতার দর্শন পেয়েছিস?" ব্রহ্মা বললেন, হ্যাঁ আমার পিতার দর্শন হয়েছে। উনি মনুষ্য সদৃশ্য তেজোময় শরীর যুক্ত। দুর্গা বললেন, কোনো সাক্ষী দেখা। তখন ব্রহ্মা বললেন, এই দুজনের (ব্রহ্মার সাথে যে দুই দেবী ছিলেন) সামনেই সাক্ষাৎকার হয়েছে। দুর্গা ঐ দুই কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের সামনে কি ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়েছে? দুই কন্যা বললো হ্যাঁ, আমরা তা স্বচক্ষে দেখেছি। এই কথা শুনে ভবাণীর (প্রকৃতির) মনে সন্দেহ হয় এই যে, ব্রহ্ম আমাকে বলেছিলেন যে "আমি কাউকে দর্শন দেবো না", কিন্তু এরা তো বলছে এদের দর্শন হয়েছে! তখন অষ্টাঙ্গী ধ্যান যোগের মাধ্যমে কাল/জ্যোতি নিরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আসলে ঘটনাটি কি? উত্তরে জ্যোতি নিরঞ্জন বললেন এরা তিন জনই মিথ্যা বলছে। মাতা তাদেরকে বললেন যে, তোমরা তো মিথ্যে কথা বলছো! আকাশবাণী হয়েছে এদের কোনো প্রকার দর্শন হয়নি। এই কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন যে, "মাতা! আমি প্রতিজ্ঞা করে পিতার খোঁজে গিয়েছিলাম। কিন্তু পিতার (ব্রহ্ম) দর্শন না হওয়ায় আপনার সম্মুখে আসতে আমার লজ্জা বোধ হচ্ছিল। তাই আমরা মিথ্যে বলেছিলাম।" তখন মাতা (দুর্গা) বললেন,"আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি।"

<u>ব্রহ্মাকে অভিশাপ</u> :- বিশ্বে তোর পূজা হবে না। তোর পরবর্তী বংশ কপটতা করবে। মিথ্যে কথা বলে জগৎকে ঠকাবে। উপর থেকে কর্ম কান্ড করবে কিন্তু অন্তরে বিকার থাকবে। পুরাণ পড়ে শুনিয়ে বেড়াবে অথচ সদগ্রন্থের বাস্তবিক জ্ঞান নিজেরাও জানবেনা তবুও মান সম্মান বশত ও ধন প্রাপ্তির জন্য গুরু হয়ে অনুগামীদের লোকবেদ (শাস্ত্র বিরুদ্ধ দন্ত কথা) শুনিয়ে বেড়াবে। দেব - দেবীর পূজা করে, অপরের নিন্দা করে কষ্টের উপর কষ্ট ভোগ করবে। নিজের অনুগামীদের তারা কখনোই পরমার্থের মার্গ বলবেনা। দক্ষিনা নেওয়ার জন্য জগৎকে পথভ্রষ্ট করবে। নিজেকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করবে, অপরকে নীচ মনে করবে। মাতার মুখ থেকে এইসব কথা শুনে ব্রহ্মা মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। অনেকক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলো।

<u>গায়েত্রীকে অভিশাপ</u> : - তোর স্বামী একজন ষাড় হবে। তুই মৃত্যুলোকে গাভী হবি।

<u>পূহপবতীকে অভিশাপ</u> : - নোংরা জায়গায় ময়লায় তোর স্থান হবে। তোর ফুল কেউ পুজোয় নেবে না। এই মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্যই তোকে নরক ভোগ করতে হবে। তোর নাম কেওড়া কেতকী হবে। (হরিয়াণাতে একে কুসোন্ধী বলে, এটি সাধারণত ময়লাযুক্ত স্থানে পাওয়া যায়)

এই প্রকার তিন জনকে অভিশাপ দিয়ে মাতা ভবাণী খুব অনুতাপ করলেন।{একই প্রকারে প্রথমত জীব চিন্তাভাবনা না করেই মন (কাল নিরঞ্জন) এর প্রভাবে অন্যায় কাজ করে ফেলে। তারপর আত্মার (সতপুরুষের অংশ) প্রভাবে যখন তার জ্ঞান হয় তখন অনুতাপ করতে হয়। যেই প্রকার মাতা - পিতা নিজের সন্তানের সামান্য ভুলের কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয় (ক্রোধের বশে) কিন্তু পরে অনুতাপ করে। একই প্রক্রিয়া মনে (কাল নিরঞ্জনের) প্রভাবে সমস্ত জীবের মধ্যে কাজ করছে।} হ্যাঁ, এখানে একটি বিশেষ কথা রয়েছে, নিরঞ্জনও (কাল-ব্রহ্ম) নিজের আইন বানিয়ে রেখেছে যে, যদি কোনো জীব কোনো দুর্বল জীবকে কষ্ট দেয় তবে তার শোধ তাকে দিতেই হবে। আদি ভবাণীর (প্রকৃতি/অষ্টাঙ্গী) ব্রহ্মা, গায়েত্রী ও পূহপবতীকে অভিশাপ দেওয়ায় অলখ নিরঞ্জন (ব্রহ্মা-কাল) বলে, "হে ভবাণী! (প্রকৃতি/অষ্টাঙ্গী) এটা তুমি ঠিক করোনি। এখন আমি (নিরঞ্জন) তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি! দ্বাপর যুগে তোমার পাঁচ স্বামী হবে।"(দ্রৌপদীই আদি মায়ার অবতার হয়েছিলেন।) আকাশবাণীতে এই কথা শুনে আদি মায়া বললেন, হে জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল)! আমি তোমার বশীভূত হয়ে আছি,

তুমি যা চাও করে নাও।

{সৃষ্টি রচনাতে দেবী দুর্গার অন্যান্য নাম গুলি বারে বারে লেখার উদ্দেশ্য এই যে, পুরান গুলিতে, গীতা এবং বেদের মধ্যে প্রমাণ দেখার সময় যাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়। যেমন গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক নং ৩-৪ এর মধ্যে কাল ব্রহ্ম বলেছেন যে, "প্রকৃতি হলেন গর্ভ ধারণকারী সকল জীবের মাতা আর আমি হলাম তার গর্ভে বীজ স্থাপনকারী পিতা। শ্লোক নং ৪ এ বলেছেন যে, প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন তিন প্রকার গুন জীবাত্মাকে কর্ম বন্ধনে বাঁধে। - (লেখা সমাপ্ত) ।

এই প্রকরণে, প্রকৃতি হলেন দেবী দুর্গা এবং তিন প্রকার গুন হলেন তিন দেবতা অর্থাৎ রজোগুন ব্রহ্মা, সত্ত্বগুন বিষ্ণু ও তমোগুণ শিবের সাংকেতিক নাম।}

## "পিতার (কাল/ব্রহ্ম) প্রাপ্তির জন্য বিষ্ণুর প্রস্থান ও মাতার আশির্বাদ প্রাপ্ত করা "

এরপর বিষ্ণুকে প্রকৃতি বললেন,"হে পুত্র! যা তুইও তোর পিতার খোঁজ কর"। বিষ্ণু তখন পিতার (ব্রহ্ম) খোঁজ করতে করতে পাতাল লোকে পৌঁছে গেলো যেখানে শেষ নাগ থাকতো। বিষ্ণুকে নিজের সীমার মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে বিষে ভরা ফুঁতকার মারলো। তার বিষের প্রভাবে শ্রী বিষ্ণুর রং কালো হয়ে গেলো, ঠিক স্প্রে পেন্ট করলে যেমনটা হয়। তখন বিষ্ণু মনে করে, নাগটিকে মজা দেখাতে হবে। জ্যোতি নিরঞ্জন দেখলো যে, এবার বিষ্ণুকে শান্ত করতে হবে। তখনই আকাশবাণী হয় যে, বিষ্ণু! এখন তুই তোর মাতার কাছে যা এবং সমস্ত বিবরণ সত্য সত্য বলে দিবি। আর এখন শীষ নাগ দ্বারা যে কষ্ট হয়েছে তার প্রতিশোধ দ্বাপর যুগে নিবি। দ্বাপর যুগে তুই (বিষ্ণু) শ্রী কৃষ্ণের অবতার ধারণ করবি আর কালিদহতে কালিন্দী নামক নাগ, শীষ নাগের অবতার হবে।

**উঁচ হোঙ্গৈ কে নীচ সতাবৈ, তাকর ওএল (প্রতিশোধ) মোহী সোঁ পাবৈ।**
**জো জীব দেঈ পীর পুনী কাঁহু, হম পুনি ওএল দিবাবেঁ তাহূঁ॥**

তারপর শ্রী বিষ্ণু মাতার কাছে এসে সত্য সত্য সব বলে দিলেন যে, পিতার দর্শন আমি পাইনি। এই কথায় মাতা (প্রকৃতি) অতি প্রসন্ন হলেন আর বললেন যে,"পুত্র তুই সত্যবাদী। আমি নিজের শক্তি দ্বারা তোর পিতার সাথে দেখা করে তোর সংশয় সমাপ্ত করছি।"

**কবীর দেখ পুত্র তোহি পিতা ভীটাউঁ, তৌরে মন কা ধোখা মিটাউঁ।**
**মন স্বরূপ কর্তা কহ জানোঁ, মন তে দূজা ঔর ন মানো।**
**স্বর্গ পাতাল দৌর মন কেরা, মন অস্থীর মন অহৈ অনেরা।**
**নিরঙ্কার মন হী কো কহিয়ে, মন কী আস নিশ দিন রহিএ।**
**দেখ হুঁ পলটি সুন্য মহ জ্যোতি, জহাঁ পর ঝিলমিল ঝালর হোতী॥**

এই প্রকার মাতা (অষ্টাঙ্গী/প্রকৃতি) বিষ্ণুকে বললেন যে, "মন হলো জগতের কর্তা, মনই হলো জ্যোতি নিরঞ্জন। ধ্যান যোগ করলে যে এক হাজার জ্যোতি দেখতে পাওয়া যায় ওটাই তার স্বরূপ। যে শঙ্খ, ঘণ্টা ইত্যাদি বাজতে শোনা যায়, সেটা মহাস্বর্গে নিরঞ্জনের বাজছে।" তারপর মাতা (অষ্টাঙ্গী/ প্রকৃতি) বললেন, "হে পুত্র! তুই সকল দেবতাদের রাজা তোর সকল কামনা ও সকল কার্য আমি পূর্ণ করবো। তোর পূজা সমস্ত জগতে হবে। তুই আমাকে সব সত্যি কথা বলেছিস। কালের ২১টি ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীদের বিশেষ অভ্যাস আছে যে তারা সবাই নিজের ব্যর্থ মহিমা দেখাতে চায়, ঠিক যেভাবে দেবী দুর্গা শ্রী বিষ্ণুকে বলেছিলেন যে তোর পূজা সমস্ত জগতে হবে। তারপর

দেবী দুর্গা কেবল প্রকাশ দেখিয়েই শ্রী বিষ্ণুকে বললেন, "আমি তোকে তোর পিতার দর্শন করিয়ে দিয়েছি" এই কথা বলে শ্রী বিষ্ণুকে বিভ্রান্ত করে দিলেন। শ্রী বিষ্ণুও প্রভুর এই প্রকাশ রূপ অবস্থাকেই নিজের অনুগামীদের বোঝাতে লাগলেন যে পরমাত্মার কেবল প্রকাশ দেখা যায়। পরমাত্মা নিরাকার। এরপর আদি ভবাণী রুদ্রের (মহেশের) কাছে গিয়ে বললেন, "মহেশ! তুইও গিয়ে তোর পিতার খোঁজ কর, তোর ভাইয়েরা তো পিতার দর্শন পেলো না, তাই তাদের যা দেওয়ার ছিল আমি প্রদান করে দিয়েছি এখন তোর যা চাওয়ার তুই নিয়ে নে।" তখন মহেশ বললেন যে, "জননী! আমার দুই বড় ভাইয়েরা যখন পিতার দর্শন পায়নি তখন আমার প্রচেষ্টা করা বৃথা। কৃপা করে আমায় এমন বর দিন যেনো আমি অমর (মৃত্যুঞ্জয়) হয়ে যাই।" মাতা বললেন, "আমি এটা করতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, এমন কৌশল বলতে পারি, যাতে তোর আয়ু দীর্ঘ হবে। যোগ সমাধি হলো সেই বিধি (তাই মহাদেব বেশিরভাগ সময় সমাধির মধ্যেই থাকেন)।

এই প্রকার মাতা (অষ্টাঙ্গী/প্রকৃতি) তিন পুত্রকে বিভাগ ভাগ করে দিলেন :-

ভগবান ব্রহ্মাকে কাল লোকে চুরাশি লক্ষ পোশাক (শরীর) বানানোর (রচনার) জন্য অর্থাৎ রজোগুণ প্রভাব যুক্ত করে সন্তান উৎপত্তির জন্য বাধ্য ক'রে জীবের উৎপত্তি করার বিভাগটি প্রদান করলেন। ভগবান বিষ্ণুকে এইসকল জীবের পালন পোষণ (কর্ম অনুসারে) করার ও মোহ-মমতা উৎপন্ন করে স্থিতি বানিয়ে রাখার বিভাগটি প্রদান করেন।

ভগবান শিব শঙ্কর (মহাদেব)-কে সংহার করার বিভাগ প্রদান করেন। কারণ এদের পিতা নিরঞ্জনকে প্রতিদিন এক লক্ষ মানব শরীরধারী জীবের আহার করতে হয়। এখানে মনে একটি প্রশ্ন উৎপন্ন হতে পারে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর দ্বারা উৎপত্তি, স্থিতি এবং সংহার কিভাবে হয়। এরা তিনজন নিজের নিজের লোকে বিরাজ করে। বর্তমানে যোগাযোগ মাধ্যম স্বয়ংক্রিয় করতে স্যাটেলাইট উপরের আকাশে পাঠানো হয় আর সেইগুলি পৃথিবীতে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালায়। ঠিক একই প্রকারে, এই তিন দেবতা যেখানেই থাকুক, তাদের শরীর থেকে বের হওয়া সূক্ষ্ম গুণের তরঙ্গ তিন লোকের মধ্যে সকল প্রাণীর ওপর তার প্রভাব ফেলতে থাকে। উপরোক্ত বিবরণ এক ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্ম (কাল) লোকের সৃষ্টির রচনার। এইরকম ক্ষর পুরুষ কালের ২১-টি ব্রহ্মাণ্ড আছে।

কিন্তু ক্ষর পুরুষ (কাল) স্বয়ং ব্যক্ত অর্থাৎ বাস্তবিক শরীর রূপে সবার সামনে আসেনা। তাকে প্রাপ্ত করার জন্যই তিন দেবতা (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিব) বেদে বর্ণিত বিধি অনুসার যতটুকু সম্ভব সাধনা করার পরেও ব্রহ্ম (কাল) এর দর্শন পায়নি। পরবর্তীকালে ঋষিগণ বেদ গুলি পড়লেন। তাতে লেখা আছে যে, 'অগ্নেঃ তনুর্ অসি' (পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ১ মন্ত্র নং ১৫) পরমেশ্বর সশরীরে আছেন এবং পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ মন্ত্র নং ১ এ লেখা আছে যে, 'আগ্নেঃ তনুর্ অসি বিষ্ণবে ত্বা সৌমস্যা তনুর্ অসি।' এই মন্ত্রে বেদ দুই বার প্রমাণ দিচ্ছে যে, সর্বব্যাপী, সর্ব পালনকর্তা সতপুরুষ সশরীরে আছেন। পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০ মন্ত্র নং ৮ এ উল্লেখিত আছে যে (কবির্ মনিষী) যেই পরমেশ্বকে পাওয়ার আশায় সকল প্রাণীর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে, সেই পরমেশ্বর'ই হলেন কবির অর্থাৎ কবীর। তাঁর শরীর নাড়ী বিহীন (অস্নাবিরম্), (শুক্রম্) বীর্য দ্বারা তৈরী পাঁচ তত্ত্বের ভৌতিক (অকায়ম্) শরীর নয়। তিনি সবার মালিক সর্বোপরি সত্যলোকে বিরাজমান, ঐ পরমেশ্বরের তেজপুঞ্জের (স্বজ্যোতি) স্ব-প্রকাশিত শরীর রয়েছে যা শব্দ রূপী অর্থাৎ অবিনাশী। তিনিই হলেন কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) যিনি সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনাকর্তা (ব্যদধাতা) সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা (স্বয়ম্ভুঃ) স্বয়ং প্রকটমান (যথা তথ্য অর্থান্) বাস্তবে (শাশ্বত্) অবিনাশী (গীতা অধ্যায়

১৫ শ্লোক ১৭ তেও এর প্রমাণ আছে।) এর ভাবার্থ হলো যে, পূর্ণ ব্রহ্মের শারীরিক নাম কবীর (কবির্দেব)। ঐ পরমেশ্বরের শরীর নূর তত্ত্ব দিয়ে তৈরি। পরমাত্মার শরীর অতি সূক্ষ্ম এবং সেই সাধকই দেখতে পান যার দিব্য দৃষ্টি খুলে গিয়েছে। এই প্রকার জীবেরও সূক্ষ্ম শরীর রয়েছে, যার উপর পাঁচ তত্ত্বের খোলস (কভার) অর্থাৎ পাঁচ তত্ত্বের শরীর চাপানো আছে, যা মাতা-পিতার মিলনে (শূক্রম) বীর্য দ্বারা তৈরি। শরীর ত্যাগের পরেও জীবের সূক্ষ্ম শরীর থেকে যায়। সেই সূক্ষ্ম শরীর ঐ সাধকই দেখতে পায় যার দিব্য দৃষ্টি খুলে গিয়েছে। এই প্রকার পরমাত্মা ও জীবের অবস্থা সম্পর্কে বোঝা যায়। বেদে ওম্ নাম স্মরণের প্রমাণ আছে, যা কেবল ব্রহ্মেরই সাধনা। ঋষিগণ এই উদ্দেশ্যে ওম্ নামের জপকেই পূর্ণ ব্রহ্মের মনে করে হাজার হাজার বছর সমাধি লাগিয়ে (হঠযোগ করে) প্রভু প্রাপ্তির চেষ্টা করেছিলেন! কিন্তু প্রভুর দর্শন পেলেন না। পরিবর্তে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে গেলো। ঐ সিদ্ধি রূপী খেলনা দিয়ে খেলে ঋষিরাও জন্ম-মৃত্যুর চক্রেই রয়ে গেলেন। এবং নিজের অনুভবই শাস্ত্রে লিখে দিলেন, পরমাত্মা নিরাকার। ব্রহ্ম (কাল) প্রতিজ্ঞা করেছে যে, "আমি আমার বাস্তবিক রূপে কাউকে দর্শন দেবো না। আমাকে সকলে অব্যক্ত বলেই জানবে। (অব্যক্ত কথার ভাবার্থ হলো এই যে, কেউ আকারে আছে অথচ ব্যক্তিগত রূপে সে স্থূল শরীরে (ভৌতিক শরীরে) দর্শন দেয় না। যেমন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেলে সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায়। সূর্য তখন দৃশ্যমান হয় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্য মেঘের আড়ালে পূর্বের অবস্থাতেই থাকে, এই অবস্থাকে অব্যক্ত বলা হয়ে থাকে। (প্রমাণের জন্য দেখুন গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ২৪ - ২৫, অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৮ এবং ৩২)

পবিত্র গীতা জ্ঞান দাতা ব্রহ্ম (কাল) শ্রী কৃষ্ণের শরীরে প্রেতের মত প্রবেশ করে অর্জুনকে বলছেন যে, "আমি বেড়ে ওঠা কাল এবং সকলকে খাওয়ার জন্যে এসেছি।"(গীতা অধ্যায় ১১ এর শ্লোক নং ৩২ ) এটাই আমার বাস্তবিক রূপ। তুই ছাড়া অন্য কেউ আমার এই রূপ আগে কখনো দেখেনি, পরেও কেউ এই রূপ দেখতে পাবে না। অর্থাৎ বেদে বর্ণিত যজ্ঞ-জপ-তপ তথা ওম্ নাম ইত্যাদি কোনো কিছুর দ্বারা আমার বাস্তবিক স্বরূপকে (কাল রূপকে) দেখা সম্ভব নয়। (গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক ৪৮) আমি কৃষ্ণ নই, এই মূর্খ জনসমুদয় কৃষ্ণ রূপে আমার অব্যক্ততাকে মানুষ রূপ (ব্যক্ত) মনে করছে। কারণ এরা আমার এই খারাপ (অনুত্তম) নিয়মের সাথে অপরিচিত, আমি কখনো আমার বাস্তবিক কাল রূপে সবার সামনে আসি না। নিজের যোগ মায়া দ্বারা লুকিয়ে থাকি (গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ২৪-২৫) **বিচার করুন :-** নিজের গুপ্ত থাকার বিধানকে নিজেই অশ্রেষ্ঠ (অনুত্তম) কেনো বলছেন?

কোনো পিতা যদি তার নিজের সন্তানকে দর্শন না দেয় তবে তার মধ্যে কোনো ত্রুটি বা দোষ আছে যে-কারণে সে লুকিয়ে থেকে সব সুবিধা প্রদান করছে। কাল (ব্রহ্মা) কে তাঁর অভিশাপের কারণে এক লক্ষ সূক্ষ্ম মানব শরীর ধারী প্রাণীকে নিত্য আহার করতে হয় এবং প্রতিদিন যেই ২৫ শতাংশ জীব বেশি উৎপন্ন হয়ে যায়, তাদের কর্ম ভোগের শাস্তি দিতে চুরাশি লক্ষ প্রকার যোনী রচনা করে রেখেছে। যদি সকলের চোখের সামনে বসে তাদের পুত্র-পুত্রী, স্ত্রী, মাতা-পিতা ইত্যাদি সবাইকে মেরে খায় তবে ব্রহ্মের প্রতি সকলের ঘৃনা হয়ে যাবে এবং যখন পূর্ণ পরমাত্মা কবিরগ্নি (কবীর পরমেশ্বর) স্বয়ং আসেন অথবা নিজের কোনো বার্তা বাহক (দূত) পাঠান তখন সকল প্রাণী সত্যভক্তি করে কালের জাল থেকে বেরিয়ে যাবে।

এই কারণেই সকলকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে এবং পবিত্র গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৮, ২৪, ২৫ এ নিজের সাধনা দ্বারা হওয়া (গতি) মুক্তিকেও (অনুত্তম) অতি অশ্রেষ্ঠ

বলেছে এবং নিজস্ব বিধান (নিয়ম) কেও (অনুত্তম) অশ্রেষ্ঠ বলেছে।

প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডে তৈরি ব্রহ্মালোকে একটি করে মহাস্বর্গ বানিয়ে রেখেছে। প্রাণীদের বিভ্রান্ত করার জন্য প্রকৃতি (দুর্গা/আদি মায়া) দ্বারা ঐ মহাস্বর্গের একটি স্থানে নকল সতলোক - নকল অলখ লোক - নকল অগম লোক ও নকল অনামী লোকের রচনা করে রেখেছে। কবীর সাহেবের একটি শব্দ আছে - 'কর নৈনোঁ দীদার মহল মেঁ প্যারা হৈ' তে বাণীতে আছে যে:-

**'কায়া ভেদ কিয়া নিরবারা, য়হ সব রচনা পিণ্ড মঁঝারা হৈ।**
**মায়া অবিগত জাল পসারা, সো কারিগর ভারা হৈ।**
**আদি মায়া কিন্হী চতুরাঈ, ঝূঠী বাজী পিণ্ড দিখাঈ,**
**অভিগত রচনা রচি অণ্ড মাহি বাকা প্রতিবিম্ব ডারা হৈ।'**

একটি ব্রহ্মাণ্ডে অন্যান্য লোকেরও রচনা আছে, যেমন শ্রী ব্রহ্মার লোক, শ্রী বিষ্ণুর লোক ও শ্রী শিবের লোক। সেখানে বসে তিন প্রভু নিচের তিনটি লোকের মধ্যে (স্বর্গ লোক অর্থাৎ ইন্দ্রের লোক - পৃথিবী লোক ও পাতাল লোক) এক একটি বিভাগের মালিক হয়ে আধিপত্য করেন এবং নিজের পিতা কালের আহারের জন্য প্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার কার্য পরিচালনা করেন। তিন প্রভুরও জন্ম মৃত্যু হয়। তখন কাল নিজের পুত্রদেরকেও খায়। এই ব্রহ্মাণ্ডে { এটিকে অন্ডও বলা হয় কারণ ব্রহ্মাণ্ডের গঠন ডিমের মত, একে পিন্ডও বলা হয়ে থাকে কারণ শরীরের (পিন্ডের) মধ্যে একটি ব্রহ্মাণ্ডের রচনা কমল গুলিতে টি.ভির মত দেখতে পাওয়া যায় } একটি মানসরোবর এবং ধর্মরাজের (ন্যায় পালিকা) লোকও আছে, এছাড়া একটি গুপ্ত স্থানে পূর্ণ পরমাত্মা অন্য রূপ ধারণ করে নিবাস করেন, যেমন প্রত্যেক দেশের 'রাজদূত ভবন' থাকে। ঐ স্থানে কেউ যেতে পারেনা। ওখানে কেবল মাত্র সেই সমস্ত আত্মারা থাকে, যাদের সতলোকে যাওয়ার ভক্তি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যখন ভক্তি যুগ আসে তখন, কবীর পরমেশ্বর নিজের প্রতিনিধি রূপে পূর্ণ সন্ত সতগুরু পাঠান। সেই সময় পৃথিবীতে এই সমস্ত পুণ্য আত্মাদের মানব শরীর প্রাপ্তি হয় এবং এরা খুব শীঘ্রই সদভক্তিতে লেগে পড়ে ও সদগুরুদেবের থেকে দীক্ষা নিয়ে পূর্ণ মোক্ষের অধিকারী হয়ে যায়। ঐ স্থানে (পূর্ণ পরমাত্মার রাজদূত ভবনে) নিবাস করা হংস আত্মাদের নিজস্ব ভক্তি ধন খরচ (নষ্ট) হয় না। পরমাত্মার ভান্ডার থেকে সমস্ত সুবিধা উপলব্ধ হয়ে থাকে। ব্রহ্মের (কাল) উপাসকদের ভক্তি ধন স্বর্গে - মহাস্বর্গে সমাপ্ত হয় যায়, কারণ এই কাল লোকে (ব্রহ্ম লোকে) এবং পরব্রহ্মের লোকে সমস্ত প্রাণীদের নিজেদের কর্ম ফলই মেলে।

ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) নিজের ২০-টি ব্রহ্মাণ্ডকে চারটি মহাব্রহ্মাণ্ডে বিভাজিত করে রেখেছে। একটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পাঁচটি ব্রহ্মাণ্ডের এক সমূহ বানিয়ে রেখেছে এবং তা চার দিক দিয়ে ডিম্বাকার গোলকের (পরিধির) মধ্যে আটকানো আছে আবার চারটি মহাব্রহ্মাণ্ড কেও একটি ডিম্বাকার গোলকের (পরিধির) মধ্যে আটকে রেখেছে। ২১ তম ব্রহ্মাণ্ডের রচনা একটি মহাব্রহ্মাণ্ডের সমান স্থান নিয়ে বানিয়ে রেখেছে। ২১ তম ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করতেই তিনটি রাস্তা তৈরি করে রেখেছে। প্রাণীদের ভ্রমিত করে রাখার জন্য আদি মায়া (দুর্গা) দ্বারা একুশ তম ব্রহ্মাণ্ডের, বামদিকে নকল সতলোক, নকল অলখ লোক, নকল অগম লোক ও নকল অনামী লোকের রচনা

ব্রহ্ম লোকের লঘু চিত্র
মহাবিষ্ণু রূপী কাল (ব্রহ্ম)
জটাকুন্ডলীর ঝীল
মহাশীব রূপে কাল
মহাব্রহ্মা রূপে কাল
রজগুন প্রধান স্থান
সত গুন প্রধান স্থান
তমোগুন প্রধান স্থান
শূন্য স্থান
দূর্গা লোক
সপ্তপুরী
নকল অনামি লোক
নকল অগম লোক
নকল অলখ লোক
নকল সতলোক
মহা ইন্দ্রের দ্বীপ
অষ্টআশি হাজার দ্বীপ
মহাস্বর্গ মিষ্টি জলের সমুদ্র
সুমেরু পর্বত
ফলযুক্ত বন
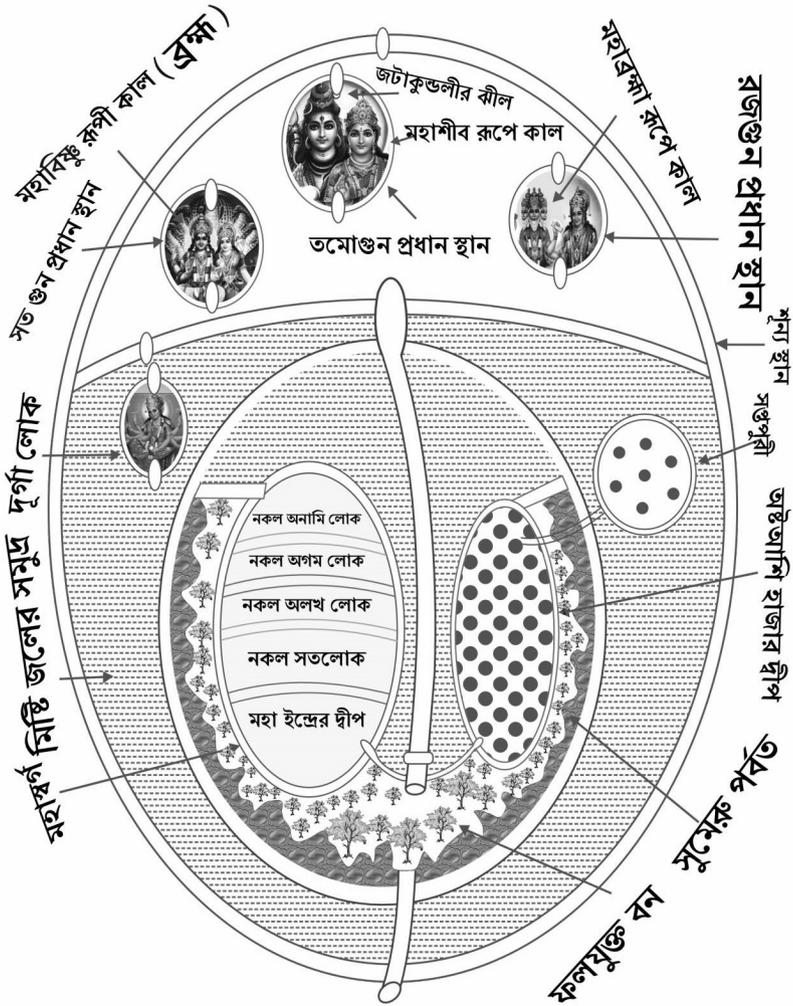
# জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) ব্রহ্মের লোক (২১ ব্রহ্মাণ্ড) এর লঘুচিত্র
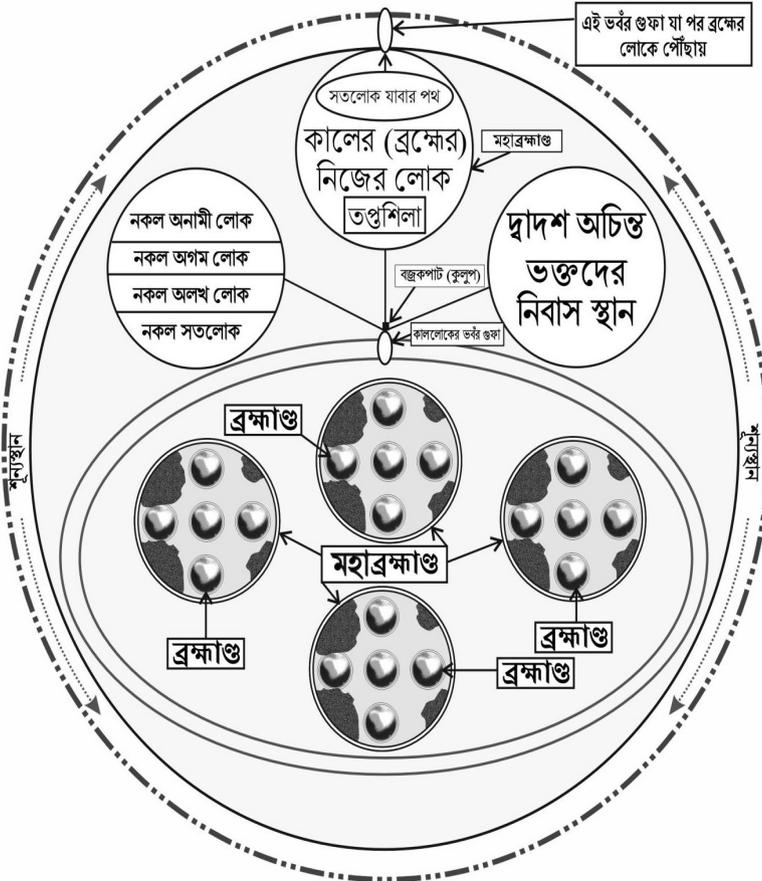
করে রেখেছে এবং ডানদিকে বারোটি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম সাধকদের (ভক্ত দের) রেখে দেয়। তারপর সেই সাধকদেরকে প্রত্যেক যুগে নিজের বার্তা বাহক (সন্ত সতগুরু) রূপে পৃথিবীতে পাঠায়, যারা শাস্ত্রবিধি ছাড়া সাধনা ও জ্ঞান বলতে থাকে, নিজেরাও ভক্তিহীন হয়ে যায় এবং নিজের অনুগামীদেরও কালের জালে ফাঁসিয়ে রাখে। এরপর সেই গুরু ও তার অনুগামীরা দুই জনেই নরকে চলে যায়। তারপর সামনে একটি তালা (কুলুপ) লাগানো আছে। সেই রাস্তা কালের (ব্রহ্মের) নিজ লোকে প্রবেশ করে। যেখানে ব্রহ্ম (কাল) নিজের বাস্তবিক মানব সদৃশ্য কাল রূপে থাকে। এই স্থানে চাটু (রুটি তৈরি করার জন্য লোহার যে গোল প্লেট আকৃতির বাসন) আকারের একটি পাথরের টুকরো সবসময় গরম হয়ে থাকে। এটির ওপর এক লক্ষ মানব শরীর ধারী প্রাণীদের সূক্ষ্ম শরীরকে ভেজে তার মধ্যে থেকে নির্গত ময়লা বের করে খায়। ঐ সময় সকল প্রাণীরা অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করে এবং তাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে যায়। কিছু সময় পর জীব অজ্ঞান হয়ে যায় কিন্তু মারা যায় না। এই সব কিছুর পর ধর্মরাজের লোকে গিয়ে কর্মের আধারে অন্যান্য জন্ম প্রাপ্ত করতে থাকে অর্থাৎ এই ভাবে জন্ম মৃত্যুর চক্র চলতে থাকে।

উপরোক্ত ব্রহ্ম লোকের সামনে লাগানো তালাটি কেবল মাত্র তার আহারের উপযুক্ত প্রাণীদের প্রবেশের জন্য কিছুক্ষন খোলা রাখে। পূর্ণ পরমাত্মার সত্যনামে ও সারনামে এই তালা স্বয়ং খুলে যায়। কালের এমন জাল সম্পর্কে পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবীর সাহেব) স্বয়ং নিজ ভক্ত ধর্মদাসকে বোঝালেন।

## “পর ব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের স্থাপনা”

কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব) আরোও বললেন যে, সতলোকে পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ) নিজ কাজে গাফিলতি (ফাঁকি দিয়ে) করে মানসরোবরে ঘুমিয়ে পড়েছিল এবং যখন পূর্ণ পরমেশ্বর (আমি অর্থাৎ কবীর সাহেব) ঐ মানসরবরে একটি ডিম (অন্ড) ছাড়ে, তখন অক্ষর পুরুষ (পর ব্রহ্ম) সেটিকে ক্রোধের দৃষ্টিতে দেখে। এই দুটি অপরাধের কারণে একেও সাত শঙ্খ ব্রহ্মান্ড সহ সতলোক থেকে বের করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় কারণ হলো, অক্ষর পুরুষ (পর ব্রহ্ম) নিজ সাথী ব্রহ্মের (ক্ষর পুরুষের) বিদায়ে ব্যাকুল হয়ে পরমপিতা কবির্দেবের (কবীর পরমেশ্বরের) কথা ভুলে গিয়ে ক্ষরপুরুষের কথা মনে করতে লাগে এবং ভাবে যে ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) সেখানে খুব আনন্দ করছে, আমি পিছনে রয়ে গেলাম। অন্যান্য কিছু আত্মারা যারা পর ব্রহ্মের সাথেই সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে জন্ম মৃত্যুর কর্ম দন্ড ভোগ করছে, তারা ব্রহ্মের (কালের) সাথে একুশ ব্রহ্মাণ্ডে ফেঁসে যাওয়া হংস আত্মাদের বিদায়ের কথা ভেবে দুঃখী হয়ে যায় এবং সুখদায়ী পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেবের কথা ভুলে যায়। পরমেশ্বর কবির্দেবের বার বার বোঝানোর সত্ত্বেও তাদের ওপর থেকে একটুও আস্থা কম হয়নি। পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ) ভাবলেন আমিও আলাদা একটি স্থান প্রাপ্ত করলে ভালো হয়! এই কথা ভেবে রাজ্য প্রাপ্তির ইচ্ছায় সারনামের জপ করতে শুরু করে দেয়। ঠিক এই প্রকার অন্যান্য আত্মারাও (যারা পরব্রহ্মের সাথে সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডে ফেঁসে আছে) ভাবলো যে, ব্রহ্মের সাথে যে আত্মারা চলে গিয়েছে, নিশ্চয়ই সেখানে তারা খুব আনন্দ-ফুর্তি করছে আর কেবল আমরাই পিছনে রয়ে গেলাম! পরব্রহ্মের মনে এই ধারণা জন্মে গেলো যে হয়তো ক্ষরপুরুষ আলাদা হয়ে খুব সুখে আছে। এই কথা বিচার করে অক্ষর পুরুষ ভিন্ন একটি স্থান প্রাপ্তির দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলো। পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ) হঠযোগ (কঠোর তপস্যা) করলো না তবে আলাদা রাজ্য প্রাপ্তির জন্য

কেবল সহজ ধ্যান যোগ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে করতে শুরু করে। আলাদা স্থান প্রাপ্ত করার জন্য পাগলের মত বিচরণ করতে থাকে, খাওয়া - দাওয়াও ছেড়ে দেয়। অন্য কিছু আত্মারা ওর এই বৈরাগ্যের ওপর আসক্ত হয়ে ওকেই ভালোবাসতে শুরু করে, পূর্ণ প্রভুর জিজ্ঞাসা করতে, পরব্রহ্ম আলাদা স্থান চায় এবং কিছু হংস আত্মার জন্য প্রার্থনা করে। তারপর কবির্দেব বললেন, "যেই সকল আত্মা তোমার সাথে স্বেচ্ছায় যেতে চাইবে তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পূর্ণ প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, কোন কোন হংস আত্মারা পরব্রহ্মের সাথে যেতে চাও, সম্মতি ব্যক্ত কর? অনেক্ষন নিস্তব্দ থাকার পর এক হংস আত্মা স্বীকৃতি দেয়, তারপর তার দেখাদেখি অন্য সকল হংস আত্মারাও সম্মতি ব্যক্ত করে। সর্ব প্রথম স্বীকৃতি দেওয়া হংস আত্মাকে পূর্ণ পরমাত্মা স্ত্রী রূপ বানায় এবং তার নাম ঈশ্বরী মায়া (প্রকৃতি সুরতি) রেখে দেয়। সেই সাথে অন্যান্য আত্মাদেরকেও ঐ ঈশ্বরী মায়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে অচিন্তের দ্বারা অক্ষর পুরুষের (পরব্রহ্মের) কাছে পাঠায়। (পতিব্রতা পদ থেকে সরে যাওয়ার শাস্তি পায়।) বহু যুগ ধরে দুজনে একসাথে সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থাকার সত্ত্বেও পরব্রহ্ম দুর্ব্যবহার করেনি। ঈশ্বরী মায়ার ইচ্ছায় নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা নখ দিয়ে স্ত্রী ইন্দ্রিয় (যোনী) তৈরি করে। ঈশ্বরী দেবীর সম্মতিতে অক্ষর পুরুষ সন্তান উৎপত্তি করলেন। এই জন্য পরব্রহ্ম লোকের (সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের) প্রাণীদের তপ্তশিলার কষ্ট ভোগ করতে হয় না এবং ঐ স্থানের পশু-পাখিরাও ব্রহ্ম লোকের দেবী দেবতাদের থেকেও ভালো চরিত্রযুক্ত হয়। তাদের আয়ুও সুদীর্ঘ হয় কিন্তু জন্ম- মৃত্যু, কর্ম অনুসারে কর্মদন্ড এবং পরিশ্রম করে উদর পূর্তি করতে হয়। এই রূপ সেখানেও স্বর্গ ও নরক রয়েছে। পরব্রহ্মের (অক্ষর পুরুষের) সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড তাঁর ইচ্ছা রূপী ভক্তি ধ্যানে অর্থাৎ সহজ সমাধি বিধিতে করা ভক্তি ধনের প্রতিফলে প্রদান করা হয় এবং পরব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডকে একটি গোলাকার পরিধির মধ্যে বন্ধ করে অক্ষর ব্রহ্ম সহিত ঈশ্বরী মায়া কে সতলোক থেকে ভিন্ন স্থানে নিষ্কাশিত করে দেওয়া হয়।

❖ পূর্ণ ব্রহ্ম (সত পুরুষ) অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড যা সতলোকের মধ্যে রয়েছে, ব্রহ্মের একুশ ব্রহ্মাণ্ড ও পরব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডেরও প্রভু (মালিক) অর্থাৎ পরমেশ্বর কবির্দেব হলেন সর্ব কূলের মালিক।

শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শঙ্করের চারটি করে বাহু আছে এবং এনারা ১৬ কলা যুক্ত, প্রকৃতি দেবী (দুর্গা) আট বাহু ও ৬৪ কলা যুক্ত। ব্রহ্মের (ক্ষরপুরুষ) এক হাজার বাহু ও এক হাজার কলা আছে এবং ইনি একুশ ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু। পরব্রহ্ম দশ হাজার বাহু ও দশ হাজার কলা যুক্ত প্রভু এবং ইনিও সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। পূর্ণ ব্রহ্ম (পরম অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ সতপুরুষ) অসংখ্য বহু ও অসংখ্য কলা যুক্ত প্রভু, সেই সাথে ব্রহ্মের একুশ ব্রহ্মাণ্ড এবং পরব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড সহ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। প্রত্যেক প্রভু নিজের সকল বাহু লুকিয়ে রেখে কেবল দুটি বাহুও রাখতে পারেন এবং ইচ্ছা মত সর্ব বাহু প্রকট করতে পারেন। পূর্ণ পরমাত্মা পরব্রহ্মের প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডে আলাদা আলাদা স্থান বানিয়ে স্বয়ং অন্য রূপে গুপ্ত থাকেন। মনে করো, যেমন একটি ঘুরতে থাকা ক্যামেরা ঘরের বাইরে লাগিয়ে দিয়ে ভেতরে টি.ভি. (টেলিভিশন) রেখে দিলে, টি.ভি. তে বাইরের সকল দৃশ্য দেখা যায়। অনুরূপভাবে অন্য একটি টি.ভি. বাইরে রেখে দিয়ে ভিতরে ক্যামেরা লাগলে, টিভিতে কেবল ঘরের ভিতরে বসা প্রবন্ধকের চিত্র দেখা যায়। যাতে সকল কর্মচারীরা সর্বদা সতর্ক থাকে।

এই প্রকার পূর্ণ পরমাত্মা নিজ সতলোকে বসে সেখান থেকে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেও সদগুরু রূপে কবির্দেব বিদ্যমান থাকেন

যেমন সূর্য দূরে থেকেও নিজের প্রভাব অন্যান্য লোকের ওপর বিস্তার করে রেখেছে।

## “পবিত্র অথর্ববেদ এ সৃষ্টি রচনার প্রমাণ”

**অথর্ববেদ কাণ্ড নং. ৪ অনুবাক নং. ১ মন্ত্র নং. ১ :-**

**ব্রহ্ম জজ্ঞানম্ প্রথমম্ পুরসত্তাদ্ বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ।**
**সঃ বুধন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনীমসতশ্চ বি বঃ ॥ ১॥**

ব্রহ্ম-জ-জ্ঞানম্-প্রথমম্-পুরসত্তাত্ -বিসিমতঃ- সুরুচঃ- বেনঃ- আবঃ - সঃ বুধন্যাঃ - উপমা - অস্য - বিষ্ঠাঃ - সতঃ-চ- যোনীম্ - অসতঃ - চ - বি বঃ

অনুবাদ :- (প্রথমম্) প্রাচীন অর্থাৎ সনাতন (ব্রহ্ম) পরমাত্মা (জ) প্রকট হয়ে (জ্ঞানম্) নিজ বুদ্ধিমত্তা দ্বারা (পুরসত্তাত্) শিখরে অর্থাৎ সতলোক ইত্যাদিকে (সুরুচঃ) স্বেচ্ছায় বড় আদরের সহিত স্ব-প্রকাশিত (বিসিমতঃ) সীমা রহিত অর্থাৎ সুবিশাল সীমা যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন লোকের রচনা করেন। ঐ (বেনঃ) তাঁতি, কাপড়ের মত বুনে (আবঃ) সুরক্ষিত করলেন (চ) এবং (সঃ) ঐ পূর্ণ ব্রহ্মই সর্ব কিছু রচনা করেন (অস্য) এই জন্যে ঐ (বুধন্যাঃ) মূল মালিক (যোনীম্) মূলস্থান সত্যলোকের রচনা করেন (অস্য) এর (উপমা) সদৃশ্য অর্থাৎ অনুরূপ (সতঃ) অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্মের লোক কিছুটা স্থায়ী (চ) এবং (অসতঃ) ক্ষর পুরুষের অস্থায়ী লোক ইত্যাদি (বি বঃ) ভিন্ন ভিন্ন আবাস স্থান (বিষ্ঠাঃ) স্থাপিত করেছেন।

**ভাবার্থ :-** পবিত্র বেদের জ্ঞান বলা ব্রহ্ম (কাল) বলছেন যে, সনাতন পরমেশ্বর স্বয়ং অনাময় (অনামী) লোক থেকে সতলোকে প্রকট হয়ে নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কাপড়ের মত রচনা করে উপরের সতলোক ইত্যাদিকে সীমা রহিত স্ব-প্রকাশিত অমর অর্থাৎ অবিনাশী করেছেন এবং নিচে পরব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড তথা ব্রহ্মের ২১ ব্রহ্মাণ্ড ও এর মধ্যে থাকা সূক্ষ্ম থেকে অতি সূক্ষ্ম রচনাও ঐ পরমাত্মা অস্থায়ী রূপে করেছেন।

**প্রার্থনা :-** পাঠকগণ চিত্র-তে উপরের লোকের সীমানা দেখলে মনে সন্দেহ উৎপন্ন হবে যে বেদে-তে লেখা আছে যে সীমানা নেই। এইজন্য চিত্র সঠিক নয়। এজন্য এখানে স্পষ্ট করছি যে পরমাত্মার লীলা অদ্ভূত। তিনি অনামী লোক ব্যতীত অন্য লোকের বিস্তার অধিক এবং কম করতে থাকেন। এইজন্য এর ব্যাস (পরিধি) সীমিত নয়।

অথর্ববেদ কাণ্ড নং. ৪ অনুবাক নং. ১ মন্ত্র নং. ২ :-

**ইয়ম্ পিত্র্যা রাষ্ট্র্যেত্বগ্রে প্রথমায় জনুষে ভুবনেষ্ঠাঃ।**
**তস্মা এতম সুরুচম্ হ্বারমহ্যম্ ধর্মম্ শ্রীণন্তু প্রথমায় ধাস্যবে ॥ ২॥**

ইয়ম্-পিত্র্যা-রাষ্ট্রি-এতু-অগ্রে-প্রথমায়-জনুষে-ভুবনেষ্ঠাঃ-তরস্মা-এতম্-সুরুচম্- হ্বারমহ্যম্ - ধর্মম্-শ্রীণান্তু- প্রথমায়-ধাস্যবে।

**অনুবাদ :-** (ইয়ম্) এই (পিত্র্যা) জগত পিতা পরমেশ্বর (এতু) এই (অগ্রে) সর্বোত্তম্ (প্রথমায়) সর্ব প্রথম মায়া পরানন্দনী (রাষ্ট্রি) রাজেশ্বরী শক্তি অর্থাৎ পরাশক্তি, যাকে আকর্ষণ শক্তিও বলা হয়, এই পরাশক্তিকে (জনুষে) উৎপন্ন করে (ভুবনেষ্ঠাঃ) বিভিন্ন লোক স্থাপনা করে, (তস্মা) ঐ পরমেশ্বর (সরুচম্) বড়ই প্রেমের সহিত স্বেচ্ছায় (এতম্) এই (প্রথমায়) প্রথম উৎপত্তি করা শক্তি অর্থাৎ পরাশক্তির দ্বারা (হ্বারমহ্যম্) একে অপরের সঙ্গে বিচ্যুতি আটকানোর জন্য অর্থাৎ আকর্ষণ শক্তির (শ্রীণান্তু) মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে পরমাত্মা আদেশ দেয় যে সর্বদা থাকো ঐ কখনো সমাপ্ত না হওয়া (ধর্মম্) স্বভাবকে (ধাস্যবে) ধারণ করে তানে অর্থাৎ কাপড়ের মত বুনে স্থিত করে রেখেছে।

**ভাবার্থ** :- জগৎ পিতা পরমেশ্বর নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা রাষ্ট্রী অর্থাৎ সর্ব প্রথম মায়া রাজেশ্বরী উৎপন্ন করলেন তথা ঐ পরাশক্তি দ্বারা একে-অপরকে আকর্ষণ শক্তি দিয়ে আবদ্ধ করে কখনো সমাপ্ত না হওয়া গুণের মাধ্যমে উপরোক্ত সর্ব ব্রহ্মাণ্ড স্থাপন করেন।

অথর্ববেদ:- কাণ্ড নং. ৪ অনুবাক নং. ১ মন্ত্র নং. ৩:-

**প্র যো জজ্ঞে বিদ্বানস্য বন্ধুর্বিশ্বা দেবানাম জনিমা বিবক্তিত।**

**ব্রহ্ম ব্রহ্মণ উজ্জভার মধ্যান্নীচৈরুচ্চৈঃ স্বধা অভি প্র তস্থৌ॥ ৩॥**

প্র-যঃ-জজ্ঞে-বিদ্বানস্য-বন্ধুঃ-বিশ্বা-দেবানাম্-জনিমা-বিবক্তিত-

ব্রহ্মঃ- ব্রহ্মাণঃ- উজ্জভার-মধ্যাত্-নিচৈঃ-উচ্চৈঃ-স্বধা-অভিঃ-প্রতস্থৌ

**অনুবাদ**:- (প্র) সর্ব প্রথম (দেবানাম্) দেবতাদের ও ব্রহ্মাণ্ডের (জজ্ঞে) উৎপত্তির জ্ঞানকে (বিদ্বানস্য) জিজ্ঞাসু ভক্তের (যঃ) যিনি (বন্ধুঃ) বাস্তবিক সাথী বা আসল সাথী অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মাই নিজের সেবককে (জনিমা) নিজের দ্বারা সৃজিত করা, (বিবক্তি) স্বয়ংই সঠিক ভাবে বিস্তার পূর্বক বলেন যে, (ব্রহ্মণঃ) পূর্ণ পরমাত্মা (মধ্যাত্) নিজের মধ্যে থেকে অর্থাৎ শব্দ শক্তি দিয়ে (ব্রহ্মঃ) ব্রহ্ম-ক্ষর পুরুষ অর্থাৎ কাল-কে (উজ্জভার) উৎপন্ন করে (বিশ্বা) সমস্ত সংসারকে অর্থাৎ সর্ব লোকের (উচ্চৈঃ) উপর সত্যলোক ইত্যাদি (নিচে:) নীচে পরব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-এর সর্ব ব্রহ্মাণ্ড (স্বধা) নিজ ধারণকারী (অভিঃ) আকর্ষণ শক্তি দিয়ে (প্র তস্থৌ) দুটো কেই ভালো ভাবে স্থির করেন।

**ভাবার্থ** :- পূর্ণ পরমাত্মা নিজের দ্বারা রচিত সৃষ্টির জ্ঞান তথা সকল আত্মার উৎপত্তির জ্ঞান নিজ দাসকে স্বয়ং সঠিক ভাবে বলেন যে, পূর্ণ পরমাত্মা নিজের মধ্যে অর্থাৎ নিজ শরীর থেকে নিজ শব্দ শক্তি দ্বারা ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ/কাল) এর উৎপত্তি করলেন এবং সর্ব ব্রহ্মান্ডের উপরে সতলোক, অলখ লোক, অগম লোক, অনামী লোক ইত্যাদি ও নিচে পরব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড তথা ব্রহ্মের ২১ ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের ধারণকারী আকর্ষণ শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন।

যেমন, পূর্ণ পরমাত্মা কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব) নিজ সেবক অর্থাৎ সখা শ্রী ধর্মদাস, শ্রদ্ধেয় গরীবদাস জী প্রমুখদের নিজের দ্বারা রচিত সৃষ্টির জ্ঞান স্বয়ং বলেছেন। উপরোক্ত বেদ মন্ত্র গুলিও এই ঘটনার সমর্থন করছে।

অথর্ববেদ:- কাণ্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র নং ৪

**সঃ হি দিবঃ সঃ পৃথিব্যা ঋতস্থা মহী ক্ষেমম রোদসী অকস্ভায়ত্।**

**মহান্ মহী অস্কভায়দ্ বি জাতো দ্যাঁ সা পার্থিব চ রজঃ ॥ ৪॥**

হি-দিবঃ-স-পৃথিব্যা-ঋতস্থা-মহী-ক্ষমম্-রোদসী-অকস্ভায়ত্-

মহান্- মহী-অকস্ভায়ত্- বিজাতঃ- ধাম্-সদম্-পার্থিবম্-চ-রজঃ

**অনুবাদ**: -(সঃ) ঐ সর্বশক্তিমান পরমাত্মা (হি) নিঃসন্দেহে (দিবঃ) ওপরের চার দিব্য লোক যেমন সত্যলোক, অলখ লোক, অগম লোক ও অনামী অর্থাৎ অকহ লোক অর্থাৎ দিব্য গুণ যুক্ত লোকগুলিকে (ঋতস্থা) সত্য স্থির অর্থাৎ অজর-অমর রূপে স্থিত করে (স) ওনার সমান (পৃথিব্যা) নিচে পৃথিবীর সমস্ত লোকগুলি, যেমন পরব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মান্ড ও কাল/ব্রহ্মের ব্রহ্মের একুশ ব্রহ্মান্ড (মহী) পৃথিবী তত্ত্ব দিয়ে (ক্ষেমম্) সুরক্ষার সহিত (অকস্ভায়ত্) স্থির করেছেন (রোদসি) আকাশ তত্ত্ব ও পৃথিবী তত্ত্ব এই দুইয়ের উপরে, নিচের ব্রহ্মান্ডকে {যেমন আকাশ হলো একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব, আকাশের গুণ শব্দ, পূর্ণ পরমাত্মা উপরের লোক শব্দ রূপে রচনা করেন (বচনে) যা তেজপুঞ্জের বানিয়েছেন। তথা নীচের পরব্রহ্মের (অক্ষর পুরুষ) সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড তথা ব্রহ্ম/ক্ষর পুরুষের একুশ ব্রহ্মাণ্ডকে পৃথিবী তত্ত্ব দিয়ে অস্থায়ী রূপে বানিয়েছেন}

(মহান) পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা (পাথির্বম) পৃথিবীর মত (বি) ভিন্ন-ভিন্ন (ধাম) লোকে (চ) আরও (সদম) আবাস স্থান (মহী) পৃথিবী তত্ত্বে (রজঃ) প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ছোট ছোট লোকেরও (জাতঃ) রচনা করে (অকস্ভায়ত্) স্থির করেছেন।

**ভাবার্থ** :- উপরের চার লোক সতলোক, অলখ লোক, অগম লোক, অনামী লোক, এইগুলি অজর – অমর স্থায়ী অর্থাৎ অবিনশ্বর বানিয়েছেন এবং নিচে ব্রহ্মের ও পরব্রহ্মের লোকগুলিকে অস্থায়ী রচনা করে তথা অন্যান্য ছোট ছোট লোক গুলিকেও ঐ পরমেশ্বর রচনা করে স্থিত করেন।

অথর্ববেদ:- কাণ্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র ৫

**সঃ বুধ্ন্যাদাষ্ট্র জনুষোৎভ্যগ্রম বৃহস্পতিদেবতা তস্য সম্রাট্।**
**অহর্যচ্ছুক্রম জ্যোতিষো জনিষ্টাথ দ্যুমন্তো বি বসন্তু বিপ্রাঃ ॥ ৫॥**

সঃ-বুধ্ন্যাত্ - আষ্ট্র - জনুষে - অভি - অগ্রম্ - বৃহস্পতিঃ - দেবতা-তস্য - সম্রাট - অহঃ - যত্ শুক্রম্ - জ্যোতিষঃ - জনিষ্ট - অথ - দ্যুমন্তঃ - বি - বসন্তু - বিপ্রাঃ।

**অনুবাদ** :- (সঃ) ঐ (বুধ্ন্যাত্) মূল মালিকের প্রথম স্থানে (অভি-অগ্রম্) সর্ব প্রথম (আষ্ট্র) অষ্টঙ্গী মায়া-দুর্গা অর্থাৎ প্রকৃতি দেবী (জনুষেঃ) উৎপন্ন হয়, কারণ নিচের পরব্রহ্ম ও ব্রহ্মের লোকগুলির মধ্যে প্রথম স্থানটি হলো সতলোক, একে তৃতীয় ধামও বলা হয় (তস্য) এই দূর্গারও মালিক হলেন (সম্রাট) রাজাধিরাজ (বৃহস্পতিঃ) সব চেয়ে বড় স্বামী ও জগত গুরু (দেবতা) পরমেশ্বর। (যত্) যার থেকে (অহঃ) সকলের বিয়োগ ঘটেছে (অথ) এর পরে (জ্যোতিষঃ) জ্যোতি রূপ নিরঞ্জন অর্থাৎ কালের (শুক্রম্) বীর্য অর্থাৎ বীজ শক্তিতে (জনিষ্ট) দুর্গার উদর থেকে উৎপন্ন হয়ে (বিপ্রাঃ) ভক্ত আত্মারা (বি) পৃথক (দ্যুমন্তঃ) মনুষ্যলোকে ও স্বর্গলোকে জ্যোতি নিরঞ্জনের আদেশে দুর্গা বলে (বসন্তু) নিবাস করো, অর্থাৎ তারা বসবাস করতে শুরু করে।

**ভাবার্থ** :- পূর্ণ পরমাত্মা উপরের চারটি লোকের মধ্যে থেকে নিচের দিক দিয়ে সর্ব প্রথম অর্থাৎ সত্যলোকের মধ্যে আষ্ট্রা অর্থাৎ অষ্টাঙ্গীর (প্রকৃতি দেবী/ দুর্গা) উৎপত্তি করেন। ইনিই রাজাধিরাজ, জগতগুরু, পূর্ণ পরমেশ্বর (সতপুরুষ) যাঁর থেকে সকলের বিয়োগ ঘটেছে। তারপর সর্ব প্রাণী জ্যোতি নিরঞ্জন (কাল) এর বীর্য দ্বারা দুর্গার (আষ্ট্রা) গর্ভ থেকে উৎপন্ন হয়ে স্বর্গ লোকে ও পৃথিবী লোকে নিবাস করতে শুরু করে।

কাণ্ড নং. ৪ অনুবাদ নং. ১ মন্ত্র ৬

অথর্ববেদ :- কাণ্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র ৬

**নূনম্ তদস্য কাব্যো হিনোতি মহো দেবস্য পূর্ব্যস্য ধাম।**
**এষ যজ্ঞে বহুভিঃ সাকমিত্থা পূর্বে অর্ধে বিষিতে সসন্ নু॥ ৬॥**

নূনম্ - তত্ - অস্য - কাব্যঃ - মহঃ - দেবস্য - পূর্ব্যস্য - ধাম - হিনোতি - পূর্বে - বিষিতে - এষ-যজ্ঞে - বহুভিঃ - সাকম্ - ইত্থা - অর্ধে - সসন্ - নু।

**অনুবাদ** :- (নূনম্) নিঃসন্দেহে (তত্) ঐ পূর্ণ পরমেশ্বর অর্থাৎ তত্ ব্রহ্ম - ই (অস্য) এই (কাব্যঃ) ভক্তআত্মা যে, পূর্ণ পরমেশ্বরের বিধিবৎ ভক্তি করে, তাকে পুনঃ (মহঃ) সর্বশক্তিমান (দেবস্য) পরমেশ্বরের (পূর্ব্বস্য) পূর্বের (ধাম) লোকে অর্থাৎ সত্যলোকে (হিনোতি) ফিরিয়ে নিয়ে যান।

(পূর্বে) পূর্বের (বিষিতে) বিশেষ ভাবে চাওয়া (এষ) এই পরমেশ্বরকে (যজ্ঞে) সৃষ্টি উৎপত্তির জ্ঞানকে জেনে (বহুভিঃ) খুব আনন্দের (সাকম্) সহিত (অর্ধে) অর্ধ (সসন্) সায়িত হয়ে (ইতমা) বিধিবৎ এই প্রকার (নু) সত্য আত্মা দিয়ে স্তুতি করে।

**ভাবার্থ** :- ঐ পূর্ণ পরমেশ্বর, সত্য সাধনা করা সাধককে সেই আগের স্থানে

(সত্যলোকে) নিয়ে যান, যেখান থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে এসেছিলো। সেখানে ঐ প্রকৃত সুখদায়ী প্রভুকে পাওয়ার খুশিতে আত্মা বিভোর হয়ে আনন্দে এই স্তুতি করতে থাকে যে, "হে পরমাত্মা! অসংখ্য জন্মের ভুলে থাকা - হারিয়ে যাওয়া আত্মা তার বাস্তবিক ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে। এরই প্রমাণ পবিত্র ঋগ্বেদ মন্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ১৬ এর মধ্যেও আছে।

শ্রদ্ধেয় গরীবদাস জীকে এই ভাবে পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) স্বয়ং সত্যভক্তি প্রদান করে সতলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন শ্রদ্ধেয় গরীবদাস জী মহারাজ স্বচক্ষে দেখা পরমাত্মার মহিমা নিজ অমৃত বাণীতে বর্ণনা করেছেন :-

**গরীব, অজব নগর মেঁ লে গয়ে, হমকুঁ সতগুরু আন।**
**ঝিলকে বিম্ব অগাধ গতি, সুতে চাদর তান॥**

অথর্ববেদ: কাণ্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র ৭

**যোৎথর্বাণম্ পিত্তরম্ দেববন্ধুম্ বৃহস্পতিম্ নমসাব চ গচ্ছাত্।**
**ত্বম্ বিশ্বেতাম্ জনিতা যথাসঃ কবির্দেবো ন দভায়ত্ স্বধাবান্ ॥ ৭।**

যঃ - অথর্বাণম্ - পিত্তরম্ দেববন্ধুম্ - বৃহস্পতিম্ - নমসা - অব - চ - গচ্ছাত্ - ত্বম্ -বিশ্বেষাম্ - জনিতা - যথা - সঃ - কবির্দেবঃ - ন - দভায়ত্ - স্বধাবান্ ।

**অনুবাদ** :- (যঃ) যে (অথর্বানম্) স্থির অর্থাৎ অবিনাশী (পিত্তরম্) জগত পিতা (দেব বন্ধুম্) ভক্তের বাস্তবিক সাথী অর্থাৎ আত্মার আধার (বৃহস্পতিম্) জগত গুরু (চ) তথা (নমসা) বিনম্র পূজারী অর্থাৎ বিধিবৎ সাধক-কে (অব) সুরক্ষার সহিত (গচ্ছত্) সতলোকে গিয়েছেন যারা অর্থাৎ সতলোক নিয়ে যাওয়া (বিশ্বেষাম্) সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের (জনিতা) রচনাকার জগদম্বা অর্থাৎ মায়ের মতোও গুণ যুক্ত (ন দভায়ত্) কালের মতো প্রতারণা না করা (স্বধাবান্) স্বভাবের অর্থাৎ গুন যুক্ত (যথা) যথাযথ অর্থাৎ সেইরূপ (সঃ) তিনি (ত্বম্) নিজে (কবির্দেবঃ/কবির্ দেব) কবির্দেব অর্থাৎ ভিন্ন ভাষায় কবীর পরমেশ্বরও বলা হয়।

**ভাবার্থ** :- এই মন্ত্র এটাও স্পষ্ট করে দেয় যে, ঐ পরমেশ্বরের নাম হলো কবির্দেব অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বর, যিনি সবকিছু রচনা করেছেন।

যে পরমেশ্বর অচল অর্থাৎ বাস্তবে অবিনাশী (গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং. ১৬-১৭ তেও প্রমাণ আছে) জগৎ গুরু, আত্মার আধার, যারা পূর্ণ মুক্তি পেয়ে সত্যলোকে চলেগিয়েছে, তাদের সতলোকে নিয়ে যাওয়া প্রভু, সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনাকার, কালের (ব্রহ্ম) মত প্রতারণা না করা যথাযথ গুন বিশিষ্ট হলেন স্বয়ং কবির্দেব অর্থাৎ কবীর প্রভু। এই পরমেশ্বরই সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের ও সকল প্রাণীদেরকে নিজের শব্দ শক্তি দ্বারা উৎপন্ন করার কারণে এনাকে (জনিতা) মাতাও বলা হয়, (পিত্তরম্) পিতা ও (বন্ধু) ভাইও বাস্তবে ই'নি আর (দেব) পরমেশ্বরও ইনিই। সেই জন্যে এই কবির্দেবের (কবীর পরমেশ্বর) স্তুতি করা হয়। ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধু চ সখা ত্বমেব, ত্বমেব বিদ্যা চ দ্রাবিণম ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব মম্ দেব দেব। পবিত্র ঋগ্বেদ মন্ডল নং. ১ সুক্ত নং. ২৪ এ এই পরমেশ্বরের মহিমা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আছে।

## " পবিত্র ঋগ্বেদ এ সৃষ্টি রচনার প্রমাণ "

মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ১

**সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাত্।**
**স ভূমিং বিশ্বতোং বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১॥**

সহস্রশির্ষা - পুরুষ - সহস্রাক্ষঃ - সহস্রপাত -

স - ভূমিম্ - বিশ্বত) - বৃত্বা - অত্যাতিষ্ঠত্ - দশংগুলম্।

**অনুবাদ :-** (পুরুষ) বিরাট রূপ কাল ভগবান অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ (সহস্রশির্ষা) হাজার মাথা (শির), (সহস্রাক্ষঃ) হাজার চোখ (সহস্রপাত) হাজার পা-ওয়ালা (স) সেই কাল (ভূমিম্) পৃথিবীর মত একুশ ব্রহ্মাণ্ডকে (বিশ্বতঃ) সর্বদিক থেকে (দশংগুলম) দশ আঙ্গুল দিয়ে অর্থাৎ পূর্ণ রূপে কন্ট্রোল করে (বৃত্বা) গোলাকার পরিধিতে বেঁধে (অত্যাতিষ্ঠত্) এর থেকে বড় পরিধিযুক্ত নিজের লোকে সকলের থেকে পৃথক (ন্যারা) একুশতম ব্রহ্মাণ্ডে থাকেন।

**ভাবার্থ :-** এই মন্ত্রে বিরাট রূপের (কাল/ব্রহ্ম) বর্ণনা আছে। (গীতা অধ্যায় ১০-১১ তেও এই কাল/ব্রহ্ম -এর রূপের একই বর্ণনা রয়েছে। গীতা অধ্যায় ১১ শ্লোক নং. ৪৬ এ অর্জুন বলছেন যে, "হে সহস্রাবাহু! অর্থাৎ হাজার বাহু যুক্ত প্রভু আপনি আপনার চতুর্ভুজ রূপে দর্শন দিন)

যার হাজার সংখ্যক হাত, পা, হাজার সংখ্যক চোখ, কান প্রভৃতি আছে সেই বিরাট রূপী কাল প্রভু নিজ অধীনে থাকা সর্ব প্রাণীদেরকে সম্পূর্ণ রূপে কাবু করে অর্থাৎ ২০টি ব্রহ্মাণ্ডকে একটি গোলাকার পরিধির মধ্যে আবদ্ধ করে স্বয়ং এর ওপরে আলাদা একুশ তম ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বসে আছেন।

মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ২

**পুরুষ এবেদং সর্বম্ যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।**
**উতা মৃতত্বস্যেশানো যদত্রেনাতিরোহতি ॥ ২॥**

পুরুষ - এব - ইদম -সর্বম্ - যত্ ভুতম্ যত চ ভাব্যম -
উত - অমৃতত্বস্য - ইশানঃ - যত্ - অন্নেন - অতিরোহতি।

**অনুবাদ:-** (এব) এই রূপ কিছু ঠিক (পুরুষ) ভগবান আছেন যিনি অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্ম, (চ) আর (ইদম্) এই (যত) যে উৎপন্ন হয়েছে এবং যে ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে (সর্বম্) সব চেষ্টার দ্বারা অর্থাৎ পরিশ্রম দ্বারা (অন্নে ন) অন্ন থেকে (অতিরোহতি) বিকশিত হয়। এই অক্ষর পুরুষ ও (উত) সন্দেহ যুক্ত (অমৃতত্বস্য) মোক্ষের (ইশানঃ) স্বামী অর্থাৎ ভগবান অক্ষর পুরুষ ও কিছু ঠিক (সাথী) পরন্তু পূর্ণ মোক্ষদায়ক নয়

**ভাবার্থ :-** এই মন্ত্রের মধ্যে পরব্রহ্ম (অক্ষর পুরুষ) এর বিবরণ আছে, যিনি কিছুটা হলেও ভগবানের লক্ষণ যুক্ত প্রভু, তবুও এনার ভক্তি করেও পূর্ণ মোক্ষ (মুক্তি) লাভ করা সম্ভব নয়, এইজন্য এনাকে সন্দেহযুক্ত মুক্তি দাতা বলা হয়। এনাকে কিছুটা হলেও প্রভুর গুণ যুক্ত বলা হয়েছে, কারণ এই প্রভু কালের মত প্রাণীদের সূক্ষ্ম শরীরকে তপ্ত শিলায় ভেজে খায় না। কিন্তু এই পরব্রহ্মের লোকেও প্রাণীদেরকে পরিশ্রম করে কর্মের আধারেই ফল পেতে হয় এবং অন্ন দ্বারাই সমস্ত প্রাণীর শরীর বিকশিত হয়ে থাকে। সেখানে জন্ম ও মৃত্যুর সময় সীমা যদিও কালের (ক্ষর পুরুষের) থেকে অধিক হয়, তবুও উৎপত্তি - প্রলয় ও চুরাশি লক্ষ যোনীর কষ্ট ভোগ করতে হয়।

ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ৩ :-

**এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াঁশ্চ পুরুষঃ।**
**পাদোৎস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩॥**

এ তাবান্ - অস্য - মহিমা - অতঃ - জ্যাযান্ - চ - পুরুষঃ - পাদঃ - অস্য - বিশ্বা - ভূতানি - ত্রি - পাদ্ - অস্য - অমৃতম্ - দিবি ।

**অনুবাদ:-** (অস্য) এই অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্মের তো (এতাবান) এতটাই (মহিমা) প্রভুত্ব আছে। (চ) তথা (পুরুষঃ) এই পরম অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম

পরমেশ্বর (অতঃ) এর থেকেও (জ্যায়ান) বড়। (বিশ্বা) সমস্ত (ভূতানি) ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ তথা এদের লোক ও সত্যলোক তথা এই সব লোকে যত প্রাণী আছে (অস্য) এই পূর্ণ পরমাত্মা পরম অক্ষর পুরুষের (পাদঃ) এক পা অর্থাৎ এক অংশ মাত্র। (অস্য) এই পরমেশ্বরের (ত্রি) তিন (দিবি) দিব্য লোক, যেমন-সতলোক-অলখ লোক-অগম লোকে (অমৃতম) অবিনাশী (পাদ্) অন্য পা মনে কর। অর্থাৎ সর্ব ব্রহ্মাণ্ডে উৎপন্ন সব কিছু সতপুরুষ পূর্ণ পরমাত্মার অংশ বা অঙ্গ।

**ভাবার্থ** :- উপরের এই ২ নং মন্ত্রের মধ্যে অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) এর এতটাই মহিমা বর্ণিত আছে কিন্তু ঐ পূর্ণ পুরুষ কবির্দেব হলেন পরব্রহ্মের থেকেও বড় অর্থাৎ সর্বশক্তিমান এবং সর্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই অংশ মাত্র। এই মন্ত্রের মধ্যে তিন লোকের বর্ণনা আছে কারণ চতুর্থ অনামী (অনাময়) লোকটি অন্যান্য লোকের থেকেও পূর্বে রচনা হয়েছিল। এই তিন প্রভুদের (ক্ষর পুরুষ-অক্ষর পুরুষ ও এই দুই প্রভু থেকে ভিন্ন প্রভু হলেন পরম অক্ষর পুরুষ) বিবরণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক সংখ্যা ১৬-১৭ তে আছে এরই প্রমাণ শ্রদ্ধেয় গরীবদাস সাহেব জী বলেন যে :-

**গরীব, জাকে অর্ধ রূম পর সকল পসারা, ঐসা পূর্ণ ব্রহ্ম হমারা॥**
**গরীব, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড কা, এক রতি নহীঁ ভার।**
**সতগুরু পুরুষ কবীর হৈঁ, কুলকে সৃজনহার॥**

এর-প্রমাণ আদরণীয় দাদু সাহেব জী বলছেন :-

**জিন মোকুঁ নিজ নাম দিয়া, সোঈ সতগুরু হমার।**
**দাদু দুসরা কোয়ে নহীঁ, কবীর সৃজনহার।**

এরই প্রমাণ শ্রদ্ধেয় নানক সাহেব জী দিচ্ছেন যে :-

**যক অর্জ গুফতম্ পেশ তো দর কূন করতার।**
**হক্কা কবীর করীম তু, বেএব পরবরদিগার॥**

(শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব, পৃষ্ঠা নং. ৭২১, মহলা ১, রাগ তিলঙ্গ)

কুন করতার শব্দের অর্থ হল সকলের রচনহার, অর্থাৎ শব্দ শক্তি দ্বারা রচনাকারী শব্দ স্বরূপী প্রভু, 'হক্কা কবীর' এর অর্থ হল সত্ কবীর, করীম এর অর্থ দয়ালু, পরবরদিগার শব্দের অর্থ হল পরমাত্মা।}

মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ৪

**ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈত্পুরুষঃ পাদোৎস্যেহাভবত্পুনঃ।**
**ততো বিশ্ব ডব্যক্রামত্সাশনানশনে অভি॥ ৪॥**

ত্রি - পাদ - উর্ধ্ব - উদৈত্ - পুরুষঃ পাদঃ - অস্য - ইহ্ - অভবত্ - পুনঃ -
ততঃ - বিশ্বড় - ব্যক্রামত্ - সঃ - অশনানশনে - অভি

**অনুবাদ**:- (পুরুষ) এই পরম অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ অবিনাশী পরমাত্মা (উর্ধ্বঃ) উপরের (ত্রি) তিন লোক যেমন সত্যলোক-অলখলোক-অগমলোক রূপী (পাদ) পা অর্থাৎ উপরের স্থানে (উদৈত) প্রকট হন অর্থাৎ বিরাজমান আছেন। (অস্য) এই পরমেশ্বর পূর্ণ ব্রহ্ম এর (পাদঃ) এক পা অর্থাৎ এক অংশ জগত রূপে (পুনর) পুনরায় তিনি (ইহ) এখানে (অভবত্) ও প্রকট হন। (ততঃ) এই জন্য (সঃ) এই অবিনাশী পূর্ণ পরমাত্মা (অশনান শনে) আহার (খাওয়া) করা কাল অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ ও আহার না করা পরব্রহ্ম অর্থাৎ অক্ষর পুরুষেরও (অভি) উপর (বিশ্বড়) সর্বত্র (ব্যক্রামত্) ব্যাপ্ত আছেন। অর্থাৎ তাঁর প্রভুত্ব সর্বব্রহ্মাণ্ড ও সর্ব প্রভুর উপর, তাই তিনি সর্ব কূলের মালিক। তিনি নিজের শক্তি সর্বত্র বিস্তার করে রেখেছেন।

**ভাবার্থ** :- ইনিই সর্ব সৃষ্টির রচনাকার প্রভু, ইনি নিজ রচিত সৃষ্টির ওপরের অংশে

তিনটি পৃথক স্থানে (সতলোক, অলখলোক, অগমলোক) তিনটি পৃথক রূপে স্বয়ং প্রকট হন অর্থাৎ স্বয়ং বিরাজমান আছেন। এখানে অনামী লোকের বর্ণনা এই কারণেই করা হয়নি, কারণ অনামী লোকে কোনো প্রকার রচনা নেই এবং অকহ (অনাময়) লোক বাকি রচনা গুলির থেকেও পূর্বে রচনা হয়েছে, আবারও বলা হয়েছে যে, ঐ পরমাত্মার সত্যলোক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই নিচের ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের লোক উৎপন্ন হয়েছে এবং ঐ পূর্ণ পরমাত্মা সকলকে খেতে থাকা ব্রহ্ম বা কাল (কারণ ব্রহ্ম/কাল ভয়ংকর অভিশাপের কারণে এক লক্ষ সূক্ষ্ম মানব শরীর ধারী প্রাণীদের আহার করে) ও কাউকে আহার না করা পরব্রহ্ম বা অক্ষর পুরুষের (পরব্রহ্ম প্রাণীদের ভক্ষণ করে না, কিন্তু জন্ম-মৃত্যু, কর্মদণ্ড যথাযথ বজায় থাকে) থেকেও ওপরে সর্বত্র ব্যপ্ত আছেন অর্থাৎ এই পূর্ণ পরমাত্মার আধিপত্য (প্রভুত্ব) সকলের ওপর আছে, কবীর পরমেশ্বরই সর্ব কুলের মালিক। যিনি নিজের শক্তি সকলের ওপর বিস্তার করে রেখেছেন। যেমন সূর্য নিজের প্রকাশ ছড়িয়ে দিয়ে সকলকে প্রভাবিত করে, এই ভাবে পূর্ণ পরমাত্মা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য নিজের শক্তি অর্থাৎ মোবাইল ফোনের রেঞ্জ (ক্ষমতা) সর্বত্র ছড়িয়ে রেখেছেন। যেমন মোবাইল ফোনের টাওয়ার এক দেশীয় হওয়ার সত্ত্বেও নিজ শক্তি অর্থাৎ মোবাইল ফোনের রেঞ্জ (ক্ষমতা/পরিসর) চারদিকে বিস্তার করে রাখে। ঠিক এইভাবে পূর্ণ প্রভুও নিজ নিরাকার শক্তি সর্বব্যাপী করে রেখেছেন, যার দ্বারা পূর্ণ পরমাত্মা সর্ব ব্রহ্মাণ্ডকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসে নিয়ন্ত্রণ করেন।

এরই প্রমাণ শ্রদ্ধেয় গরীবদাস জী মহারাজ দিচ্ছেন ।

(অমৃতবাণী রাগ কল্যাণ)

**তীন চরণ চিন্তামণী সাহেব, শেষ বদন পর ছাএ।**
**মাতা, পিতা, কুল ন বন্ধু, না কিন্হে জননী জায়ে॥**

মণ্ডল ১০ সুপ্ত ৯০ মন্ত্র ৫

**তস্মা দ্দিরাটজায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।**
**স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫ ॥**

তস্মাত্ - বিরাট্ - অজায়ত - বিরাজঃ- অধি-পুরুষঃ-

স - জাতঃ- অত্যারিচ্যত-পশ্চাত্ - ভূমিম্-অথঃ- পুরঃ ।

**অনুবাদ:**- (তস্মাত্) তার পরে ঐ পরমেশ্বর সতপুরুষের শব্দ শক্তিতে (বিরাট) বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্ম যাকে কালপুরুষ বলা হয় তাঁর (অজায়ত) উৎপত্তি হয়। (পশ্চাৎ) তার পরে (বিরাজঃ) বিরাট পুরুষ অর্থাৎ কাল ভগবানের থেকে ও (অধি) বড় (পুরুষঃ) পরমেশ্বর (ভূমিম) পৃথিবী অর্থাৎ পরব্রহ্মের লোককে (অত্যারিচ্যত) ভালভাবে রচনা করে (অথঃ) পুনরায় (পুরঃ) অন্য ছোট ছোট লোককে (স) ঐ পূর্ণ পরমেশ্বরই (জাতঃ) সৃষ্টি করে স্থাপিত করেন॥

**ভাবার্থ :**- উপরোক্ত মন্ত্র ৪ এ বর্ণিত তিন লোকে (অগমলোক, অলখলোক ও সতলোক) এর রচনা করার পর পূর্ণ পরমাত্মা জ্যোতি নিরঞ্জনের (ব্রহ্মের) উৎপত্তি করলেন অর্থাৎ ঐ সর্ব শক্তিমান পরমাত্মা পূর্ণ ব্রহ্ম কবির্দেবের থেকেই (কবীর প্রভু) বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্মের (কালের) উৎপত্তি হয়েছে। এরই প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৩ মন্ত্র ১৫ তে রয়েছে যে পরম অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ অবিনাশী প্রভুর থেকেই ব্রহ্ম উৎপন্ন হয় যার প্রমাণ অথর্ববেদ কাণ্ড ৪ অনুবাক ১ সুক্ত ৩ এ আছে যে পূর্ণ ব্রহ্মের থেকেই ব্রহ্মের উৎপত্তি হয় এবং ঐ পূর্ণ ব্রহ্মই (ভূমিম্) ভূমি ইত্যাদি ছোট-বড় সর্ব লোকের রচনা করেন। ঐ পূর্ণ ব্রহ্ম এই বিরাট ভগবান অর্থাৎ ব্রহ্মের থেকেও বড় অর্থাৎ এরও মালিক তিনিই।

মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ১৫

**সপ্তাস্যাসন্পরিধযাস্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।**
**দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্পুরুষং পশুম্ ॥ ১৫॥**

সপ্ত - অস্য - আসন্ - পরিধয়ঃ - ত্রিসপ্ত - সমিধঃ - কৃতাঃ -
দেবা - যত্ - যজ্ঞম্ - তন্বনাঃ - অবধ্নন্ - পুরুষম - পশুম্।

**অনুবাদ:-** (সপ্ত) সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড তো পরব্রহ্মের তথা (ত্রিসপ্ত) একুশ ব্রহ্মান্ড কাল ব্রহ্মের (সমিধঃ) কর্ম দণ্ড দুঃখ রূপী আগুন দ্বারা দুঃখদায়ী (পরিধিয়ঃ) গোলাকার পরিধিতে ঘেরা সীমানায় (আসন) বিদ্যমান। (যত্) যে (পুরুষ) পূর্ণ পরমাত্মার (যজ্ঞম) বিধিবত্ ধার্মিক কর্ম অর্থাৎ পূজা করে, (পশুম) বলির পশুর মত কালের জালে কর্ম বন্ধনে বাঁধা (দেবা) ভক্ত আত্মাকে (তন্বানাঃ) কালের দ্বারা রচনা করা অর্থাৎ পাপ কর্ম বন্ধনের জাল থেকে যিনি (অবধ্নন) বন্ধন রহিত করেন বা ছাড়িয়ে দেন তাঁকে বন্দীছোড় বলা হয়।

**ভাবার্থ :-** সাত শঙ্খ ব্রহ্মাণ্ড পরব্রহ্মের লোক ও একুশ ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের লোক, যার মধ্যে গোলাকার সীমায় আবদ্ধ পাপ কর্মের আগুনে জ্বলতে থাকা প্রাণীদের বাস্তবিক পূজার বিধি বলে সঠিক উপাসনা করান, যেই কারণে বলি দেওয়া পশুর মত জন্ম-মৃত্যুর কালের (ব্রহ্মের)খাওয়ার জন্য তপ্ত শিলার কষ্টে নিপীড়িত আত্মাদের কালের কর্ম বন্ধনের বিস্তৃত জাল ছিঁড়ে বাঁধন মুক্ত করেন অর্থাৎ তিনি বাঁধন থেকে মুক্ত করা বন্দীছোড়। এর প্রমাণ পবিত্র যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ মন্ত্র ৩২ এ আছে যে, কবিরংঘারিসি (কবির্) কবির পরমেশ্বর (অংঘ) পাপের (অরি) শত্রু (অসি) অর্থাৎ পাপ বিনাশক হলেন কবীর। বম্ভারিসি (বম্ভারি) বন্ধনের শত্রু অর্থাৎ বন্দী ছোড় (অসি) হলেন কবীর পরমেশ্বর।

মণ্ডল ১০ সুক্ত ৯০ মন্ত্র ১৬

**যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মানি প্রথমান্যাসন্।**
**তে হ নাকম্ মহিমানঃ সচন্ত য়ত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬॥**

যজ্ঞেন - অযজ্ঞম্ - অ - যজন্ত - দেবাঃ - তানি - ধর্মাণি - প্রথমানি - আসন্ - তে - হ - নাকম - মহিমানঃ - সচন্ত - যত্র - পূর্বে - সাধ্যা - সন্তি দেবাঃ।

**অনুবাদ:-** যে (দেবাঃ) নির্বিকার দেব স্বরূপ ভক্ত আত্মারা (অযজ্ঞম্) অসম্পূর্ণ ভুল ধার্মিক পূজার স্থানে (যজ্ঞেন) সত্য ভক্তির ধার্মিক কর্মের আধারে (অজন্ত) পূজা করেন, (তানি) তাঁরা (ধর্মানি) ধার্মিক শক্তি সম্পন্ন (প্রথমানি) মুখ্য অর্থাৎ উত্তম। (তে-হ)তাঁরাই বাস্তবে (মহিমানঃ) মহান ভক্তি শক্তি যুক্ত হয়ে (সাধ্যাঃ) সফল ভক্তজন (নাকম) পূর্ণ সুখদায়ক পরমেশ্বরকে (সচন্ত) ভক্তি নিমিতের কারণ অর্থাৎ সত্ভক্তির কামাঈ এর ফলে প্রাপ্ত হন। তাঁরা ওখানে চলে যান। (যত্রঃ) যেখানে (পূর্বে) প্রথম সৃষ্টির (দেবাঃ) পাপরহিত দেব স্বরূপ ভক্ত আত্মারা (সন্তি) আছেন।

**ভাবার্থ :-** যিনি নির্বিকার (যারা মাংস, মদ, তামাক সেবন করা ত্যাগ করে দিয়েছেন এবং অন্যান্য মন্দ কর্ম থেকে দূরে থাকেন তারা) দেব স্বরূপ ভক্ত আত্মারা শাস্ত্রবিধি রহিত পূজার বিধি ত্যাগ করে শাস্ত্র অনুকূল সাধনা করেন তারা ভক্তির কামাই্ দ্বারা ধনী হয়ে কালের ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে নিজের সতভক্তির কামাইয়ের ফলে ঐ সর্ব সুখদায়ী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করেন অর্থাৎ সতলোকে চলে যান, যেখানে সর্ব প্রথম রচিত সৃষ্টির দেব স্বরূপ অর্থাৎ পাপ রহিত আত্মারা থাকে।

যেমন, কিছু আত্মারা কালের (ব্রহ্মের) জালে ফেঁসে গিয়ে এখানে চলে এসেছে, কিছু আত্মারা পরব্রহ্মের সাথে সাত শঙ্খ ব্রহ্মান্ডে চলে যায়, তবুও অসংখ্য আত্মা

যাদের বিশ্বাস পূর্ণ পরমাত্মার মধ্যে অটল রয়ে গেছে, যারা পতি ব্রতা পদ থেকে বিচ্যুত হয়নি, তারা ওখানেই রয়ে গেলেন, এই জন্যে এইরূপ বর্ণনা পবিত্র বেদেও সত্য বলা হয়েছে। একই প্রমাণ গীতা অধ্যায় ৮ এর শ্লোক ৮ থেকে ১০ এর মধ্যে বলা আছে যে, যেই সাধক পূর্ণ পরমাত্মার সত্য সাধনা শাস্ত্রবিধি অনুসারে করে, সে ভক্তিতে উপার্জিত শক্তি দ্বারা ঐ পূর্ণ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে অর্থাৎ তাঁর কাছে চলে যায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিন প্রভু হলেন ব্রহ্মা - পরব্রহ্ম - পূর্ণব্রহ্ম । এদেরকেই ১.ব্রহ্ম-ঈশ-ক্ষর পুরুষ ২.পরব্রহ্ম-অক্ষর পুরুষ/অক্ষর ব্রহ্ম ঈশ্বর এবং ৩.পূর্ণ ব্রহ্ম -পরম অক্ষর ব্রহ্ম-পরমেশ্বর-সতপুরুষ ইত্যাদি সমর্থক শব্দের দ্বারা পরিচিত হন।

একই প্রমাণ ঋগ্বেদ মণ্ডল ৯ সুক্ত ৯৬ মন্ত্র ১৭ থেকে ২০ তে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, পূর্ণ পরমাত্মা কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) শিশুর রূপ ধারণ করে প্রকট হন এবং নিজের নির্মল জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান (কবিগির্ভিঃ) কবীর বাণীর মাধ্যমে নিজ অনুগামীদের উচ্চারণ করে বর্ণনা করেন। ঐ কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) , ব্রহ্মের (ক্ষর পুরুষ) ধাম ও পরব্রহ্মের (অক্ষর পুরুষের) ধামের থেকে ভিন্ন, যেটি হলো পূর্ণ ব্রহ্মের (পরম অক্ষর পুরুষ) তৃতীয় ঋতধাম (সতলোক), যেখানে আকার রূপে বিরাজমান আছেন এবং সতলোক থেকে চতুর্থ তম অনামী লোক রয়েছে, সেখানেও ঐ কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) অনামী পুরুষ রূপে মনুষ্য সদৃশ্য আকারে বিরাজমান।

## “পবিত্র শ্রীমদদেবী মহাপুরাণে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ ”

“ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মাতা-পিতা”

(দুর্গা ও ব্রহ্মের যোগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্ম)

পবিত্র শ্রীমদদেবী মহাপুরান তৃতীয় স্কন্ধ অধ্যায় ১-৩ গীতা (প্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত, অনুবাদ কর্তা শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার এবং শ্রী চিমন লাল গোস্বামী, পৃষ্ঠা নম্বর ১১৪ থেকে)

পৃষ্ঠা নম্বর ১১৪ থেকে ১১৮ পর্যন্ত বিবরণ আছে যে, কয়জন আচার্য ভবাণীকে সম্পূর্ণ ইচ্ছা পূর্ণকারী বলেন। ওনাকে প্রকৃতিও বলা হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের সাথে অনন্য বা অতুল্য সম্বন্ধ রয়েছে, যেমন পত্নীকে অর্ধাঙ্গিনীও বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ দূর্গা হলেন ব্রহ্মের (কালের) পত্নী। একটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রচনার বিষয়ে রাজা শ্রী পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করলে শ্রী ব্যাসদেব বললেন যে, “আমি শ্রী নারদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘হে দেবর্ষি! এই ব্রহ্মাণ্ডের রচনা কিভাবে হলো?’ আমার এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী নারদ বললেন, ‘আমি আমার পিতা শ্রী ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, ‘এই ব্রহ্মাণ্ডের রচনা আপনি করেছেন, না শ্রীবিষ্ণু, না শ্রী শিব? সত্য সত্য বলার কৃপা করুন। তখন আমার পূজ্য পিতা শ্রী ব্রহ্মা বললেন, পুত্র নারদ! আমি নিজেকে পদ্ম ফুলের উপর বসে দেখতে পেলাম, আমার এই বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই যে, আমি এই অগাধ জলের মাঝে কি করে উৎপন্ন হলাম! এক হাজার বছর ধরে আমি পৃথিবীর অন্বেশন (খুঁজতে) করতে থাকি। কোথাও জলের কোনো কূল-কিনারা পাই না। তারপর আকাশবাণী হয়, তপ করো! ১০০০ বর্ষ ধরে তপস্যা করি, তারপর সৃষ্টি রচনা করার আকাশ বাণী হলো এরই মধ্যে মধু ও কৈটভ নামক দুই রাক্ষস এসে উপস্থিত হয়। তাদের ভয়ে আমি পদ্ম ফুলের বৃন্তের দণ্ড ধরে নিচের দিকে নেমে আসতেই সেখানে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে শীষ নাগের সজ্জায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। শ্রী বিষ্ণুর মধ্যে থেকে এক স্ত্রী (প্রেতবশ প্রবিষ্ট দূর্গা) বের হলেন, তিনি অলংকার পরিহিত অবস্থায় আকাশে দেখা দেন। তারপর ভগবান বিষ্ণুর চেতনা আসে। সেখানে আমি ও ভগবান

বিষ্ণু দুজনেই ছিলাম। এরই মধ্যে ভগবান শিবও চলে আসেন। দেবী দুর্গা আমাদের সকলকে বিমানে বসিয়ে ব্রহ্মা লোকে নিয়ে গেলেন। সেখানে আরও এক ব্রহ্মা, এক বিষ্ণু ও একজন শিবকে দেখি এবং এক দেবীকেও দেখা গেলো, যাকে দেখে ভগবান বিষ্ণু বিবেকপূর্বক নিম্নের বর্ণনা করলেন (কাল ব্রহ্মাই ভগবান বিষ্ণুকে চেতনা প্রদান করেন এবং তার বাল্যকালের কথা মনে পড়ে যায় ও ছোটবেলার গল্প শোনান।) ।

পৃষ্ঠা নম্বর ১১৯ - ১২০ তে ভগবান বিষ্ণু, শ্রী ব্রহ্মা ও শ্রী শিবকে বললেন, "ইনি হলেন আমাদের তিনজনের মাতা, ইনিই জননী প্রকৃতি দেবী। এই দেবীকে আমি সেই সময় দেখি যখন আমি ছোট্ট বালক ছিলাম, ইনি আমাকে দোলনায় দোলাচ্ছিলেন।"

তৃতীয় স্কন্দ পৃষ্ঠা নং. ১২৩ এ শ্রীবিষ্ণু শ্রী দুর্গার স্তুতি করে বলছেন, তুমি শুদ্ধ স্বরূপা, এই সমস্ত সংসার তোমার দ্বারাই উদ্ভাসিত হচ্ছে, "আমি (বিষ্ণু) , ব্রহ্মা ও শঙ্কর আমরা সকলেই তোমার কৃপাতেই বিদ্যমান রয়েছি। আমাদের আবির্ভাব (জন্ম) ও তিরোভাব (মৃত্যু) হতে থাকে অর্থাৎ আমরা তিন দেবই নাশবান, কেবল তুমিই নিত্য (অবিনাশী), জগত জননী, তুমি প্রকৃতি দেবী।"

ভগবান শংকর বললেন, "দেবী! যদি মহাভাগ বিষ্ণু তোমার থেকেই প্রকট (উৎপন্ন) হয়ে থাকে তবে ওনার পরে উৎপন্ন হওয়া শ্রী ব্রহ্মাও আপনারই পুত্র হলেন। তাহলে আমি তমোগুণী লীলা কারী শঙ্কর কি আপনার পুত্র নয়? অর্থাৎ আমাকেও আপনি উৎপন্ন করেছেন।"

**বিচার করো :-** উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, শ্রী ব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রী শিব তিন জনই নাশবান! মৃত্যুঞ্জয় (অজর-অমর) ও সর্বেশ্বর নন। এনারা হলেন দুর্গা (প্রকৃতি) ও ব্রহ্মের (কাল-সদাশিবের) পুত্র।

তৃতীয় স্কন্দ পৃষ্ঠা নং. ১২৫ এ শ্রী ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করলেন, "হে মাতা! বেদে যে ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে, সেই ব্রহ্ম কি আপনি, না অন্য কোন প্রভু?" এই প্রশ্নের উত্তরে এই স্থানে দুর্গা বলেছেন যে, "আমি ও ব্রহ্ম একই"। আবার একই স্কন্দের অধ্যায় ৬ এর পৃষ্ঠা নম্বর ১২৯ এ বলেছেন যে, "এবার আমার কার্যসিদ্ধ করার জন্য তোমরা বিমানে বসে শীঘ্রই প্রস্থান করো (যাও)। কোনো কঠিন কার্য এসে উপস্থিত হলে, যখনই তোমরা আমাকে স্মরণ করবে, আমি তোমাদের সামনে চলে আসব। দেবতাগণ! আমার (দুর্গার)ও ব্রহ্মের ধ্যান তোমাদের সব সময় করা উচিত। আমাদের দুজনকে স্মরণ করতে থাকলে তোমাদের কার্যসিদ্ধ হবে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"

উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা স্বয়ং প্রমাণিত হয় যে, দুর্গা (প্রকৃতি) ও ব্রহ্ম (কাল) হল তিন দেবতার মাতা-পিতা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এনারা নাশবান অর্থাৎ এক পূর্ণ শক্তি যুক্ত নন।

তিন দেবতার (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবের) বিবাহ দুর্গা (প্রকৃতি দেবী) করান। পৃষ্ঠা নং. ১২৮-১২৯ এর তৃতীয় স্কন্ধে।

গীতা অধ্যায় নং ৭ শ্লোক ১২

**য, চ, এব, সাত্বিকাঃ,ভাবাঃ, রাজসাঃ, তামসাঃ, চ, যে,**
**মতঃ, এব, ইতি, তান, বিদ্ধি, ন, তু,অহম, তেষু, তে, ময়ি।**

**অনুবাদ:**-(চ) আর (এব) ও (যে) যে (সাত্বিকাঃ) সত্ত্বগুণ বিষ্ণু থেকে স্থিতি (ভাবাঃ) ভাবা হয় আর (যে) যে (রাজসাঃ) রজ গুন ব্রহ্মা থেকে উৎপত্তি (চ) তথা (তামসাঃ) তমোগুণ শিব থেকে সংহার হয় (তান) ঐ সব (মতঃএব) আমার দ্বারা সুনিয়োজিত নিয়ম অনুসারেই হয়। (ইতি) এমন (বিদ্ধি) জান (তু) পরন্তু বাস্তবে (তেষু) এতে (অহম্) আমি আর (তে) তাঁরা (ময়ি) আমার মধ্যে (ন) নেই।

## "পবিত্র শিব মহাপুরাণে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ "

(কাল ব্রহ্ম ও দুর্গা থেকে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের উৎপত্তি)

এর প্রমাণ পবিত্র শ্রী শিব পুরাণ গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত। অনুবাদ কর্তা শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার। অধ্যায় ৬ রুদ্র সংহিতা পৃষ্ঠা নং ১০০ -তে বলা হয়েছে, যে মূর্তি রহিত পরব্রহ্ম রয়েছেন, তারই মূর্তি হল ভগবান সদাশিব। তার শরীর থেকে একটি শক্তি নির্গত হয়, সেই শক্তি অম্বিকা, প্রকৃতি (দুর্গা), ত্রিদেব জননী (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু ও শ্রী শিবের জন্ম প্রদানকারী মাতা) নামে পরিচিত হলেন। যিনি অষ্টভুজা যুক্ত। সেই সদাশিবকে শিব, শম্ভু ও মহেশ্বর বলা হয়। (পৃষ্ঠা নম্বর ১০১ -এ বলা আছে) তিনি নিজের সর্বাঙ্গে ভস্ম মেখে থাকেন। ঐ কালরূপী ব্রহ্ম এক শিবলোক নামক ক্ষেত্রের নির্মাণ করেন। তারপর দুজনের স্বামী স্ত্রী ব্যবহারে এক পুত্র উৎপন্ন হল। তার নাম বিষ্ণু রাখলেন (পৃষ্ঠা নং ১০২)।

রুদ্র সংহিতা অধ্যায় নং. ৭ পৃষ্ঠা নং. ১০৩ -এ শ্রী ব্রহ্মা বললেন, "আমার উৎপত্তি ভগবান সদাশিব (ব্রহ্ম-কাল) ও প্রকৃতির (দুর্গার) মিলনে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী ব্যবহারে হয়েছে। তারপর আমাকে অজ্ঞান করে দেওয়া হয়।

রুদ্র সংহিতা অধ্যায় নং. ৯ পৃষ্ঠা নং. ১১০ এ বলা আছে যে, এই প্রকার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন দেবতাদের মধ্যে গুণ রয়েছে কিন্তু শিবকে (কাল-ব্রহ্ম) গুণাতীত মানা হয়।

এখানেই চারটি বিষয় প্রমাণিত হলো, সদাশিব (কাল-ব্রহ্ম) ও প্রকৃতির (দুর্গার) থেকেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও শিবের উৎপত্তি হয়। তিন ভগবানের (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রী শিবের) মাতা শ্রী দূর্গা এবং পিতা শ্রী জ্যোতি নিরঞ্জন (ব্রহ্ম)। এই তিন প্রভু হলেন রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব।

## "পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ"

এরই প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৪ শ্লোক ৩ থেকে ৫ এর মধ্যে আছে। ব্রহ্ম (কাল) বলছেন যে, প্রকৃতি (দুর্গা) হলো আমার স্ত্রী এবং আমি ব্রহ্ম (কাল) তার স্বামী। আমাদের দুজনের মিলনে সমস্ত প্রাণী সহ তিন গুণের (রজোগুণ - ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ - বিষ্ণু, তমোগুণ - শিবের) উৎপত্তি হয়েছে। আমি (ব্রহ্ম) সর্ব প্রাণীর পিতা এবং প্রকৃতি (দুর্গা) হলেন তাদের মাতা। আমি দুর্গার উদরে বীজ স্থাপন করি, যার দ্বারা সর্ব প্রাণীর উৎপত্তি হয়। প্রকৃতির (দুর্গার) থেকে উৎপন্ন তিন গুণ (রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব) জীবেদের কর্মের আধারে শরীর প্রদান করে।

গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক নং ১

**উর্ধ্ব মূলম, অধঃশাখম্, অশ্বত্থম্, প্রহুঃ অব্যয়ম্,**
**ছন্দাসি, যস্য, পর্ণানি, যঃ,তম্, বেদ, সঃ বেদবিত্॥**

**অনুবাদ:-** (উর্দ্ধমূলম) উপরে পূর্ণ পরমাত্মা আদি পুরুষ পরমেশ্বর রূপী শিকড় (অধঃশাখম্) নীচের তিন গুণ অর্থাৎ রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু ও তমোগুণ শিব রূপী শাখা ওয়ালা (অব্যয়ম্) অবিনাশী (অশ্বতুম্) বিস্তারিত অশ্বত্থের বৃক্ষের মত (যস্য) যার, (ছন্দাসি) যেমন বেদ এ ছন্দ (ভাগ) আছে-এমন সংসার রূপী বৃক্ষের ছোট-ছোট ভাগের ডাল ও (পর্ণানি) পাতা (প্রাহুঃ) বর্নিত আছে,(তম্) ঐ সংসার রূপী বৃক্ষকে (যঃ) যিনি (বেদ) বিস্তারিত ভাবে জানেন(সঃ) তিনি (বেদবিত্) পূর্ণ জ্ঞানী অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী।

গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক নং ২ :-

**অধঃ, চ, উর্ধ্বম্, প্রসৃতাঃ, তস্য, শাখাঃ, গুণ প্রবৃদ্ধাঃ, বিষয়প্রবালাঃ,**
**অধঃ, চ, মুলানি, অনুসন্ততানি, কর্মানুবন্ধীনি, মনুষ্যলোকে ॥**

**অনুবাদ:-** (তস্য) ঐ বৃক্ষের (অধঃ) নীচে (চ) আর (উর্ধ্বম্) উপরে (গুণপ্রবৃদ্ধাঃ) তিন গুণের-ব্রহ্মা-রজোগুণ, বিষ্ণু-সত্বগুণ-শিব-তমোগুণ রূপী (প্রসৃতা) বিস্তারিত (বিষয়প্রবালাঃ) বিকার-কাম-ক্রোধ, মোহ, লোভ, অহংকার রূপী মোটা (শাখাঃ) ডাল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব (কর্মানুবন্ধীনি) জীবকে কর্মের বাঁধনে বাঁধার (মুলানি) মূল শিকড় অর্থাৎ মুখ্য কারণ (চ) তথা (মনুষ্যলোকে) মানব লোকে অর্থাৎ পৃথিবী লোকের (অধঃ) নীচে নরক ও (উর্ধ্বম) উপরে স্বর্গ লোক ইত্যাদি চুরাশি লাখ যোনীতে(অনুসন্ততানি) ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে ।

গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক নং ৩ :-

**ন, রুপম্, অস্য, ইহ, তথা, উপলভ্যতে, ন, অন্তঃ, ন, চ, আদিঃ, ন, চ**
**সম্প্রতিষ্ঠা, অশ্বত্থম্, এনম, সুবিরুঢ়মূলম, অসংগশস্ত্রেণ, দৃড়েন, ছিত্বা ॥**

**অনুবাদ:-** (অস্য) এই রচনার (ন) না (আদিঃ) শুরু (চ) তথা (ন) না (অন্তঃ) শেষ আছে, (ন) না (তথা)তার (রূপম্) স্বরূপ (উপলভ্যাতে) পাওয়া যায় (চ) তথা (ইহ) এখানে বিচারকালে অর্থাৎ আমার দ্বারা দেওয়া গীতা জ্ঞানে পূর্ণ তথ্য নেই, কারণ ভালভাবে আমারও জানা (ন) নেই। (সম্প্রতিষ্ঠা) সমস্ত ব্রহ্মান্ডের রচনার বিষয় আমি ভালোভাবে জানি না। (এনম্) এই (সুবিরুঢ়মূলম্) ভাল ভাবে স্থায়ী স্থিতিওয়ালা (অশ্বত্থম) মজবুত স্বরূপওয়ালা সংসার রূপী বৃক্ষের জ্ঞানকে (অসংগশস্ত্রেন) পূর্ণ জ্ঞান রূপী (দৃড়েন) দৃঢ় সূক্ষ্ম বেদ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা (ছিত্বা) কেটে অর্থাৎ নিরঞ্জনের ভক্তিকে ক্ষণিক অর্থাৎ ক্ষণ ভঙ্গুর মেনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্ম তথা পরব্রহ্ম থেকেও আগে পূর্ণ ব্রহ্মের খোঁজ করা উচিত ।

গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক নং ৪

**ততঃ, পদম্, তত্,পরিমার্গিতব্যম্, যস্মিন, গতাঃ, ন, নিবর্তন্তি, ভূয়ঃ,**
**তম, এব, চ,আদ্যম্, পুরুষম্, প্রপদ্যে, যতঃ, প্রবৃতিঃ, প্রসৃতা, পুরাণী ॥**

**অনুবাদ:-** যখন তত্ত্বদর্শী সন্ত খুঁজে পাবে (ততঃ) তার পরে (তত্) ঐ পরমাত্মার (পদম) পরম পদ বা স্থান অর্থাৎ সতলোকের (পরিমার্গিত ব্যম) ভালোভাবে খোঁজ করা উচিত,(যস্মিন) যেখানে (গতাঃ) যাওয়ার পর সাধক আর (ভূয়ঃ) এই সংসারে (ন, নিবর্তন্তি) ফিরে আসে না। (চ) আর (যতঃ) যে পরমাত্মা পরম অক্ষর ব্রহ্ম থেকে (পুরাণী) আদি (প্রবৃতিঃ) রচনার সৃষ্টি (প্রসৃতা) উৎপন্ন হয়েছে, (তম) অজ্ঞাত (আদ্যম্) আদি যম অর্থাৎ আমি কাল নিরঞ্জন (পুরুষম্) পূর্ণ পরমাত্মার (এব) ই (প্রপদ্যে) শরণে আছি তথা তাঁরই পূজা করি।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬

**দ্বৌ, ইমৌ, পুরুষৌ, লোকে, ক্ষরঃ, চ, অক্ষরঃ, এব, চ,**
**ক্ষরঃ, সর্বাণি, ভূতানি, কূটস্থঃ,অক্ষরঃ, উচ্যতে ॥**

**অনুবাদ:-** (লোকে) এই সংসারে (দ্বৌ) দুই প্রকারের (পুরুষ) ভগবান আছে এক (ক্ষর) নাশবান (চ) আর এক (অক্ষরঃ) অবিনাশী (পুরুষঃ) ভগবান (এব) এই রূপ (ইমৌ) এই দুই প্রভুর লোকে (সর্বাণি) সম্পূর্ণ (ভূতানি) প্রাণীর শরীর (ক্ষর) নাশবান (চ) আর (কূটস্থঃ) জীবাত্মাকে (অক্ষরঃ)অবিনাশী (উচ্যতে) বলা হয়।

গীতা অধ্যায় নং ১৫ শ্লোক নং ১৭

**উত্তমঃ, পুরুষঃ, তু, অন্যঃ,পরমাত্মা, ইতি, উদাহৃতঃ, যঃ,**
**লোকত্রয়ম্ আবিশ্য, বিভর্তি, অব্যয়ঃ, ঈশ্বরঃ ॥**

**অনুবাদ:-** (উত্তমঃ) উত্তম (পুরুষঃ)প্রভু (তু) তো (অন্যঃ) উরপরোক্ত দুই প্রভু "ক্ষরপুরুষ তথা অক্ষর পুরুষ" থেকেও অন্য, (ইতি) তাঁকে বাস্তবে পরমাত্মা (উদাহৃত) বলা হয়। (যঃ) যিনি (লোকত্রয়ম) তিন লোকে (আবিশ্য) প্রবেশ করে (বিভর্তি) সকলের ধারন পোষণ করেন, তিনিই (অব্যয়ঃ) অবিনাশী (ঈশ্বরঃ) ঈশ্বর (প্রভুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সমর্থ প্রভু)।

**ভাবার্থঃ-** গীতা জ্ঞানদাতা প্রভু কেবল মাত্র এতটুকুই বলেছেন যে, এই সংসারকে উল্টোভাবে ঝুলে থাকা বৃক্ষের সমতুল্য জানো। যার উপরের দিকে শিকড় (মূল) তো পূর্ণ পরমাত্মা। নিম্নভাগে কাণ্ড সহ ডালপালাকে অন্যান্য অংশ মনে করুন। এই সংসার রূপী বৃক্ষের প্রতিটা বিভাগের বিবরণ ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে যে সন্ত জেনে থাকেন, তিনিই তত্ত্বদর্শী সন্ত। সেই তত্ত্বদর্শী সন্তের বিষয়ে গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩৪-এ বলা হয়েছে। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ২-৩ এর মধ্যে কেবল এতটুকুই বলা হয়েছে যে, তিনগুণ রূপী শাখা আছে। এখানে এই বিচার কালে অর্থাৎ গীতা জ্ঞানের আলোচনায় আমি (গীতা জ্ঞানদাতা) তোমাকে সম্পূর্ণ জ্ঞান দিতে পারবো না, কারণ এই সংসার সৃষ্টির আদি এবং অন্তের বিষয়ে আমার কোনো জ্ঞান নেই। সেই জন্য গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক নং. ৩৪-এ বলেছেন যে, কোনো তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছ থেকে ঐ পূর্ণ পরমাত্মার বিষয়ে জ্ঞান জানো, এই গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১-এর মধ্যে ঐ তত্ত্বদর্শী সন্তের পরিচয়ের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি সংসার রূপী বৃক্ষের প্রতিটি বিভাগের জ্ঞান করাবেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করো। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪ -এ বলা হয়েছে যে, ঐ তত্ত্বদর্শী সন্তের সন্ধান পাওয়ার পর, পরমেশ্বরের ঐ পরম পদের খোঁজ করা উচিত, অর্থাৎ ঐ তত্ত্বদর্শী সন্তের বলা, বিধি অনুসারে সাধনা করা উচিত, যার ফলে পূর্ণ মোক্ষ (অনাদি মুক্তি) পাওয়া যায়, গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১৬-১৭ -তে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তিনজন প্রভু আছেন, তাদের মধ্যে একজন ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম), দ্বিতীয় জন অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) এবং তৃতীয় জন হলেন পরম অক্ষর পুরুষ (পূর্ণ ব্রহ্ম)। ক্ষর পুরুষ এবং অক্ষর পুরুষ বাস্তবে অবিনাশী নয়। সেই অবিনাশী পরমাত্মা তো এই দুই প্রভু থেকে ভিন্ন অন্য কেউ আছেন। তিনিই তিন লোকে প্রবেশ করে সকলের পালন-পোষণ করেন।

উপরোক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪ এবং ১৬-১৭ তে এটি প্রমাণিত হল যে, উল্টো ভাবে ঝুলে থাকা সংসার রূপী বৃক্ষের মূল অর্থাৎ শিকড় তো হল পরম অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম। যাঁর থেকে সম্পূর্ণ বৃক্ষের পালন হয়ে থাকে, এবং এই বৃক্ষের যে অংশ ভূমির বাইরে মাটির উপরে দেখতে পাওয়া যায়, তাকে কাণ্ড বলা হয়, একে অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্ম জানো। উপরের দিকে ঐ কাণ্ড থেকে অন্যান্য মোটা ডাল বের হয়, সেই ডালগুলির মধ্যে একটি ডালকে ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ মনে করো এবং ঐ ডাল থেকে অন্য তিনটি শাখাও বের হয়, সেগুলিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব জানো, আর ঐ শাখাগুলি থেকে যে সমস্ত পাতা বের হয়েছে, সেগুলিকে সাংসারিক প্রাণী জানো। উপরোক্ত গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক নং ১৬-১৭-তে স্পষ্ট ভাবে বলা আছে যে, ক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) এবং অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম) এবং এনাদের লোকে যতপ্রাণী আছে, তাদের স্থূল শরীর তো নাশবান এবং জীবাত্মা অবিনাশী অর্থাৎ উপরোক্ত দুই প্রভু এবং এনাদের অন্তর্গত সকল প্রাণীই নাশবান। যদিও অক্ষর পুরুষকে (পরব্রহ্মকে) অবিনাশী বলা হয়, কিন্তু বাস্তবে অবিনাশী পরমাত্মা তো এই দুইজনের থেকে ভিন্ন অন্য কেউ আছেন। তিনিই তিনলোকে প্রবেশ করে সকলের

এই সংসার হল, উল্টো বৃক্ষের মত যেমন – উপরে মূল (শিকড়) নীচে শাখা (ডাল বা পাতা) রূপী বৃক্ষের চিত্র
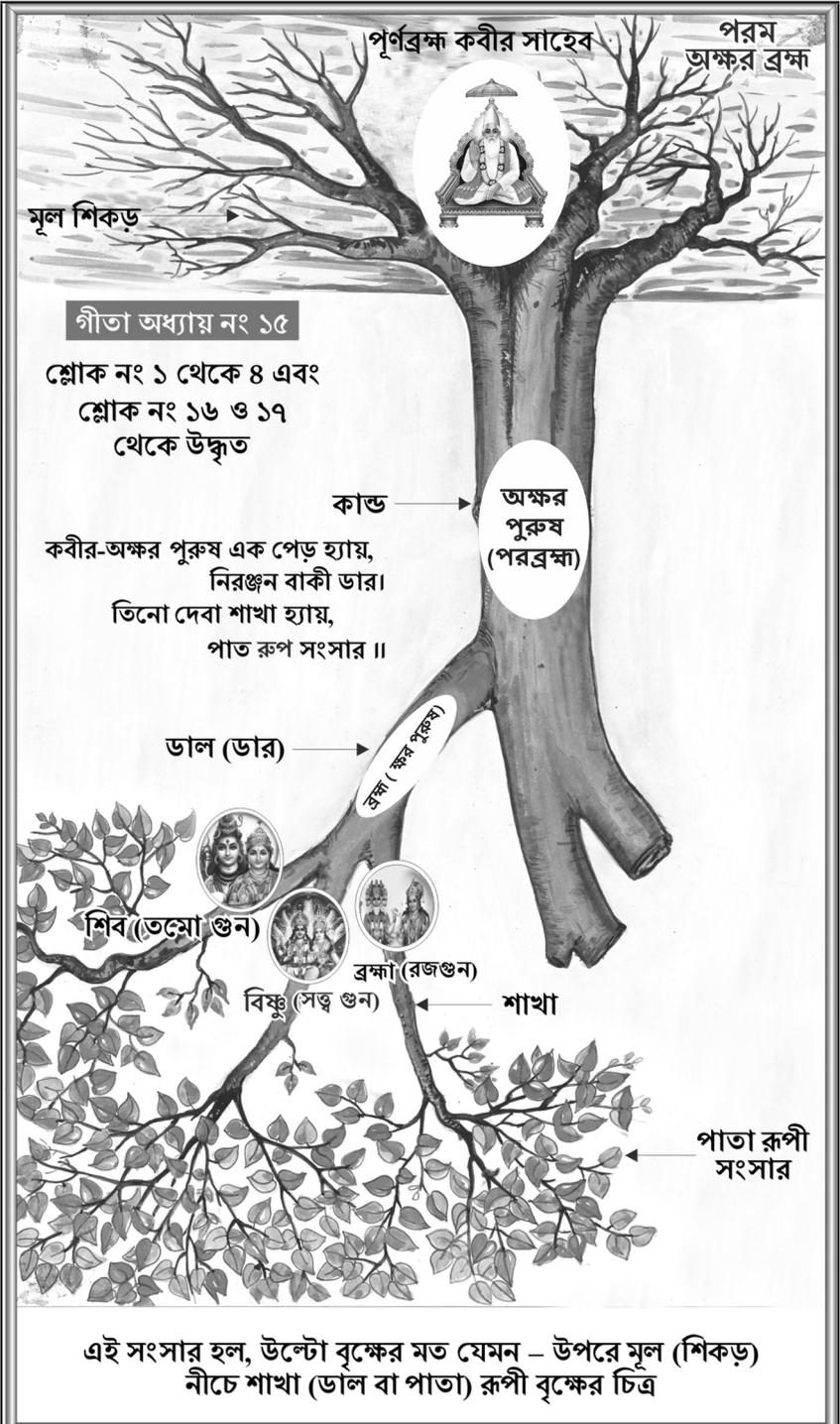
পালন-পোষন করেন। উপরোক্ত বিবরণের মধ্যে তিনটি প্রভুর আলাদা-আলাদা বিবরণ দেওয়া আছে।

## "পবিত্র বাইবেল এবং পবিত্র কুরান শরীফে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ"

এই প্রমাণ পবিত্র বাইবেলে এবং পবিত্র কুরান শরীফের মধ্যেও আছে। কুরান শরীফের মধ্যে পবিত্র বাইবেলের জ্ঞানও আছে, এইজন্য এই দুটি পবিত্র সদগ্রন্থ মিলে প্রমাণিত করেছে যে, সৃষ্টির রচয়িতা কে? এবং তিনি কেমন দেখতে? আর তাঁর বাস্তবিক নাম'ই বা কি ?

পবিত্র বাইবেল (উৎপত্তি গ্রন্থ পৃষ্ঠা নং ২, অঃ ১:২০- ২.৫ তে)

**ষষ্ঠ দিন:- প্রাণী আর মানুষ :**

অন্য সকল প্রাণী রচনা করে, ২৬. তারপর পরমেশ্বর বললেন, আমি মানুষকে নিজের স্বরূপে নিজের মত বানিয়েছি, যে সর্ব প্রাণীদের নিজেদের অধীনে রাখবে। ২৭. তখন পরমেশ্বর মানুষকে নিজের স্বরূপ অনুসারে উৎপন্ন করেন। নর আর নারী রূপে মানুষকে সৃষ্টি করেন।

২৯. প্রভু মানুষের খাওয়ার জন্য বীজওয়ালা দানাশস্য, সবুজ শাক সবজি, ছোট ছোট গাছ ও যে গাছে বীজ ওয়ালা ফল হয় তা ভোজনের জন্য প্রদান করলেন, (মাছ, মাংস ইত্যাদি খেতে বলেননি।)

**সপ্তম দিন:- বিশ্রামের দিন**

পরমেশ্বর ষষ্ঠ দিনে সর্ব সৃষ্টি উৎপন্ন করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেন।

পবিত্র বাইবেলে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, পরমাত্মা মানব সদৃশ্য শরীর যুক্ত।

তিনি ছয় দিনে সর্ব সৃষ্টির উৎপত্তি করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেন। পবিত্র কোরান শরীফ (সুরত ফুর্কানি ২৫, আয়ত নং ৫২, ৫৮, ৫৯)

**আয়ত ৫২:- ফলা তুতিঅল্- কাফিরণ ব জহিদ্হুম বিহী জিহাদন্ কবীরা (কবীরন)। ৫২।**

এর ভাবার্থ এই যে, হজরত মুহম্মদের খুদা (প্রভু ) বলছেন যে, হে পৈগম্বর! তুমি কাফিরদের (যারা এক প্রভুর ভক্তি ত্যাগ করে অন্য দেবী-দেবতাদের মূর্তি ইত্যাদির পূজা করে) কথা শুনবে না, কারণ ঐ লোকেরা কবীরকে পূর্ণ পরমাত্মা মানে না, তুমি আমার দ্বারা দেওয়া কুরাণ শরীফের জ্ঞানের আধারে অটল থাকবে যে, কবীরই পূর্ণ প্রভু এবং কবীর আল্লাহের জন্যই সংঘর্ষ করবে (লড়াই করবে না) অর্থাৎ কোরানের জ্ঞানের আধারে দৃঢ় থাকবে, লড়াই করবে না।

**আয়ত ৫৮:- বৃ তবক্কাল্ অলল, হরুল্লিজী লা যমূতু ব সব্বিহ বিহম্দিহী ব কফা বিহী বিজুনূবি ইবাদিহী খবীরা (কবীরা) ॥ ৫৮ ॥**

ভাবার্থ এই যে, হজরত মুহম্মদ জী স্বয়ং যাকে প্রভু মানেন, সেই আল্লাহ (প্রভু) কোনো অন্য পূর্ণ প্রভুর দিকে সংকেত করছেন এবং বলছেন যে, হে পৈগম্বর! ঐ কবীর পরমাত্মার উপর বিশ্বাস রাখ, যে তোকে জিন্দা মহাত্মা রূপে এসে দর্শন দিয়েছিলেন।সে কখনো মৃত্যুবরণ করে না, অর্থাৎ বাস্তবে (আসলে) তিনি অবিনাশী। প্রশংসার সাথে ওনার মহিমার (পাকী ) গুনগান করে যা, ঐ কবীর আল্লাহ (কবির্দের) পূজার যোগ্য। তিনি নিজের উপাসকের সমস্ত পাপ বিনাশ করে দেন।

**আয়ত ৫৯:-অল্লজী খলকস্সমাবাতি বল্অর্জ ব মা বৈনহুমা ফী সিত্ততি অয্যামিন্ সুম্মস্তবা অলল্অর্শি অর্রহমানু ফস্অল বিহী খবীরন্ (কবীরন) ॥ ৫৯ ॥**

**ভাবার্থ:**- হজরত মুহম্মদকে কুরান শরীফের জ্ঞান বলা প্রভু (আল্লাহ) বলছেন যে, এই কবীর প্রভূ তো সেই প্রভু, যিনি ধরতী ও আকাশের মাঝখানে যা কিছু আছে, সেই সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করে এবং সপ্তম দিনে উপরের আকাশে সতলোকে সিংহাসনে বিরাজমান হয়ে যান। তাঁর বিষয়ে জানার জন্য কোনো (বাখবর) তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো, ঐ পূর্ণ পরমাত্মার প্রাপ্তি কিভাবে হবে অর্থাৎ বাস্তবিক জ্ঞান তো কোনো তত্ত্বদর্শী সন্তের (বাখবরের) কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো, আমি জানি না।

উপরোক্ত দুই পবিত্র ধর্মের (ঈসাই ও মুসলমান) পবিত্র শাস্ত্র দুটি একসাথে মিলে প্রমাণিত করে দিয়েছে যে, সকল সৃষ্টির রচনা কর্তা, সর্ব পাপ বিনাশক, সর্ব শক্তিমান, অবিনাশী পরমাত্মা মানব সদৃশ্য শরীরের আকারে আছেন এবং সতলোকে থাকেন। ওনার নাম কবীর, ওনাকেই আল্লাহু আকবিরু বলা হয়।

শ্রদ্ধেয় ধর্মদাস জী পূজ্য কবীর প্রভু কে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে সর্ব শক্তিমান! আজ পর্যন্ত এই তত্ত্বজ্ঞান কেউ বলেনি, বেদ বিশেষজ্ঞরাও বলেনি। এই থেকে প্রমাণিত হয় যে, চার বেদ এবং চারটি পবিত্র কতেব (কুরান শরীফ প্রভৃতি) মিথ্যা। কিন্তু পূর্ণ পরমাত্মা বলেন:-

**কবীর, বেদ কতেব ঝুঠে নহীঁ ভাই, ঝুঠে হেঁ যো সমঝে নাহিঁ।**

**ভাবার্থ:**-চারটি পবিত্র বেদ (ঋগবেদ, অথর্ববেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ) এবং পবিত্র চারটি কতেব (কুরান শরীফ-জবুর-তৌরাত-ইঞ্জিল) মিথ্যা নয়। কিন্তু যারা এরগুলির অর্থ বুঝতে পারেনি তারা অজ্ঞানী (নাদান) ।

## “পূজ্য কবীর পরমেশ্বরের (কবীর্দেব) অমৃত বাণীতে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ”

⇨ **বিঃ.দ্রঃ** :- নিম্নের অমৃতবাণী গুলি সন্ ১৪০৩ থেকে {যখন পূজ্য কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) লীলাময় শরীরে পাঁচ বছর বয়সী ছিলেন} সন্ ১৫১৮ সালের {যখন কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) মগহর স্থান থেকে সশরীরে সতলোকে চলে যান।} মধ্যবর্তী সময় প্রায় ৬০০ বছর পূর্বে পরম পূজ্য কবীর পরমেশ্বর (কবির্দেব) তাঁর নিজ সেবক (দাস ভক্ত) শ্রদ্ধেয় ধর্মদাস সাহেব জী কে শুনিয়েছিলেন এবং ধনী ধর্মদাস সাহেব তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু ঐ সময় পবিত্র হিন্দু সমাজের ও পবিত্র মুসলমান সমাজের অজ্ঞানী গুরুরা (নীম-হাকিমরা) বলেছিল যে, এই ধানক (তাঁতি) কবীর মিথ্যা কথা বলছে। কোনো সদগ্রন্থের মধ্যে শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু, শ্রী শিবের মাতা পিতার নাম উল্লেখ নেই। এই তিনজন প্রভু অবিনাশী, এনাদের জন্ম মৃত্যু হয় না। নাই বা পবিত্র বেদ এবং পবিত্র কুরান শরীফ প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে কবীর পরমেশ্বরের প্রমাণ আছে, তার পরিবর্তে পরমাত্মা নিরাকার লেখা আছে। আমরা প্রতিদিন পড়ি। সহজ সরল আত্মারা এই বিজ্ঞদের (চতুর গুরুদেব) উপর সহজে বিশ্বাস করে নেয় যে, সত্য কথা তো এই কবীর তাঁতি তো অশিক্ষিত! কিন্তু গুরুদেব শিক্ষিত, নিশ্চয় সত্য কথা বলছেন। আজ সেই সমস্ত সত্য সভ্য সমাজের শিক্ষিত মানুষের কাছে উন্মোচিত হচ্ছে, এবং আমাদের সর্ব পবিত্র ধর্মের সকল পবিত্র সদ্গ্রন্থ তার সাক্ষী দিচ্ছে, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ণ পরমেশ্বর সকল সৃষ্টির রচনা কর্তা, সর্ব কূলের মালিক এবং সর্বজ্ঞ হলেন কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) , যিনি কাশী (বেনারস) শহরে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের উপর প্রকট হয়েছিলেন এবং ১২০ বছর ধরে নিজের বাস্তবিক তেজোময় শরীরের উপর মানব সদৃশ্য হালকা তেজপুঞ্জের শরীর বানিয়ে ছিলেন এবং নিজের দ্বারা রচিত সৃষ্টির একদম সঠিক (বাস্তবিক) জ্ঞান প্রদান

করে সশরীরে সতলোকে চলে গিয়েছেন। কৃপা করে প্রভু প্রেমী পাঠকগণ পড়ুন, কবীর সাহেব জী দ্বারা উচ্চারিত করা নিচে লেখা অমৃতবাণী:-

**ধর্মদাস য়হ জগ বৌরনা। কোঈ ন জানে পদ নিরবানা ॥ 1॥**
**য়হী কারণ মৈঁ কথা পসারা। জগসে কহিয়ো রাম নিয়ারা॥**
**যহী জ্ঞান জগ জীব সুনাউ। সব জীবোঁ কা ভরম নশাউ॥ 2॥**
**ভরম গয়ে জগ বেদ পুরাণা। আদি রামকা ভেদ ন জানা॥ 3॥**
**রাম রাম সব জগত বাখানে। আদি রাম কোঈ বিরলা জানে॥ 4॥**
**জ্ঞানী সুনে সো হিরদৈ লগাঈ। মূর্খ সুনে সো গম্য না পাঈ॥ 5॥**
**অব মৈঁ তুমসে কহূঁ চিতাঈ। ত্রিদেবন কী উৎপত্তি ভাঈ॥ 6॥**
**কুছ সংক্ষেপ কহূঁ গৌহরাঈ। সব সংশয় তুম্হরে মিট জাঈ॥ 7॥**
**মাঁ অষ্টঙ্গী পিতা নিরঞ্জন। বে জম দারুন বংশন অঞ্জন॥ 8॥**
**পহিলে কীন্হ নিরঞ্জন রাঈ। পীছে সে মায়া উপজাঈ॥ 9॥**
**মায়া রূপ দেখ অতি শোভা। দেব নিরঞ্জন তন মন লোভা॥ 10॥**
**কামদেব ধর্মরায় সত্তায়ে। দেবী কো তুরতহী ধর খায়ে॥ 11॥**
**পেট সে দেবী করি পুকারা। সাহব মেরা করো উবরা॥ 12॥**
**টের সুনী তব হম তহাঁ আয়ে। অষ্টঙ্গী কো বন্দ ছুড়ায়ে॥ 13॥**
**সতলোক মেঁ কীন্হা দুরাচারি, কাল নিরঞ্জন দিন্হা নিকারি॥ 14॥**
**মায়া সমেত দিয়া ভগাঈ, সোলহ সঙ্খ কোস দূরী পর আঈ॥ 15॥**
**অষ্টঙ্গী ঔর কাল অব দোঈ, মন্দ কর্ম সে গএ বিগোঈ॥ 16॥**
**ধর্মরায় কো হিকমত কীন্হা। নখ রেখা সে ভগকর লিন্হা॥ 17॥**
**ধর্মরায় কিনহাঁ ভোগ বিলাসা। মায়া কো রহী তব আসা॥ 18॥**
**তীন পুত্র অষ্টঙ্গী জায়ে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নাম ধরায়ে॥ 19॥**
**তীন দেব বিস্তার চলায়ে। ইনমেঁ য়হ জগ ধোকা খায়ে॥ 20॥**
**পুরুষ গম্য কৈসে কো পাবৈ। কাল নিরঞ্জন জগ ভরমাবৈ॥ 21॥**
**তীন লোক অপনে সুত দীন্হা। সুন্ন নিরঞ্জন বাসা লিন্হা॥ 22॥**
**অলখ নিরঞ্জন সুন্ন ঠিকানা। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ভেদ ন জানা॥ 23॥**
**তীন দেব সো উনকো ধাবেঁ। নিরঞ্জন কা বে পার না পাবেঁ॥ 24॥**
**অলখ নিরঞ্জন বড়া বটপারা। তীন লোক জিব কীন্হ অহারা॥ 25॥**
**ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নহীঁ বচায়ে। সকল খায় পুন ধূর উড়ায়ে॥ 26॥**
**তিনকে সুত হৈঁ তীনোঁ দেবা। আঁধর জীব করত হৈঁ সেবা॥ 27॥**
**অকাল পুরুষ কাহূ নহীঁ চীন্হাঁ। কাল পায় সবহী গহ লীন্হা।28॥**
**ব্রহ্ম কাল সকল জগ জানে। আদি ব্রহ্ম কো না পহিচানে॥ 29॥**
**তীনোঁ দেব ঔর ঔতারা। তাকো ভজে সকল সংসারা॥ 30॥**
**তীনোঁ গুণ কা য়হ বিস্তারা। ধর্মদাস মৈঁ কহোঁ পুকারা॥ 31॥**
**গুণ তীনোঁ কী ভক্তি মেঁ, ভূল পরো সংসার॥ 32॥**
**কহৈ কবীর নিজ নাম বিন, কৈসে উতরৈ পার॥ 33॥**

উপরোক্ত অমৃতবাণীতে পরমেশ্বর কবীর সাহেব জী নিজের সেবক শ্রী ধর্মদাস সাহেবকে বলেছেন যে, ধর্মদাস! এই সম্পূর্ণ সংসার তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে বিচলিত হয়ে আছে, কেউই পূর্ণ মোক্ষ মার্গের এবং পূর্ণ সৃষ্টি রচনার জ্ঞান জানে না। এই জন্য আমি তোমাকে আমার দ্বারা রচিত সৃষ্টির কথা শোনাচ্ছি। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তো তত্ত্বজ্ঞান বুঝে যাবে, কিন্তু যারা সমস্ত প্রমাণ দেখেও সত্যকে স্বীকার করবে না, সেই মূর্খ কালের

প্রভাবে প্রভাবিত, তারা ভক্তি করার যোগ্য নয়। এখন আমি বলছি তিন দেবতাদের (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু এবং শ্রী শিবের) উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে? এনাদের মাতা হলেন অষ্টাঙ্গী (দুর্গা) এবং পিতা হলেন জ্যোতি নিরঞ্জন (ব্রহ্ম, কাল)। সর্ব প্রথম ডিম থেকে ব্রহ্মের উৎপত্তি হয়, তারপর দুর্গার উৎপত্তি হয়, দুর্গার রূপে আসক্ত হয়ে কাল (ব্রহ্ম) অপরাধ (অসভ্য) আচরণ করে, তখন দূর্গা (প্রকৃতি) নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করতে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে ঐ ব্রহ্মের খোলা মুখ দিয়ে পেটের ভিতরে প্রবেশ করে আশ্রয় নেয়।

আমি ওখানে গিয়ে যেখানে জ্যোতি নিরঞ্জন কাল ছিল তখন ভবাণীকে (দুর্গাকে) ব্রহ্মের পেট থেকে বের করে একুশ (২১) ব্রহ্মান্ড সহ দুজন কে ১৬ শঙ্খ ক্রোশ দূরে পাঠিয়ে দিই। জ্যোতি নিরঞ্জন (ধর্মরায়) প্রকৃতি দেবীর (দুর্গা) সাথে ভোগ-বিলাস করে। এই দুই জনের সংযোগে তিন জনের (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু এবং শ্রী শিবের) উৎপত্তি হয়। এই তিন জনেরই (রজোগুন ব্রহ্মা, সত্ত্বগুন বিষ্ণু ও তমোগুণ শিবের) সাধনা করে সকল প্রাণী কাল জালে ফেঁসে আছে। যতক্ষন বাস্তবিক মন্ত্র প্রকৃত সন্তের থেকে পাবে না, পূর্ণ মোক্ষ (মুক্তি) কিভাবে হবে?

⇨ **বিঃ.দ্রঃ-** প্রিয় পাঠকগণ বিচার করুন শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু এবং শ্রী শিবের স্থিতি কে অবিনাশী বলে বোঝানো হয়েছিল। সমস্ত হিন্দু সমাজ এখনো পর্যন্ত এই তিন প্রভু কে অজর-অমর এবং জন্ম-মৃত্যু রহিত বলে মেনে আসছে, অর্থাৎ যেখানে এই তিন জনই নশ্বর অর্থাৎ নাশবান। এদের পিতা হলেন কাল রূপী ব্রহ্ম এবং মাতা দুর্গা (প্রকৃতি, অষ্টাঙ্গী) যেগুলি আপনারা পূর্বে দেওয়া প্রমাণ গুলিতে পড়েছেন। এই জ্ঞান আমাদের শাস্ত্রের মধ্যেই বিদ্যমান কিন্তু হিন্দু সমাজের কলিযুগী গুরুদের, ঋষিদের এবং সন্তদের এই জ্ঞান জানা নেই। যে অধ্যাপক পাঠ্যক্রমের (সিলেবাসের) সাথে পরিচিত নয়, সেই অধ্যাপক সঠিক নয় (বিদ্বান নয়), তিনি বিদ্যার্থীদের ভবিষ্যতের শত্রু।

ঠিক এই প্রকার যে গুরুরা এখনো পর্যন্ত এটা জানে না যে, শ্রী ব্রহ্মা, শ্রী বিষ্ণু এবং শ্রী শিবের মাতা পিতা কে? সেই গুরু, ঋষি, সন্ত নিঃসন্দেহে জ্ঞান হীন। যার কারণে সকল ভক্ত সমাজকে শাস্ত্র বিরুদ্ধ জ্ঞান (লোকদের অর্থাৎ গল্প কথা) শুনিয়ে শুনিয়ে অজ্ঞানতায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। শাস্ত্র বিধি বিরুদ্ধ ভক্তি সাধনা করিয়ে পরমাত্মার বাস্তবিক লাভ (পূর্ণ মোক্ষ) থেকে বঞ্চিত করে রাখে, এবং সকলের মানব জন্ম নষ্ট করিয়ে দেয়। কারণ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩-২৪ এ এরই প্রমাণ দেওয়া আছে যে, যারা শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে মনমর্জি বিধিতে পূজা-অর্চনা করে তাদের কোনো লাভ হয় না। পূর্ণ পরমাত্মা কবীর জী পাঁচ বছর বয়সী নিজের লীলাময় শরীরে, ১৪০৩ সাল থেকেই সর্ব শাস্ত্র যুক্ত জ্ঞান নিজের অমৃত বাণীর (কবিরবাণী) মাধ্যমে বলা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই অজ্ঞানী গুরুরা এই জ্ঞান ভক্ত সমাজের কাছে পৌঁছাতে দেয়নি, যা বর্তমানে সর্ব সদগ্রন্থ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, কবির্দেব (কবীর প্রভু) তত্ত্বদর্শী সন্ত রূপে স্বয়ং পূর্ণ পরমাত্মই এসেছিলেন।

## "আদরনীয় গরীবদাস সাহেবের অমৃত বাণীতে সৃষ্টি রচনার প্রমাণ।"

**আদি রমৈণী (সদ গ্রন্থ পৃষ্ঠা নং ৬৯০ থেকে ৬৯২ পর্যন্ত)**

**আদি রমৈণী অদলী সারা। জা দিন হোতে ধুঁধুংকারা ॥ ১॥**
**সতপুরুষ কীন্হা প্রকাশা। হম হোতে তখত্ কবীর খবাসা ॥ ২॥**
**মন মোহিনী সিরজী মায়া। সত্পুরুষ এক খ্যাল বনায়া ॥ ৩॥**
**ধর্মরায় সিরজে দরবানী। চৌসঠ জুগ তপ সেবা ঠাঁনী ॥ ৪॥**

পুরুষ পৃথিবী জাকূঁ দীন্হী। রাজ করো দেবা আধীনী ॥ ৫॥
ব্রহ্মাণ্ড ইকীস রাজ তুম্হ দীন্হা, মন কী ইচ্ছা সব জুগ লীন্হা ॥ ৬॥
মায়া মূল রূপ এক ছাজা। মোহি লিয়ে জিনহুঁ ধর্মরাজা॥ ।৭॥
ধর্ম কা মন চঞ্চল চিত ধারয়া। মন মায়া কা রূপ বিচারা ॥ ৮॥
চঞ্চল চেরী চপল চিরাগা। যা কে পরসে সরবস জাগা ॥ ৯॥
ধর্মরায় কীয়া মন কা ভাগী। বিষয় বাসনা সংঙ্গ সে জাগী ॥ ১০॥
আদি পুরুষ অদলি অনরাগী। ধর্মরায় দিয়া দিল সেঁ ত্যাগী ॥ ১১॥
পুরুষ লোক সেঁ দিয়া ঢহাহী। অগম দীপ চলি আয়ে ভাঈ॥ ১২॥
সহজ দাস জিস দীপ রহঁতা। কারণ কৌঁন কৌঁন কুল পন্থা ॥ ১৩॥
ধর্মরায় বোলে দরবানী। সুনো সহজ দাস ব্রহ্ম জ্ঞানী ॥ ১৪॥
চৌসঠ জুগ হম সেবা কীন্হী।পুরুষ পৃথিবী হম কূঁ দীন্হী ॥ ১৫॥
চঞ্চল রূপ ভয়া মন বৌরা। মনমোহিনী ঠগিয়া ভৌঁরা ॥ ১৬॥
সতপুরুষ কে না মন ভায়ে। পুরুষ লোক সে হম চলি আয়ে॥ ১৭॥
অগর দীপ সুনত বড়ভাগী। সহজ দাস মেটো মন পাগী ॥ ১৮॥
বোলে সহজদাস দিল দানী। হম তো চাকর সত্ সহদানী ॥ ১৯॥
সতপুরুষ সেঁ অরজ গুজারূঁ। জব তুমহারা বিবাণ উতারূঁ ॥ ২০॥
সহজ দাস কো কীয়া পীয়ানা। সত্যলোক লীয়া প্রবানা। ॥ ২১॥
সতপুরুষ সাহিব সরবংগী। অবিগত অদলী অচল অভংগী ॥ ২২॥
ধর্মরায় তুম্হরা দরবানী। অগর দীপ চলি গয়ে প্রাণী ॥ ২৩॥
কৌঁন হুকম করী অরজ অবাজা। কহাঁ পঠাবৌ উস ধর্মরাজা ॥ ২৪॥
ভঈ অবাজ অদলী এক সাচা। বিষয় লোক জা তীন্যুঁ বাচা ॥ ২৫॥
সহজ বিমাঁন চলে অধিকাঈ। ছিন মেঁ অগর দীপ চলি আঈ॥ ২৬॥
হমতো অরজ করী অনরাগী। তুম্হ বিষয় লোক জাবো বড়ভাগী॥ ২৭॥
ধর্মরায় কে চলে বিমানা। মানসরোবর আয়ে প্রাণা ॥ ২৮॥
মানসরোবর রহন ন পায়ে। দরৈ কবীরা থাঁনা লয়ে ॥ ২৯॥
বংকনাল কী বিষমী বাটী। তহাঁ কবীরা রোকী ঘাটী ॥ ৩০॥
ইন পাঁচোঁ মিলি জগত বঁধানা। লখ চৌরাশী জীব সন্তানা ॥ ৩১॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মায়া। ধর্মরায় কা রাজ পঠায়া ॥ ৩২॥
যৌহ খোকা পুর ঝূঠী বাজী। ভিসতি বৈকুণ্ঠ দগাসী সাজী॥ ৩৩॥
কৃতিম জীব ভুলাঁনেঁ ভাঈ। নিজ ঘর কী তো খবরি ন পাঈ॥ ৩৪॥
সবা লাখ উপজেঁ নিত হংসা, এক লাখ বিনশেঁ নিত অংসা ॥ ৩৫॥
উপতি খপতি প্রলয় ফেরী। হর্ষ শোক জৌঁরা জম জেরী॥ ৩৬॥
পাঁচোঁ তত্ব হৈঁ প্রলয় মাঁহী। সত্ত্বগুণ রজোগুণ তমোগুণ ঝাঁঈ॥ ৩৭॥
আঠোঁ অঙ্গ মিলী হৈ মায়া। পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সকল ভরমায়া॥ ৩৮॥
যা মেঁ সুরতি শব্দ কী ডোরী। পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড লগী হৈ খোরী॥ ৩৯॥
শ্বাসা পারস মন গহ রাখো॥ খোল্হি কপাট অমীরস চাখো॥ ৪০॥
সুনাউঁ হংস শব্দ সুন দাসা। অগম দীপ হৈ অগ হৈ বাসা ॥ ৪১॥
ভবসাগর জম দণ্ড জমানা। ধর্মরায় কা হৈ তলবাঁনা ॥ ৪২॥
পাঁচোঁ উপর পদ কী নগরী। বাট বিহংগম বঁকী ডগরী॥ ৪৩॥
হমরা ধর্মরায় সোঁ দাবা। ভবসাগর মে জীব ভরমাবা ॥ ৪৪॥
হম তো কহেঁ অগম কী বাণী। জহাঁ অবিগত অদলী আপ বিনানী ॥ ৪৫॥

**বন্দী ছোড় হমারা নামম্। অজর অমর হৈ অস্থীর ঠামম্॥ ৪৬॥**
**জুগন জুগন হম কহতে আয়ে। জম জৌঁরা সেঁ হংস ছুটায়ে॥ ৪৭॥**
**জো কোঈ মানেঁ শব্দ হমারা। ভবসাগর নহী ভরমে ধারা॥ ৪৮॥**
**যা মেঁ সুরতি শব্দ কা লেখা। তন অন্দর মন কহো কীন্হী দেখা॥ ৪৯॥**
**দাস গরীব অগম কী বাণী। খোজা হংসা শব্দ সহদানী॥ ৫০॥**

উপরে উল্লেখিত অমৃত বাণীর ভাবার্থ, শ্রদ্ধেয় গরীব দাস সাহেব জী বলছেন যে, পূর্বে এখানে শুধুমাত্র অন্ধকার ছিল এবং পূর্ণ পরমাত্মা কবীর সাহেব জী সতলোকে সিংহাসনের (তখ্ত) উপরে বিরাজমান ছিলেন। আমরা ওখানে চাকর ছিলাম, প্রথমে পরমাত্মা জ্যোতি নিরঞ্জনকে উৎপন্ন করেন। তারপর তার তপস্যার প্রতিফলে একুশ ব্রহ্মাণ্ড প্রদান করেন। তারপর মায়ার (প্রকৃতি/দুর্গা) উৎপত্তি করেন। যুবতী দুর্গার রূপে মুগ্ধ (মোহিত) হয়ে জ্যোতি নিরঞ্জন (ব্রহ্ম) দুর্গার (প্রকৃতি) ইজ্জত নেওয়ার চেষ্টা করে। ব্রহ্ম তার অপরাধের সাজা পায়। তাঁকে সতলোক থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং অভিশাপ দেয় যে, এক লক্ষ সূক্ষ্ম মানব শরীর ধারী প্রাণীদেরকে প্রতিদিন আহার করবে এবং সওয়া লাখ উৎপন্ন করবে। তাই এখানে সমস্ত প্রাণী জন্ম-মৃত্যুর কষ্ট ভোগ করছে। যদি কেউ পূর্ণ পরমাত্মার বাস্তবিক শব্দ (প্রকৃত নাম জপের মন্ত্র) আমার (সন্ত গরীবদাস জী) থেকে প্রাপ্ত করে নেয়, তাহলে তাকে কালের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেব। আমার নাম বন্দীছোড়। শ্রদ্ধেয় গরীব দাস জী নিজের গুরুদেব এবং প্রভু কবীর পরমাত্মার আধারে বলছেন যে, প্রকৃত স্বচ্ছ মন্ত্র, অর্থাৎ সত্যনাম এবং সারশব্দ প্রাপ্তি করে নাও, তাহলে পূর্ণ মোক্ষ (মুক্তি) হয়ে যাবে। তা না হলে নকল নাম দাতা সন্ত মহন্তদের মিষ্টি কথায় ফেঁসে গিয়ে শাস্ত্র বিধি বিরুদ্ধ সাধনা করে কাল জালে বন্দী হয়ে রয়ে যাবে। তারপর কষ্টের পর কষ্ট অর্থাৎ মহাকষ্ট ভোগ করতে থাকবে।

সন্ত গরীব দাস জীর অমর গ্রন্থের অধ্যায় “হংস পরম হংস” কথার বাণী নং ৩৭-৪৩ এ বলেছেন যে :-

**মায়া আদি নিরঞ্জন ভাঈ, অপনে জায়ে আপৈ খাঈ।**
**ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর চেলা, ওঁ সোহম কা হৈ খেলা॥ ৩৭॥**
**শিখর সুন্ন মেঁ ধর্ম অন্যায়ী, জিন শক্তি ডায়ন মহল পঠাঈ॥**
**ঐলাখ গ্রাসৈ নিত উঠ দূতী, মায়া আদি তখত্ কী কুতী॥ ৩৮॥**
**সবা লাখ ঘড়িয়ে নিত ভাণ্ডে, হংসা উত্পত্তি প্রলয় ডাণ্ডে।**
**য়ে তীনোঁ চেলা বট পারী, সিরজে পুরুষা সিরজী নারী॥ ৩৯॥**
**খোকাপুর মেঁ জীব ভুলায়ে, স্বপনা নরক বৈকুণ্ঠ বনায়ে।**
**য়ৌহ হরহট কা কুবা লোঈ, যা গল বন্ধ্যা হৈ সব কোঈ॥ ৪০॥**
**কীড়ী কুঞ্জর ঔর অবতারা, হরহট ডোরী বন্ধে কোঈ বারা।**
**অরব অলীল ইন্দ্র হুয়ে হৈঁ ভাঈ, হরহট ডোরী বন্ধে সব আঈ॥ ৪১॥**
**শেষ মহেশ অরু গণেশ তাঁঈ, হরহট ডোরী বন্ধে সব আঈ।**
**শুক্রাদিক ব্রহ্মাদিক দেবা, হরহট ডোরী বন্ধে সব খেবা॥**
**কোটিক কর্তা ফিরতা দেখ্যা, হরহট ডোরী কহূঁ সুন লেখা ॥ ৪২॥**
**চতুর্ভুজী ভগবান কহাবৈঁ, হরহট ডোরী বন্ধে সব আবৈঁ॥**
**যৌহ হৈ খোখা পুর কা কূবা, যা মেঁ পড়য়া সো নিশ্চয় মুবা ॥ ৪৩ ॥**

জ্যোতি নিরঞ্জনের (কাল বলীর) বশবর্তী হয়ে এই তিন দেবতা (রজোগুন ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু ও তমোগুন শিব) নিজেদের মহিমা দেখিয়ে সকল জীবকে স্বর্গ-নরক এবং ভবসাগরে (চুরাশি লক্ষ যোনীতে) ভ্রমিত করতে থাকে। জ্যোতি নিরঞ্জন নিজের

মায়া দ্বারা নাগিনীর মতো জীব উৎপন্ন করে। তারপর নিজেই তাদের মেরে ফেলে। যেমন করে নাগিনী নিজের লম্বা লেজ দিয়ে ডিমের চারিদিকে কুণ্ডলী বানিয়ে রাখে। ঠিক তারপর সেই ডিমের ওপর নিজের ফনা মারতে থাকে। যার ফলে অনেক গুলি ডিম এক সাথে ফেটে যায়, এবং তার মধ্যে থেকে বাচ্চা গুলি বেরিয়ে আসার পর নাগিনী তাদের খেয়ে ফেলে। ভাগ্যক্রমে যদি কোনো বাচ্চা নাগিনীর কুণ্ডলীর বাইরে বেরিয়ে আসে, তখন তারাই বেঁচে যায়। তা না হলে কুণ্ডলীর মধ্যে থাকা কাউকেই সে (নাগিনী) ছাড়ে না। যে সমস্ত বাচ্চারা কুণ্ডলীর মধ্যে থাকে, তাদের সবাইকেই খেয়ে ফেলে। যে সাধক ব্রহ্ম (কাল ব্রহ্ম অর্থাৎ জ্যোতি নিরঞ্জন দেবী পূজা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং অন্যান্য দেবতারদের ভক্তিতে সীমিত আছে, তারা কালব্রহ্ম রূপী নাগিনীর কুণ্ডলীতে অর্থাৎ জন্ম মরণের চক্রের মধ্যে কাল লোকে থেকে যায়, যাদেরকে কাল জ্যোতি নিরঞ্জন খায়।

**মায়া কালী নাগিনী, অপনে জায়ে খাত ।**
**কুণ্ডলী মেঁ ছোড়ে নহীঁ, সৌ বাতোঁ কী বাত ॥**

এই প্রকারে কাল লোকের সর্বত্র কালবলীর জাল বিছিয়ে রেখেছে। এমনকি যদি নিরঞ্জনের ভক্তিও পূর্ণ সন্তের (গুরুর) কাছ থেকে নিয়ে করা হয়, তাহলেও কেউ এই নিরঞ্জনের কুণ্ডলীর (একুশ ব্রহ্মাণ্ডের) বাইরে বের হতে পারবে না স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ আদি মায়া অর্থাৎ দেবী দুর্গাও নিরঞ্জনের কুণ্ডলীর মধ্যে আছে। এ বেচারা অবতার ধারণ করে এখানে আসে, আর জন্ম-মৃত্যু রূপী চক্রে ভ্রমিত হতে থাকে। এই জন্য বিচার করুন, সোহং জপ যা ধ্রুব, প্রহ্লাদ এবং সুকদেব ঋষি জপ করেছিলেন, তবুও তারা পার হতে পারেনি, কারণ শ্রী বিষ্ণু পুরাণের প্রথম অংশের ১২ তম অধ্যায় ৯৩ শ্লোক অর্থাৎ ৫১ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, ধ্রুব কেবল মাত্র এক কল্প অর্থাৎ এক হাজার চতুর্যুগ পর্যন্ত মুক্তি পেয়েছিল।

এই জন্য তিনিও কাল লোকের মধ্যে রয়ে যায় এবং 'ওঁ নমঃ ভাগবতে বাসুদেবায়' মন্ত্র জপ করা ভক্তরাও শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত ভক্তি করছে, তারাও চুরাশি লক্ষ প্রকার যোনীতে ভ্রমণ করা থেকে রক্ষা পাবে না। এই কথাগুলি পরম পূজ্য কবীর সাহেব জী এবং শ্রদ্ধেয় গরীব দাস জী মহারাজের বাণীই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেয়।

**অনন্ত কোটি অবতার হৈঁ, মায়া কে গোবিন্দ।**
**কর্তা হো হো অবতরে, বহুর পড়ে জম ফন্ধ ॥**

সতপুরুষ কবীর সাহেব জীর ভক্তিতেই জীব পূর্ণ মুক্ত হতে পারে। যতদিন না জীব সতলোকে ফিরে না যাবে, ততদিন জীবকে কাল লোকে এইভাবে কর্ম করতে হবে এবং নামজপ ও দান ধর্মের কামাই স্বর্গ রূপী হোটেলে গিয়ে সমাপ্ত করে পুনরায় কর্মের আধারে চুরাশী লক্ষ প্রকার প্রাণীর শরীরে কষ্ট পেতে পেতে কাল লোকে ভ্রমিত হতে থাকবে।

মায়া (দুর্গা) থেকে উৎপন্ন হয়ে কোটি কোটি গোবিন্দ (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব) মারা গিয়েছে। ভগবানের অবতার হয়ে এসেছিলেন তারপর কর্ম বন্ধনে বন্দী হয়ে কর্মের দণ্ড ভোগ করতে চুরাশি লক্ষ প্রকার যোনীতে চলে গিয়েছেন। যেমন, ভগবান শ্রী বিষ্ণুর উপর দেবর্ষি নারদের অভিশাপ লেগেছিল, তাই তিনি শ্রীরামচন্দ্র রূপে অযোধ্যাতে এসেছিলেন, তারপর আবার তিনি অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র রূপে বালীকে বধ করেছিলেন। সেই কর্ম-দন্ড ভোগ করার জন্য শ্রী কৃষ্ণের দ্বাপর যুগে জন্ম হয়। তারপর, সেই বালীর আত্মা শিকারী হয় এবং নিজের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়। শ্রীকৃষ্ণের পায়ে বিষাক্ত তীর মেরে তাকে বধ করেন।
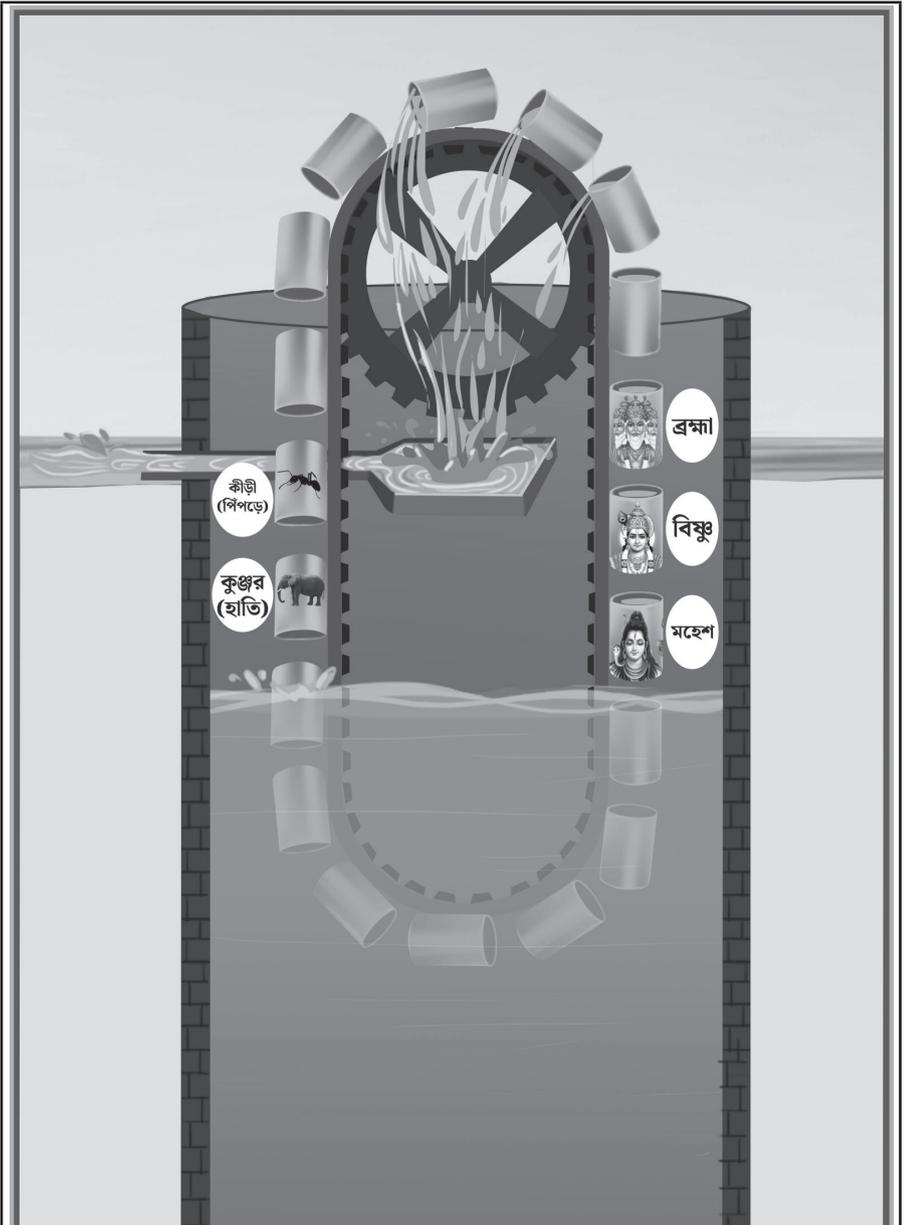
যোহ হরহট কা কুঁয়া লোই, যা গল বন্ধা হে সব কই ।
কীড়ী কুঞ্জর ওর অবতারা, হরহট ডোরী বন্ধে কই বারা ।।

কাল লোকে জন্ম-মৃত্যু রূপী চক্র (হরহট)

মহারাজ গরীব দাস জী নিজের বাণীতে বলেছেন:-

**ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর মায়া, ঔর ধর্মরায় কহিয়ে।**
**ইন পাঁচোঁ মিল পরপঞ্চ বনায়া, বাণী হমরী লহিয়ে॥**
**ইন পাঁচো মিল জীব অটকায়ে, জুগন-জুগন হম আন ছুটায়ে।**
**বন্দী ছোড় হমারা নামম্, অজর অমর হে অস্থির ঠামম্॥**
**পীর পৈগম্বর কুতুব ঔলিয়া, সুর নর মুনিজন জ্ঞানী।**
**যেতা কো তো রাহ্ ন পায়া, জম কে বন্ধে প্রাণী॥**
**ধর্মরায় কী ধূমা-ধামী, জম পর জংগ চলাউঁ।**
**জোরা কো তো জান ন দুঙ্গা, বান্ধ অদল ঘর ল্যাউঁ॥**
**কাল অকাল দোহুঁ কো মোসূং, মহাকাল সির মুণ্ডু॥**
**মৈঁ তো তখত হজূরী হুকুমী, চোর খোজ কূঁ ঢূঁঢূ॥**
**মূল মায়া মগ মেঁ বৈঠী, হংসা চুন-চুন খাঈ।**
**জ্যোতি স্বরূপী ভয়া নিরঞ্জন, মৈঁহী কর্তা ভাঈ॥**
**সঁহস অঠাসী দীপ মুণীশ্বর, বন্ধে মুলা ডোরী।**
**এত্যাঁ মেঁ জম কা তলবানা, চলিয়ে পুরুষ কীশোরী॥**
**মূলা কা তো মাথা দাঙ্গূ, সতকী মোহর করুঙ্গা।**
**পুরুষ দীপ কূঁ হংস চলাউঁ, দরা ন রোকন দুংগা॥**
**হম তো বন্দীছোড় কহাবাঁ, ধর্মরায় হৈ চকবৈ।**
**সতলোক কী সকল সুনাবাঁ, বাণী হমরী অখবৈ॥**
**নৌ লখ পট্টন উপর খেলুঁ, সাহদরে কূ রোকূঁ।**
**দ্বাদস কোটি কটক সব কাটূঁ, হংস পঠাউঁ মোখূঁ ॥**
**চৌদহ ভূবন গমন হৈ মেরা, জল থল মেঁ সরবংগী।**
**খালিক খলক খলক মেঁ খালিক, অবিগত অচল অভংগী॥**
**অগর অলীল চক্র হৈ মেরা, জিত সে হম চল আএ।**
**পাঁচোঁ পর প্রবাণা মেরা, বন্ধি ছুটাবন ধায়ে॥**
**জহাঁ ওঁকার নিরঞ্জন নাহীঁ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু দেব নহীঁ জাহীঁ।**
**জহাঁ করতা নহীঁ কাল ভগবানা, কায়া মায়া পিণ্ড ন প্রাণা॥**
**পাঁচ তত্ত্ব, তীনোঁ গুণ নাহীঁ, জোরা কাল দীপ নহীঁ জাহীঁ।**
**অমর করুঁ সতলোক পঠাউঁ, তাতেঁ বন্দীছোড় কহাউঁ।**

কবীর পরমেশ্বরের (কবির্দেব) মহিমা বলতে গিয়ে, শ্রদ্ধেয় গরীব দাস সাহেব বলেছেন যে, আমার প্রভু কবীর (কবির্দেব) হলেন বন্দীছোড়। বন্দীছোড় এর ভাবার্থ হল, কালের কারাগার থেকে মুক্তি প্রদানকারী। কাল ব্রহ্মের একুশ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব প্রাণী পাপের কারণে কালের কাছে বন্দী আছে। পূর্ণ পরমাত্মা (কবির্দেব) কবীর সাহেব সমস্ত পাপ বিনাশ করে দেন। এই পাপ বিনাশ না ব্রহ্ম, না পরব্রহ্ম আর না ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও শিব করতে পারেন, এনারা কেবল যেমন কর্ম আছে, তেমনিই ফল প্রদান করে থাকেন। এই জন্য যজুর্বেদ অধ্যায় ৫ এর মন্ত্র নম্বর ৩২ এ লেখা আছে যে, 'কবিরংঘারিরসি' = (কবির্) কবির্দেব (কবীর পরমেশ্বর) (অংঘ অরি) পাপের শত্রু 'বম্ভারিরসি = (বম্ভারিঃ) বন্ধনের (অরি) শত্রু অর্থাৎ বন্দীছোড়।

এই পাঁচ জনের (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-মায়া এবং ধর্মরায়) উপরে সতপুরুষ পরমাত্মা (কবির্দেব) আছেন। যিনি সতলোকের মালিক! এই পরব্রহ্ম-ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এবং আদি মায়া এনারা সকলেই নাশবান পরমাত্মা। মহাপ্রলয়ে এনারা সকলেই

এনাদের লোক সহ সমাপ্ত (ধ্বংস) হয়ে যায়। সাধারণ জীবের থেকে কয়েক হাজারগুন বেশি আয়ু এনাদের। তবুও যে সময় এনাদের জন্য নির্ধারিত করা আছে তা একদিন অবশ্যই সমাপ্ত হয়ে যাবে। শ্রদ্ধেয় গরীব দাস জী মহারাজ বলেছেন যে:-

**শিব ব্রহ্মা কা রাজ, ইন্দ্র গিনতী কহাঁ। চার মুক্তি বৈকুণ্ঠ সমঝ, যেতা লহ্যা॥**
**সংখ জুগন কী জুনী, উম্র বড় ধারিয়া। জা জননী কুর্বান, সু কাগজ পারিয়া॥**
**যেতী উম্র বুলন্দ মরৈগা অন্ত রে। সত্‌গুরু লগে ন কান, ন ভেঁটে সন্ত রে॥**

যতই শঙ্খ যুগ সমান দীর্ঘ আয়ু হোক না কেন তা একদিন তা একদিন অবশ্যই শেষ হয়ে যাবে। যদি সতপুরুষ পরমাত্মা (কবির্দেব) কবীর সাহেবের প্রতিনিধি পূর্ণ সন্ত (গুরু), যিনি তিন নামের মন্ত্র (যার মধ্যে একটি ওম্+তত্+সত্ সাংকেতিক আছে) প্রদান করেন এবং তিনি যেন পূর্ণ সন্তের কাছ থেকে নাম দান করার আদেশ পেয়ে থাকেন। তবেই তাঁর কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে নামের কামাই করলে, সতলোকের অধিকারী হংস হতে পারবে। সত্য সাধনা বিনা অনেক লম্বা আয়ুও কোনো কাজে আসবে না, কারণ নিরঞ্জনের লোকে শুধুই দুঃখ আর দুঃখ।

**কবীর, জীবনা তো থাড়ো হী ভলা, জৈ সত্ সুমরন হোয়।**
**লাখ বর্ষ কা জীবনা, লেখৈ ধরৈ না কোয়॥**

⇨ যদি সত্য সাধনা করা হয় তাহলে অল্প আয়ুই ভাল যদি সত্য সাধনা সৎ পুরুষের না হয় কাল ব্রহ্মের বা দেব দেবীদের পূজা করে অথবা প্রণায়াম ইত্যাদি করে দীর্ঘায়ু যুক্ত হলেও ঐ ব্যক্তির কোন অস্তিত্ব মোক্ষমার্গে থাকবে না। এতো বেশি আয়ু (শ্রীশিবের মতো) পাওয়া গেলেও একদিন মৃত্যু অবশ্যই হবে। ভুল ভক্তিতে জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকেই যাবে। এই রকম আয়ুর লাভ কি?

কবীর সাহেব নিজের (পূর্ণব্রহ্মের) খবর স্বয়ং বলছেন যে, এই পরমাত্মা দেরও উপরে অসংখ্য ভূজার পরমাত্মা সতপুরুষ আছেন। যিনি সতলোকে (সচখন্ড, সতধাম) থাকেন এবং ওনার অন্তর্গত সর্ব লোক [ব্রহ্ম (কালের ২১ ব্রহ্মান্ড এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব শক্তির লোক এবং পর ব্রহ্মের সাত শঙ্খ ব্রহ্মান্ড এবং অন্য ব্রহ্মান্ড] আছে ওখানে কেবল সতনাম ও সারনামের জপের দ্বারা যাওয়া সম্ভব, যা পূর্ণ গুরুদেবের থেকে প্রাপ্ত করতে হয়। সচ্চখন্ডে যে আত্মা চলে যায়, তার আর পুনর্জন্ম হয় না।

সতপুরুষ (পূর্ণ ব্রহ্ম) কবীর সাহেবই (কবির্দেব) অন্যান্য লোকেও স্বয়ং ভিন্ন ভিন্ন নামে বিরাজমান আছেন। যেমন অলক লোকে অলক পুরুষ ,অগম লোকে অগম পুরুষ এবং অকহ্ লোকেও অনামী পুরুষ রূপে বিরাজমান আছে। এগুলি তো ওনার উপমাত্মক নাম, কিন্তু ঐ পূর্ণ পুরুষের বাস্তবিক নাম হলো কবির্দেব (ভিন্ন ভাষাতে তাকে কবীর সাহেব বলা হয়)

## “আদরনীয় নানক সাহেবের অমৃতবাণীতে সৃষ্টি রচনার সংকেত”

শ্রী নানক সাহেবের অমৃতবাণী, মহলা ১, রাগ বিলাবলু, অংশ ১ (গু, গ্র, পৃ: ৮৩৯)

**আপে সচু কীয়া কর জোড়ি। অন্ডজ ফোড়ি জোডি বিছোড়॥**
**ধরতী আকাশ কীয়ে বৈসণ কউ থাউ। রাতি দিনন্তু কীয়ে ভউ-ভাউ॥**
**জিন কীএ করি বেখণহারা। (৩)**
**ত্রিতীয়া ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেসা। দেবী দেব উপায়ে বেসা॥ (৪)**
**পবণ পানী অগনী বিসরাউ। তাহী নিরঞ্জন সাচো নাউ॥**

**তিসু মহি মনুআ রহিয়া লিব লাঈ। প্রণবতি নানকু কালু ন খাঈ॥ (১০)**

উপরোক্ত অমৃতবাণীর ভাবার্থ হল এই যে, প্রকৃত পরমাত্মা (সতপুরুষ) স্বয়ং নিজের হাতে সকল সৃষ্টি রচনা করেছেন। তিনি ডিম বানিয়ে পরে তা ভাঙেন অর্থাৎ, সেই ডিম থেকে জ্যোতি নিরঞ্জন বের হয়। এই পূর্ণ পরমাত্মা সকল প্রাণীদেরকে থাকার জন্য ধরতী, আকাশ, পবন, পানী প্রভৃতি পাঁচ তত্ত্ব রচনা করেন। নিজের দ্বারা রচনা করা সৃষ্টির সাক্ষী তিনি নিজেই। অন্য কেউ তার সঠিক বর্ণনা দিতে পারবে না। ডিম থেকে জ্যোতি নিরঞ্জন বের হওয়ার পর, তিন দেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের উৎপত্তি হয় এবং অন্যান্য দেবী দেবতার উৎপন্ন হয়। সেই সাথে অগণিত জীবের উৎপত্তি হয়। তারপর অন্যান্য দেবী দেবতা জীবন চরিত্র এবং অন্যান্য ঋষিদের অনুভব ছয় শাস্ত্র এবং আঠারো পুরাণ রূপে প্রকাশ পায়। পূর্ণ পরমাত্মার প্রকৃত নামের (সত্যনাম) সাধনা অনন্য চিত্তে করলে এবং গুরু মর্যাদার মধ্যে থাকা ভক্তের বিষয়ে শ্রী নানকদেব বলেছেন যে, তাকে কাল কখনো খাবে না।

রাগ মারু (অংশ) অমৃতবাণী মহলা (গু.গ্র-পৃ১০৩৭)

**সুনহু ব্রহ্মা, বিসনু, মহেসু উপাএ। সুনে বরতে জুগ সবাএ॥**
**ইসু পদ বিচারে সো জনু পুরা। তিস মিলিএ ভরমু চুকাইদা॥ (3)**
**সাম বেদু, রূগু জুজরূ তথরবণু। ব্রহমেঁ মুখ মাইআ হৈ ত্রেগুণ॥**
**তা কী কীমত কহি ন সকৈ। কো তিউ বোলে জিউ বুলাঈদা॥ (৯)**

উপরিক্ত অমৃতবাণীর সারাংশ হল, যে সন্ত পূর্ণ রূপে সৃষ্টি রচনা। শুনিয়ে দেবেন এবং বলে দেবেন যে, ডিম দুই ভাগে ভেঙে গিয়ে কে বের হয়েছে? যিনি ব্রহ্মালোকের শূন্য অর্থাৎ গুপ্ত স্থানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের উৎপত্তি করেছেন, সেই পরমাত্মা কে? যিনি ব্রহ্মের (কালের) মুখ থেকে চার বেদ (পবিত্র ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অর্থববেদ) উচ্চারণ করিয়েছেন, সেই পূর্ণ পরমাত্মা যেভাবে চায়, সেভাবেই প্রত্যেক প্রাণীকে বলায়। এ সমস্ত জ্ঞানকে পূর্ণরূপে বলতে পারবে, এমন সন্তের সন্ধান পেলে তার কাছে যাও এবং যিনি সমস্ত শঙ্কা পূর্ণরূপে নিবারণ করেন। তিনিই পূর্ণসন্ত অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী সন্ত।

শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা নম্বর ৯২৯ শ্রী নানক সাহেব জীর অমৃতবাণী রাগ রামকালী মহলা ১ দক্ষনী ওঁমঙ্কার।

**ঔ-ওঁকারি ব্রহ্মা উৎপত্তি। ওঅঙ্কারু কীআ জিনি চিত। ঔ-ওঁকারি সৈল জুগ ভয়ে। ঔ-ওঁকারি বেদ নিরময়ে। ঔ-ওঁকারি সবদি উধরে। ঔ-ওঁকারি গুরুমুখি তরে। ওনম অখর সুনহু বীচারু। ওনম অখরু ত্রিভবন সারু।**

উপরোক্ত অমৃতবাণীতে শ্রী নানক সাহেব জী বলেছেন যে, ওঁ-কার অর্থাৎ জ্যোতি নিরঞ্জনের (কালের) থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। কয়েক যুগ আনন্দ ফুর্তি করার পর ওঁ-কার (ব্রহ্ম) বেদের উৎপত্তি করে, যা পরে শ্রী ব্রহ্মা পায়। তিন লোকে ভক্তি করার জন্য কেবল একটি ওম্ মন্ত্রই বাস্তবে জপ করা উচিত। এই ওম্ শব্দকে পূর্ণ সন্তের কাছ্ থেকে উপদেশ নিয়ে অর্থাৎ পূর্ণ সন্তকে গুরু হিসাবে ধারন করে জপ করলে ,তবেই উদ্ধার হওয়া সম্ভব।

**বিশেষ**:- শ্রী নানক সাহেব জী তিন মন্ত্রের (ওম +তত্+সত্) বিভিন্ন স্থানে রহস্যময় বর্ণনা দিয়েছেন তা কেবল পূর্ণ সন্তই বুঝতে পারেন এবং তিনি তিন মন্ত্রের জপের বিধি উপদেশীকে বুঝিয়ে থাকেন।

**(পৃ: ১০৩৮) উত্তম সতিগুরু পুরুষ নিরালে, সবদি রতে হরি রস মতবালে।**
**রিধি, বুধি, সিধি, গিয়ান গুরু তে পাইয়ে, পুরে ভাগ মিলাঈদা ॥ ১৫॥**

**সতিগুরু তে পায়ে বিচারা, সুন সমাধি সচে ঘরবারা॥**
**নানক নিরমল নাদু সবদ ধুনি, সচু রামৈঁ নামি সমাইদা (১৭)।**

উপরোক্ত অমৃতবাণীর ভাবার্থ হলো এই যে, প্রকৃত জ্ঞান প্রদানকারী সদগুরু তো অনন্য। তিনি কেবল নাম জপ'ই করেন ও করান। অন্য কোন হঠ্ যোগ সাধনার কথা বলেন না। যদি আপনি ধন -দৌলত পদ, বুদ্ধি অথবা ভক্তি শক্তি চান, তাহলে সেই ভক্তি মার্গের জ্ঞান পূর্ণ সন্তই পূর্ণ রূপে প্রদান করবেন। এমন পূর্ণ সন্ত বড়ো ভাগ্যের অধিকারী হলেই পাওয়া যায়। সেই পূর্ণ সন্ত বিবরণ দেবেন যে উপরে শূন্য (আকাশে) আমাদের আসল ঘর (সত্যলোক) পরমেশ্বর যা রচনা করে রেখেছেন।

সেখানে একটি বাস্তবিক সারনামের ধুন (আওয়াজ) হয়েই চলেছে। ঐ আনন্দময় অবিনাশী পরমেশ্বরকে সারশব্দের দ্বারা প্রাপ্ত করা যায়, অর্থাৎ এই বাস্তবিক সুখদায়ী স্থানে নিবাস করা সম্ভব। অন্য কোনো নামে এবং অসম্পূর্ণ গুরুদের দ্বারা সম্ভব নয়।

আংশিক অমৃতবাণী মহলা পহলা (শ্রী গু.গ্র.পৃ:- ৩৫৯-৩৬০)

**সিব নগরী মহি আসণি বৈসউ কলপ ত্যাগী বাদং। (১)**
**সিঙ্গী সবদ সদা ধুনি সোহৈ অহিনিসি পূরৈ নাদম্। (২)**
**হরি কীরতি রহ রাসি হমারী গুরু মুখ পন্থ্ অতীতম্ (৩)**
**সগলী জোতি হমারী সংমিআ নানা বরণ অনেকম্।**
**কহ নানক সুনি ভরথরী জোগী পারব্রহ্ম লিব একম্। (৪)**

উপরোক্ত অমৃতবাণীর ভাবার্থ হল এই যে, শ্রী নানক সাহেব জী বলেছেন যে, হে ভরথরী যোগী জী! আপনার সাধনা তো শিব ভগবান পর্যন্ত সীমিত আছে, যার প্রতিফলে আপনি শিব নগরীতে (লোকে) স্থান পেয়েছেন, আর আপনার শরীরে যে সিঙ্গি শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে তা এই কমল চক্রে এবং টেলিভিশনের মতো প্রত্যেক দেবতার লোক থেকে সেই শব্দ এই শরীরের মধ্যে শোনা যায়। আমি এক পরমাত্মা পারব্রহ্ম অর্থাৎ সবার ঊর্ধ্বে যে পূর্ণ পরমাত্মা বিরাজমান আছেন, সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার প্রতি ধ্যান (অনন্য মনে চিন্তা করা) লাগাই।

আমি লোক দেখানো (ভস্ম লাগানো হাতে লাঠি রাখা) ভক্তি করি না। আমি তো সকল প্রাণীদেরকে এক পূর্ণ পরমাত্মার (সত পুরুষের) সন্তান মনে করি। সব কিছুই ঐ শক্তিতেই চলছে। আমার মুদ্রা তো সত্যনামের জপ গুরুদেবের থেকে প্রাপ্ত করে করতে হয়, এবং ক্ষমা করা আমাদের বেশভূষা। আমি তো পূর্ণ পরমাত্মার উপাসক এবং পূর্ণ সতগুরুদেবের ভক্তি মার্গ সম্পূর্ণ আলাদা।

অমৃতবানী রাগ আসা মহলা ১ (গুরুগ্রন্থ-পৃ:- ৪২০)

**॥ আসা মহলা ॥ জিনী নামু বিসারিআ দূজৈ ভরমিঁ ভুলাই। মূলু ছোড়ি ডালী লগে কিআ পাবহি ছাঈ॥ ১॥ সাহিবু মেরা একু হৈ অবরু নহীঁ ভাঈ। কিরপা তে সুখু পাইআ সাচে পরথাঈ ॥ ৩॥ গুরু কী সেবা সো করে জিসু আপি করাএ। নানক সিরু দে ছুটীঐ দরগাহ পতি পাএ॥ ৮॥ ১৮॥**

উপরোক্ত বাণীর ভাবার্থ হলো এই যে, নানক সাহেব বলেছেন যারা পূর্ণ পরমাত্মার বাস্তবিক নাম ভুলে গিয়ে অন্য ভগবানের নাম জপ করে ভ্রমিত আছে, তারা তো এমন করছে ঠিক যেমন মূল শিকড় (পূর্ণ পরমাত্মা) কে ছেড়ে দিয়ে ডালে (তিনগুণ রূপী রজোগুন- ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ -বিষ্ণু, তমোগুণ শিবের) জল সেচ (পূজা) করছে। ঐ সাধনাতে কোন প্রকার সুখ প্রাপ্তি হওয়া সম্ভব নয়, অর্থাৎ ভক্তিরূপী চারা গাছটি শুকিয়ে যাবে গাছের ছায়ায় বসতে পারবে না। এর ভাবার্থ এই হলো যে, শাস্ত্রবিধি

রহিত সাধনা করলে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা হয়, যার কোন লাভ নেই। এ কথার প্রমাণ পবিত্র গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক ২৩ ২৪ এর মধ্যে আছে এই পূর্ণ পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্য মনমুখী (মনমর্জি) সাধনা ত্যাগ করে সমর্পিত/পূর্ণ গুরুদেবের চরণে সমর্পিত হয়ে প্রকৃত নামের জপ করলেই তবেই মোক্ষ সম্ভব। তা না-হলে মৃত্যুর পর নরকে যেতে হবে।

(শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা ৮৪৩,৮৪৪)

**বিলাবলু মহলা ১॥ মৈঁ মন চাহু ঘণা সাচি বিগাসী রাম। মোহী প্রেম পিরে প্রভু অবিনাসী রাম॥ অবিগতো হরি নাথু নাথহ তিসৈ ভাবৈ সো থীঐ। কিরপালু সদা দইআলু দাতা জীআ অন্দরি তূঁ জীঐ। মৈঁ আধারু তেরা তূ খসমু মেরা মৈ তাণু তকীআ তেরও। সাচি সূচা সদা নানক গুরুসবদি ঝগরু নিবেরও॥ ৪॥ ২॥**

উপরোক্ত অমৃত বাণীতে শ্রী নানক সাহেব বলেছেন যে, অবিনাশী পূর্ণ পরমাত্মা নাথেরও নাথ অর্থাৎ দেবতাদেরও দেব সকল প্রভুদের (শ্রী ব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ,শ্রী শিব এবং ব্রহ্ম ও পর ব্রহ্মের নাথ তিনি অর্থাৎ স্বামী।) আমি তো সত্যনামকে হৃদয়ে স্থাপিত করে নিয়েছি, হে পরমাত্মা! সকল প্রাণীর জীবনের একমাত্র আধার আপনি। আমি আপনার ওপর আশ্রিত; আপনি হলেন আমার মালিক। আপনিই গুরু রূপে এসে সত্য ভক্তির নির্ণায়ক জ্ঞান দিয়ে, সমস্ত ঝগড়াঝাঁটি সমাপ্ত করে দিয়েছেন অর্থাৎ অবসান/সমস্ত সন্দেহের সমাধান করে দিয়েছেন।

(শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা ৭২১, রাগ তিলক মহলা ১)

**য়ক অর্জ গুফতম পেশ তো দর কুন করতার। হক্কা কবীর করীম তু বেএব পরবরদিগার। নানক বুগোয়দ জন তুরা তেরে চাকরাঁ পাখাক॥**

উপরোক্ত অমৃতবাণীতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, (হক্কা কবীর) আপনি সত্কবীর (কুল কর্তার) শব্দ শক্তিতে রচনাকারী, শব্দ স্বরূপী প্রভু অর্থাৎ সকল সৃষ্টির রচনাকর্তা আপনি বেএব নির্বিকার (পরবরদিগার) সকলের পালনকর্তা দয়ালু প্রভু ও আমি আপনার দাসেরও দাস।

(শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেব পৃষ্ঠা নং ২৪ রাগ সিরী মহলা ১)

**তেরা এক নাম তারে সংসার, মৈঁ ঐহা আস ঐহো আধার।**
**নানক নীচ কহৈ বিচার, ধানক রূপ রহা করতার॥**

উপরোক্ত অমৃতবাণীর মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, যিনি কাশীতে ধানক (তাঁতি) রূপে এসেছিলেন তিনি (করতার) অর্থাৎ সর্ব কলের সৃজনহার। অতি আধীন হয়ে শ্রী নানক সাহেব জী বলেছেন যে, আমি সত্য কথা বলছি যে ,এই ধানক (তাঁতি) অর্থাৎ কবীর জোলা'ই পূর্ণব্রহ্ম (সতপুরুষ )

**বিশেষ**:- উপরোক্ত প্রমাণ গুলির সাংকেতিক জ্ঞান থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, সৃষ্টি রচনা কিভাবে হয়েছে ? এমন পূর্ণ পরমাত্মার প্রাপ্তি করা উচিত, যা ঐ পূর্ণ সন্তের থেকে নাম দীক্ষা নিলে তবেই সম্ভব।

## "অন্যান্য সাধু - সন্তদের দ্বারা সৃষ্টি রচনার গল্প কথা"

অন্যান্য সাধু-সন্তদের দ্বারা সৃষ্টির রচনার যে জ্ঞান বলা হয়েছে তা কেমন? কৃপা করে নিচে পড়ুন:- সৃষ্টি রচনার বিষয়ে রাধাস্বামী পন্থের সন্ত এবং ধনধন সদগুরু পন্থদের বিচার:-

পবিত্র পুস্তক "জীবন চরিত্র পরম সন্ত বাবা, জয়মল সিংহ জী মহারাজ" পৃষ্ঠা নং-১০২ -১০৩ এর মধ্যে 'সৃষ্টি রচনা' (সাবন কৃপাল পাবলিকেশন, দিল্লি।)

**“প্রথমে সতপুরুষ নিরাকার ছিলেন ,তারপর তিনি ইজহার (আকারে) আসেন, সাথে সাথেই উপরের তিনটি নির্মল মন্ডল (সতলোক, অলকলোক, অগমলোক) সৃষ্টি হয়ে যায় এবং প্রকাশ এবং মন্ডল সমূহের নাদ (ধ্বনি) হয়ে যায়।”**

পবিত্র পুস্তক সার বচন (নসর) প্রকাশক :- রাধাস্বামী সতসঙ্গ সভা, দয়ালবাগ আগরা সৃষ্টি রচনা পৃষ্ঠা নং- ৮

**“সর্বপ্রথম ধুন্দুকার (অন্ধকার) ছিল। তার মধ্যে পুরুষ শূন্য সমাধিতে ছিল। তখন কোন কিছু রচনা ছিল না। তারপর যখন ওনার ইচ্ছা হল তখন শব্দ প্রকট হয়, আর ঐ শব্দ থেকে সবকিছু রচনা হলো। প্রথমে সতলোক এবং তারপর সতপুরুষের কলা থেকে তিন লোক এবং অন্যান্য সমস্ত কিছুর বিস্তার হয়।”**

এই জ্ঞান তো এমন, ঠিক যেমন এক সময় একটি ছেলে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে যায়, তখন তাকে আধিকারিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি মহাভারত পড়েছেন? ছেলেটি উত্তর দেয় যে, মহাভারত তো আমার হাতের মুঠোর মধ্যে আছে। আধিকারিক প্রশ্ন করলেন পঞ্চ পান্ডবের নাম বল। ছেলেটি উত্তর দেয়, একজন ভীম ছিল, একজন তার বড় ভাই ছিল, একজন তার থেকে ছোট ভাই ছিল, আর একজন ছিল এবং বাকি অন্যজনের নাম আমি ভুলে গিয়েছি। উপরোক্ত সৃষ্টি রচনার জ্ঞান ঠিক সেই রকম।

সতপুরুষ এবং সতলোকের মহিমা বর্ণনাকারী পাঁচ নাম (ঔঙ্কার- জ্যোতি নিরঞ্জন-ররংকার -সোহং- সত্যনাম) প্রদানকারী ও তিন নাম (অকালমূর্তি- সতপুরুষ- শব্দ স্বরূপী রাম) প্রদানকারী সন্তদের দ্বারা রচনা করা পুস্তকের কিছু নিষ্কর্ষ :-

সন্তমত প্রকাশ ভাগ ৩ পৃষ্ঠা নং ৭৬-তে লেখা আছে যে, “সচ্চখন্ড অথবা সতনাম হলো চতুর্থ লোক”, এখানে ‘সতনাম’ কে স্থান বলা হয়েছে। এরপর এই পবিত্র পুস্তকের পৃষ্ঠা নং ৭৯-তে লেখা আছে যে, “এক রাম দশরথের পুত্র, দ্বিতীয় রাম ‘মন’ তৃতীয় রাম হল ‘ব্রহ্ম’, চতুর্থ রাম ‘সতনাম’, ইনিই আসল রাম।” আবার ও পবিত্র পুস্তক সন্তমত প্রকাশ প্রথম ভাগ পৃষ্ঠা নং ১৭- তে লেখা আছে যে “সেটি সতলোক এবং তাকে সতনাম বলা হয়।” পবিত্র পুস্তক ‘সার বচন নসর ইয়ানি ওয়ার্তিক’ পৃষ্ঠা নং -৩ এ লেখা আছে যে, এখন বোঝা উচিত যে, রাধাস্বামীর পদ হল সবার থেকে উঁচু মুকাম বা ঘর, যাকে সন্তগণ সতলোক, সচ্চখন্ড, সারশব্দ, সতশব্দ, সতনাম এবং সতপুরুষ বলে বর্ণনা করেছে। পবিত্র পুস্তক সার বচন (নসর) আগ্রা থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা নং ৪ এর মধ্যেও উপরোক্ত যথার্থ বর্ণনা আছে। পবিত্র পুস্তক ‘সচখন্ড কী সড়ক’ পুস্তকের পৃষ্ঠা নং. ২২৬ এ “সন্তদের দেশ সচ্চখন্ড অথবা সতলোক,আর তাকেই সতনাম - সতশব্দ - সারশব্দ বলা হয়”।

**বিশেষ:-** উপরোক্ত ব্যাখ্যা পড়ে এমন মনে হবে, ঠিক যেমন কোন এক ব্যক্তি তার জীবনে কখনো শহর দেখেনি, কখনো গাড়ি দেখেনি বা পেট্রোল দেখেনি, আর ড্রাইভার কাকে বলে তাও জানে না। ঐ ব্যক্তি তার অন্য সাথীদের বলে যে, আমি শহরে যাই, মোটর গাড়িতে বসে আনন্দ করি। তখন তার সাথীরা তাকে জিজ্ঞাসা করে মোটর গাড়ি কেমন ? পেট্রোল কেমন ? ড্রাইভার ও শহর কেমন? ঐ গুরুদেব তখন উত্তর দেয় যে, শহর বলো বা মোটরগাড়ি একই কথা, শহরকেও মোটরগাড়ি বলে, পেট্রোলও মোটর গাড়িকেই বলা হয়, ড্রাইভারকেও মোটরগাড়ি বলা হয়। সড়ক ও মোটরগাড়িকেই বলা হয় ।

**আসুন বিচার করি :-** সতপুরুষ তো হলেন পূর্ণ পরমাত্মা। সতনাম হল সেই দুই মন্ত্রের নাম, যার মধ্যে একটি ওম্ + তত সাংকেতিক রয়েছে এবং এরপর পূর্ণ গুরু দ্বারা

সারনাম সাধককে প্রদান করা হয় । এই সতনাম এবং সারনাম দুটি স্মরণ (জপ ) করার নাম। সত লোক হল সেই স্থান যেখানে সতপুরুষ থাকেন। পুণ্যআত্মা গণ আপনারা স্বয়ং নির্ণয় করুন সত্য এবং অসত্যের বিষয়।

## "ভক্তির মর্যাদা"

নাম (দীক্ষা) গ্রহণকারী ব্যক্তির জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

**১.পূর্ণ গুরুদেবের থেকে দীক্ষা নেওয়া উচিত :-**

**পূর্ণ গুরুর পরিচয়:-** দীক্ষা গ্রহন করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য প্রথম দরকার গুরুর পরিচয় জানা, তারপর দীক্ষা গ্রহন করা উচিত। আজকের কলিযুগে, পূর্ণ গুরুকে কিভাবে চিনে নেওয়া যায়, সেটাই ভক্ত সমাজের কাছে সবথেকে জটিল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এর এক খুবই সাধারণ এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর রয়েছে যে, যে গুরু শাস্ত্র অনুসারে ভক্তি করেন আর নিজের অনুগামীদের অর্থাৎ শিষ্যদেরও করান, তিনিই পূর্ণ সন্ত। কেননা ভক্তিমার্গের সংবিধান হল ধার্মিক শাস্ত্রগুলি। যেমন কবীর সাহেবের বাণী, নানক সাহেবের বাণী, সন্ত গরীব দাস মহারাজের বাণী, সন্ত ধর্মদাস সাহেবের বাণী, বেদ, গীতা, পুরাণ, কুরান, পবিত্র বাইবেল ইত্যাদি। যেসব সন্ত শাস্ত্র অনুসারে ভক্তি সাধনা বলেন আর ভক্ত সমাজকে মার্গ দর্শন করান তিনিই পূর্ণ সন্ত অন্যথায় তিনি ভক্ত সমাজের শত্রু যিনি শাস্ত্রের বিরুদ্ধে সাধনা করাচ্ছেন। এই অমূল্য মানব জন্মের সাথে ছেলেখেলা করছেন। এই ধরনের গুরুদের বা সন্তদের ভগবানের দরবারে গিয়ে ঘোর নরকে উল্টো করে ঝোলানো হবে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, যদি কোনো অধ্যাপক সিলেবাসের বাইরে শিক্ষা দেন তাহলে তিনি বিদ্যার্থীদের শত্রু।

পবিত্র গীতার অধ্যায় নং- ৭ এর শ্লোক নং- ১৫

**ন, মাম্, দুষ্কৃতিনঃ, মূঢাঃ, প্রপদ্যন্তে, নরাধমাঃ,**
**মায়য়া, অপহৃতজ্ঞানাঃ, আসুরম্, ভাবম্ আশ্রিতাঃ ॥**

**অনুবাদ:-** মায়ার দ্বারা যার জ্ঞান হারিয়ে গেছে, সে অসুর স্বভাব ধারণকারী মানুষের মধ্যে নীচ দূষিত কর্ম করা মূর্খ, আমাকে ভজে না অর্থাৎ তিন গুণ (রজোগুণ-ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ-বিষ্ণু, তমোগুণ-শিব) এর সাধনা করতে থাকে।

যজুর্বেদ অধ্যায় নং ৪০ শ্লোক নং-১০ (সন্ত রামপাল দাস জী দ্বারা অনুবাদিত)।

**অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাত্, ইতি শুশ্রুম ধীরানাম যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১০॥**

**বাংলা অনুবাদ:-** পরমাত্মার বিষয়ে নিরাকার অর্থ কখনো জন্ম না নেওয়া (মায়ের পেটে জন্ম গ্রহন করে না) বলা হয়। অন্য আকারে অর্থাৎ জন্ম নিয়ে অবতার রূপে আসা বলা হয়। যা স্থায়ী অর্থাৎ পূর্ণ জ্ঞানী সমরূপ অর্থাৎ যথার্থ রূপে পৃথকভাবে প্রত্যক্ষ জ্ঞান করায়।

গীতা অধ্যায় নং ৪ শ্লোক নং ৩৪

**তত্, বিদ্ধি, প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া,**
**উপদেক্ষ্যন্তি, তে, জ্ঞানম্ জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ॥**

**অনুবাদ:-** ঐ পূর্ণ পরমাত্মার জ্ঞান ও সাধনকে জানা সন্তকে ভালো ভাবে দন্ডবৎ প্রণাম ক'রে তাঁর সেবা করলে এবং ছল-কপট ছেড়ে সরলতা পূর্বক প্রশ্ন করলে পরমাত্ম তত্ত্বকে সঠিক ভাবে জানা জ্ঞানী মহাত্মা তোকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেবেন।

**২. নেশা জাতীয় বস্তুর সেবন করা নিষেধ:-** হুঁকো, মদ, বিয়ার তামাক, বিড়ি, সিগারেট, নস্যি শোঁকা, গুটকা, মাংস, ডিম, সুলফা, আফিং, গাঁজা আরো অন্য নেশা

জাতীয় বস্তুর সেবন করা তো দূরের কথা, কাউকে নেশা জাতীয় বস্তু এনেও দিতে পারবে না। বন্দীছোড় গরীব দাস মহারাজ এই সমস্ত নেশা জাতীয় বস্তুকে ভীষণ খারাপ বলে প্রতিপন্ন করে নিজের বাণীতে বলেছেন :-

**সুরাপান মদ্য মাংসাহারী, গমন করৈ ভোগৈ পর নারী।সত্তর জনম কটত হৈঁ শীশম্, সাক্ষী সাহিব হৈ জগদীশম্॥ পরদ্বারা স্ত্রী কা খেলৈ, সত্তর জনম অন্ধা হোয় ডোলৈ। মদিরা পীবৈ কড়বা পানী, সত্তর জনম শ্বান কে জানী॥ গরীব, হুক্কা হরদম পীবতে, লাল মিলাবৈঁ ধূর।ইসমেঁ সংশয় হৈ নহীঁ, জন্ম পিছলে সুর॥ 1॥ গরীব, সো নারী জারী করৈ, সুরা পান সৌ বার। এক চিলম্ হুক্কা ভরৈ, ডুবৈ কালী ধার॥ 2॥ গরীব, সূর গউ কূঁ খাত হৈঁ, ভক্তি বিহুনেঁ রাড। ভাঙ্গ তম্বাখূ খা গয়ে, সৌ চাবত হৈঁ হাড়॥ 3॥ গরীব, ভাঙ তম্বাখূ পীব হীঁ, সুরা পান সে হেত। গোস্ত মট্টি খায় কর, জঙ্গলী বনেঁ প্রেত॥ 4॥ গরীব, পান তম্বাখু চাব হীঁ, নাস নাক্ মেঁ দেত। সো তো ইরানৈ গয়ে, জ্যোঁ ভড়ভুজে কা রেত॥ 5॥ গরীব, ভাঙ তম্বাখু পীবহীঁ, গোস্ত গলা কবাব। মোর মৃগ কূঁ ভখত হৈঁ, দেঙ্গে কহাঁ জবাব॥ 6॥**

**৩. তীর্থস্থানে যাওয়া নিষেধ :-** কোন প্রকারের কোন ব্রত করবে না। কোন তীর্থযাত্রা করবে না। না গঙ্গা স্নান করবে, না অন্য কোনো ধার্মিক স্থানে স্নান বা দর্শনের উদ্দেশ্যে যাবে। কোনো মন্দির বা ইষ্টধামে পূজা বা ভক্তি এরকম ভাব নিয়ে যাবে না যে, এখানে ভগবান আছেন। ভগবান কোন পশু তো নন যে পূজারী তাকে মন্দিরে বেঁধে রেখেছেন। ভগবান তো প্রত্যেক জায়গায় কোণে কোণে ব্যপ্ত হয়ে আছেন। ঐ সমস্ত সাধনা গুলো শাস্ত্র বিরুদ্ধ ছিল।

একটু ভালোভাবে বিচার করে দেখুন যে, এই সমস্ত তীর্থস্থান (যেমন জগন্নাথ মন্দির, বদ্রিনাথ, হরিদ্বার, মক্কা-মদিনা, অমরনাথ, বৈষ্ণোদেবী, বৃন্দাবন, মথুরা, বরসানা, অযোধ্যা রাম মন্দির, কাশীধাম, ছুড়ানীধাম ইত্যাদি) মন্দির, মসজিদ গুরুদ্বার, চার্চ বা ইষ্ট ধাম ইত্যাদি জায়গা গুলোতে কোনো না কোনো সন্ত থাকতেন। তিনি সেখানে নিজের ভক্তি সাধনা করে, নিজের ভক্তি রূপী ধন সঞ্চয় করে, শরীর ছেড়ে নিজের ইষ্ট দেবের লোকে চলে গেছেন। তারপর তার স্মৃতি সৌধকে সেই ঘটনার প্রমাণ হিসেবে ধরে রাখার জন্য সেখানে কেউ মন্দির, কেউ মসজিদ, কেউ গুরুদ্বার কেউ চার্চ বা কেউ ধর্মশালা ইত্যাদি বানিয়ে দিয়েছে। যাতে তাঁর স্মৃতি থেকে যায়। আর আমাদের মত তুচ্ছ প্রাণীদের সেই প্রমাণ মেলে যে আমাদেরও ঐরকম কর্ম করা উচিত। যেমন এই মহান আত্মারা করেছিলেন। এই সমস্ত ধর্মীয় স্থানগুলি আমাদেরকে এই বার্তা দেয় যে কি, যেমন ভক্তি সাধনা এই বিখ্যাত সন্তরা করেছিলেন এইরকমই তোমরা করো। এর জন্য তোমরা এই ধরনের সাধনাকারী বা এই ধরনের ভক্তি প্রদান করেন যে সন্ত তার খোঁজ করো আর তারপর তিনি যেমন বলেন সেই রকম করো। কিন্তু পরে এই স্থান গুলিরই পূজা শুরু হয়ে গেল। যেটা একদম ব্যর্থ এবং শাস্ত্রের বিরুদ্ধেও।

এই সমস্ত স্থানগুলো তো আসলে ঠিক সেই রকম, যেমন ধরুন কোন এক হালুইকর কোনো এক জায়গায় উনুন বানিয়ে জিলিপি লাড্ডু ইত্যাদি বানিয়ে স্বয়ং নিজে খেয়ে আর নিজের সঙ্গী সাথীদেরকে খাইয়ে চলে গেল। তারপর তো ঐ স্থানে না রইলো হালুই কর আর না রইলো মিঠাই।পড়ে থাকলো শুধু উনুন,তো না সেটা আমাদেরকে মিঠাই বানানোশেখাতে পারবে আর না আমাদের পেট ভরাতে পারবে। এখন যদি কেউ বলে যে,আসুন ভাই আপনাকে ঐ ভাট্টি/উনুন দেখিয়ে নিয়ে আসছি, যেখানে এক হালুইকর মিঠাই বানিয়েছিল। চলো যাই। আর ওখানে গিয়ে আপনি ঐ উনুন গুলো

দেখে নিলেন, আর সাতবার চক্কর কেটে নিলেন, তাহলেই কি আপনি মিঠাই পেয়ে গেলেন? নাকি আপনি মিঠাই বানানোর পদ্ধতি বলা হালুইকর পেয়ে গেলেন? এর জন্য আপনাকে এই রকমই হালুইকর খুঁজতে হবে যে প্রথমে আপনাকে মিঠাই খাওয়াবে আর বানানোর পদ্ধতিও বলে দেবে। তারপর তিনি যেমন বলেছেন কেবল সেই রকম করুন, অন্য রকম করবেন না।

ঠিক একইভাবে তীর্থস্থানের পূজো না করে ঐরকম সন্তের খোঁজ করুন, যিনি শাস্ত্র অনুসারে পূর্ণ পরমাত্মা কবীর সাহেবের ভক্তি করেন এবং বলেন। তারপর তিনি যেমন বলেছেন কেবল সেই রকম করুন, নিজের মনের ইচ্ছা অনুযায়ী ভক্তি করবেন না।

সামবেদ সংখ্যা নম্বর ১৪০০ উতার্চিক অধ্যায় নম্বর ১২ খন্ড নম্বর ৩ শ্লোক নম্বর ৫ (সন্ত রামপাল দাস জী দ্বারা অনুবাদিত) :-

**ভদ্রা বস্ত্রা সমন্যাঅবসানো মহান্ কবির্নিবচনানী শংসন্।**
**আ বচ্যস্ব চম্বোঃ পুয়মানো বিচক্ষণো জাগৃবির্দেববীতৌ ॥ ৫**

**হিন্দী থেকে বাংলা:-** চতুর ব্যক্তিরা বচন দ্বারা পূর্ণ পরমাত্মার (পূর্ণ ব্রহ্ম) পূজা বা সত্ মার্গ দর্শন না করে, অমৃতের স্থানে অন্য (আন) উপাসনা {যেমন ভূত পূজা, পিতরপূজা, শ্রাদ্ধ করা, তিনগুনের পূজা (রজোগুণ-ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ-বিষ্ণু, তমোগুণ-শংকর) ও ব্রহ্ম কালের পূজা, মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বার, চার্চ ও তীর্থ,উপবাসের উপাসনা} রূপী ফোঁড়া বা ঘা থেকে বের হওয়া পুঁজকে আদরের সাথে আচমন করাতে থাকে। পরম সুখদায়ক পূর্ণ ব্রহ্ম কবীর স্বশরীরে সাধারন বেশ ভূষায় (বস্ত্রের অর্থ বেশভূষা, সন্ত ভাষায় একে চোলাও বলা হয়। যেমন কোন শরীর ছেড়ে চলে গেলে বলে- মহাত্মা তো চোলা ছেড়ে চলে গেছে) সতলোকের শরীরের মত অন্য কম তেজপুঞ্জের শরীর ধারন করে সাধারন মানুষের মত জীবন যাপন ক'রে কিছু দিন সংসারে থেকে নিজের শব্দ-সাখীর মাধ্যমে বা ছন্দের মাধ্যমে সত্য জ্ঞানকে বর্ণনা ক'রে পূর্ণ পরমাত্ম নিজের লুকানো বাস্তবিক সত্য জ্ঞান ও ভক্তিকে জাগ্রত করেন।

গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক নং ২৩

**যঃ, শাস্ত্রবিধিম্, উৎসৃজ্য, বর্ততে, কামকারতঃ ন, সঃ,**
**সিদ্ধিম, অবাপ্নোতি, ন, সুখম, ন, পরাম্, গতিম্॥ ২৩॥**

**অনুবাদ :-** যে ব্যক্তি (পুরুষ) শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে নিজের ইচ্ছায় মনমর্জি আচরন করে, তাঁর না তো সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, না পরমগতি, না সুখ-শান্তি।

গীতা অধ্যায় ৬ শ্লোক নং ১৬

**ন, অতি, অশ্রনতঃ, তু যোগঃ, অস্তি, ন, চ, একান্তম্,**
**অনশ্রনতঃ, ন, চ, অতি, স্বপ্নশীলস্য, জাগ্রতঃ, ন, এব, চ, অর্জুন॥ ১৬॥**

**অনুবাদ :-** হে অর্জুন! এই যোগ অর্থাৎ ভক্তি না তো বেশি খাওয়া ব্যক্তির, না তো একদম না খাওয়া ব্যক্তির, না একান্ত স্থানে আসন লাগিয়ে সাধনা করা ব্যক্তির, না তো অধিক শয়ন করা অথবা সদা জেগে থাকা ব্যক্তির সিদ্ধ হয়॥

**পূজেঁ দেঈ ধাম কো, শীশ হলাবৈ জো। গরীব দাস সাচী কহৈ, হদ কাফির হৈ সো॥**
**কবীর, গঙ্গা কাঠৈ ঘর করৈ, পীবৈ নির্মল নীর। মুক্তি নহীঁ হরি নাম বিন, সতগুরু কহেঁ কবীর॥**
**কবীর, তীর্থ কর-কর জগ মুবা, উড়ৈ পানী ন্হায়। রাম হী নাম না জপা, কাল ঘসীটে জায়॥**
**গরীব, পিতল হী কা থাল হৈ, পিতল কা লোটা। জর মূরত কো পূজতেঁ, আবৈগা টোটা॥**
**গরীব, পিতল চমচ্চা পূজিয়ে, জো থাল পরোসৈ। জড় মূরত কিস কাম কী, মতি রহো ভরসৈ॥**

**কবীর, পর্বত পর্বত মৈঁ ফিরয়া, কারণ আপনে রাম। রাম সরীখে জন মিলে, জিন সারে সব কাম॥**

**৪. পিতৃ পুরুষদের পুজো নিষেধ :-** কোন প্রকারের পিতর পূজা, শ্রাদ্ধ করা ইত্যাদি কিছুই করতে হবে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পিতর এবং ভূতদের পূজা করতে একদম মানা করে দিয়েছেন। শ্রী গীতার অধ্যায় নম্বর ৯ শ্লোক নম্বর ২৫ এ বলা হয়েছে যে :-

**যান্তি, দেবব্রতা:, দেবান্, পিতৃঋণ, যান্তি, পিতৃব্রতাঃ।**
**ভূতানি, যান্তি, ভূতেজ্যাঃ, মদ্যাজিনঃ, অপি, মাম্॥ ২৫॥**

**অনুবাদ:-** দেবতাকে পূজা করলে দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। পিতরকে পূজা করলে পিতর কে প্রাপ্ত হয়, আর ভূতের পূজা করলে ভূতকে প্রাপ্ত হয় এবং মতানুসার পূজা করা ভক্ত আমার দ্বারা লাভবান হয়।

বন্দীছোড় গরীব দাস জী মহারাজ আর কবীর সাহেব জী মহারাজও বলেছেন :-

**গরীব, ভূত রমৈ সো ভূত হৈ, দেব রমৈ সো দেব।**
**রাম রমৈ সো রাম হৈ, সুনো সকল সুর ভেব॥**

এই জন্য ঐ (পূর্ণ পরমাত্মা) পরমেশ্বরের ভক্তি করো যাতে পূর্ণ মুক্তি হবে। ঐ পরমাত্মা পূর্ণ ব্রহ্ম সতপুরুষ (সত কবীর)। এর প্রমাণ গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৪৬ এ আছে:-

**যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।**
**স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬॥**

**অনুবাদ:-** যে পরমেশ্বর থেকে সম্পূর্ণ প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে এবং যার দ্বারা সমস্ত জগত ব্যপ্ত, ঐ পরমেশ্বরকে নিজের স্বাভাবিক কর্মের দ্বারা পূজা করলে মানুষের পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

গীতা অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬২:-

**“তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব ভাবেন ভারত।**
**তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাশ্বতম্॥ ৬২॥”**

**অনুবাদ:-** হে ভরত বংশদ্ভুত অর্জুন। তুই সর্ব ভাবে ঐ ঈশ্বরের শরণে চলে যা। তার কৃপায় তুই পরম শান্তি এবং অবিনাশী পরম পদকে প্রাপ্ত করবি। সর্ব ভাবের তাৎপর্য হল অন্য কোনও পূজা না করে মন-কর্ম বচনে এক পরমাত্মার প্রতি বিশ্বাস রাখা।

গীতা অধ্যায় ৮ শ্লোক ২২:-

**পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।**
**যস্যান্ত: স্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥ ২২॥**

**অনুবাদ:-** হে পৃথানন্দন অর্জুন! সম্পূর্ণ প্রাণী যার অন্তর্গত এবং যার দ্বারা এই সম্পূর্ণ সংসার ব্যপ্ত সেই পরম পুরুষ পরমাত্মা তো অনন্য ভক্তিতে প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য।

অনন্য ভক্তির অর্থ একাগ্র মনে এক পরমেশ্বরের (পূর্ণ ব্রহ্ম) ভক্তি করা, অন্য দেবী দেবতা অর্থাৎ তিনগুন (রজগুণ- ব্রহ্মা, সত্বগুণ- বিষ্ণু, তমোগুণ- শিব) এর ভক্তি না করা। গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১ থেকে ৪ পর্যন্ত বর্ণনা আছে :-

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ১

**উর্দ্ধমূলম্, অর্ধশাখম্, অশ্বত্থম্, প্রাহুঃ, অব্যয়ম্,**
**ছন্দাংসি, যস্য, পর্ণানি, যঃ, তম্, বেদ সঃ, বেদবিত্॥ ১॥**

**অনুবাদ:-** উপরের দিকে মূল (শিকড়) ও নীচের দিকে শাখা ওয়ালা বিস্তৃত সংসার রূপী অবিনাশী অশ্বত্থবৃক্ষ যার ছোট ছোট অংশকে (বা ছোট ডাল) ডাল, পাতা

বলা হয়। ঐ সংসার রূপী বৃক্ষকে যিনি ভালোভাবে জানেন তিনি পূর্ণ জ্ঞানী অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী সন্ত।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ২

**অধঃ, চ, উর্দ্ধম, প্রসৃতাঃ, তস্য, শাখা, গুণপ্রবৃদ্ধাঃ বিষয়প্রবালাঃ॥**
**অধঃ চ. মুলানি, অনুসন্ততানি, কর্ম্মানুবন্ধিনী মনুষ্যলোকে॥ ২॥**

**অনুবাদ** :- ঐ বৃক্ষের নীচে আর উপরে তিন গুন, ব্রহ্মা-রজোগুণ, বিষ্ণু-সত্ত্বগুণ, শিব-তমোগুণ রূপী ছড়ানো বিকার, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার, রূপী ডাল (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব)-ই জীবকে কর্ম বন্ধনে রাখার জড় অর্থাৎ মূলকারণ তথা মনুষ্য লোক, স্বর্গ লোক, নরক লোক, পৃথিবী লোকের নীচে (চৌরাশি লাখ যোনীতে) ও উপরে ব্যবস্থিত করে রেখেছে।

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৩

**ন, রূপম, অস্য, ইহ, তথা, উপলভ্যতে, ন, অন্ত:, ন, চ, আদিঃ ন, চ,।**
**সম্প্রতিষ্ঠা, অশ্বত্থম, এনম্, সুবিরূঢ়মূলম, অসড়্গশস্ত্রেণ, দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥ ৩॥**

**অনুবাদ** :- এই রচনার না শুরু (আরম্ভ) তথ না অন্ত (শেষ) আছে, না এমন স্বরূপ পাওয়া যায়, তথা এখানে বিচারকালে অর্থাৎ আমার দ্বারা দেওয়া গীতা জ্ঞানে সম্পূর্ণ তথ্য নেই। কারণ সর্ব ব্রহ্মান্ডের রচনার বিষয়ে আমি ভালোভাবে জানি না। এই ভালোভাবে স্থায়ী স্থিত মজবুত স্বরূপ ওয়ালা নির্মল তত্ত্বজ্ঞান রূপী দৃঢ় শস্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ নির্মল তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা খন্ডন করে, অর্থাৎ নিরঞ্জনের ভক্তিকে ক্ষনিক জানো। (৩)

গীতা অধ্যায় ১৫ শ্লোক ৪

**ততঃ পদং তত্পরিমার্গিতব্যং, যস্মিন্গতা, ন,নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।**
**তমেব চাদ্যম পুরুষম প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তি প্রসৃতা পুরানী॥ ৪॥**

**অনুবাদ**:- তারপর ঐ পরমপদ পরমাত্মার খোঁজ করা দরকার। যাকে প্রাপ্ত হওয়ার পর মানুষ পুনরায় এই সংসারে ফিরে আসে না। তখন অনাদিকাল থেকে চলে আসা এই সৃষ্টি বিস্তারকে প্রাপ্ত হয়, আমিও ঐ আদি পুরুষ পরমাত্মারই শরনে আছি। এইভাবে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবী দেবতাদের রাজা ইন্দ্রদেবের পূজা বন্ধ ক'রে ঐ পরমাত্মার ভক্তি করার জন্য প্রেরণা দিয়েছিলেন। সেই জন্য ইন্দ্র কুপিত হয়ে ব্রজবাসীকে ডুবানোর জন্য বর্ষা শুরু করেছিলেন, তখন ইন্দ্রের কোপের হাত থেকে ব্রজবাসীকে রক্ষা করার জন্য শ্রী কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতকে তুলেছিলেন।

**গরীব, ইন্দ্র চড়া ব্রিজ ডুবোবন, ভীগা ভীত ন লেব।**
**ইন্দ্র কঢ়াঈ হোত জগৎ মেঁ, পূজা খা গএ দেব॥**
**কবীর, ইস সংসার কো সমঝাউঁ কৈ বার।**
**পুঁছ জো পকড়ে ভেড় কী, উতরা চাহেঁ পার॥**

**৫.গুরুর আজ্ঞা/আদেশ পালন**:- গুরুদেবের আদেশ বা আজ্ঞা ছাড়া ঘরে কোন প্রকারের কোন ধার্মিক অনুষ্ঠান করাবেন না। যেমন বন্দীছোড় নিজের বাণীতে বলেন যে:-

**গুরু বিন যজ্ঞ হবন জো করহীঁ, মিথ্যা জাবে কবহু নহীঁ ফলহীঁ।**
**কবীর, গুরু বিন মালা ফেরতে, গুরু বিন দেতে দান।**
**গুরু বিন দোনোঁ নিষ্ফল হৈঁ, পুছো বেদ পুরাণ॥ ॥**

**৬. মাতা মসানির পূজা করা নিষেধ**:- নিজের জমিতে তৈরি করা মণ্ডপে বা কোনো

সাধু ইত্যাদির বা কোনো অন্য দেবতার সমাধিতে পুজো করা যাবে না। সমাধি সে তা যারই হোক না কেন একদম পূজো করা যাবে না। অন্য কোন উপাসনা করা যাবে না। এমনকি তিন গুনদের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) পূজাও করা যাবে না। কেবল গুরুজীর বলা অনুসারেই করতে হবে।

গীতা অধ্যায় ৭ শ্লোক ১৫

**ন, মাম, দুষ্কৃতিনঃ, মূঢ়াঃ, প্রপদ্যন্তে, নরাধমাঃ,**
**মায়য়া, অপহৃতজ্ঞানাঃ, আসুরম, ভাবম্, আশ্রিতাঃ॥**

**অনুবাদ :-** মায়ার দ্বারা যার জ্ঞান হারিয়ে গিয়েছে, এমন অসুর স্বভাব ধারণ করা মানুষ নীচ, দুষিত কর্ম করা মূর্খ, আমাকেও ভজে না। অর্থাৎ সে তিন গুণ (রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ-বিষ্ণু,তমোগুন-শিব) এর সাধনা করতে থাকে।

**কবীর, মাঈ মসানী শেঢ় শীতলা, ভৈরব ভূত হনুমন্ত।**
**পরমাত্মা উনসে দূর হৈ, জো ইনকো পূজন্ত॥**
**কবীর, সৌ বর্ষ তো গুরু কী সেবা, একদিন আন উপাসী।**
**বো অপরাধী আত্মা, পরৈ কাল কী ফাঁসি॥**
**গুরুকো তজৈ ভজৈ জো আনা, তা পশুআ কো ফোকট জ্ঞানা॥**

**৭.সংকট মোচন হলেন কবীর্দেব :-**

কর্ম সংকট/কষ্ট উপস্থিত হলে কোনো অন্য ইষ্ট দেবতা বা মাতা-মসানি ইত্যাদির পূজা কখনো করবে না। না কোনো প্রকারের ঝাড়-ফুঁক করাবে। কেবলমাত্র বন্দীছোড় কবীর সাহেবের পূজা করতে হবে। যিনি সমস্ত দুঃখের হরণকারী কষ্ট মোচনকারী।

সামবেদ সংখ্যা নম্বর ৮২২ উতার্চিক অধ্যায় ৩ খন্ড নম্বর ৫ শ্লোক নম্বর ৮ (সন্ত রামপাল দাস দ্বারা অনুবাদিত) :-

**মনীষিভিঃ পবতে পূর্ব্যঃ কবির্নৃভির্যতঃ পরি কোশাং অসিষ্যদৎ।**
**ত্রিতস্য নাম জনয়ন্মধু ক্ষরন্নিন্দ্রস্য বায়ুং সখায় বর্ধয়ন্॥ 8॥**

**অনুবাদ:-** সনাতন অর্থাৎ অবিনাশী কবীর পরমেশ্বর, হৃদয় থেকে চাওয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তি করা ভক্তাত্মাকে তিন মন্ত্র উপদেশ দিয়ে পবিত্র করে, জন্ম ও মৃত্যু থেকে মুক্ত করেন এবং তার প্রাণ অর্থাৎ জীবন রূপী শ্বাস যা সংস্কারবশত নিজের মিত্র অর্থাৎ ভক্তের প্রারব্ধ গুণে দেওয়া থাকে, তা নিজের ভান্ডার থেকেপূর্ণ রূপে বাড়িয়ে দেন। যার কারণে পরমেশ্বরের বাস্তবিক/আসল আনন্দকে নিজের আশীর্বাদ প্রসাদ রূপে প্রাপ্ত করান।

**কবীর, দেবী দেব ঠাটে ভয়ে, হমকো ঠৌর বতাও।**
**জো মুঝ (কবীরকে) কো পূজেঁ নহী, উনকো লুটো খাও॥**
**গরীব, কাল জো পীসৈ পীসনা, জৌরা হৈ পনিহার।**
**য়ে দো অসল মজুর হৈঁ, সদগুরু কে দরবার॥**

**৮. অনাবশ্যক দান করা নিষেধ:-** কোথাও বা কাউকে দান রূপে কিছু দেবেনা। না টাকা-পয়সা, না বিনা সেলাই করা বস্ত্র ইত্যাদি কিছু দেবে না। যদি কেউ দান রূপে কিছু চায় তো তাকে খাবার খাইয়ে দাও বা দুধ, লস্যি, জল ইত্যাদি খাইয়ে দাও, কিন্তু অন্য কিছু দেবেনা। কে জানে ঐ ভিখারী হয়তো ঐ টাকা নিয়ে কোন দুষ্কর্ম করবে। যেমন এক ব্যক্তি একজন ভিখারীকে তার মিথ্যা কাহিনী শুনে, যাতে সে বলেছিল যে কি তার বাচ্চা বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাচ্ছে দয়া করতে, দয়া বশত ১০০ টাকা দিয়ে দেয়।

ঐ ভিখারী আগে ছোট গ্লাসে মদ খেত, ঐ দিন সে অর্ধেক বোতল মদ খেয়ে ফেলে। আর নিজের স্ত্রীকে গিয়ে পেটায়। তার স্ত্রী বাচ্চা সমেত সেদিন আত্মহত্যা করে নেয়। ঐ ব্যক্তির দ্বারা করা ঐ দান ঐ পরিবারের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। যদি আপনি ঐ দুঃখী ব্যক্তিকে সাহায্য করতে চান, তাহলে তার বাচ্চাকে ডাক্তার দেখিয়ে দিন, টাকা হাতে দেবেন না।

**কবীর, গুরু বিন মালা ফেরতে, গুরু বিন দেতে দান।**
**গুরু বিন দোনোঁ নিস্ফল হৈঁ, পূছো বেদ পুরান॥**

**৯. এঁটো খাওয়া নিষেধ :-** যে ব্যক্তি মদ, মাংস, তামাক, ডিম, বিয়ার, আফিম্, গাঁজা ইত্যাদি খায় তার এঁটো খাওয়া নিষেধ।

**১০. সত্যলোক গমন (দেহ ত্যাগ) করলে ক্রিয়া কর্ম করা নিষেধ:-** যদি পরিবারের কারোর মৃত্যু হয়ে যায়, চিতাতে অগ্নি যে কেউ দিতে পারে, ঘরের বা অন্যকেউ তথা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার সময় মঙ্গলাচরণ বলে দাও। আর তার ফুল ইত্যাদি কিছু তুলবে না। যদি ঐ জায়গাকে পরিষ্কার করার দরকার থাকে তো ঐ অস্থি উঠিয়ে নিজেই কোন স্থানে প্রবাহিত জলে দিয়ে দাও আর ঐ সময় মঙ্গলাচরণ উচ্চারণ করে দাও। না শ্রাদ্ধ করতে হবে, না ১৩ দিন, ৬ মাস, বার্ষিকী, পিন্ডদান ইত্যাদি কিচ্ছু করার দরকার নেই। কোন অন্য ব্যক্তি দ্বারা হবনযজ্ঞ ইত্যাদি করানোর দরকার নেই। নিজের আত্মীয়-স্বজন তথা পরিবার-পরিজন ইত্যাদি যারা শোক ব্যক্ত করতে আসবে, তাদের জন্য কোনো একটা দিন ঠিক করো। ঐ দিন প্রতিদিনের মতো নিত্য নিয়ম করো, জ্যোতি জ্বালাও তারপর সবাইকে খাবার খাওয়াও। যদি আপনি ঐ মৃত ব্যক্তির নামে কিছু ধর্ম করতে চান তো আপনি নিজের গুরুদেব জীর আজ্ঞা নিয়ে বন্দীছোড় গরীব দাসজী মহারাজের অমৃতময়ী বাণীর অখন্ড পাঠ করানো উচিত।

যদি পাঠ করার আদেশ না পান তো পরিবারকে উপদেশী ভক্তরা চার দিন অথবা সাত দিন ঘরে দেশী ঘি এর এক অখন্ড জ্যোতি জ্বালান এবং ব্রহ্ম গায়ত্রী মন্ত্র প্রতিদিন চারবার করুন তথা তিন অথবা এক বারের মন্ত্র সতলোক বাসিকে দান সংকল্প করুন। যেমন উচিত মনে করবেন এক, দুই বা তিন পর্যন্ত মন্ত্রের জপের ফল তাকে দান করুন। প্রতিদিনের মতো জ্যোতি ও আরতি, নাম স্মরণ করতে থাকুন। এই কথা মনে রাখবেন যে :-

**কবীর, সাথী হমারে চলে গএ, হম ভী চালনহার।**
**কোয় কাগজ মেঁ বাকী রহ রহী, তাতে লগী হৈ বার॥**
**কবীর, দেহ পড়ী তো ক্যা হুয়া, ঝুটা সভী পটীট।**
**পক্ষী উড়ায় আকাশ কূঁ, চলতা কর গয়া বীট॥**

## "কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সত্য কথা"

আমার (সন্ত রামপাল দাসের) পূজ্যগুরুদেব স্বামী রামদেবানন্দ জী মহারাজের ১৬ বছর বয়সে, কোন মহাত্মার সৎসঙ্গ শুনে বৈরাগ্য এসে গিয়েছিল। একদিন তিনি ক্ষেতে গিয়েছিলেন। পাশে বন ছিল, ঐ বনে গিয়ে কোন মৃত জানোয়ারের হাড়গোড়ের কাছে নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে রেখে ঐ মহাত্মার সাথে চলে গিয়েছিলেন।

যখন তার খোঁজ পড়লো তখন তার ঘরের লোকজন দেখল যে, বনের মধ্যে কিছু হাড়গোড়ের কাছে ছেঁড়াফাটা জামাকাপড় পড়ে আছে , দেখে তারা ভেবে নিল যে, কোন জংলি জানোয়ার তাকে খেয়ে ফেলেছে। ঐ কাপড় এবং হাড়গোড়গুলো উঠিয়ে নিয়ে এসে তার অন্তিম সংস্কার করে দিল। তারপর ১৩ দিনের কাজ তথা ছয়

মাসের কাজ করতে লাগলো আর বার্ষিক শ্রাদ্ধ করা শুরু হয়ে গেল।

যখন আমার পূজ্য গুরুদেব অনেক বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তখন একবার ঘরে গিয়েছিলেন। তখন তার ঘরের লোকজন জানতে পারলো যে, তিনি জীবিত আছেন, ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তারা বলেন যে, যখন ইনি ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তখন তার খোঁজ করা হয়েছিল। বনে এনার জামা কাপড় পাওয়া গিয়েছিল, তার কাছে কিছু হাড়গোড় পড়েছিল, তাই আমরা ভেবেছিলাম কোন জংলি জানোয়ারে ওনাকে খেয়ে ফেলেছে। আর ঐ কাপড় গুলো ঘরে এনে অন্তিম সংস্কার করে দিয়েছিলাম।

তারপর আমি (সন্ত রামপাল দাস) আমার পূজ্য গুরুদেবের ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, যখন আমাদের পূজ্য গুরুদেব ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তখন আপনারা কি করেছিলেন? তিনি বললেন কি যখন আমি বিয়ের পর এলাম তখন সেই সময় আমি দেখলাম তার শ্রাদ্ধ করা হচ্ছে। আমি নিজের হাতে এনার প্রায় ৭০ বার শ্রাদ্ধ করেছি। তিনি বললেন যে, যখনই ঘরে কোনো লোকসান হতো, যেমন মহিষের দুধ না দেওয়া, তার দুধের বাটে খারাপ কিছু হয়ে যাওয়া, বা কোন রকমের কোনো লোকসান এসে পড়া ইত্যাদি হতো, তখন আমরা অভিজ্ঞ বয়স্কদের কাছে বুঝতে গেলে তারা বলতো যে, তোমাদের ঘরে কেউ নিঃসন্তান মারা গেছে সে তোমাদের দুঃখ দিচ্ছে। তখন আমি তাদের কাপড় ইত্যাদি দিতাম।

তখন আমি ওনাকে বলি যে, ইনি তো দুনিয়া উদ্ধার করছেন, ইনি কাকে দুঃখ দিচ্ছেন, ইনি তো সুখ দাতা। তারপর আমি (সন্ত রামপাল দাস) ঐ বৃদ্ধাকে বললাম যে এবার তো আপনার সামনে সত্যটা প্রকাশিত হলো। এবার তো ঐ ব্যর্থ সাধনা যেমন শ্রাদ্ধ করা ইত্যাদি বন্ধ করে দিন। তখন উনি বললেন যে এসব তো পুরনো রেওয়াজ, এসব কি করে ছাড়বো! অর্থাৎ নিজের এই পুরনো রীতি রেওয়াজে এতটাই লীন হয়ে গেছেন যে এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ সামনে পেলেন যে, এসব ভুল করছেন,দেখার পরও ওসব ছাড়তে পারছেন না। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে শ্রাদ্ধ করা, পিতর পুজো করা (পিতৃ পুরুষদের পুজো করা) ইত্যাদি সব ব্যর্থ।

**১১. সন্তান জন্মের পর শাস্ত্রের বিরুদ্ধ পূজা করা নিষেধ :-** সন্তানের জন্ম হলে ষষ্ঠী পূজো ইত্যাদি করা যাবে না আঁতুরের কারণে প্রতিদিনের করণীয় পূজা, ভক্তি, আরতী, জ্যোতি জ্বালানো ইত্যাদি বন্ধ করা যাবে না।

এই উপলক্ষে একটা ছোট্ট কথা বলছি যে, এক ব্যক্তির বিয়ের ১০ বছর পরে পুত্রের জন্ম হলো। পুত্র হওয়ার খুশিতে সে প্রচুর ধুমধাম করল, ২০-২৫ টা গ্রামের লোককে ভোজনে নিমন্ত্রণ করলো আর অনেক গান বাজনা হলো অর্থাৎ প্রচুর টাকা খরচ করল । তার এক বছর পর সেই পুত্রের মৃত্যু হয়ে গেল, এবার ঐ পরিবার মাথা ঠুকে কাঁদছে আর নিজের দুর্ভাগ্যকে দোষারোপ করছে। এই জন্য কবীর্দেব আমাদের বলেছেন যে :-

**কবীর, বেটা জায়া খুশী হুঈ, বহুত বজায়ে থাল ॥**
**আনা জানা লগ রহা, জ্যোঁ কীড়ী কা নাল॥**
**কবীর, পতঝড় আবত দেখ কর, বন রোবৈ মন মাহিঁ ।**
**উঁচী ডালী পাত থে, অব পীলে হো হো জাহিঁ॥**
**কবীর, পাত ঝড়ঁতা য়ূঁ কহৈ, সুন ভঙ্গ তরুবর রায় ।**
**অব কে বিছুড়ে নহীঁ মিলা, ন জানে কহাঁ গিরেঙ্গে জায়॥**
**কবীর, তরুবর কহতা পাত সে, সুনো পাত এক বাত।**
**য়হাঁ কী য়াহে রীতি হৈ, এক আবত এক জাত॥**

**১২.দেবস্থানে চুল দিতে যাওয়া নিষেধ:-** সন্তানের চুল দিতে কোন দেবী দেবতাদের স্থানে যাওয়া যাবে না। যখন দেখবেন চুল বড় হয়ে গেছে কেটে ফেলে দেবেন। একটা মন্দিরে দেখা যায় যে, শ্রদ্ধালু ভক্তরা নিজের মেয়ে অথবা ছেলের চুল দিতে গেছে, ওখানে উপস্থিত নাপিত বাইরে যা রেট তার থেকে তিনগুণ টাকা নিচ্ছে আর একবার কাঁচি চালিয়ে বাবা-মার কাছে দিয়ে দিচ্ছে। তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে সেটা দান করছে। পূজারী একটা থলিতে ফেলে দিচ্ছে। রাত্রিতে সেখান থেকে তুলে নিয়ে দূরে কোনো ফাঁকা জায়গায় ফেলে দিচ্ছে। এটা কেবল একটা নাটক। আবার আগের মতো স্বাভাবিক ভাবে চুল কেটে বাইরে ফেলে দিলেই তো হয়। পরমাত্মা, নাম স্মরণে প্রসন্ন হন ভন্ডামিতে নয়।

**১৩. নাম জপ করলে সুখ হয়:-** কেবল মাত্র দুঃখ নিবারণ করার দৃষ্টিকোণ থেকে নাম উপদেশ গ্রহণ করা উচিত নয় । বরং আত্ম কল্যাণের জন্য নেওয়া উচিত। তারপর নাম স্মরণ (জপ) করলে তো সর্ব সুখ আপনা আপনি হয়ে যায়।

**কবীর,সুমিরন সে সুখ হোত হৈ, সুমিরন সে দুঃখ জাএ।**
**কহেঁ কবীর সুমিরণ কিএ, সাঁঈ মাহিঁ সমায়॥**

**১৪. ব্যভিচার করা নিষেধ :-** পরস্ত্রীকে মা-মেয়ে-বোনের দৃষ্টিতে দেখা উচিত। ব্যভিচার হল মহাপাপ। যেমন :-

**গরীব, পরদ্বারা স্ত্রী কা খোলৈ। সত্তর জন্ম অন্ধা হো ডোলৈ ॥**
**সুরাপান মদ্য মাংসাহারী। গবন করেঁ ভোগৈঁ পর নারী ॥**
**সত্তর জন্ম কটত হৈঁ শীশম্। সাক্ষী সাহিব হৈ জগদীশম্॥**
**পরনারী না পরসিয়ো, মানো বচন হমার । ভবন চতুর্দশ তাস সির, ত্রিলোকী কা ভার॥**
**পরনারী না পরসিয়ো, সুনো শব্দ সলতন্ত। ধর্মরায় কে খম্ভ সে, অর্ধমুখী লটকন্ত॥**

**১৫. নিন্দা করা এবং শোনা উভয়ই নিষেধ :-** ভুল করেও নিজের গুরুর নিন্দা কখনো করবেন না আর না তো কারো কাছে শুনবেন । শুনবেন না কথাটা বলার মানে হলো, যদি কেউ আপনার গুরুর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে, তাহলে আপনি লড়াই করবেন না, কেন না এই কথাটা বুঝতে হবে যে, ও তো বিচার শক্তিহীন অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলছে।

**গুরু কী নিন্দা সুনৈ জো কানা। তাকো নিশ্চয় নরক নিদানা॥**
**অপনে মুখ নিন্দা জো করহীঁ। শুকর শ্বান গর্ভ মেঁ পরহী॥**

নিন্দা তো কারোরই করা যাবে না, আর না কারোর নিন্দা শোনা যাবে, তাতে সে কোনো সাধারণ ব্যক্তিই হোক না কেন । কবীর সাহেব বলেন যে :-

**তিনকা কবহূ ন নিন্দিয়ে, জো পাঁব তলে হো। কবহু উঠ আখিন পড়ে, পীর ঘনেরী হো॥**

**১৬. গুরু দর্শনের মহিমা :-** সময় পেলেই সৎসঙ্গে আসার চেষ্টা করুন আর সৎসঙ্গে মান-বড়াই করার জন্য আসবেন না । বরং নিজেকে একজন রোগী মনে করে আসবেন। যেমন একজন রোগী ব্যক্তি সে যতই পয়সা ওয়ালা হোক অথবা উচ্চ পদাধিকারী হোক, হাসপাতালে যখন যায়, তখন তার কেবল একটাই উদ্দেশ্য যে রোগ মুক্ত হওয়া । যেখানে ডাক্তার শুতে বলবেন সেখানেই শুয়ে পড়েন, যেখানে বসতে বলেন সেখানেই বসে পড়েন, বাইরে যেতে নির্দেশ দিলে বাইরে চলে যায় । আবার ভিতরে আসার জন্য ডাকলে চুপচাপ ভেতরে চলে আসে । ঠিক এইভাবে যদি আপনি সৎসঙ্গে আসেন, তাহলে আপনার সৎসঙ্গে আসার ফল মিলবে অন্যথায় আপনার আসা নিষ্ফল হবে । যেখানে বসার জায়গা পাওয়া যাবে সেখানেই বসে যাবেন, যা

খাওয়ার জন্য পাওয়া যাবে তাই পরমাত্মা কবীর সাহেবের দয়ার প্রসাদ মনে করে খেয়ে প্রসন্ন হবেন।

গুরু দর্শনে অনেক লাভ পাওয়া যায়। কবীর পরমেশ্বর জী বলেছেন যে :-

**কবীর, সন্ত মিলন কূঁ চালিএ, তজ মায়া অভিমান। জো-জো কদম আগে রখে, বো হী যজ্ঞ সমান॥**
**কবীর, সন্ত মিলন কূঁ জাইয়ে,দিন মেঁ কঈ-কঈ বার। আসোজ কে মেহ্ জ্যোঁ, ঘনা করে উপকার॥**
**কবীর, দর্শন সাধুকা পরমাত্মা আবৈ য়াদ। লেখে মেঁ বোহে ঘড়ী, বাকী কে দিন বাদ॥**
**কবীর, দর্শন সাধু কা, মুখ পর বসৈ সুহাগ। দর্শ উন্হীঁ কো হোত হৈঁ, জিনকে পূর্ণ ভাগ॥**

**১৭. গুরুদেবের মহিমা :-** যদি কোথাও পাঠ বা সৎসঙ্গ চলছে বা এমনিই গুরুদেবের দর্শনের জন্য গেছেন তো সর্বপ্রথম গুরুদেবকে দণ্ডবৎ (লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে) প্রণাম করা উচিত। পরে সদগ্রন্থ সাহেব এবং ফটো গুলিতে যেমন প্রভু (সাহেব) কবির্দেবের মূর্তি, গরীবদাস মহারাজ এবং স্বামী রামদেবানন্দ মহারাজ এবং গুরুদেবের মূর্তির সামনে প্রণাম করুন। যাতে শুধু (শ্রদ্ধাভক্তির) ভাব বজায় থাকে। মূর্তি পূজা করা যাবে না। কেবল প্রণাম করা পূজোর মধ্যে পড়ে না। এটা তো ভক্তের শ্রদ্ধাকে বজায় রাখতে সহযোগিতা করে। পূজা তো উপস্থিত গুরুর এবং নাম মন্ত্রের করতে হবে যা আপনাকে পার করবে।

**কবীর, গুরু গোবিন্দ দোউ খড়ে, কাকে লাগূঁ পায়।**
**বলিহারী গুরু আপনে, জিন গোবিন্দ দিয়ো মিলায়॥**
**কবীর, গুরু বড়ে হৈঁ গোবিন্দ সে, মন মেঁ দেখ বিচার।**
**হরি সুমরে সো রহ্ গএ, গুরু ভজে হোয় পার॥**
**কবীর, হরি কে রুঠতাঁ, গুরু কী শরণ মেঁ জায়।**
**কবীর গুরু জৈ রুঠ জাঁ, হরি নহীঁ হোত সহায়॥**
**কবীর, সাত সমুন্দ্র কী মসি করূঁ, লেখনি করূঁ বনিরায়।**
**ধরতী কা কাগজ করূঁ, তো গুরু গুন লিখা ন জায়॥**

**১৮. মাংস ভক্ষণ করা নিষেধ :-** ডিম, মাংস ভক্ষণ করা এবং জীব হিংসা করা যাবে না । এতে মহাপাপ হয় । যেমন প্রভু (সাহেব) কবির্দেব মহারাজ এবং গরীবদাস মহারাজ বলেছেন যে :-

**কবীর, জীব হনে হিংসা করে, প্রকট পাপ সির হোয়, নিগম পুনি ঐসে পাপ তেঁ, ভিস্ত গয়া নহীঁ কোয়॥ ১॥**
**কবীর, তিলভর মছলী খায়কর, কোটি গউ দে দান। কাশী করৌঁত লে মরে, তো ভী নরক নিদান॥ ২॥**
**কবীর, বকরী পাতী খাত হৈ, তাকী কাটী খাল। জো বকরী কো খাত হৈ, তিনকা কৌন হবাল॥ ৩॥**
**কবীর, গলা কাটি কলমা ভরে, কীয়া কহৈ হলাল। সাহব লেখা মাংগসী, তব হোসী কৌন হবাল॥ ৪॥**
**কবীর, দিনকো রোজা রহত হৈঁ, রাত হনত হৈঁ গায়। য়হ খূন বহ বন্দগী, কহুঁ ক্যোঁ খুশী খুদায়॥ ৫॥**
**কবীর, কবীরা তেঈ পীর হৈঁ, জো জানৈ পর পীর। জো পর পীর ন জানি হৈ, সো কাফির বেপীর॥ ৬॥**
**কবীর, খুব খানা হৈ খীচড়ী, মাঁহীঁ পরি টুক লৌন। মাংস পরায়া খায়কৈ, গলা কটাবৈ কৌন॥ ৭॥**
**কবীর, মুসলমান মারৈঁ করদ সোঁ, হিন্দু মারৈঁ তরবার। কহৈ কবীর দোনূঁ মিলি, জৈহৈঁ যম কে দ্বার॥ ৮॥**
**কবীর, মাংস অহারী মানব, প্রত্যক্ষ রাক্ষস জানি। তাকী সঙ্গতি মতি করৈ, হোঈ ভক্তি মেঁ হানি॥ ৯॥**
**কবীর, মাংস খাঁয় তে ঢেড় সব, মদ পীবৈঁ সব নীচ। কুল কী দুরমতি পর হরৈ, রাম কহৈ সো উঁচ॥ ১০॥**
**কবীর, মাংস মছলিয়া খাত হৈঁ, সুরাপান সে হেত। তে নর নরকৈ জাহিঙ্গে, মাতা পিতা সমেত॥ ১১॥**
**গরীব, জীব হিংসা জো করতে হৈঁ, যা আগে ক্যা পাপ। কন্টক জুনী জিহান মেঁ, সিংহ ভেড়িয়া ঔর সাঁপ ॥**
**ঝোটে বকরে মুরগে তাঈ। লেখা সব হী লেত গুসাঈ। মৃগ মোর মারে মহমন্তা। অচরা চর হৈঁ জীব অনন্তা॥**
**জিহ্বা স্বাদ হিতে প্রাণা। নীমা নাশ গয়া হম জানা।**

**তীতর লবা বুটেরী চিড়িয়া। খূনী মারে বড়ে অগড়িয়া॥**
**অদলে বদলে লেখে লেখা। সমঝ দেখ সুন জ্ঞান বিবেকা॥**
**গরীব, শব্দ হমারা মানিয়ো, ঔর সুনতে হো নর নারি।**
**জীব দয়া বিন কুফর হৈ, চলে জমানা হারি॥**

অজান্তে হয়ে যাওয়া হিংসাতে পাপ হয় না। বন্দীছোড় কবীর সাহেব বলেছেন যে:-

**ইচ্ছা কর মারৈ নহীঁ, বিনা ইচ্ছা মর জাএ।**
**কহৈঁ কবীর তাস কা, পাপ নহী লগাএ।**

**১৯.গুরু দ্রোহীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা নিষেধ:-** যদি কোন ভক্ত গুরুদেবের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা (গুরুদেবের থেকে বিমুখ হয়ে যায়) করে, সে মহাপাপের ভাগী হয়ে যায়। যদি কারোর এই মার্গ ভালো না লাগে, তাহলে নিজের গুরু বদলে নিতে পারে। যদি সে পূর্বের গুরুর সঙ্গে শত্রুতা করে বা তাঁর নিন্দা করে তাহলে তাকে গুরুদ্রোহী বলা হয়। এই ধরনের ব্যক্তির সাথে ভক্তি চর্চা করলে উপদেশীদের দোষ লাগে, তাদের ভক্তি সমাপ্ত হয়ে যায়।

**গরীব, গুরু দ্রোহী কী পৈড় পর, জে পগ আবৈ বীর। চৌরাসী নিশ্চয় পড়ে, সতগুরু কহৈঁ কবীর॥**
**কবীর, জান বুঝ সাচী তজৈ, করৈ ঝুঠে সে নেহ। জাকী সঙ্গত হে প্রভু, স্বপন মেঁ ভী না দেহ॥**

অর্থাৎ গুরুদ্রোহীর কাছে যাওয়া ব্যক্তি ভক্তি রহিত হয়ে নরক এবং চুরাশি লক্ষ প্রকার যোনীতে চলে যাবে।

**২০. জুয়া খেলা নিষেধ:-** কখনো জুয়া, তাস খেলা উচিত নয়।

**কবীর, মাংস ভখৈ ঔর মদ পিয়ে, ধন বেশ্যা সৌঁ খায়।**
**জুয়া খেলি চোরী করৈ, অন্ত সমূলা জায়।**

**২১. নাচ গান করা নিষেধ :-** কোনো ধরনের কোনো খুশির অনুষ্ঠানে নাচ করা বা অশ্লীল গান গাওয়া, ভক্তি ভাবের বিরুদ্ধ কর্ম। যেমন এক সময় এক বিধবা বোন কোনো খুশির অনুষ্ঠানে নিজের আত্মীয়ের ঘরে গিয়েছিল। সবাই খুশিতে নাচছিল, গান করছিল কিন্তু ঐ বোন এক ধারে বসে প্রভুর চিন্তায় লেগেছিল। তখন তার আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি এইভাবে কেন নিরাশ হয়ে বসে আছো? তুমিও আমাদের মতো নাচ করো, গান করো, আনন্দ করো। এই কথায় ঐ বোন বলে যে, কিসের আনন্দ করব! আমার মতো বিধবার একটাই ছেলে ছিল, সেও ভগবানের প্রিয় হয়ে গেল। এখন কিসের খুশি আর আমার জন্য বাকি আছে? এই কালের লোকে প্রত্যেকটি ব্যক্তির ঠিক একই রকম অবস্থা।

এর উপরে গুরু নানক দেবজীর বাণী রয়েছে যে :-

**না জানে কাল কী কর ডারে, কিস বিধি ঢল জা পাসা বে।**
**জিন্হাদে সির তে মৌত খুড়গদী, উন্হাঁনু কেড়া হাঁসা বে॥**
**সাধ মিলে সাডী শাদী (খুশী) হোন্দী, বিছড় দাঁ দিল গিরি (দুঃখ) বে।**
**অখদে নানক সুনো জিহানা, মুশকিল হাল ফকীরী বে॥**

কবীর সাহেব জী মহারাজ বলেছেন :-

**কবীর, ঝূঠে সুখ কো সুখ কহৈ, মান রহা মন মোদ।**
**সকল চবীনা কাল কা, কুছ মুখ মেঁ কুছ গোদ ॥**
**কবীর, বেটা জায়া খুশী হুঈ, বহুত বজায়ে থাল।**
**আবন জাণা লগ রহা, জ্যোঁ কীড়ী কা নাল॥**

**বিশেষ কথা:-** স্ত্রী অথবা পুরুষ উভয়েই পরমাত্মা প্রাপ্তির অধিকারী। স্ত্রীদের মাসিক ধর্মের (menstruation) দিন গুলোতেও নিজের দৈনিক পূজা, জ্যোতি জ্বালানো ইত্যাদি বন্ধ করা উচিত নয়। আর না তো কারোর মৃত্যু বা জন্মের পর দৈনিক পূজা কর্ম বন্ধ করা উচিত।

**নোট:-** যে ভক্তগণ এই ২১-টি মূল আদেশ পালন করবে না, সে নাম বিহীন হয়ে যাবে। যদি অজান্তে কোন ভুল হয়ে যায়, তাহলে তা মাফ হয়ে যায়। আর যদি জেনে বুঝে কেউ ভুল করে, তাহলে ঐ ভক্ত নাম বিহীন হয়ে যায়। এর সমাধান এটাই হল যে, গুরুদেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে দ্বিতীয়বার নাম উপদেশ নিতে হবে। দয়া করে পড়ুন, ঐ সমস্ত ভক্তদের আত্মকথা, যারা শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা ত্যাগ করে উপরোক্ত নিয়ম গুলি পালন করে কেমন সুখী হলো। আর পূর্বে তারা লোকবেদের আধারে পূজা-অর্চনা করেও মহা দুঃখী ছিল।

**লেখক -**
**সন্ত রামপাল দাস মহারাজ**
**সতলোক আশ্রম বরবালা,**
**জেলা- হিসার, হরিয়াণা (ভারত)।**

## "শাস্ত্রানুকূল ভক্তি-সাধনায় হওয়া ভক্তদের লাভ"

### "ভক্ত মদন দাসের পরিবারের প্রতি সদগুরুর কৃপা"

আমার নাম মদন দাস, (প্রাক্তন স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) গ্রাম:- ঝিকরা, পোঃ- দীঘলগ্রাম, জেলা:- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের বাসিন্দা। আমি গত ২৩/১০/২০১৯ তারিখে অনলাইনে নাম দীক্ষা নিয়েছিলাম। আমার বর্তমান বয়স ৬৬ বছর। আমার গ্রামে বৈষ্ণব ধর্মীয়দের জন্য এক আশ্রম আছে, যা আমার পিতা, জ্যাঠামশাই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। স্বাভাবিক কারণেই আমি ৭/৮ বছর বয়স থেকেই বৈষ্ণব ধর্মচর্চায় নিমজ্জিত ছিলাম। আমি ও আমার স্ত্রী, নবদ্বীপের শ্রীবাস অঙ্গন থেকে দীক্ষা নিয়েছিলাম ২০০০ সালে। প্রায় ১৬-১৭ বছর ধরে বৈষ্ণব ধর্মের সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিতাম। নিয়মিত জপ ধ্যান করেছি। আমার স্ত্রী ভগাবত পাঠিকা ছিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠা নিয়ে পূজা অর্চনা করতেন। তা সত্ত্বেও আমাদের কনিষ্ঠ কন্যার ছাদ থেকে পড়ে অকালে মৃত্যু হয়। আমি কেবলই ভাবতাম যদি একজন সঠিক গুরু পেতাম, তাহলে সংসারের প্রাণীদের অকাল মৃত্যু, শোক, দুরবস্থা প্রভৃতি দুঃখ কষ্টের হাত থেকে মুক্তি পেতাম। আমি ৩১/৮/২০১৭ তারিখে সরকারি ব্যাংকের আধিকারিক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করি। তারপর আমি সঠিক গুরুর সন্ধান করতে থাকি। আমার স্ত্রী নিয়মিত টিভিতে ধর্মীয় চ্যানেল দেখেন এবং ভাগবত পাঠ শিক্ষা করেন। এভাবে একদিন গুরুদেব রামপাল মহারাজের সৎসঙ্গ শোনেন এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে জানতে পারেন অনেক রোগী রোগমুক্ত হচ্ছে। আমার স্ত্রী হেপাটাইটিসের রোগী ছিলেন এবং কোলকাতার পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ডাক্তারবাবুরা বলে দিয়েছিলেন যে, এই রোগ কোনদিন সারবে না। তাই গুরুদেব রামপালজী মহারাজের সৎসঙ্গ শোনার সময় শেষের দিকে পাঁচ/দশ মিনিটের বিভিন্ন রোগীদের ইন্টারভিউ দেখে খুবই উৎসাহিত হয়ে, এবং টিভিতে প্রচারিত ফোন নম্বরে আমি সরাসরি যোগাযোগ করি। পরিশেষে রিষড়া নামদান কেন্দ্র থেকে আমার স্ত্রী নাম দীক্ষা নেয়। গুরুজীর দেওয়া নিয়ম কানুন মেনে মর্যাদায় থেকে আমার স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। আমি এমন চমৎকার দেখে তো অবাক হয়ে যাই। এবার আমার কথায় আসি । আমি অবসর গ্রহণ করার পর দুটি অপ্রত্যাশিত বিপদে পড়ি। প্রথমটিতে আমি ইনকাম ট্যাক্স দপ্তর থেকে একটি নোটিশ পাই যে, ঐ দপ্তরে আমার এক লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা বকেয়া আছে বলে দাবি করে। কিন্তু আমি যে দপ্তরের কাজ করেছি, সেখানে কোন গন্ডগোল হয় না এবং নিজে আধিকারিক হিসেবে ট্যাক্স জমা করতাম, যেখানে প্রতিবছর অডিট করা হতো। সুতরাং ভুল হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। আমি আমার ভক্তিমতীকে বলেছিলাম যে "তুমি তোমার গুরুদেবকে বলে আমাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দাও"। আমার স্ত্রী আমাকে গুরুদেবের সামনে দণ্ডবৎ প্রণাম করে প্রার্থণা বা আবেদন জানাতে বলেন। আমি অত্যন্ত দুঃখে সজল নয়নে গুরুদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে আর্জি জানাই, যদিও আমি তখনও দীক্ষা গ্রহণ করিনি। রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়ে কে একজন সাদা পোশাকের বৃদ্ধ আমাকে সমাধানের রাস্তা বলে দিলেন। আমি সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে স্বপ্নের নির্দেশ মতো এক ইনকাম ট্যাক্স উকিলের সঙ্গে যোগাযোগ করি, যিনি আমার ঐ ট্যাক্সের টাকা মুকুব করিয়ে দেন এবং ৪০০০ টাকা ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা হয়। ফলে গুরুজীর প্রতি আমার বিশ্বাস দৃঢ় হয়। তারপর রিষড়ায় অনলাইনে গুরুজীর নিকট থেকে নামদীক্ষা গ্রহণ করি।

**দ্বিতীয় চমৎকার:-** অবসরের পর আমি কলিকাতার দমদমে চল্লিশ লক্ষ (40

লাখ) টাকা খরচ করে একটি ফ্ল্যাট কিনি; কিন্তু প্রোমোটার ঐ ফ্ল্যাট দুজনের কাছে বিক্রি করেন। দুজনের কাছে থেকে টাকা নিয়ে তিনি নিখোঁজ বা লুকিয়ে পড়েন। ফ্ল্যাটে ডবল ডবল তালা ঝোলানো হয়। আমি রিষড়াতে ভগৎ দিলীপ দাসের সঙ্গে আমার সমস্যার কথা বলি। উনি বলেন যে যদি আইন আদালত ও নেতা-মন্ত্রীদের দ্বারস্থ হন তবে প্রচুর টাকা খরচ হবে এবং দীর্ঘদিন সময় লাগবে। তিনি তখন আমার ফ্ল্যাটের বিষয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য গুরুজীর কাছে প্রার্থণা জানাতে বলেন। গুরুজীর কৃপায় প্রার্থণা জানানোর ১৫ দিনের মধ্যে ফ্ল্যাট সংক্রান্ত সমস্যা মিটে যায়। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর আমার নামে ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রি হয় এবং গুরুজী আমাকে ৪০ লক্ষ টাকা ক্ষতির হাত থেকে বাঁচান।

এছাড়া ছোট-বড় অনেক সমস্যা, বিপদ, আপদ থেকে মুক্তি পাই গুরুজীর দয়াতে। আমার এক বিবাহিত কন্যা গুরুজীর শরণে এসে নাম দীক্ষা নিয়েছে, সে আজ পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দপ্তরে কর্মরতা। আপাতত আমার পরিবারে কোন বড় রকমের সমস্যা নেই। গুরুজীর কৃপায় এবং আরো অনেক উপকার পেয়েছি। সকল বুদ্ধিজীবী মহলের কাছে আমার প্রার্থণা এই যে সত্য জ্ঞানকে বোঝার চেষ্টা করুন এবং সদগুরু শ্রী রামপালজি মহারাজের চরণে এসে নাম দীক্ষা নিয়ে মনুষ্য জীবন সফল করুন। বন্দীছোড় সতপুরুষ সদগুরুদেব রামপালজী মহারাজ আমার মত ক্ষুদ্র জীবকে চরণে আশ্রয় দিয়েছেন এবং প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর চমৎকারিত্ব অনুভব করিয়েছেন। গুরুজীর আশীর্বাদ আমাদের জীবনে "চমৎকার হি চমৎকার"। বন্দীছোড় যে কৃপা করেছেন তা মুখে বর্ণনা করার ভাষা ও সামর্থ্য আমার মত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। গুরুজীর শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম।

**জয় হো বন্দীছোড় কি।**

**ভক্ত মদন দাস**
**গ্রাম:- ঝিকরা, পোঃ- দীঘেলগ্রাম**
**জেলা:- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ**
**পিন নং- ৭৪১২৫৭**
**মোবাইল নং- ৯৯৩৩৫২১৯৫৭**

## সদগুরুদেবের শরণে এসে দূর হল ভুত-প্রেতের বাধা

আমি ভক্ত রমেশ পুত্র শ্রী উমেদ সিংহ গ্রাম- পেটবাড়, তহশিল-হাঁসী, জেলা হিসারের নিবাসী। এখন এম্পলাইজ কলোনী, জীন্দ এ জেলের সামনে সপরিবারে থাকি।

নাম নেওয়ার আগে আমি ভূতের পূজা করতাম। আমাদের গ্রামে বাবা সরিয়ার মান্যতা ছিল। ওখানে আমি প্রত্যেক মাসে পূর্ণিমায় জ্যোতি জ্বালাতে যেতাম। আমি শুক্রবার, জন্মঅষ্টমী, শিব রাত্রির ব্রত করতাম। পিতরকে পিণ্ড দান আর শ্রাদ্ধ ও করতাম, তবুও আমার ঘর বরবাদ হয়ে যায়। যখন আমি ১২ বছরের ছিলাম তখন আমার পিতার মৃত্যু হয়। বাড়িতে তিন সদস্য। আমাদের এই তিন জনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-ঝাটি লেগে থাকত। আমাদের সবাইকে ভূত প্রেত খুব দুঃখী করত, প্রায়ই অসুখ বিসুখ লেগে থকত। প্রথমে ডাক্তারের কাছে যেতাম কিন্তু কোন আরাম না হওয়ায় পরে কবিরাজের কাছে যেতাম। কেউ বলে আমাকে ৫০০০ টাকা দিলে আমি সব ঠিক করে দেব। কেউ বলে ১০,০০০ টাকা দাও।

আমি একেবারে বরবাদ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার আত্মীয় ভক্ত রঘুবীর সিংহ গ্রাম কৌথকলা। তার প্রার্থনায় আমার মাতাজী ১৯৯৬ সালে সন্ত রামপালজী মহারাজ থেকে

নাম উপদেশ নেয়। আমার স্ত্রীর ৫ বছরের মধ্যে কোন সন্তান উৎপন্ন হয় নি। আমার মাতাজীর কথায় আমার স্ত্রী ও নাম উপদেশ নেয়। নাম উপদেশ নেওয়ার এক বছরের ভিতর এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। ভগবানের উপর থেকে আমার বিশ্বাস শেষ হয়ে গিয়েছিল। যার কারণে আমি নাম উপদেশ নেই নি। মা-ও স্ত্রীকে আশ্রমে যেতে মানা করতাম। একবার আমার ১৫ দিনের ছেলের খুব শরীর খারাপ হয়। ডাক্তার বলে দেয় এই বাচ্চা সকাল পর্যন্ত মরে যাবে। একে নিয়ে যাও। সন্ধ্যায় এক ভক্ত বন্দীছোড় সদগুরু রামপালজী মহারাজের বিষয়ে বলে, জিন্দের আশ্রমে পূর্ণ সন্ত এসেছে। তিনি এই বাচ্চাকে ঠিক করতে পারেন। আমি ডাক্তার আর কবিরাজের কাছে যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ভগবানের উপর থেকে আমার বিশ্বাস হারিয়ে গিয়েছিল। আমি ঐ ভক্তকে মানা করে দিই। ভক্ত দ্বিতীয়বার প্রার্থনা করে স্বয়ং ভগবান বন্দীছোড় অবতার নিয়ে এসেছে। যদি তিনি দয়া করেন তাহলে ঐ বাচ্চা ঠিক হতে পারে। ঐ ভক্তের এতো বিশ্বাস দেখে আমি মাতাজীকে অনুমতি দিই। আমার মা ছেলেকে নিয়ে গুরুজীর চরণে রেখে দেয়। আর কান্না-কাটি করে প্রার্থনা করে, মহারাজ এ বাচ্চা তো মরে গেছে। এখন আপনিই ঠিক করতে পারেন। তখন বন্দীছোড় সতগুরু বলেন, বাচ্চা পরমেশ্বরের দয়ায় ঠিক হয়ে যাবে। বল বন্দীছোড় সদগুরু রামপালজী মহারাজ কি জয়।

আমার বরবাদ হওয়া ঘর বন্দীছোড় সদগুরু রামপালজী মহারাজের দয়ায় পুনরায় স্থাপিত হয়। এই চমৎকার দেখার পরেও পাপ কর্মের জন্য আমি নাম উপদেশ না নিয়ে ভূতের পূজাই করতে থাকি। আমার বাড়ি বন্দীছোড় গরীব দাসজীর বাণীর পাঠ সন্ত রামপালজী মহারাজ করতেন আর আমি বাইরে গিয়ে মদ পান করতাম। এক বছর পরে একদিন আমাদের বাড়ি পাঠ হচ্ছিল সন্ধ্যার সময় সদগুরু রামপালজী মহারাজ সত্সঙ্গ করেন। সেইদিন আমি সত্সঙ্গ শুনি এবং নাম উপদেশ নিই। আজ আমাদের ঘরে দুঃখ নামের কোন শব্দ নেই। আমার মা লোকের কথায় ভ্রমিত হয়ে নাম খণ্ডিত করে দেয়।

কিছুদিন পরে ২০০০ সালে মায়ের গায়ে হঠাৎ জ্বলন হতে লাগে। ডাক্তারকে দেখাই ডাক্তার বলে ব্লাড ক্যান্সার। এ ১০/১৫ দিনের মধ্যে মরে যাবে। যদি পি.জি. আই চণ্ডীগড় নিয়ে যাও, যদি দেড় লাখ টাকা খরচ কর তাহলে এক বছর বাঁচতে পারো। কিন্তু ব্যথা কম হবে না। বন্দীছোড় সদগুরু রামপালজী মহারাজ বলেছে তোমার মা নাম খণ্ডিত করে দিয়েছে। যেমন বিজলীর বিল না দিলে কানেকশন কাটলে বিদ্যুতের লাভ পাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় কানেকশন নিলে বিদ্যুতের লাভ প্রাপ্ত হয়। আমার মা নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চান। মহারাজজী পুনঃ নাম দেন এবং মাথায় হাত রাখেন। মাথায় হাত রাখতেই গায়ের জ্বলন বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় দুই বছর পরে মাড়ির দাঁত পড়ার কারণে রক্ত বের হতে লাগে। ডাক্তার ওষুধ দিয়েছে কিন্তু রক্ত পরা বন্ধ হয় না। তখন ডাক্তার চেকআপ করে বলে ব্লাড ক্যান্সারে ফেটে গেছে। এখন আর ঠিক হবে না। বাড়িতে নিয়ে যাও। দুই দিনের মধ্যে মৃত্যু হবে। পরের দিন পায়খানা প্রস্রাবের সাথেও রক্ত আসতে শুরু করে। তখন আমি সদগুরু রামপালজী মহারাজকে ফোন করে বলি, ডাক্তার বলেছে, এ দুই দিনের মধ্যে মরে যাবে। তখন সদগুরুদেব বলেন, বন্দীছোড় যা করবে তা ঠিক করবে। পরের রাতে ২টার সময় যমদূত মাকে নিতে আসে। আমার মা বলেছে তোর পিতা (যে দশ বছর পূর্বে মারা গিয়েছে) আমাকে নিতে এসেছে। এই কথা বলতেই যমদূত আমার মায়ের ভিতর প্রবেশ করে বলতে লাগে আমি একে নিয়ে যাব। এর সময় পুরা হয়ে গিয়েছে। আমাকে চা খাওয়াও। আমি

চা বানিয়ে রেখেছিলাম। ওর মধ্যে যমদূত বলতে লাগে, জানি না তোমাদের ঘরে কত বড় শক্তি আছে। সে আমাকে মারছে। আমি আর এখানে থাকতে পারছি না। আমাকে তাড়াতাড়ি চা খাওয়াও, আমি চলে যাচ্ছি। এই বলে গরম চা খেয়ে ফেলে। যাওয়ার সময় বলে তোমাদের বাড়ি পূর্ণ পরমাত্মা আছে। আমি একে নিয়ে যেতে পারলাম না। এই কথা বলে চলে যায়। এক মিনিটের ভিতর রক্ত পড়া একদম বন্ধ হয়ে যায়। জিহবা ও দাঁত কালো হয়ে গিয়েছিল তাও ঠিক হয়ে যায়। সদগুরু রামপালজী মহারাজের কৃপায় আমার মা আগের থেকেও সুস্থ হয়ে যায়। পরমেশ্বর কবীর সাহেবজী আমার মায়ের ৫ বছর আয়ু বাড়িয়ে দেন। ২৪ জুলাই ২০০৫-এ সত ভক্তি করে আমার মা সতলোক প্রস্থান করে। বলো বন্দীছোড় সতগুরু রামপালজী মহারাজকী জয়!

সত্ সাহেব।

## সদগুরুদেবের অসীম কৃপায় ব্রেন টিউমার বিনা অপারেশনে সম্পূর্ণ সেরে গেছে

আমি ভক্তিমতি পূর্ণিমা সরকার, আমার স্বামীর নাম বরেন সরকার, আমি পশ্চিমবঙ্গের, জলপাইগুড়ি জেলার, আমবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা। পরম্পরা অনুযায়ী পুরাতন রীতি অনুসারে আমি বিভিন্ন প্রকার দেবী দেবতাদের নিত্য পূজা, গীতা পাঠ, বিশেষ করে গোপাল সেবা তথা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতাম এবং তাঁকেই সর্বশক্তিমান পূর্ণ পরমাত্মা বলে মানতাম। সেটা ২০২০ সাল চলছিল, হঠাৎ করে একদিন দুপুরবেলা পূজার সময়ে আমার বমি হওয়া এবং মাথা ঘোরা শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই, তারপর আমার ছেলে এবং স্বামী দুজন মিলে আমাকে স্থানীয় ডাক্তারখানায় নিয়ে যায়, সেখান থেকে আমাকে তড়িঘড়ি শিলিগুড়ি সদর হসপিটালে পাঠানো হয়। সেখানকার ডাক্তাররা আমার সিটি স্ক্যান করায় এবং রিপোর্টে ব্রেন টিউমার ধরা পড়ে। যখন আমার জ্ঞান ফেরে তখন আমি দেখি আমি একটা নার্সিংহোমে ভর্তি আছি। এই ঘটনা গুলির কথা আমি জ্ঞান ফেরার পরে নিজের ছেলের মুখেই শুনি। কিছুদিন পর কিছু ওষুধপত্র দিয়ে ট্রিটমেন্ট করার পরে ঐ নার্সিংহোম থেকে আমাকে ব্রেন টিউমার অপারেশন করানোর জন্য ব্যাঙ্গালোরে রেফার করে দেওয়া হয় এবং অপারেশনের খরচও প্রায় ছয় লক্ষ টাকা হতে পারে বলে জানিয়ে দেয়, কারণ ব্রেন টিউমারটি খুবই সেনসিটিভ জায়গায় হয়েছিল, প্রাণঘাতের আশঙ্কা ছিল, তাই ওরা নিজেরা রিস্ক নিতে চায়নি।

এরপর আমার পরিবারের লোকজন আমাকে ব্যাঙ্গালোরে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে কিছুদিন এডমিট থাকার পরও চিকিৎসকরা আমার কেসটা ঠিকমতো ধ্যান দিচ্ছিলেনে না, অন্যান্য ইমারজেন্সি রোগীদের নিয়ে তারা ব্যস্ত ছিলেন। যখন আমার অপারেশনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তারা বলে দেয় ছয় মাস পরে নিয়ে আসতে। ডাক্তারদের কথা মত আমাকে ওষুধপত্র দিয়ে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়, আর ঠিক তার পরেই করোনার জন্য লকডাউন লেগে যায়। ছমাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও লকডাউনের কারণে প্লেন বা ট্রেন কিছুই চলছিল না, আর যে কারণে চিকিৎসার জন্য ব্যাঙ্গালোরে যেতে পারছিলাম না, এদিকে প্রয়োজনীয় ওষুধও শেষ হয়ে গিয়েছিল, শরীর আরো বেশি খারাপ হতে লাগলো, হাঁটা চলা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল, তারপর অ্যাম্বুলেন্সে করে জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতার এস এস কে এম হসপিটালে আনা হল। এস এস কে এম হসপিটালে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কিছুদিন ভর্তি রাখা হল। এমতাবস্থায় আমাকে যে মহিলা ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল, সেখানকার তিন-

চারজনের করোনা পজিটিভ হয়ে যায়। তারপর আমারও পরীক্ষা করা হয় এবং আমিও করোনা পজিটিভ হয়ে যাই। তখন আমাকে এস এস কে এম হসপিটাল থেকে রেফার করে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে অর্থাৎ করোনা হসপিটালে পাঠানো হয়, সেখানে বিনা চিকিৎসায় একরকম মরণাপন্ন অবস্থায় হয়ে যায়, তখন আমি বাড়ির লোককে ফোন করে কান্না-কাটি করে বলি যে, হসপিটালে মরার থেকে নিজের বাড়িতে গিয়ে মরা অনেক ভালো কারণ প্রিয় জনদের পাশে দেখতে পাবো। তোমরা আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলো। তারপর আমার পরিবারের লোকজন আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলে আসে।

এভাবে কিছুদিন কাটার পর একদিন আমার স্বামী বাজারে চলতে থাকা পুস্তক প্রচার সেবা থেকে 'জ্ঞান গঙ্গা' বই নিয়ে এসে আমাকে পড়তে দেয়, ঐ বইটা আমি তিনদিনেই পড়ে কমপ্লিট করি, এবং বইটি পড়ার পরে নিজের মধ্যে নতুন করে বাঁচবার জন্য একটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করি এবং ছোটবেলা থেকে অজানা এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর আমি জানতে পারি, বিশেষ করে মোক্ষ প্রাপ্তির বিষয়ে, তারপর জ্ঞান গঙ্গা পুস্তকে থাকা সন্ত রামপালজী মহারাজের ফটোটা আমি ল্যামিনেশন করে তার সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিজের মত করে ভক্তি করা শুরু করে দিই, আর তাতেই আমার বাম হাত যেটা অকেজো অচল হয়ে পড়েছিল, তা আবার আগের মতো সচল হয়ে যায়। আমার বিশ্বাস তখন অনেক দৃঢ় হয়ে যায়, আর আমি পাগলের মত চেষ্টা করছিলাম কিভাবে সন্ত রামপালজী মহারাজের থেকে নাম দীক্ষা নিয়ে ভক্তি করা যায়। এরপর অনেক বাধা অতিক্রম করে পুস্তকে থাকা নম্বরে ফোন করে নিকটবর্তী শিলিগুড়ি নামদান সেন্টার থেকে নাম দীক্ষা প্রাপ্ত করি, তারপর গুরুদেবের বলা নিয়ম মর্যাদাতে থেকে ভক্তি করার প্রায় এক মাসের মধ্যেই আমার ব্রেন টিউমার সম্পূর্ণ সেরে যায়, এবং আমি নিজে থেকে চলাফেরা করা, সৎসঙ্গে যাওয়া, পুস্তক সেবায় যাওয়া সবকিছুই করতে শুরু করে দিই। এগুলোর সাথে সাথে প্রতিদিন পরমাত্মার কৃপায় আমার সাথে আরো অনেক চমৎকার তো ঘটতেই থাকে, সর্বোপরি সদগুরুদেবজীর অসীম দয়ায় আমি শাস্ত্র নির্দেশিত সঠিক ভক্তিবিধি এবং মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য মোক্ষ প্রাপ্তির মার্গ তো পেয়েই গেছি।

জগতের সমস্ত ভাই বোনদের কাছে আমার বিশেষ নিবেদন, আপনারা কৃপা করে সন্ত রামপালজী মহারাজ এর দ্বারা লিখিত "জ্ঞান গঙ্গা" অথবা "জীবনের পথ" পুস্তক order করে ডাকযোগে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বা প্রচার সেবা থেকে স্বল্প মূল্যে প্রাপ্ত করে অবশ্যই পড়ুন এবং সন্ত রামপালজী মহারাজের কাছে থেকে নাম দীক্ষা নিয়ে, নিজের মানব জীবনকে সফল করুন।

সত্ সাহেব

## ১১০০০ ভোল্টেজ-এর বিদ্যুতের তার থেকে বাঁচান

আমি ভক্ত সুরেশ দাস, পিতা শ্রী চাঁদ রাম, গ্রাম- ধনানা, জেলা সোনীপত। বর্তমান শাস্ত্রীনগর রোহতকে (হরিয়াণা) থাকি। সদগুরু দেবের থেকে নাম উপদেশ নেওয়ার পূর্বে আমার আর্থিক স্থিতি খুব খারাপ ছিল। পরিবারের সকল সদস্য প্রায়ই অসুখ-বিসুখে ভুগতে থাকত। আমার স্ত্রীকে ভূত প্রেত খুব বেশী দুঃখী করত। এতো কষ্টে থাকার পরেও আমরা দেবী দেবতার খুব পূজা পাঠ করতাম। হনুমানজীকে আমি খুব মানতাম। কিন্তু ঘরে সংঙ্কটের উপর সঙ্কট আসতে থাকে। পূর্ণ পরমাত্মা সদগুরু রামপালজী মহারাজ, আমার পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণে, পূর্ণ পরমাত্মা মানতাম

না। যার ফলে আমাকে কয়েক বছর পর্যন্ত ভুগতে হয়। এক দিন গ্রাম সিংহপুরা নিবাসী ভক্ত বিকাশ আমাকে বলে আপনাদের ঘরে 'পূর্ণ পরমাত্মা জগতগুরু রামপালজী মহারাজ' এসেছেন। আর আপনি কোথায় ঘুমিয়ে আছেন। আমি বলি, কাল আমাকে এতো কষ্ট দিয়ে রেখেছে যে, ওখানে যাওয়ার সময়ই পাই না। ডাক্তাদের কাছে ঘুরতে ঘুরতে সময় চলে যায়। আর আর্থিক স্থিতিও খুব খারাপ। ঐ ভক্ত আমাকে অনেক বোঝায়। তখন পূর্ণ পরমাত্মার এমন দয়া হল যে, আমি সন্ত রামপালজীর কাছ্ থেকে উপদেশ নেওয়ার জন্য অক্টোবর ২০১০-এ সতলোক আশ্রম বরবালা চলে যাই। নাম উপদেশ নেওয়ার পরে সদগুরুজী দয়ার ভাণ্ডার খুলে দেয়। আর আমি ঐ সুখ-শান্তি অনুভব করিতে থাকি যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

আমার স্ত্রীকে ভূত-প্রেত খুব দুঃখী করতো। কিন্তু সদগুরুদেবের দয়ায় এখন পূর্ণরূপে ভালো আছে। ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১১-আমার ছেলে মহিতের বয়স ১২ বছর ছিল। আমার কথায় মিস্ত্রিকে ডাকতে গিয়ে ছেলে মিস্ত্রীর বাড়ির ছাদের উপর চলে যায়। ওখানে ১১০০০ ভোল্টেজের বিজলির তার ছিল। ছেলে আর তারের মাঝখানে মাত্র এক ফুট দূরত্ব ছিল। বিদ্যুতের তার ছেলেকে টেনে নেয় আর ছেলের মাথায় তার লেগে যায়। এক ইঞ্চি গভীরে ঢুকে যায়, মুখ জ্বলে যায় আর বিদ্যুৎ শরীরে প্রবেশ করে পায়ের বুড়ো আঙুলের হাড় ফুটে বের হতে লাগে। ঐ সময় সদগুরু রামপালজী মহারাজ আকাশ মার্গ দিয়ে আসেন। আমার ছেলের খুব তেজ প্রকাশের চমকানো শরীর দেখে যেন মনে হচ্ছে, হাজার হাজার টিউব লাইটের প্রকাশ বেরোচ্ছে। গুরুজী ছেলের হাত ধরে বিদ্যুতের তার থেকে ছাড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে দেন এবং ছেলের সাথে অনেক কথা হয়। যখন গুরুজী চলে যান তখন ছেলে জিজ্ঞাসা করে গুরুজী কোথায় যাচ্ছেন! গুরুজী বলে বেটে, (পুত্র) আমি তোমার সঙ্গে আছি। ভয় পেয়ো না। ঐ সময় মহিতের মা ওখানে যায়। সে খুব ভয় পায়, কারণ ছেলের শরীর দিয়ে বিদ্যুতের ঝলকানী (লেপট) বের হচ্ছিল। আমরা ছেলেকে পি.জি.আই. রোহতক নিয়ে যাই। ওখানে ও গুরুজী ছেলেকে দর্শন দেন। ছেলে বলছে, গুরুজী আমার সঙ্গে আছে। তোমরা ভয় পেয়ো না। যদি আজ আমরা গুরুজীর স্মরণে না থাকতাম তাহলে আমার ছেলে বাঁচত না। আর আমার স্ত্রীকেও প্রেতে মেরে দিত। আমি যে সুখী পরিবারে আছি, তা সদগুরু রামপালজী মহারাজের দয়ার দান।

সর্ব ভক্ত আত্মার কাছে প্রার্থণা আমার এই সত্য কথা পড়ুন আর আপনারাও সদগুরু রামপালজী মহারাজের শরণে এসে নিজের মানব জীবনের কল্যাণ করুণ কপালের লেখা বা কর্মের কারণ যে ঘটনা ঘটে তার থেকেও পূর্ণ রূপে বাঁচবেন। সদগুরু রামপালজী মহারাজের সত্সঙ্গে আমি শুনেছিলাম পূর্ণ পরমাত্মার কবীরজী বন্দিছোড় আমাদের সমস্ত পাপকে নাশ করে দেন। এই প্রমাণ ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সুক্ত ১৬১ মন্ত্র ২-এ তথা মণ্ডল ৯ সুক্ত ৮০ মন্ত্র ২-এ লেখা আছে। যদি কোন রোগের কারণ প্রাণ শক্তি সমাপ্ত হয়ে যায় তাহলেও আমি তাঁর প্রাণ রক্ষা করি এবং ১০০ বছর আয়ু প্রদান করি। অর্থাৎ ভক্তি করার জন্য আয়ু বাড়িয়ে দিই, সর্বসুখ প্রদান করি। সদগুরু রামপালজী মহারাজ নিজের অমৃত বাণীতে বলেছেন, প্রত্যেক প্রাণী নিজের কর্ম অনুসার সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত করে। দুঃখ তো পাপ কর্মের ফল আর সুখ পুণ্য কর্মের ফল। এখন পর্যন্ত সর্ব সন্ত, আচার্য গুরু এটাই বলে আসছে প্রারদ্ধ (পূর্ব কর্মের ফল) কর্মফল ভোগ করতেই হবে। শিক্ষিত পাঠক সমাজ! সদগুরু রামপালজী মহারাজ বলেন পাপ কর্মের জন্য দুঃখ হয়। যদি পাপকর্ম নাশ হয়ে যায় তাহা হলে দুঃখ ও সমাপ্ত হয়ে যাবে। যদি ভক্তি করতে করতে পাপ কর্মফল ভুগতে হয় তাহলে ভক্তি করার প্রয়োজনই

হয় না। ৭ সেপ্টেম্বর ২০১১ আমার বিধিলিপির কারণ অর্থাৎ প্রারব্ধের পাপের ফলের কারণ আমার পুত্র মোহিতের মৃত্যু ছিল। আমার সদগুরু রামপালজী মহারাজের কৃপায় পরম পূজ্য কবীর পরমেশ্বরজী আমার পাপকে নাশ করে আমার ছেলে মোহিতের জীবন রক্ষা করে পরমায়ু বাড়িয়ে দেন। যদি ৭ সেপ্টেম্বর ২০১১ তে প্রারব্ধ কর্মের (পূর্ব জন্মের কর্মফল) কারণ আমার ছেলে মারা যেত তাহলে আমরা সমস্ত পরিবার ভক্তি ছেড়ে নাস্তিক হয়ে যেতাম। কারণ ঐ সময় পরমাত্মার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না। এখন ভগবানের প্রতি অত্যাধিক বিশ্বাস হয়ে গিয়েছে। এবং এটাও বিশ্বাস হয়েছে যে কবীর সাহেবই পূর্ণ পরমাত্মা পাপ নাশক এবং সর্ব সুখ দায়ক ও পূর্ণ মোক্ষদায়ক। সদগুরু রামপালজী মহারাজ কবীর পরমেশ্বরের পাঠানো অবতার। তাই আপনাদের কাছে পুণঃ প্রার্থণা অবিলম্বে আপনার জেলার নিকটবর্তী নামদান কেন্দ্রে এসে উপদেশ নিয়ে আত্মকল্যাণ করান। আমার উদ্দেশ্য আমার মত দুঃখী আত্মারা অনেক। তাই আমার উপরোক্ত আত্মকথা পড়ে এবং বিচার করে আমার মত সঙ্কট নিবারণ করুন।

**য়হ সংসার সমঝদা নাহি, কহুন্দা শাম দোপহরে ঝুঁ।**
**গরিবদাস য়হ বক্ত জত হে, রোবেগে ইশ পহরে (সময়) নু।**

**কৃপাপ্রার্থী ভক্ত সুরেশ দাস**
**পুত্র শ্রী চাঁদ রাম।**
**শাস্ত্রীনগর হিসারবাইপাস রোহতক।**
**মো: ০৯৮২৯৫৮৮৬২৮**

## মুখের ক্যান্সার রোগ সম্পূর্ণ সেরে যাওয়া

আমি ভক্ত অশোক কুমার সিনহা, পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার, রিষড়া এলাকায় থাকি, বাড়ির ঠিকানা- ২৪এ, এস.ডি. মুখার্জি লেন, পিন - ৭১২২৪৮, রিষড়া।

কৈশোর অবস্থা থেকেই ভক্তির দিকে আমার একটা বিশেষ টান বরাবরই ছিল। পারম্পরিক দুর্গা মাতার পূজা, হনুমান পূজা ছাড়াও বিশেষ করে সাঁই বাবার ভক্তি পূজাও করতাম। বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র, ধাম যাত্রা এবং সঙ্গে অন্যান্য দান ধর্ম ক্রিয়াকর্ম গুলোও করতে থাকতাম।তখন আমার বয়স ছিল ৫২ বছর, একদিন হঠাৎ করে সামান্য শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমি ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলাম। ডাক্তারবাবু আমাকে ভালো করে দেখে শুনে অনেকগুলো টেস্ট এবং চেক আপ করাতে বলেছিলেন। সেই সব রিপোর্টগুলো চেক করে ডাক্তাররা আমাকে বলেন যে, আমি ওরাল ক্যাভিটি ক্যান্সারে আক্রান্ত। খবরটা শুনতেই আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল, আর আমার জীবন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে ভরে গেল। জীবনের কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে, ভগবানের প্রতি আমার যে একটা বিশ্বাস ছিল সেটা হারিয়ে যেতে শুরু করলো। যাইহোক, এরপর আমি চিকিৎসার জন্য মুম্বাইয়ে যাই, সেখানে এক হসপিটালে ১৮ দিন ভর্তি ছিলা। অপারেশনের জন্য আমাকে অপারেশনের পোশাক পরিয়ে রাখা হত এবং অত্যন্ত কম খাবার খেতে দেওয়া হত। এই সময়ে হঠাৎ একদিন সাঁই বাবা এক অন্য সাধুবেশে আমাকে স্বপ্নে দর্শন দেন, তখন আমি ওনার কাছে প্রার্থনা করছিলাম আমার ক্যান্সার ঠিক করে দেওয়ার জন্য, কিন্তু উনি আমাকে সুস্থ করার পরিবর্তে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে চান। তখন আমি টাকা না নিয়ে, একটাই কথা বলি যে, আমি টাকা চাই না কেবল আমি সুস্থ হতে চাই, আপনি আমাকে সুস্থ করে দিন। সুস্থ হওয়া তো দূরের কথা বরং আমি আরো অসুস্থ হয়ে পড়ি, ক্যান্সারের অপারেশনে, ডাক্তারদের আমার খাদ্যনালীর কিছু অংশ কেটে বাদ দিতে হয়, আর

আমাকে বলে দেয় যে, তুমি জীবনে কখনো মুখ দিয়ে খাবার খেতে পারবে না তাছাড়া লবণ, ঝাল, মসলা এগুলো কখনোই খেতে পারবে না। তখন আমাকে নাকের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে নল ঢুকিয়ে কেবল জুস খাওয়ানো হতো। অসহ্য কষ্টের মধ্যে দিয়ে এইভাবে দিন গুলো কাটছিল। যাঁদের ভগবান বলে মনে করতাম তাঁরাও যখন কিছু করতে পারলেন না তখন ভগবানের প্রতি আমার যে অল্প আস্থা ছিল সেটাও হারিয়ে গেলো।

একদিন আমার এক নিকট পরিচিত বন্ধু (ভক্ত দিলীপ রজক দাস) আমার এই শোচনীয় অবস্থার কথা জানতে পারেন এবং তিনি আমাকে পরম সন্ত রামপালজী মহারাজের অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে বলেন। জ্ঞানটা আরো জানার জন্য আমি সর্বপ্রথম সন্ত রামপালজী মহারাজ দ্বারা লিখিত জ্ঞান গঙ্গা পুস্তক কিছুদিন যাবৎ পড়তে থাকি, জ্ঞানটা বুঝতে পারার পর বরবালা গিয়ে আশ্রম থেকে ২০১৪ সালে নাম দীক্ষা প্রাপ্ত করে আমি এবং আমার স্ত্রী নিয়মানুসারে ভক্তি করতে থাকি। নাম দীক্ষা প্রাপ্ত করার এক মাসের মধ্যেই গুরুজীর আশীর্বাদে আমার ক্যান্সার সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়। আমি পূর্বের ন্যায় চলাফেরা, খাওয়া- দাওয়া সবকিছুই করতে থাকি। সবচেয়ে বড় কথা যেখানে ডাক্তাররা আমাকে বলে দিয়েছিল যে, আমি কখনো মুখ দিয়ে খেতে পারব না এবং আমার খাদ্যনালীর অংশ কাটা ছিল, সেখানে গুরুজীর আশীর্বাদে আমার খাদ্যনালী পুনরায় জুড়ে পুরো হয়ে যায়। আজ আমি সমস্ত প্রকারের খাবার, লবণ ঝাল, মসলাদার খাবার নির্দ্বিধায় খেতে পারি। গুরুজী সৎসঙ্গে বলেন:-

**সতগুরু জো চাহে সো করহী। চৌদো কোটি দূত জম ডরহী॥**
**উত ভূত যম ত্রাস নিবারে। চিত্রগুপ্ত কে কাগজ ফারে॥**

অর্থাৎ সৎগুরু যা চান তাই করতে পারেন, এমনকি চিত্রগুপ্তের কাগজও ছিঁড়ে ফেলে নিজের ভক্তের আয়ু বাড়িয়ে নতুন করে লিখতে পারেন। এছাড়াও আমার আর্থিক স্থিতি আগের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

একবার আমার স্ত্রী চলন্ত বাইক থেকে পড়ে যায় এবং মাথায় গভীর ভাবে চোট এসে যায়, প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওনাকে ব্রেনের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে, ডাক্তার বাবু বলেন, ইনি বেঁচে আছেন কি ভাবে। "আমি এই পেশেন্ট-কে দেখবো না, কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ইনি মারা যাবেন। আমি সতগুরুজীর কাছে প্রার্থনা করি, আর স্ত্রী-কে নিয়ে সোজা বাড়িতে চলে আসি। ডাক্তার যা ওষুধ দিয়েছিল, তা সব আমি ড্রেনে ফেলে দিই, আর গুরুজীর বলা মত দৃঢ় ভাবে ভক্তি করতে থাকি। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমার স্ত্রী এবং আমাকে কখনো রোগের কারণে ওষুধ খেতে হয় নি এবং আমার ঘর পরিবার নিয়ে আমি খুব সুখে শান্তিতে পরমাত্মার ভক্তি, সেবা করে জীবন যাপন করছি।

তাই যে সকল পাঠকগণ করমাত্মার এই সব লীলা, মহিমা শুনছেন, তাদের নছেন, তা সকলের কাছে আমার সবিনয়ে নিবেদন, আপনারা অবশ্যই সন্ত রামপালজী মহারাজের লেখা অদ্ভুত অদ্বিতীয় জ্ঞান গঙ্গা পুস্তক পড়ন এবং সত্য জ্ঞান বুঝে নাম দীক্ষা প্রাপ্ত করে নিজের কল্যাণ সাধন করান।

## "কিডনী ভাল করেন ও শয়তানকে মানুষ বানান

আমি ভক্ত জগদীশ দাস, পিতা - শ্রী প্রভুরাম, গ্রাম-পাঞ্জাবখেড়া, দিল্লী ৮১, ডী.টী. সী (দিল্লী, ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন) -এর ম্যাকানিক। মদ আমাকে রাক্ষস প্রবৃত্তির মানুষ বানিয়েদিয়েছিল। মদ মাংস, বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা পান আমার কাছে সাধারণ ব্যাপার ছিল। আমি চাকরি থেকে সন্ধ্যা প্রায় ৭/৮ টার সময় বাড়ি ফিরতাম। মদ বেশি খাওয়ার কারণ

অনেক সময় ৯/১০টাও বেজে যেত। নেশায় পাগল হয়ে একবার এদিকে একবার ওদিকে টলটে-টলতে বাড়ি ফিরতাম। ঘরে ঢুকতেই পত্নী ও বাচ্চাদের মারপিঠ শুরু করতাম। প্রত্যেকদিন বাড়িতে ঝগড়া ঝামেলা করতাম। যে বাচ্চাদের আদর করে বুকে লাগানো দরকার ছিল, সেই অবলা অবুঝ বাচ্চারা আমাকে দেখে খাটের নিচে লুকাতো। ছোট ছেলে মেয়েরা রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে, কখন আমার বাবা খাবার জিনিস নিয়ে বাড়ি আসবে। কিন্তু আমি খাবার জিনিসের জায়গায় মদ খেয়ে চোখ লাল করে নেশায় পাগল হয়ে ঐ মাসুমদের (অবুঝ বাচ্চাদের) মারতাম। অন্যদিকে আমার স্ত্রী সুমিত্রা দেবী দুঃখী জীবনে ভয়ঙ্কর রোগের সাথে লড়াই করে শ্বাস পুরা করিতেছিল। তার দুটো কিডনিই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার বলে ওষুধ খেতে থাকলে ৬ মাস পর্যন্ত বাঁচতে পার। অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল, আর ৫১৯ রাম মনোহর লোহিয়া হসপিটাল দিল্লী থেকে রিপোর্ট দেয় কিডনী খারাপ হয়ে গিয়েছে ৬ মাস বাঁচতে পারে, যদি ঠিক মত ওষুধ খায়! তখন ঐ বাচ্চাদের কি অবস্থা হয়? যার পিতা এক নম্বরের মাতাল আর মা মৃত্যুশয্যায়! কোন ভারী কাজ করতে পারে না। যখন বাচ্চারা জানতে পারে, তোমাদের মা আর মাত্র ৬ মাস বাঁচবে। তখন ঐ বাচ্চাদের চোখ দিয়ে শুধু জল পড়ত। এদিকে পিতা মাতাল অন্যদিকে মা মৃত্যু শয্যায়। আমাদের কি হবে? তিন ছেলে এক মেয়ে নিজের মায়ের কাছে বসে কান্না করত আর বলতো, হে ভগবান আমাদেরও মায়ের সাথে তোমার কাছে ডেকে নিও। এখানে কার ভরসায় থাকবো?

পরমাত্মা বাচ্চাদের ডাক শোনে আর আমারও শুভ কর্মের উদয় হয়। আমাদের প্রতিবেশী ভক্তমতি নিহালী দেবী নিজের গুরুদেব সন্ত রামপালজী মহারাজের আদেশ অনুসার জানুয়ারী ১৯৯৭-এ সদগুরু গরীবদাস মহারাজের অমৃত বাণীর তিন দিনের অখণ্ড পাঠ করান। আমাদের বাড়ির সবাই ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৬-এ রাত ৯টা থেকে ১১ পর্যন্ত সন্ত রামপালজী মহারাজের সত্সঙ্গ শুনতে যায়। কিছুক্ষণ পরে আমি চাকরি থেকে বাড়ি এসে বাচ্চাদের কাছে জানতে পারি, আমার স্ত্রী নিহালী দেবীর বাড়িতে সত্সঙ্গ শুনতে গিয়েছে। আমি খুব রেগে যাই। আর বলি কোন পাখণ্ডির কাছে চলে গেছে? আমি ওকে মারতে মারতে বাড়ি নিয়ে আসব। এই ভবনায় আমি নিহালী দেবীর বাড়িতে যাই, আমি মদ খেয়েছিলাম। যখন আমি নিহালী দেবীর বাড়ি যাই, তখন সন্ত রামপালজী মহারাজ সতসঙ্গ করিতেছিলেন। অনেক ভক্তজন সত্সঙ্গ শুনছিল। এতো লোক জন দেখে আমি কিছু না বলে, চুপচাপ সবার পিছনে বসে পড়ি। আমি ও সতসঙ্গ শুনি। সত্সঙ্গে মহারাজ বলেন-

**শরাব পীবৈ কড়বা পানী, সত্তর জন্ম শ্বানকে জানি।**
**গরীব, সো নারী জারী করে, সুরাপান সো বার।**
**এক চিলম হুক্কা ভরৈ, ডুবৈ কালি ধার॥**
**কবীর, মানুষ জন্ম পায় কর, নহি ভজৈ হরি নাম।**
**জৈসে কুয়া জল বিনা, খুদবায়া কিস কাম।**

মহারাজ সত্সঙ্গে-বলেন, যে বাচ্চাদের আদর করে পিতাকে বুকে লাগানো উচিত। কিন্তু ঐ মাতাল ব্যক্তিকে দেখে বাচ্চারা খাটের নিচে লুকায়। মদ্যপ ব্যক্তি নিজেও দুঃখী এবং পাড়া প্রতিবেশিদেরও দুঃখী করে। মাতাল ব্যক্তিদের ধনহানী, মানহানী হয়, সমাজে ঐ মাতালদের কোন সম্মান নেই। পরিবার, প্রতিবেশীদের এবং আত্মীয়দের দুঃখী করে অভিশাপ প্রাপ্ত করে। যেমন মাতাল ব্যক্তির স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা অত্যাচারের শিকার হয়। পত্নীর মা-বাবা ভাই-বোন দিন রাত চিন্তায় থাকে। এই সব পাপের ভার ঐ নির্বোধ মাতালের মাথায় পড়বে। পরমাত্মা মনুষ্য জন্ম দিয়েছে প্রভু

ভক্তি করে আত্মা কল্যাণের জন্য। এই জীবনকে মদ খেয়ে নষ্ট করা উচিত নয়। যেমন বাচ্চারা যদি স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ না করে, এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে, তাহলে সে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকবে। পরে সারা জীবন মজুরের কাজ করে জীবন নির্বাহ করতে হবে। তখন তার মনে পড়ে ঐ সময় যদি আবারাগদী না করতাম তাহলে আজ সহপাঠিদের মত বড় অফিসার হতাম। কিন্তু এখন চিন্ত করে কি লাভ। এই চিন্তা তো ছাত্র জীবনে করা দরকার ছিল। কবীর সাহেব বলেন-

**আচ্ছা দিন পিছে গয়ে, গুরু সে কিয়া ন হেত।**
**আব পছতাবা ক্যা করে, জব চিড়িয়া চুগ গই খেত॥**

যদি কোনো প্রাণী মানব জন্মে প্রভু ভক্তি না করে, তাহলে সে পশু পাখীর যোনী প্রাপ্ত করে। যে ব্যক্তি মদ খায় সে মদের নেশায় খাবার থালায় লাথি মারে। ভক্তি না করে বিভিন্ন প্রাণীর যোনীতে কষ্ট করে। কখনো কুকুরের যোনী ধারণ করে। কুকুর সারা রাত ঠান্ডায় রাস্তায় পড়ে থাকে, উপর থেকে বর্ষাকালে তাকে খুব কষ্ট সহ্য করতে হয়। সকালে ক্ষুধার যন্ত্রণা। কারো রান্না ঘরে ঢোকার চেষ্টা করলে লাঠি বা ডেলা মারে। কুকুর অনেক সময় পর্যন্ত চিল্লাতে থাকে। পরে অন্য ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে, না জানি ওখানে খাবার মিলবে না লাঠি। যদি ওখানেও লাঠি মারে তখন ক্ষুধায় ব্যাকুল কুকুর মানুষের পায়খানা খায়। যদি এই মূর্খ প্রাণী মানুষের শরীরে থাকা কালীন সত্‌সঙ্গে এসে ভাল কথা শুনতো আর খারাপ কর্ম ত্যাগ করে সদগুরুর থেকে দীক্ষা নিয়ে নিজের কল্যাণ করতো এবং বাচ্চাদের ভালো শিক্ষাও প্রভুর দীক্ষা প্রদান করাতো, তাহলে সর্বদা সুখী থাকতো। মদের নেশায় বুঁদ্ হয়ে থাকার আনন্দ কিছুক্ষণ মাত্র থাকে, আর পরমাত্মার নামে ভজনের সুখ-আনন্দ সর্বদাই সাথে থাকে।

উপরোক্ত সতসঙ্গে সন্ত রামপালজী মহারাজের কথা শুনে আমার মদের নেশা ছু-মন্ত্রর হয়ে যায়। দু'চোখে অশ্রু জলে ভরে যায়। বাড়ি চলে যাই। রাত্রে ঘুম আসে নাই। ১ জানুয়ারি ১৯৯৭-এর দুপুরে ১-৩০ এ আমার পত্নীকে সাথে নিয়ে সন্ত রামপালজী মহারাজের কাছে যাই এবং আত্মকল্যাণের জন্য নাম উপদেশ প্রাপ্ত করি। ঐ দিন থেকে আজ (২০০5) পর্যন্ত মদ, তামাক ও মাছ-মাংস ছুঁই না। আমার পত্নীও যে দিন উপদেশ নেয় সেই দিন থেকে সুস্থ। ডাক্তারের চিকিৎসা এবং এক্সরে ইত্যাদি রিপোর্ট আজও আমার ঘরে রাখা আছে সবাইকে দেখাই।

সর্ব আত্মাদের কাছে আমার প্রার্থণা আপনারাও প্রভুর চরণে আসুন। সন্ত রূপে পরমেশ্বরের বার্তা বাহক সন্ত রামপালজী মহারাজকে চিনুন এবং জানুন। বিনামূল্যে (ফ্রি) নাম উপদেশ নিয়ে নিজের কল্যাণ করান।

সত্ সাহেব। -ভক্ত জগদীশ।

## "ভূত-প্রেতের হাত থেকে পরিবারকে রক্ষা করেন"

ভক্তমতী অপলেশ- স্বামী শ্রী রামেশ্বর, পুত্র শ্রী মাঙ্গেরাম, গ্রাম-মিরচ, জেলা-ভিবাণী হরিয়াণা) আমি অপলেশ দেবী, আমার দুঃখী জীবনের এক ঝলক আপনাদের শোনাচ্ছি। আমি আর আমার ছেলে রাহুল আর মেয়ে জ্যোতির ফেলে আসা অতীত সময়ের করুণ অবস্থার কথা মনে পড়লে শিউরে উঠি। সেই কথা বর্ণনা করার সময় হৃতপিন্ড স্তব্ধ হয়ে যায়। ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৫ রাত্রে গুণ্ডারা আমার স্বামীকে ডিউটির সময় জীবনে মেরে দেয়। কিন্তু পূর্ণ পরমাত্মা (কবীর সাহেব) আমার পতিকে জীবন দান দেন। তাই আজ আমরা সপরিবারে বন্দি ছোড় সদগুরু রামপালজী মহারাজের শ্রীচরণের শরণে আছি। আমার স্বামী পরিস্কার কাপড় পরত কিন্তু কিছুক্ষণ পরে

কোমরের চারিপাশের কাপড় রক্তে লাল হয়ে যেত। বাচ্চাদেরও কফের সঙ্গে রক্ত পড়তো। আর আমিও এক বছর যাবৎ হার্টের অসুখে খুব দুঃখী ছিলাম। আমার স্বামী দিল্লী পুলিশে চাকরি করে। আমার সর্ব শরীরে ফোড়া-ফুসকুড়ির মতো চর্ম রোগ হতো। ঘরের খারাপ স্থিতির জন্য আমার স্বামীর মানসিক শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। এই সকল দুঃখ দুর্দশার জন্য ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ডজনেরও বেশি লোভী, লালচী গুরুদের কাছে যাই। ভারতের বিভিন্ন তীর্থ স্থানে যেমন গঙ্গা, যমুনা, হরিদ্বার, জবালা, চমুণ্ডা, চিন্তপুরন্দী, নগর কোট, বালাজী, মেহন্দীপুর, গুড়গাওয়ের মাই, গোরখ টীলা প্রত্যেক স্থানে বাচ্চা সহিত কয়েক চক্কর লাগাই। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। আমাদের পরিবারের অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে হোলি ও দীপাবলীর সময় আমরা কোন মসজিদে বসে থাকতাম।

আমার কপাল ভালো যে শ্রী রামপালজী মহারাজ দ্বারা পরম পূজ্য কবীর পরমেশ্বরের শরণে এসেছি। এখন কোথায় গেল সেই কালের দূত, আর আমার অসুখ, যার চিকিৎসা অল ইণ্ডিয়া হসপিটালে চলতো। সদগুরুদেবের চরণের ধূলায় সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১-এ কাল-এর পূজা করা এক তান্ত্রিক ফোন করে জিজ্ঞাসা করে অপলেশ তোমার নাম? আমি বলি হ্যাঁ। আপনার নাম কি? তখন ঐ তান্ত্রিক বলে আমার নাম জিজ্ঞাসা করবেন না আর আমি বলতেও চাই না। আমি হাঁসী থেকে বলছি। এখানে বলরাম আর একটি লোক এসেছিল। ঐ দুইজন আমাকে ৩৭০০ টাকা তোমাদের মারার জন্য দিয়েছে, আমি তোমার ফোন নম্বরও ঐ বলরামের থেকে নিয়েছিলাম। কারণ তোমাদের দুর্গতি হচ্ছে কিনা তাহা জানার জন্য। আমি রাত্রে তোমার ক্ষতির জন্য খারাপ কাজ করে, যখন শুয়ে পড়ি তখন তুমি যে গুরুর পূজা করে তিনি আমাকে দেখা দেন। এবং বলে এই কর্মের পরিণাম তুমি নিজে ভুগবে। ঐ পরিবার সর্ব শক্তিমান সর্ব কষ্ট হরণকারী পরম পূজ্য কবীর পরমেশ্বরের শরণে আছে। তোমার কি ক্ষমতা আছে? এই লোকের ধর্ম রাজও ঐ পরিবারের কোন ক্ষতি করতে পারবে না!

**গরীব, যম জৌরা জাসে ডরৈ, মিটে কর্মকে লেখ।**
**অদলী অদল কবীর হে, কুলকে সদগুরু এক ॥**

পরম পূজ্য কবীর পরমেশ্বরকে যম (কাল তথা কালের দূত) তথা মৃত্যু ও ভয় পায়। এই পূর্ণ প্রভু, 'পাপ কর্ম দণ্ড' সমাপ্ত করে দেয়। পরে ঐ তান্ত্রিক বলে তুমি আমার মেয়ের মতো, তাই একটা কথা বলছি। তুমি যে পুরুষোত্তমের পূজা কর তিনি প্রবল শক্তি যুক্ত। আমি ২৫ বছর ধরে এই খারাপ কাজ করিতেছি। না-জানি কত পরিবারকে বর্বাদ করে দিয়েছি। কিন্তু আজ প্রথমবার হেরে গেলাম। তাই পুত্রী এই শক্তিকে ছাড়িও না। তোমার বিনাশের জন্য বলরামরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন আমি বলি, আমি পূর্ণ পরমাত্মার পূজা করি। বলরাম আমার পতির বড় ভাই। আমাদের মহা শত্রু। আমরা আজ এতোটা ভাগ্যবান যে, আমাদের মনে কোন কার্য বা জিনিসের প্রয়োজন হলে তা সদগুরুদেব সত কবীর সাহেব পূর্ণ করে দেন। আজ গুরু গোবিন্দ দোনো খড়ে, কিসকে লাগে পায়। বলিহারী সদগুরুদেব রামপালজীর চরণে জিনহে পরমেশ্বর দিয়া মিলায়।

হে ভাই ও বোনেরা! আমরা পুরা পরিবার আপনাদের এই খবর দিচ্ছি। যদি সতলোকের মার্গ, পূর্ণ মোক্ষ ও সর্ব সুখ প্রাপ্ত করতে চান এবং সাংসারিক দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে চান, তাহলে বন্দীছোড় সদগুরু রামপালজী মহারাজের থেকে নামদীক্ষা প্রাপ্ত করুন। আর নিজের অমূল্য মানব জীবন সফল করুন।

**সত সাহেব। ভক্তিমতি অপলেশ**

## দুঃখ পরম সুখে বদল

আমি ভক্তিমতি পুতুলি দাসী, স্বামী নিশি দাস। আমার বাড়ি মালদা জেলার, ভগবানপুর গ্রামে। সৎগুরুদেব রামপালজী মহারাজের শরণে আসার আগে, আমার জীবনে দুঃখের পাহাড় ভেঙে পড়েছিল। সেই দুঃখের কাহিনী, এখানে সংক্ষেপে কিছুটা বলার চেষ্টা করবো মাত্র।

আমার বয়স ছিল মাত্র আট বছর, আমার বাবা হঠাৎ করে মারা যান। আমি তখন স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ি, বাবার এই হঠাৎ চলে যাওয়াতে আমাদের পরিবারে বিশাল একটা শূন্যস্থান তৈরী হয়। মানসিক, আর্থিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে, মায়ের অবস্থা তো বলার অপেক্ষা রাখে না অন্যদিকে আমরা তিনজন বোন ভাই, আমার এই ছোট ভাই আর এক বড় দিদি মিলে, সবাই তখনও বেশ ছোটই ছিলাম। ভাই আর দিদি তো প্রায় সময় কাঁদতেই থাকতো, দুবেলা খাবারটাও আমাদের ঠিক মতো করে জুটতো না। এই অবস্থায় কাউকে না কাউকে তো পরিবারের হালটা ধরতেই হতো। সেই সময় একদিন আমার স্কুলের এক ম্যাডাম নিজের বাড়ির এক রুগীর দেখাশোনার জন্য কাজের আয়া খুঁজছিলো। আর আমি তখন সেই কাজ করবো বলে ম্যাডাম কে অনুরোধ করি, উনি আমাকে বলেছিলেন, যে তুমি এতো ছোট্ট আছো, তুমি কি কাজ করতে পারবে? আমি নির্দ্বিধায় হ্যাঁ বলে দিই। তখন আমার গায়ে পড়ার মতো পোশাক টুকুও ঠিক ছিল না, ম্যাডাম আমাকে আগে ঠিক মত জামা কাপড় কিনে পরিয়ে দেন, তারপর নিজের বাড়িতে নিয়ে যান এবং আমাকে আমার কাজ বুঝিয়ে দেন। আর সেই তখন থেকেই আমি কাজ করে বাড়িতে টাকা পাঠাতে শুরু করি।

এইভাবে বছর চার পার হয়ে যায়, তখন আমার বয়স মাত্র ১২ বছর, আমার কাকা, জ্যাঠারা মিলে আমাকে এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়। আমার স্বামীর মারাত্মক মদের নেশা ছিল। বিয়ের পর থেকে এমন একটা দিনও কাটেনি, যেদিন আমার স্বামী নেশা করেনি, তার জন্য অভাব, দুঃখ কষ্ট আর প্রতিদিন ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকতো। এরপর এক এক করে আমার দুই মেয়ের জন্ম হয়। এইভাবে যখন আমাদের সংসার ডামাডোলে চলছিল ধীরে ধীরে আমার স্বামীর মধ্যে, এক অজানা রোগ শুরু হল, যাতে শরীরের চামড়া ফেটে ফেটে রক্ত বার হতে থাকে, উনি অত্যন্ত দুঃখী ও পীড়িত হয়ে পড়েন। রোগের জ্বালায় হঠাৎ একদিন বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। আমার স্বামীর এই ভাবে মৃত্যুতে, তার পরিবার আর পাড়া প্রতিবেশীরা আমাকে অপবাদ দিতে থাকলো যে, আমিই আমার স্বামীকে খেয়েছি। এই জ্বালায় আমাকে, দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘর ত্যাগ করতে হয়, কোলে ছ-মাসের মেয়ে সহ দুই সন্তানকে নিয়ে মায়ের কাছে চলে আসি। এদিকে মায়ের অবস্থাও, বাবার মৃত্যুর পর থেকেই সেখানে খুবই খারাপ পরিস্থিতি চলছিল। তাই সেখানেও আমার বেশিদিন ঠাঁই হয় নি। মৃত্যুই একমাত্র পথ বলে মনে হয়েছিল। তবুও দুই সন্তানের কথা মাথায় রেখে, অন্য কোন রাস্তা চোখের সামনে না দেখতে পেয়ে আবার সেই পুরোনো স্কুলের ম্যাডামকে ফোন করি, যেখানে আমি আগে কাজ করতাম। নিজের সমস্ত ঘটনাটাকে ম্যাডাককে জানাই এবং তারপর বলি যে, আপনি আমাকে না সামলালে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর অন্য কোন উপায় থাকবে না তখন ম্যাডাম বললেন তুমি অটো ধরে আমার বাড়িতে চলে এসো। সেইমতো আমি আবার পুরোনো ম্যাডামের বাড়িতে কাজ করা আরম্ভ করি, আর বড় মেয়েকে দিদির কাছে রেখে তার খরচ খরচা পাঠিয়ে দিতে থাকি। যা রোজগার করতাম তার বেশির ভাগটাই দিদিকে পাঠিয়ে দিতাম। আর দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে থাকার জন্য ছোট মেয়েটাকে ঠিক মতো দেখতে

পারতাম না, যার কারণে একদিন ছোট মেয়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে ঠিকমত চিকিৎসা না করালেও নয়, একদিকে ভয় আমার মেয়েটার রোগটা যেন বাড়াবাড়ি না হয়ে যায়, আরও একটা ব্যাপার মাথায় ছিল যে, যদি সেরকম কিছু হয়ে যায় তো আবার শ্বশুড় বাড়ির লোকজন বলবে আগে স্বামীকে খেয়েছে, এখন মেয়েটাকেও খেয়ে ফেলেছে। তাই ম্যাডামের কাছে ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসে মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে দৌড়াতে থাকি। অনেক ওষুধ পত্র করে বহু চিকিৎসার পর মেয়ে সুস্থ হয়। ইতিমধ্যে অন্য আর এক ম্যাডামের সাথে আমার পরিচয় হয়, তিনি আমাকে দুঃখী দেখে বলেন, তুমি বোম্বাই চলে যাও, সেখানে গিয়ে ভালো কাজ করে বাড়িতে পয়সা পাঠাও এবং নিজেও সুখে থাকো। সেইমতো আমি বাড়িতে না জানিয়ে দুই মেয়েকে এখানে মায়ের কাছে ছেড়ে বোম্বাই চলে যাই। সেখানে এক ম্যাডামের বাড়িতে ঘরের কাজকর্ম করতে থাকি। প্রথম মাসের বেতন ৯০০০ টাকা পাই, প্রায় পুরোটাই বাড়িতে পাঠিয়ে দিই। এত টাকা বাড়িতে পাঠিয়েছি বলে নিজের মা আমাকে বলে, যে তুই ওখানে নিশ্চয়ই কোন খারাপ কাজ করছিস। মায়ের কথায় কষ্ট পেয়ে সেদিন আমি অনেক কেঁদেছিলাম। তারপর থেকে বাড়িতে টাকা পাঠানো একটু কম করে দিই, তখন আবার মা বলে এত কম টাকা পাঠাচ্ছিস কেন, বেশি করে টাকা পাঠা। যাই হোক এই হল সংসারের রীতি। এইভাবে বেশ কিছুদিন কাটার পর হঠাৎ করে একদিন আমার মা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পড়েন, আমি জানি না তখন আমি কি করবো, কোথায় যাব। বাড়িতে ছোট ছোট দুটো মেয়ে আছে, মায়েরকিছু হয়ে গেলে ওদের কে দেখবে। আমি অত্যন্ত দুঃখী আর হয়রান হয়ে যাই। ছোটবেলা থেকেই গোপালকে (শ্রীকৃষ্ণকে) নিজের ঈস্টদেব বলে, ভক্তি পূজা করে আসছি, তবুও আমার জীবনে দুঃখের পর দুঃখ আসতেই থাকছে। কিছুতেই কিছু বুঝতে পারছিলাম না, যে কেনো এমন হয়? আর যদি ভগবান তুমি সত্যিই থাকো, আর যদি তোমার এত ভক্তি পূজোও করি, তবুও কেন আমার এত কষ্ট? আমার সাথে এগুলো কি হচ্ছে ভগবান? প্রতিটা রাত আমাকে কেঁদে কেঁদে কাটাতে হতো, যে কেউ আমাকে দেখতো, সে প্রশ্ন করত আমি কেন এত দুঃখে থাকি? আমি নিজে তখন এর উত্তর পাইনি আর ভগবানও আমাকে সারা দেয়নি।

তারপর একদিন হঠাৎ সকালবেলাতে আমি রুটি বানাচ্ছিলাম, পাশে মোবাইলটা রাখা ছিল, হঠাৎ করে একটা অদ্ভুত চমৎকার হয়, আমার ফোনে অটোমেটিক ভাবে সন্ত রামপালজী মহারাজের সৎসঙ্গ চালু হয়ে যায়। প্রথমে গিয়ে আমি বন্ধ করে দিই, কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয়বার আবার ঐ সৎসঙ্গ চালু হয়। এবার আমি তাড়াতাড়ি রুটি বানানো সেরে নিয়ে সৎসঙ্গে গুরুজী কি বলছেন, সেটা শুনতে লাগলাম আর বুঝতে পারলাম কে সেই পরম ভগবান। সেই ভিডিওতে সন্ত রামপালজী মহারাজ সংসাররূপী উল্টো ভাবে থাকা অবিনাশী অশ্বত্থ বৃক্ষের বর্ণনা করছিলেন। আর বলছিলেন, “যে এই বৃক্ষের প্রতিটা বিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন তিনি হলেন প্রকৃত গুরু অর্থাৎ গোবিন্দও তিনিই।” ওনার এই কথাগুলো আমার মনে গভীর দাগ কেটে যায় এবং মহারাজের

স্বরূপ দেখেই আমি আকৃষ্ট হয়ে যাই আর ওনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বিচলিত হয়ে পড়ি। যেহেতু এই ঘটনাটি লকডাউন চলাকালীন সময়ে হয়েছিল সেই কারণে আমি বাইরে বার হতে পারছিলাম না, তাই কোন উপায় না দেখে আমার মোবাইলে যত কন্টাক্ট নাম্বার ছিল সবাইকে আমি এক এক করে কল করে, সন্ত রামপালজী মহারাজ এর বিষয়ে জানার চেষ্টা করতে থাকি। কিন্তু কেউই গুরুজীর বিষয়ে কিছু বলতে পারেনি। অবশেষে আমার মোবাইলে যখন শেষ একটা মাত্র কন্টাক্ট নাম্বার আর কল করতে বাকি রয়ে গেছে, যাকে ফোন করতেও দ্বিধা করছিলাম

কারণ সেই ব্যক্তির বিষয়ে আমি কর্মসূত্রে তাকে জানতাম যে, তিনি দেবী দেবতার ভক্তি করেন না, কোন প্রসাদ খান না, এবং আমি তাঁকে ঠিক এই কারণেই পছন্দ করতাম না, যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ কে পূর্ণ পরমাত্মা বলে মানতেন না। যাই হোক কোন উপায় না দেখে তাকেই যখন ফোন করলাম, এবং আমার সাথে ঘটা অদ্ভুত চমৎকারের বিষয়ে ওনাকে বললাম সেই সাথে গুরুজীর ভিডিও ক্লিপের বিষয়ে যখন বলি। তখন সেই ব্যক্তি আমাকে বলেন যে আপনি এখন কি করতে চান। আমি তাঁকে বলি যে আমি এই গুরুজীর কাছে যেতে চাই, ওনাকে দেখতে চাই। আমার কথা শুনে সেই ব্যক্তি আমাকে বলেন যে, আপনি তো আমার গুরুজীর কথা বলছেন। ওনার মুখে এই আমার গুরুজী কথাটা শুনে আমি এতটা খুশি হয়ে যাই এবং চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করি, যেন আমি ভগবানের খোঁজ পেয়ে গেছি। তারপর সেই ব্যক্তির থেকে মালদা নামদান সেন্টারের নম্বর নিয়ে সেন্টারে কল করি, এবং যথারীতি ঐ দিনই দুপুর বেলা একটার সময় অনলাইনে আমার নাম দীক্ষা সম্পন্ন হয়। নাম দীক্ষা নেওয়ার পর আমি প্রদীপ জ্বালতে পারতাম না যেহেতু আমি অন্য ব্যক্তির বাড়িতে কাজের জন্য থাকি তাই। তখন সতগুরুদেবজীর কাছে অনেক কাঁদতাম। নাম দীক্ষানেওয়ার তিনদিন পর সত গুরুদেব রামপালজী মহারাজ আমাকে দর্শন দেন, এবং আমার চোখের জল মুছিয়ে দেয়। তারপর পরমাত্মার দয়ায় আমি প্রদীপ জ্বালাতে শুরু করি, কিছুদিন ভক্তি করার পর আমার দীর্ঘদিনের এলার্জি রোগ সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়। বাড়িতে আমার অসুস্থ মা অনেকটা সুস্থ হয়ে যায়। আমি জীবনে বাঁচার একটা নতুন রাস্তা খুঁজে পাই। আমি যে বাড়িতে কাজ করতাম, সেখান থেকে আমার ভক্তি করতে বেশ সমস্যা হচ্ছিল, কারণ একদিন আমি খাওয়ার জন্য ফ্রিজ খুলে দেখি তার মধ্যে মদের বোতল রাখা ছিল, তাই দেখে আমি ম্যাডামকে বলি যে, ম্যাডাম আমি তো ভক্তি করি আর এইভাবে ফ্রিজে নেশার জিনিস থাকলে আমি খাবার কিভাবে খাব? সেই কথা শুনে ম্যাডাম অত্যন্ত রেগে যায় এবং আমাকে একপ্রকার সেখান থেকে তাড়িয়েই দেয়, হঠাৎ করে কাজটা চলে যাওয়াতে আমার অনেকটা দুঃখ হয় বটে, কিন্তু পরমাত্মার এত দয়া হল, যে কাজ চলে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই এক ভক্ত ভাইয়ের বাড়িতে আমি নতুন করে কাজ পেয়ে যাই। বর্তমানে আমি সেখানেই থাকি, পরমাত্মা নিজ দাসী কে খুব সুখে রেখেছেন, যে বাড়িতে আমি কাজ করি, তাদের সাথেই আমি প্রতি রবিবার সৎসঙ্গে যাই, পুস্তক সেবায় যাই এবং ভক্তি, সেবা, নামজপে আমার কোন প্রকার অসুবিধা হয় না। আজ পূর্ণ পরমাত্মা স্বরূপ আমার গুরুজী আমাকে সর্ব সুখ এবং মোক্ষ প্রাপ্তির সঠিক রাস্তা দেখিয়েছেন। আমি জানি আমার মত দুঃখী মানুষ এই সংসারে অনেক আছে, তাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনারা একবার সন্ত রামপালজী মহারাজের সৎসঙ্গ শুনুন অথবা "জ্ঞান গঙ্গা" "জীবনের পথ" পুস্তক পড়ুন। আজ পূর্ণ পরমাত্মা স্বয়ং পৃথিবীতে অবতার রূপে এসেছেন, ওনাকে চিনুন এবং সৎভক্তি করে সনাতন পরম ধাম প্রাপ্ত করুন। গুরুজী একটি বাণীর বলেন:-

**ঈস সন্সার সামাঝদা নাহী, ক্যাহেন্দা শাম দো পেহেরু নু।**
**গরীব দাস, ইয়ে বক্ত জাত হ্যাঁয় রোবোগে ঈস পেহেরু নু॥**

আজ এই সংসার বুঝতে পারছে না যে, অসংখ্য যুগ ধরে জন্ম মৃত্যুর মাধ্যমে এই দুঃখ কষ্টে ভরা জীবন ব্যতীত করার পর সতগুরু প্রাপ্তির আর তার সঙ্গ সমীপে থেকে সৎভক্তি করে মোক্ষ লাভ করার এই সুযোগ ঘটেছে। আর এই ভয়ঙ্কর কালের লোকে মানব জীবনের এই অমূল্য সময়টা সৎভক্তি বিনা কিভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর পর এই সময় সুযোগের কথা চিন্তা করে, কান্না ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। আপনারা

সতগুরু রামপালজী মহারাজের স্মরণে আসুন এবং নিজের আত্মকল্যাণ করান।

সত্ সাহেব

## "মেডিক্যাল ফেরত দূরারোগ্য ব্যাধি এবং সর্বপ্রকার নেশা থেকে মুক্তির একমাত্র ঠিকানা"

আমার নাম যুধিষ্ঠীর (দাস) মন্ডল। আমি মুর্শিদাবাদ জেলার, রঘুনাথ গঞ্জ থানার অন্তর্গত রানীনগর গ্রামের নিবাসী। সন্ত রামপাল জী মহারজের কাছ থেকে আমি ১৬-ই মার্চ ২০১৯ -এ নাম দীক্ষা নিয়েছিলাম। সন্ত রামপাল জী মহারাজের জ্ঞান শোনার আগে, আমি অনেক ভক্তি সাধনা করেছি। বিশেষ করে, আমি ভগবান শিবের পূজা অর্চনা করতাম। তাতে আমার বিশেষ কোনো লাভ হয়নি, বরং ক্ষতি হয়েছে। গাঁজাকে ভগবান শিবের প্রসাদ মনে করে খেতাম। এর সাথে সাথে অন্য আরো সব নেশা করতাম, কোনো নেশাই বাদ ছিল না আমার! আমার নেশা করা দেখে আমার বাবা-মা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। বাবা-মা রোজ বকাবকি করতেন। মা বলতেন, "নেশা করে করে তোর জীবনটা কি নষ্ট করে দিবি! নেশা ছেড়ে দে।" এই কথা শুনে খুব খারাপ লাগতো। রাতে একা বসে ভাবতাম যে, আজ থেকে কোনো নেশা করবো না, বিড়ি গাঁজা সব ফেলে দিতাম। সকাল হলে আবারও সেই নেশা করার জন্য কারো কাছে চলে যেতাম। এভাবে আমি খুব দুঃখী হয়ে পড়েছিলাম এবং খুব কষ্টের মধ্যে দিয়ে জীবন-যাপন করছিলাম। আমার পরিবারের লোকেরা আত্মীয়-স্বজনরা হাজার বার বলেছিল, নেশা করিস না। তাদের কোনো কথা আমার কোনো কাজেও লাগেনি। অথচ সন্ত রামপাল জী মহারাজের জ্ঞান (সতসঙ্গ) শোনার পরে থেকে, ধীরে ধীরে আমার সমস্ত নেশা ছেড়ে গেলো। আমি এই ভেবে অবাক হয়ে গেলাম! যে, সন্ত রামপাল জী মহারাজের জ্ঞানে এত শক্তি! এত লাভ! তাহলে তাঁর কাছে দীক্ষা নিলে কত না লাভ পাওয়া যাবে! এই ভেবে আমি সন্ত রামপাল জী মহারাজের কাছ থেকে নাম দীক্ষা নিয়ে ভক্তি শুরু করলাম। আমি H.I.V পজেটিভ ছিলাম! ডাক্তার বলে দিয়েছিল, এটা কখনো কোনদিনও ঠিক হবে না। সারা জীবন ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। সন্ত রামপাল জী মহারাজের আশীর্বাদে এবং ওনার অসীম কৃপায় আমার সেই অসাধ্য রোগও এখন সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। যে সরকারি হাসপাতালে আমি আমার HIV চেকআপ করাতে প্রতি মাসে যেতাম, গুরুজীর শরণে আসার পর শেষবারের মতো সেখানে গিয়ে আমার চিকিৎসা করা নার্স ম্যাডামকে, আমি গুরুজীর লেখা 'জ্ঞান-গঙ্গা' পুস্তক দিয়ে বলে এসেছিলাম, "ম্যাডাম! আমি আর কখনো এখানে আসবো না, আমার গুরুজীর কৃপায় আমি এখন ভালো আছি।"

এছাড়াও আমার আরো একটা সমস্যা ছিল, আমার কোনো জীবিকা নির্বাহের পথ ছিলনা। সেটাও সদগুরু সন্ত রামপাল জী মহারাজ সমাধান করে দিয়েছেন। আমার সমস্ত বাজে অভ্যাস সন্ত রামপাল জী মহারাজ ছাড়িয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও আমি অনেক লাভ পেয়েছি, সেগুলো লিখতে গেলে অনেক লম্বা লিস্ট হয়ে যাবে। আপনাদের কাছে এই দাসের প্রার্থণা! সন্ত রামপাল জী মহারাজ বিশ্বের মধ্যে একমাত্র সন্ত! যার কাছ থেকে নাম দীক্ষা নিলে আপনারা শারীরিক, আর্থিক ও মানসিক কষ্ট থেকে মুক্তি পাবেন। আর সব থেকে বড় লাভ হচ্ছে মুক্তি প্রাপ্তি। জন্ম ও মৃত্যু রূপী ভয়ংকর রোগ থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি পাওয়া যাবে। তাই আপনারাও সন্ত রামপাল জী মহারাজের শরণে এসে নাম দীক্ষা নিয়ে নিজের ও পরিবারের কল্যাণ করুন।

সত সাহেব।

## "সদগুরুর কৃপার মহিমা"

আমি ত্রিলোক দাস বৈরাগী। গ্রাম তীমরখেড়া, জেলা- কাটনী, মধ্যপ্রদেশ-এর বাসিন্দা। আমি ২৭-০৬-২০১০ তারিখে নাম দান নিয়ে ছিলাম। আমার কথা আপনাদের কাছে গল্প মনে হবে। কিন্তু আমি গুরুদেবের শ্রীচরণের শপথ নিয়ে সত্যকথা বলছি। আমি যাহা অনুভব করেছি বা যে প্রমাণ পেয়েছি তা কোনদিনও কল্পনাও করি নাই যে, আমার সাথে এমন চমৎকার হবে। নাম দীক্ষা নেওয়ার ছয় মাস পরে আমার পুত্রের অসুখ হয়। পাঁচ মেয়ের পরে আমার এই একমাত্র পুত্র। আমি আমার ছেলের চিকিৎসা এক মাস পর্যন্ত এম.বি.বি.এস ডাক্তার দিয়ে করাই কিন্তু ভাল হয় না। হঠাৎ একদিন সকাল ৯টার সময় আমার ছেলে অজ্ঞান হয়ে যায়। আমি ওকে নিয়ে উমরিয়াপান যাই। ওখানকার ডাক্তাররা চিকিৎসার জন্য মানা করে দেয়। তখন আমি সিহোর যাই। কিন্তু ছেলের অবস্থা দেখে সব ডাক্তররা চিকিৎসা করতে মানা করে। অর্থাৎ ডাক্তাররা বলতে চাইছে তোমার ছেলের মৃত্যু হয়ে গিয়েছে। ছেলের বয়স মাত্র এক বৎসর ছিল। সাহস করে এক ডাক্তার বলে যদি একে অক্সিজেন দেওয়া হয় তাহলে কিছু হতে পারে। তৎক্ষণাৎ আমি একটি গাড়ি রিজার্ভ করে জবলপুর বাচ্চাদের রিসার্চ সেন্টারে যাই। ওখানের ডাক্তাররা বাচ্চার অবস্থা দেখে বলে, এতে কিছু নেই, সুই ফুটালেও কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ভর্তি করাও আমার রিস্ক। আমি বলি ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করুন। বাকি পরমেশ্বরের উপর ছেড়ে দেন। ডাক্তার বলে যদি ছয় ঘন্টার মধ্যে জ্ঞান ফিরে আসে তাহলে তোমার ছেলে বাঁচতে পারে। তা-না হলে কোনো আশা নেই। সকাল ৯টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত বাচ্চার কোন জ্ঞান ছিল না। ছেলের মা আর আমি কান্না শুরু করে দিই। তখন আমার ধ্যান হঠাৎ 'জ্ঞান গঙ্গা'য় লেখা চমৎকার এর দিকে যায়। যা ভক্তদের সাথে ঘটেছে। আমি নিজেকে সামলে নিয়ে শ্রী সদগুরুর চরণে সমর্পিত করে দিই। আর বলি হে গুরুজী! আমার ছেলেকে রক্ষা করুন আর আমার যে বিশ্বাস গুরু মহিমার উপর আছে তা যেন অটুট থাকে। প্রায় ১২ টার সময় ডাক্তার এসে বলে বাচ্চার অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে? আমি বলি সকালে যেমন ছিল তেমনই আছে। ডাক্তার ইনজেকশন আনতে বলে। আর বাচ্চার উরুতে ইজেকশন লাগাতেই বাচ্চা কাঁদতে শুরু করে। যেন গুরুদেব নিজে বাচ্চাকে ইনজেকশন দিচ্ছেন। তখন পুরো হলে খুশির তুফান উঠে। ডাক্তার আমার মাথায় হাত রেখে বলেন, এই ধরনের রোগে খুব কম বাচ্চার বাঁচার আশা থাকে। ইনজেকশন তো ১০ - ২০ মিনিট পরে কাজ করে। ছেলে সুচের ব্যথাতেই কেঁদে উঠে। এতে প্রমাণিত হয়, এটাই সদগুরু পরমেশ্বর কবীর জীর চমৎকার।

**সদগুরু শরণ মেঁ আনে সে আঈ টলৈ বলা।**
**জৈ ভাগ্য মেঁ মৃত্যু হো কাঁটে মেঁ টল জা॥**

গুরুজী বলেন তন মন দিয়ে মন্ত্র জপ করাতে চমৎকার হয়। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। হসপিটালে গুরুজীর চরণ বন্দনা করি আর ধন্যবাদ দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ি। ডাক্তারবাবু বলেন, এর লাগাতার আট দিন চিকিৎসা চলবে। ২৪ ঘন্টায় ৫০০০ টাকা করে খরচ হচ্ছিল। আমি ডাক্তারকে বলি আমাকে সকালে ছুটি দেবেন। ডাক্তার বলে যদি একে বাড়ি নিয়ে যাও, তা হলে মৃত্যু হতে পারে। কারণ এখনই তো জ্ঞান ফিরেছে। আমি বলি যা হবে দেখা যাবে এখন আমাকে ছুটি দেন। আজ ছয় মাসের উপর হতে চলছে বাচ্চার জ্বর পর্যন্ত হয় নাই। এমন চমৎকার দেখে আমি ধন্য হয়ে গেছি। আমার সাইকেল নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। কারণ আমার পারিবারিক স্থিতি ঠিক ছিল না। হঠাৎ

একদিন স্টেট ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বলেন, আপনি ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিতে চান? আমি বলি যদি লোন পাওয়া যায়, তাহলে এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে। আমার পারিবারিক স্থিতি ভালো হবে। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আমাদের দেড় লক্ষ টাকা লোন দেয়। সাইকেল কেনার যোগ্যতা না থাকা ব্যক্তি হঠাৎ ৫৫০০০ টাকার হীরো হোন্ডা গাড়ি নিয়ে আসে। আজ আমি আনন্দের সাথে গাড়িতে ঘুরছি। আমি সরকারি স্কুলের পিয়ন পদে চাকরি করতাম। চাকরিতে আমার ১৬ বৎসর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমার পারিবারিক স্থিতি ভালো হয় নাই। জবলপুর সম্ভাগ থেকে শুধু আমার (সিঙ্গল) প্রমোশন হয়। আমি চাপরাশি (দপ্তরী) থেকে বাবু হয়ে যাই। চেয়ার এদিক থেকে ওদিক নিয়ে যাওয়া চাকর আজ সদগুরুর কৃপায় সাহেব হয়ে চেয়ারে বসি। আমার বেতন এতো বেশি হবে, তা কখনো কল্পনাও করিনি। আমার ছোট ভাই বি.এড.-এর আশা ছেড়ে নিরাশ হয়ে যায়। হঠাৎ একদিন কাউনসিলিং লেটার আসে। তার বিশ্বাস হচ্ছিল না, কারণ সে ২৯ নং (নম্বর) পেয়েছিল। আর বি.এড-এর জন্য ৩৩ নম্বরের উপর দরকার। কিন্তু এই প্রথমবার ২৮ নম্বর পাওয়া পরিক্ষার্থীদের সুযোগ দিয়েছে। যার কারণ সুযোগ পায়। এখন আমার ভাই বি.এড করছে। এই চার চমৎকার আমার জীবনে এমন ঘটেছে, যা কোন দিন চিন্তাও করিনি। রামায়ণের লেখা ঐ শব্দ আমার মনে আছে, "মাতা-পিতা, গুরু কী বাণী বিচার করো শুভ জানী"। এই সকল চমৎকার এক বৎসরের ভিতর হয়। প্রমাণের জন্য:-

১) ভারত হসপিটাল সেন্টারের সমস্ত রিপোর্ট।
২) গাড়ির সমস্ত কাগজ।
৩) প্রমোশনের আদেশ।
৪) বি.এড-এর কাউনসিলিং চিঠি।

এই সকল চমৎকার নাম উপদেশ নেওয়ার ৬ মাস পরে হয়। শুধু নাম দীক্ষা নিলে লাভ হয় না। গুরুর আদেশে চলতে হবে।

**"হরি রূঠে গুরু ঠৌর হৈ, গুরু রূঠে নহীঁ ঠৌর"**

**গুরুদেবের শ্রীচরণে শিষ্যের অনুভব সদা সমর্পিত।**
**ভক্ত ত্রিলোক দাস বৈরাগী।**
**সহ: গ্রেড- সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।**
**টীমর খেড়া, জেলা কাটনী (M.P)**

## "ভক্ত রামস্বরূপ দাসের আত্মকথা"

(বন্দীছোড় কবীর সাহেব কি জয়।)

আমি ভক্ত রামস্বরূপ পুত্র মঙ্গল রাম গ্রাম বড়ৌলী, জেলা অম্বালার নিবাসি। আমি ১৩ বৎসর পূর্বে ধন-ধন সদগুরু থেকে নাম উপদেশ নিয়ে ছিলাম। ৬ বৎসর পূর্বে আমার হাত ও পা অবশ হয়ে গিয়েছিল এবং কোমরের নিচের অংশও মৃত প্রায় হয়ে গিয়েছিল। আমার দুই ছেলে আমাকে নিয়ে আম্বালা সরকারি হাসপাতালে যায়। পরে প্রাইভেট ডাক্তারও দেখায়। তারপর আমাকে ২ বৎসর পর্যন্ত এদিক-ওদিক দেখানোর পর পি.জি-আই চণ্ডীগড় নিয়ে যায়। ওখানে এক বৎসরে দুইবার টেস্ট করায়। কারণ যে মেশিনে আমার টেস্ট হইত তাতে আমার নম্বর এক মাস পরে আসত। এবং টেস্টের চার্জ ছয় হাজার টাকা ছিল। দুইবার টেস্টে কোন রোগ ধরা পরে না। মাথার অপারেশন করতে বলে। তাতে জীবনের ঝুঁকি ও পূর্ণ ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

তারপর রামদেবের আশ্রমে নিয়ে যায়। ওখানে কিছুদিন চিকিৎসা হয়। কিন্তু কোন পরিবর্তন না হওয়ায় আমকে বাড়িতে নিয়ে আসে। আর ঝার-ফুঁক- তন্ত্র-মন্ত্র করানোর জন্য পাঞ্জাব-হরিয়াণা সহ আরো অনেক স্থানে নিয়ে যায়। কিন্তু কোনো সুরাহা হয় না। তখন আমি বুঝতে পারি আমার জীবন আর বেশিদিন নেই। যখন সর্ব চেষ্টা ফেল হয়ে যায়, তখন আমার মেয়ে আমাকে ডেকে নেয়। আমার জামাই এক ভগতের কথা বলে, সে আমাকে ১৫ আগস্ট ২০০৮-এ বরবলা আশ্রমে সদগুরু বন্দীছোড় রামপালজী মহারাজের কাছে নিয়ে যায়। ১৬ আগস্ট ২০০৮-এ আমি নাম দীক্ষা নিই। তারপর থেকে আমি ভালো হতে থাকি। গুরুজীর কৃপায় আজ আমি নিজের জমিতে ট্রাক্টর চালিয়ে জমি চাষ করি। গুরু মহারাজের আশীর্বাদে পুনরায় জীবন দান পাই। মহারাজ বন্দীছোড় যে কৃপা করেছেন, তা মুখে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। গুরুজী সতলোক থেকে আমার জীবন দান দেওয়ার জন্য এসেছেন। আমার কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণাম।

**জয় হো বন্দীছোড় কি!**
**আপনার দাস**
**ভক্ত রামস্বরূপ দাস**
**গ্রাম- বৌড়লী, জেলা-আম্বালা।**

⇨ সতলোক আশ্রমের অন্যান্য বই (আধ্যাত্মিক জ্ঞান গঙ্গা, গেহরি নজর গীতা মে, গীতা তোমার জ্ঞান অমৃত, সৃষ্টি রচনা সমগ্র; মানবতার অবনতি ও উন্নয়ন ইত্যাদি) আমাদের ওয়েবসাইট www.jagatgururampalji.org থেকে ডাউনলোড করতে পারেন।